ভালোবাসার সাম্পান

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। অধ্যাপনা করেছেন তিনি তিরিশ বছর—১৯৬২ সাল থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত। অধ্যাপক হিসেবে তাঁর খ্যাতি কিংবদন্তিতুল্য। ষাটের দশকে বাংলাদেশে যে নতুন ধারার সাহিত্য আন্দোলন হয়, তিনি ছিলেন তার নেতৃত্বে। সাহিত্য পত্রিকা 'কণ্ঠস্বর' সম্পাদনার মাধ্যমে সেকালের নবীন সাহিত্যিকদেরকে তিনি নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা দিয়ে সংহত ও বহমান করে রেখেছিলেন এক দশক ধরে। বাংলাদেশে টেলিভিশনের সূচনালগ্ন থেকে মননী, রুচিমান ও বিনোদন-সক্ষম ব্যক্তিত্ব হিশেবে আবির্ভূত হন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। টেলিভিশনের বিনোদন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় তিনি পথিকৃৎ ও অন্যতম সফল ব্যক্তিত্ব।

এইসব ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সাহিত্যচর্চায় নিবিষ্ট। কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটক, অনুবাদ, জার্নাল, জীবনীমূলক বই ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থভাণ্ডারও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ২১টি।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ব্যক্তিত্বের প্রায় সবগুলো দিক সমন্বিত হয়েছে তাঁর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সংগঠক সত্তায়। তিনি অনুভব করেছেন যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের প্রয়োজন অসংখ্য উদ্ভাসিত মানুষ। 'আলোকিত মানুষ চাই'—সারা দেশে এই আন্দোলনের অগ্রযাত্রী হিশেবে তেইশ বছর ধরে তিনি রয়েছেন সংগ্রামশীল। ২০০০ সাল থেকে সামাজিক আন্দোলনে উদ্যোগী ভূমিকার জন্য তিনি দেশব্যাপী অভিনন্দিত হয়েছেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধ আন্দোলন, পরিবেশ দূষণ-বিরোধী আন্দোলনসহ নানান সামাজিক আন্দোলন তাঁর নেতৃত্বে প্রাণ পেয়েছে।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, পিতা মৃত আযীম উদ্দিন, জন্মস্থান : পার্ক সার্কাস, কলকাতা। জন্মসাল : ২৫ জুলাই ১৯৪০। পৈতৃক নিবাস : কামারগতি, কচুয়া, বাগেরহাট। বর্তমান ঠিকানা : ৩৬৭/১/এ ফ্রিস্কুল স্ট্রিট ঢাকা। শিক্ষা : মাধ্যমিক : পাবনা জিলা স্কুল (১৯৫৫); উচ্চমাধ্যমিক : প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, বাগেরহাট ১৯৫৭ ; স্নাতক সম্মান (বাংলা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬০), স্নাতকোত্তর (বাংলা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬১)। পেশা : অধ্যাপনা; প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

পুরস্কার : জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার (১৯৭৭), মাহবুব উল্লাহ ট্রাস্ট পুরস্কার (১৯৯৮), রোটারি সিড পুরস্কার (১৯৯৯), বাংলাদেশ বুক ক্লাব পুরস্কার (২০০০)।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
ছবি : এম. এ. তাহের

সে এক সময় এসেছিল এই দেশে, এই ঢাকায়, ষাটের দশক, আয়ুব খানের সামরিক শাসনের কাঁটাতারে বিদ্ধ, কবিতার তথা সাহিত্যের কামড়ে অস্থির যুবাদের পদভারে কম্পিত, বিশ্বব্যাপী মূল্যবোধ-ভেঙে-ফেলা প্রতিবাদী তারুণ্যের আন্দোলনের ধাক্কায় টলটলায়মান, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের আঘাতে জর্জরিত। নতুন সময়ের নতুন ভাষাকে প্রকাশ করবার তীব্র বাসনায় একত্রিত হয়েছিল কয়েকজন অতিতরুণ, বের করেছিল সাহিত্যপত্র কণ্ঠস্বর (যার লেখকেরা পরবর্তীকালে বিখ্যাত হবেন ষাটের দশকের কবি-লেখক বলে, আবদুল মান্নান সৈয়দ কিংবা রফিক আজাদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতো কেউ-কেউ দশকের গণ্ডি পেরিয়ে মহাকালের গায়ে খোদিত করবেন নিজের নাম, পরে এসে যোগ দেবেন নির্মলেন্দু গুণ বা আবুল হাসান)। সেই কণ্ঠস্বর সম্পাদনা করা, প্রকাশ করা, তার জন্য অর্থসংগ্রহ করতে গিয়ে জিভ-বের-হয়ে-আসা গ্লানিকর কষ্টকর অধ্যবসায় চালিয়ে যাওয়া আর লেখক-সাহিত্যিকদের বুকভরা ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখার কেন্দ্রীয় ভূমিকাটি পালন করেছিলেন কিছুটা অগ্রজ, সৃজনশীল সাহিত্যিক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

ভালোবাসার সাম্পান সেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে সৃজনশীলতার নৌকা বয়ে নিয়ে যাওয়া নাবিকের স্মৃতিচারণার গল্প। এ গ্রন্থের কুশীলব হলেন সেদিনের তরুণ কবি-লেখকেরা, আজকের তরুণদের কাছে যাঁরা নায়কের আসনে অধিষ্ঠিত, যাঁদের প্রত্যেকের গল্প হতে পারে আলাদা আলাদা উপন্যাস। আর গ্রন্থের নায়ক হলো স্বয়ং সার্বভৌম সময়—মধ্যষাট থেকে মধ্যসত্তর—এমন সময়কাল একটা জাতির জীবনে আসে কদাচিৎই। এই বইয়ের প্রাণটুকু হলো ভালোবাসা, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মতো বিশালহৃদয় মানুষের প্রতিটা সৃজনশীল সাহিত্যিকের জন্য নিখাদ নিঃশেষ স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা এবং একই সঙ্গে শিল্প-সাহিত্য ও স্বদেশের জন্য একদল ভবিষ্যৎভাবনাবিহীন শৃঙ্খলমুক্ত তারুণ্যের অস্তিত্ব-কাঁপানো ভালোবাসা।

ভালোবাসার সাম্পান একই সঙ্গে ইতিহাস ও কিংবদন্তি, উপন্যাস ও স্মৃতিকথা; অনবদ্য আবেগদীপ্ত ও বুদ্ধি-ঝলকিত ভাষাশৈলীতে গাঁথা এ হলো আমাদের জাতির এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, একটা সাহিত্যিক সম্প্রদায় বা একদল সাহিত্যিকের বেড়ে ওঠার হাহাকারের সঙ্গে যেখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে একটা জাতির জন্ম-চিৎকার।

এ গ্রন্থ আরম্ভ করলে শেষ না করে বন্ধ করা মুশকিল এবং এ গ্রন্থ হাতে পেলে সংগ্রহ-ছাড়া করা অসম্ভব।

ISBN 984 410 294 4

প্রকাশনার পাঁচ দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখক
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০২

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল : mowla@accesstel.net

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
বাংলামটর, ঢাকা

মুদ্রণ
বসুন্ধরা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড
৫১/৫২ বনগ্রাম লেন, ঢাকা ১১০০

দাম
দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN 984 410 294 4

BHALOBASAR SAMPAN (A Reminiscence) by Abdullah Abu Sayeed. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Dhruba Esh. Price : Taka Two Hundred Fifty Only.

ভালোবাসার সাম্পান

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

যা পড়বেন

প্রথম খন্ড : শুরুর কথা /১৩
সমবেত, একত্রিত, আয়োজিত /১৬
পাপ ও পতন /২৯

দ্বিতীয় খন্ড : প্রথম কদম ফুল /৩৮
হোটেল নাইল ভ্যালি /৪৮
রাতের বেলার গান /৬১

তৃতীয় খন্ড : কলকাতার কলরবে /৬৫
পদপাতের শব্দ /৮৪

চতুর্থ খন্ড : যাত্রা শুরু /৯৫

পঞ্চম খন্ড : জলের আহ্বান /১৪০
পথের গল্প /১৭৮
সংকট ও স্বস্তি /২০৩

ষষ্ঠ খন্ড : অশান্ত কালপর্ব /২১২
শেষ বাসের যাত্রী /২৩৪

সপ্তম খন্ড : সাগর সমান বড় /২৫০
সত্তরের সহযাত্রী /২৭৪
শিশিরের শব্দের মতন /২৮৩
পরিশিষ্ট /২৮৫

দশকের পর দশক

চায়ের দোকানে ওরা কারা বসে আছে?
–ওরা বসে আছে শামসুর হাফিজুর।
ওরা বলো দেখি ঠিক কোন্ দশকের?
—ওরা পঞ্চাশ, ওরা সব পঞ্চাশ।

চায়ের দোকানে ওরা কারা আড্ডায়?
—ওরা বসে আছে সিকদার অরুণাভ।
গল্প করছে ওরা কোন্ দশকের?
চেনো না ওদের? ওরা ষাট দশকের।

চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছে কারা?
—ঐ বসে আছে আবিদ শিহাব ও যে।
ওদের দশক জানা আছে তোমাদের?
—কেন জানবো না, ওরা সব সত্তর।

চায়ের দোকানে আড্ডা পেটায় কারা?
—কাজল রিফাত বসে আছে ওরা ঐ।
ওদের সময় কোন্ কালে চিহ্নিত?
—আশির দশকে বেরিয়ে এসেছে ওরা।

চায়ের দোকানে ঐ যে ওখানে কারা?
—তপন অরুণ আড্ডা মারছে খুব।
ওদের বলবে ঠিক কোন্ দশকের?
—ওরা নব্বই, ওরা সব নব্বই।

পঞ্চাশ, ষাট সত্তর, আশি... সব
দশক দশক চলে যায় দ্রুত বেগে;
একদিন বিশ শতকও ফুরিয়ে আসে;
কালো মাথাগুলি হতে থাকে ধু ধু শাদা।

কার্তিক–রাতে শিশিরের ধ্বনি বাজে,
অঘ্রানে গেছে গাছের পাতারা ঝরে,
পৌষের হিমে পাখি মুড়ে ফ্যালে ডানা,
মাঘের বাতাসে উড়ে যায় শুধু ভুল।

দশকের পর দশক গিয়েছে চলে;
কালো মাথাগুলি হতে থাকে ধু ধু শাদা;
চিরযৌবনা লাস্যে লিখিয়ে নেয়
তার প্রশস্তি কবিতায় কবিতায়।

কার্তিকে বাজে শিশিরের ধ্বনি চুপে,
অঘ্রানে যায় গাছের পাতারা ঝরে,
পৌষের হিমে পাখিরা গুটোয় ডানা,
পুরোনো কবিতা মাঘের বাতাসে ওড়ে॥

আবদুল মান্নান সৈয়দ

ভূমিকা

ষাট-সত্তর দশকের তরুণ লেখকদের গল্প বলতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু শেষ করা গেল না। বাঙলা একাডেমীর বইমেলায় বই ধরানোর তাগিদে কিছুটা অসম্পূর্ণভাবে সবকিছু শেষ করে দিতে হল। কয়েকজনের গল্প বাকি রয়ে গেল, কিছু ভুলচুকও রয়ে থাকল। আগামীতে সময় পেলে ঠিক করে নিতে চেষ্টা করব।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
ফেব্রুয়ারি ২০০২

প্রথম খণ্ড

শুরুর কথা

সাহিত্যের অঙ্গনে সে-সময় ভালো সময় যে-সময় ভালো লেখকেরা জন্মায় ; কিন্তু সে-সময়টা আরো ভালো যখন ঐ লেখকেরা বন্ধু হয়। এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল ষাটের দশকে, তরুণ-লেখকদের মধ্যে। সব কালপর্বের মতো ঐ সময়েও বেশকিছু নবীন-লেখক এসে দাঁড়িয়েছিল এই সাহিত্যের অঙ্গনে। কেবল এসে দাঁড়ায়নি, এক উদ্দীপ্ত মুখর সাহিত্যযাত্রায় অংশ নিয়েছিল তাঁরা বন্ধু হিসেবে, সহযাত্রী হিসেবে। লেখক হিসেবে তারা সম্পন্ন ছিল কি না, সে বিচার-বিশ্লেষণের কাজ সমালোচকের। তবে এটুকু বলা যায় মোটামুটি ভালো লেখকদের একটা দল এই সময় দেখা দিয়েছিল আমাদের সাহিত্যের অঙ্গনে, যাঁরা একটা জলবহুল মেঘের মতো এই সাহিত্যের আকাশে দাঁড়িয়ে এর অঙ্গনকে খরা আর অনাবৃষ্টি থেকে বেশ কিছুদিন বাঁচিয়েছে এবং নিজেদের শ্রম, চেষ্টা এবং চরিত্র দিয়ে এই সাহিত্যক্ষেত্রে এমন কিছু উপহার দিয়েছে যা এর ধারাকে সজীব ও বহমান থাকতে সাহায্য করেছে।

আমি আমার প্রথম যৌবনের সুন্দর রক্তিম দিনগুলোয়, ঐ লেখকদের বন্ধু হতে দেখেছিলাম। সাহিত্যকে উপলক্ষ করে একটা তরুণ-লেখকগোষ্ঠীর সদস্যরা পরস্পরকে ভালোবেসেছিল। সে-ভালোবাসার ঢেউ সাহিত্যকে ছাড়িয়ে তাদের জীবনের আঙিনাকে প্লাবিত করেছে। অবৈষয়িক, অপার্থিব ও অবিশ্বাস্য এক আনন্দে যূথবদ্ধ হয়েছিল তারা। এমন দৃশ্য এর আগে বা পরে আমাদের এখানকার সাহিত্যে আর কখনো উথলে ওঠেনি। বাংলাসাহিত্যে এর একমাত্র উপমা তিরিশের সাহিত্য-আন্দোলন। আমাদের সাহিত্যে এর আগের লেখকদের মতো এর পরের লেখকরাও ব্যক্তিগত সংকীর্ণ কুঠুরিতে কেবলই একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, একাকীত্বের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ঐ সময়কার সেই অভাবিত দৃশ্য আজও আমার জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃশ্যগুলোর একটি।

এমন মত্ত ভালোবাসা, এমন উন্মাতাল ঢেউ, শিল্পের জন্যে এমন উদ্দাম উদগ্র নেশা বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। জগতের সুস্থতার খাতিরেই তাকে একদিন শান্ত হয়ে আসতে হয়। অল্প ক'টা দিনের সেই উত্তাল আনন্দলোক নিজের প্রমত্ত শীর্ষকে ছুঁয়ে একসময় নিজের নিয়মেই হারিয়ে গেছে। কিন্তু ঢেউয়ের সঙ্গে নিয়ে-আসা যে-নুড়িগুলোকে তা যাবার সময় পেছনে ফেলে গেছে তারা আজও বেলাভূমির ওপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। আমার এই লেখা সেই ছিটিয়ে থাকা নুড়িগুলোরই মালা।

ভালো হত যদি এই লেখাটি আজ না-লিখে বছর-পনেরো আগে লিখতে পারতাম। তাহলে প্রতিটি ঘটনা ও অনুভূতির প্রতি সুবিচার করা যেত। হাজার হাজার কাজ আর দায়ের নিচে নিষ্পিষ্ট এই জীবনস্মৃতি থেকে সবকিছু খুইয়ে এভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ত না। যেসব ঘটনা এই লেখার উপজীব্য তার সবগুলোই পঁচিশ থেকে চল্লিশ বছর আগে ঘটে-যাওয়া। প্রকৃতির নিয়মেই এর অধিকাংশ ঘটনা আমার ক্ষীয়মাণ স্মৃতির কুঠুরি থেকে জীর্ণ পাতার মতো ঝরে গেছে। সবচেয়ে রঙিন কথাগুলোও হয়ে এসেছে ধূসর আর বিবর্ণ।

পলায়মান জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার একটা পরিচিত উপায় হল সঞ্চয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বা দরকারি স্মৃতিগুলোকে—সময়ের দলিল ও কাগজপত্রগুলোকে—সাজিয়ে গুছিয়ে একান্ত দেরাজের ভেতর থরে থরে জমিয়ে রাখা। কিন্তু সঞ্চয়ের কোনোরকম উৎসাহ বা শক্তি আমার ভেতরে নেই। আমার প্রকৃতির প্রবণতা অনেকটা নির্মলেন্দু গুণের কবিতার সেই প্রেমিকের মতো, যার বক্তব্য : 'অনন্ত বিরহ চাই, ভালোবেসে কার্পণ্য শিখিনি।'

সেই কার্পণ্যহীন উদারতার জগতে এক অনন্ত নিঃসীম শূন্যতা আজ তাই হয়ে পড়েছে আমার নিয়তি। দুই হাতে জীবনকে কেবল ছড়াতে ছড়াতে চলে গেছি, এর কোনো হিসাব রাখিনি। একটা নিষ্ক্রিয়, অলস, হিসাববিমুখ ঔদাসীন্য দিয়ে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয়মুখগুলোকে, সুখ-দুঃখের সবচেয়ে অনিন্দ্য মুহূর্তগুলোকে, আমার একান্ত ভালোবাসাগুলোকে বেহাত করে ফেলেছি। নেহাত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বাঁধাই করে রাখা একসেট 'কণ্ঠস্বর' ছাড়া ষাটের দশকের কোনো পত্র-পত্রিকা, ব্যক্তিগত বা সম্পাদকীয় চিঠি—কোনোকিছুই আজ আমার কাছে নেই। একটা ঘসে-যাওয়া স্মৃতি আর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথোপকথনের ভেতর দিয়ে পাওয়া কিছু তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আজ আমাকে এই বইয়ের ত্বক-লাবণ্য দাঁড় করাতে হচ্ছে। এত অপ্রতুল তথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি স্মৃতিমূলক লেখার ঐতিহাসিক ভিত্তি পোক্ত হতে পারে না। এ-লেখারও তা হবে না। ছোটখাটো ভুলত্রুটির সম্ভাবনা ভালোরকমেই রয়ে যাবে। তবে তথ্যের ভুল থাকলেও এই বইয়ের যে-জায়গাটায় কোনো মিথ্যা থাকবে না বলেই মনে করি তা হল এর আবেগের এলাকাটুকুতে। একটি সাহিত্য-আন্দোলনে জড়িয়ে গিয়ে যে-সাথিত্বে, বন্ধুত্বে, ভালোবাসায় এবং সাহিত্যপ্রেমে আমরা, ষাটের দশকের তরুণ-

তরুণীরা একদিন উচ্ছল হয়ে উঠেছিলাম, সেই উজ্জীবনের গানকে তুলে ধরার চেষ্টা করব এই লেখার পৃষ্ঠাগুলোয়। যদি প্রতিভা থাকত, আমাদের প্রথম যৌবনের সেই টালমাটাল দিনগুলোকে যদি আরও রঙিন আরও শক্তিমন্ত ছবিতে জ্বলজ্বলে করে এঁকে রেখে যেতে পারতাম, নিজেকে অনেক বেশি কৃতার্থ মনে হত। কিন্তু যে–তারুণ্যের উন্মাতাল গল্প এই বইয়ের উপজীব্য, সেই তারুণ্য বহুদিন হয় আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। দুবছর আগে আমার বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। প্রথম যৌবনের উদ্দাম আলোড়নের সেই গল্প বর্ণনার জন্যে যে–রক্তিম ও সজীব শব্দের সম্ভার দরকার, যে–জ্বলন্ত আবেগ আর প্রাণের বৈভব প্রয়োজন তা আজ আমার দুহাতের আঙুল গলিয়ে হারিয়ে গেছে। যতটুকু যা আছে তা আমাদের তারুণ্য–ঝলমল দিনগুলোর করুণ প্রেতাত্মা মাত্র। তবু যে–সামান্য স্মৃতির সঞ্চয় রয়েছে সেটুকু লিখে রেখে না–গেলে যে কিছুই থাকে না। সে–উৎকণ্ঠা থেকে এই গল্প লিখতে বসা।

‘সমবেত, একত্রিত, আয়োজিত’

১

১৯৬৫ সালের মে-জুন মাসের একটি বিকেল। বেলা পড়তে শুরু করতেই সেকালের ঢাকার ‘তরুণতম’ লেখকদের প্রায় সকলেই এক দুই করে এসে ভিড় করতে শুরু করল পাবলিক লাইব্রেরির সামনের ছোট্ট মাঠটুকুতে। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির যে-ভবনটি টি.এস.সি.-শাহবাগ রাস্তাটার পশ্চিম পাড়ে দাঁড়িয়ে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, বর্তমানের গণ-পাঠাগারটি নির্মিত হওয়ার আগে সেটিই ছিল ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরি। বিশ শতকের আমেরিকান স্থাপত্যের ঝকঝকে প্রতীক হয়ে যে-কটি হাল-ফ্যাশনের সুরম্য দালান তখন ঢাকা শহরে মাথা উঁচু করে বিভিন্ন এলাকায় ফুটে আছে—ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউট ভবন, পরমাণু শক্তি কমিশন ভবন, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল ভবনের মতো এই পাবলিক লাইব্রেরিও তার একটি। ঢাকা শহরের সেকালের একঘেয়ে দালানকোঠার ভেতর এই ভবনগুলোর পারিপাট্য, নতুনত্ব ও স্থাপত্যের চমৎকারিত্ব আমাদের চোখে বিস্ময় ছড়াত। যে নিখাদ নান্দনিকতা, পারিপাট্য, বুদ্ধিপ্রাধান্য, ঋজুতা—এক কথায় আধুনিকতা—সেকালে শিল্পের আদর্শ হিশেবে যা আমাদের তখন অন্বিষ্ট—শেষের কবিতার গদ্যের পর, দু-চারটা বিক্ষিপ্ত শৈল্পিক উদাহরণ বাদ দিলে, এই দালানগুলোতেই আমরা তখন যেন তার সৌকর্যময় প্রতীক দেখতে পেতাম।*

তরুণ-লেখকেরা এক দুই করে জড়ো হতে শুরু করল সেই পাবলিক লাইব্রেরির চত্বরে। সবার ভেতরেই একটা উত্তেজিত ব্যগ্রতা আর কৌতূহল। তরুণেরা দুই দলে

---

* স্থপতি মাযহারুল ইসলামের স্থাপত্যরুচির পরিচয়বাহী এই পাবলিক লাইব্রেরি ভবনটি তার শৈল্পিক শ্রীর কারণে তখন দেশী-বিদেশী পত্রপত্রিকায় আলোচিত হচ্ছে। রমনার নির্জন বিশাল পটভূমিতে স্থাপিত এই আশ্চর্য দালানটির ভেতরে এসে সৌন্দর্য আর রহস্যের একটা নিঃশব্দ স্পর্শ অনুভব করতাম আমরা। দালানের চারধার জুড়ে ঘাসে-ঢাকা সবুজ লনের এখানে-ওখানে মূক হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা নভেরা আহমেদের মোজাইকের অভিনব বিমূর্ত ভাস্কর্যগুলো আমাদের সেই অনুভূতিকে আরও গাঢ় করে তুলত। বিকেলের বিষণ্ন ছায়া এগিয়ে এলে লনের সেই নির্জন ভাস্কর্যগুলো অস্ফুট নীরব কথার মতো চারপাশ থেকে আমাদের যেন আরও নিবিড়ভাবে ঘিরে ধরত।

বিভক্ত। এক দলে রয়েছে, অন্যদলের ভাষায় 'পবিত্রতাবাদীরা'—গতানুগতিক সাহিত্যের প্রচলিত আদর্শ ও মূল্যবোধগুলোকে আঁকড়ে-থাকা রাবীন্দ্রিক চেতনার একালীয় উত্তরসূরিরা, সত্য শিব সুন্দরের ফেলে-আসা পুরোনো আদর্শগুলোকে যারা নতুন যুগের তারুণ্যস্নানে পুনরুজ্জীবিত করতে চায়—এক কথায় তারা যারা আজও সনাতন আদর্শের প্রথাকে অবিচলিত রেখে পবিত্রতার স্বস্ত জলে জীবনের নিরাপদ ফুল ফোটাতে আগ্রহী।

অন্যদল পবিত্রতায় বিশ্বাস করে না। তারা ব্রাত্য, উচ্ছন্নে যাওয়া। তারা বিশ্বাস করে জীবনে—উষ্ণ, গনগনে, অনাস্বাদিত জীবনে ; এর অসহ্য সুখ আর অকথ্য যন্ত্রণার দীপ্র উড্ডীন পতাকায়। তারা জানে, বহ্নিমান আর যন্ত্রণাদগ্ধ এই জীবন গতিশীল নদীর মতোই পবিত্র। এর ভেতর আমুণ্ডু আত্মাহুতি দিয়ে ডুবুরির আদলে তুলে আনতে হবে জীবনের সব অর্থ আর অর্জন। নতুন যুগচেতনার দেশলাইয়ে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে সেই দুঃসহ যন্ত্রণার ভেতর থেকে উপহার দিতে হবে জীবনের নতুন অনুপম উপমা। গৃহপালিত জীবনের সেই আশ্রয়চ্যুতদের যাত্রা তাই অনিশ্চিত সমুদ্রের তরঙ্গসংকুল পথে। গতানুগতিক জীবনের নিরাপত্তা ফেলে এক সমূহ সর্বনাশের দিকে তারা নতজানু।

তবু সেদিন সেই সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে দুই দলের ভেতর সমঝোতার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আশায়। জনকয়েক শুভানুধ্যায়ীর পীড়াপীড়িতেই তা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য : বেশ কিছুদিন একসঙ্গে চলার পর তাদের সম্পর্কের ভেতর যে চিড় ধরেছে, শক্তিশালী চিকিৎসায় সে-বিভেদকে সারিয়ে তুলে আবার সব তরুণকে এক কাতারে নিয়ে আসা। এতে লাভ অনেক। সৌহার্দ্য আসবে, সম্প্রীতি বাড়বে, তৈরি হবে বৃহত্তর ঐক্যের ভিত্তি, আর সেই সমবেত আয়োজনের ভেতর থেকে জেগে উঠবে ষাট দশকের পরাক্রান্ত তারুণ্য, একটা অঘটন-ঘটনাকারী সম্ভাবনা হিসেবে তা দেখা দেবে। কিন্তু এরই মধ্যে দু-দলের হৃদয়ের ভেতরে যে-ফারাক তৈরি হয়ে গেছে তার পরিমাণও কম নয়। লেখকেরা ভাগ হয়ে গেছে স্পষ্ট দুটো দলে। প্রথম দলে রয়েছে সেবাব্রত চৌধুরী, হায়াৎ মামুদ, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, হুমায়ুন চৌধুরী ও অন্যান্যেরা। দ্বিতীয় দলের সভ্যেরা হল রফিক আজাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শহীদুর রহমান, সিকদার আমিনুল হক, প্রশান্ত ঘোষাল, মফিজুল আলম, ফারুক আলমগীর, ইউসুফ পাশা, আমি নিজে ও এমনি আরও অনেকে।

প্রথম দলের সবাই প্রায় আমার সমবয়সী, দু-তিন বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসা তরুণ। দ্বিতীয় দলে রয়েছে অতি-তরুণেরা, আমার চেয়ে দু-তিন বছরের ছোট এরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখনো সবাই। দু-দলের বিচ্ছেদ এতটাই বেড়ে গেছে যে এরি মধ্যে ঠিক হয়ে গেছে কোনোভাবেই আর একসঙ্গে থাকা চলবে না—দু-দলের লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি, বোধ, বিশ্বাস যেহেতু ভিন্ন তাই তাদের আত্মপ্রকাশের পত্রিকাও হবে আলাদা। নিজ নিজ আলাদা জীবনভাবনা তুলে ধরবে তারা নিজ নিজ মুখপত্রের

ভেতর দিয়ে। ঠিক হয়ে গেছে প্রথম দলের পক্ষ থেকে বেরোবে 'কালবেলা', সম্পাদনা করবে জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। দ্বিতীয় দলের পক্ষ থেকে বেরোবে 'কণ্ঠস্বর', সম্পাদক হব আমি। সেদিনের সম্মেলন ডাকা হয়েছে একাত্মতা আর সহমর্মিতার স্নিগ্ধ জলসেচে এইসব আপাত-বিরোধ মিটিয়ে ঐক্যের রবিশস্যে অপ্রেমের সেই পোড়ো প্রান্তরকে সবুজ করে তোলার শেষ আশায়।

এই সম্মেলনের ব্যাপারে প্রথম থেকেই আমি অনুৎসাহী ছিলাম। মনে হচ্ছিল কোনো লাভ নেই। অহেতুক চেষ্টা সব। ভুল ঘোড়ার ওপর অযথা বাজি ধরা।

প্রথম দলের সদস্যরা দ্বিতীয় দলের চেয়ে বয়সে বড় হলেও আমি বয়সে প্রথম দলের চেয়েও বড়। (জানি না হুমায়ুনের বা জ্যোতির আসল বয়স আমার সমান বা আমার চেয়ে বেশি ছিল কি না।) আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছি ওদের এক বছর আগে। কিন্তু একটা জায়গায় আমি তখন ওদের অনেক পেছনে। লেখা শুরু করেছি আমি ওদের চেয়ে অনেক দেরিতে। গল্পরচনায় জ্যোতি আর হুমায়ুন তো তখন আমাদের চোখে রীতিমতো বিস্ময়—যাকে বলা যায় : গোপন ঈর্ষার মধ্যমণি। তবু মনে হত ওরা আলাদা। আমাদের অর্থে এরা ঠিক ঐ সময়টার কালসম্মত বাসিন্দা নয়। যে-নতুন অনাস্বাদিত কালপর্ব দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে--মধ্যরাতের গণিকার মতো সর্বনাশের রাস্তায় প্রতিনিয়ত আহ্বান জানাচ্ছে—ওরা সে-পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। আমরা যা খুঁজছি, যাতে জ্বলছি, দগ্ধ হচ্ছি—সেই কষ্ট, সেই যন্ত্রণার অঙ্গীকার এক হুমায়ুন ছাড়া ওদের কারো ভেতরে নেই। এরা প্রায় সবাই স্বস্তি আর নিরাপত্তামধুর জীবনের অন্বেষী। মুখে এরা নিজেদের পঞ্চাশোত্তর বলে দাবি করে ঠিকই; কিন্তু শব্দ, ভাষা, বাচনভঙ্গি এমনকি চৈতন্যজগতের শরীর-গঠনেও ওরা কেবল পঞ্চাশের নয়, তারও অনেক আগের, তিরিশের, হয়তো রাবীন্দ্রিক ভাবনা-বলয়েরই। কিন্তু আমরা তো বলতে চাচ্ছি নতুন ভাষায় নতুন কিছু, অচিন্তিত কিছু, অনাস্বাদিত অভাবনীয় কিছু, নতুন বসন্তের আগুনে জীবনকে জ্বালিয়ে তা থেকে জিতে নেওয়া খাঁটি সোনার মতো ঝলমলে কিছু। (হ্যাঁ তেমনি এক উষ্ণ জ্বলন্ত আত্মঘাতী স্বাতন্ত্র্যকে অনুভব করছি আমরা।) কী করে এই তেল জলের বিবাদী স্বর, চেতনাজগতের এই পদ্মা-মেঘনার বৈরী স্রোত একসঙ্গে পথ চলবে?

তবু আমার মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে এই সম্মেলনের চূড়ান্ত ফয়সালায় আমাদের ধারাই প্রাধান্য পাবে। এই আশা অহেতুক নয়। প্রথমত সংখ্যায় আমরা ওদের চেয়ে অনেক বেশি, ওদের প্রায় কয়েক গুণ। এক কথায় ওরা কয়েকজন ছাড়া সবাই প্রায় আমরা। এমন কিছু অনুভূতির সম্পদ আমাদের তরুণতম লেখকদের স্নায়ুতন্ত্রকে প্রজ্বলিত করে রেখেছে যা ঐ দলের লেখকদের কেবল অচেনা নয়, অভাবিত। তাছাড়া আমরা তো জানি একালের সর্বশেষ জীবনানুভূতিগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করছি আমরাই। এরি মধ্যে আমাদের ক'জন লেখক—আবদুল মান্নান সৈয়দ (তখন 'অশোক সৈয়দ'), রফিক আজাদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শহীদুর

রহমানের মতো কেউ কেউ বিচ্ছিন্নভাবে নানান লেখায় এমন কিছু উজ্জ্বলতা ও নতুনত্ব উপহার দিয়েছে যা সবাইকে সচকিত করেছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের মুখপত্র 'কণ্ঠস্বর'ই যে হবে এই সম্মিলিত তরুণদের পত্রিকা, সে তো এমন অতি-আশা নয়। তাছাড়া আরও–একটা উল্লেখযোগ্য দিক আছে এই প্রত্যাশার। নাম হিসেবেও 'কালবেলা'র চেয়ে 'কণ্ঠস্বর' সুন্দর। 'কালবেলা'র চেয়ে অনেক বলিষ্ঠ আর দ্যোতনাময়। অন্যদিকে 'কালবেলা' শব্দটা একটা নিশ্চল গতিহীন কালো সময়ের ছবি চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়, প্রদোষ–ছায়ার নিষ্ক্রিয়তাকে চিরকালীন নিয়তিলিপি করে দিতে চায়, আমরা যার বিপক্ষে।

কিন্তু সভা শুরু হতেই বোঝা গেল স্বার্থ হাসিলের বুদ্ধিতে কতখানি অপদার্থ আমরা। চোখেমুখে কথাবার্তার ব্যাপারে আমার নাম সেই ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু নির্লজ্জভাবে নিজেদের ফায়দা উসুলের ব্যাপারে তা যে কতখানি অসার টের পেতে দেরি হল না। চোখের মাথা খেয়ে নিজেদের পত্রিকার পক্ষে যে কী করে ঢাক পেটানো যেতে পারে, কিছুতেই তা মাথায় এল না। এ তো নির্লজ্জ আত্মপ্রশংসার সামিল। সভায় কী কী বলা যেতে পারে, বাড়ি থেকে সেগুলো কমবেশি ভেবেও গিয়েছিলাম। কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধের কর্ণের মতো সময়কালে সেই অব্যর্থ অস্ত্রগুলোর কথা স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেল।

আশা ছিল আমার সম্পাদিতব্য 'কণ্ঠস্বর'–এর ব্যাপারে কথা বলতে আমি সংকোচ বোধ করলেও দলের তরুণেরা নীরব হয়ে থাকবে না। অন্তত তারা সোচ্চার হবে, হাল ধরবে। জোরালো উচ্চারণে মনের কথা স্পষ্ট করে বলে উঠবে। কিন্তু সময়কালে তাদের নিষ্ক্রিয়তা আমাকেও যেন ছাড়িয়ে গেল। সবাই চুপচাপ, নিস্পৃহ। নিজেকে অসম্ভব অসহায় মনে হতে লাগল। প্রায় ঘেমে উঠতে লাগলাম।

ওদিকে ওদের পক্ষ থেকে জ্যোতি আর হায়াৎ দাঁড়িয়ে গেছে দিগ্বিজয়ী বীরের মতো অপ্রতিরোধ্য ভঙ্গিতে। দুর্বার বাগ্মিতায় প্রমাণ করে চলেছে কেন পত্রিকার নাম হওয়া উচিত 'কালবেলা'। এটা একটা নষ্ট কাল, একটা অজন্মা অনুর্বর সময়। চারপাশে মূল্যবোধের ভিতগুলো কেবলই ধসে পড়ছে, সবকিছু অন্ধকার, এমন কালবেলার পত্রিকার নাম তো 'কালবেলা'ই হওয়া উচিত। এটাই তো সঙ্গত আর প্রত্যাশিত। অযথা ইতির কথা তুলে কেনই বা নিজেদের আর প্রতারিত করা, আর কেনই বা পুরোনো ভুলের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে রাখা। জ্যোতির আত্মবিশ্বাসে ভরা উদ্দীপ্ত 'কণ্ঠস্বর' বিকেলের স্তব্ধতাকে উথালপাথাল করে রেসকোর্সের সবুজ বাতাসে কেঁপে কেঁপে যেতে লাগল। গর্বিত দৃষ্টিতে জ্যোতি ঘুরে তাকাল লনের ওপর বসে–থাকা দলিত, পরাজিত ও করুণ প্রতিপক্ষের দিকে। তাদের কারো ভেতর তখন আর–কোনো প্রাণস্পন্দন নেই। সেই উদ্দীপ্ত বাগ্মিতার সামনে যেন সবাই সম্মোহিত, স্তব্ধ। আড়চোখে আমিও একবার তাকিয়ে নিলাম সেই অসহায়কুলের দিকে। সবাই যেন ছেঁড়া পাতার মতো মিয়োনো। ওদিকে অন্যপক্ষের ওরা তলোয়ারধারী রাজপুত্রের মতো জ্বলজ্বল করছে, যেন উদ্যত বর্শার ফলা একেকজন।

জ্যোতি আর হায়াতের যুক্তি আমার ওপরেও এমন জাদুকরি প্রভাব ফেলল যে খানিকক্ষণের জন্যে কেমন যেন হয়ে গেলাম। হঠাৎ করেই যেন যুক্তিবুদ্ধিগুলো গুলিয়ে গেল সব। বিশ্বাসই করে ফেললাম যে আমাদের নয়, ওদের কথাগুলোই আসলে ঠিক। ওদের সহযোগিতা দিয়ে যাওয়াই এই মুহূর্তে আমাদের একমাত্র দায়িত্ব। অনেক কম সত্যবস্তু নিয়েও ওরা জয়ী হল। সভার সিদ্ধান্ত তৈরি হতে দেরি হল না। সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল জ্যোতি নিজে। আচ্ছন্নের মতো মেনেও গেলাম।

সিদ্ধান্ত ছোট্ট : পত্রিকা দুটি হবে না, হবে একটি, নামে হবে 'কালবেলা'। সম্পাদক হব আমরা দুজন। জ্যোতি আর আমি। ঠিক হল লেখকেরা লেখা দিলে আমরা দুজন বসে যাচাই-বাছাই করে লেখা ছাপব। কোনো লেখা বাদ দিতে দুজনের ঐকমত্যের দরকার হবে। আমাদের দলের লেখকদের লেখা যাতে জ্যোতির ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কারণে খারিজ হয়ে না যেতে পারে সেজন্যে এই শর্ত রেখে দেওয়া হল।

২

আমি তখন থাকতাম পি ৪৮ পুরানা পল্টনে, মামার বাসায়। মামা মাস-কয়েকের জন্য সপরিবারে বিদেশ যাওয়ায় বাড়িটার তাবৎ দেখভালের দায়িত্ব তখন আমার ওপর। কাজটা আমার অপরিচিত নয়। এর আগেও দুবার—প্রথমবার চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় ও দ্বিতীয়বার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার সময় এই দায়িত্ব আমি পালন করেছি।

এই সেই পুরানা পল্টন যার ১৯২৭-২৮ সালের দিনগুলোর ঝাপসা বিষণ্ন স্মৃতি বুদ্ধদেব বসুকে সারাজীবন স্মৃতিবিধুর করে রেখেছিল। এই পুরানো পল্টনের বর্ণনাই তাঁর 'আমরা তিন জন' গল্পে এবং 'পুরানা পল্টন' স্মৃতিকথায় স্মরণীয় হয়ে আছে। আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন কেটেছে পুরানা পল্টনের ঐ বাড়িতে। ১৯৫৪ সালে আমি যে পুরানা পল্টনকে পেয়েছিলাম, বুদ্ধদেব বসুর পুরানা পল্টন থেকে তা খুব বেশি আলাদা নয়। উদ্ধত বাণিজ্যিকতার আগ্রাসন তখনো পুরানা পল্টনের শান্ত নিরিবিলি হৃদয়কে আজকের মতো ইটকাঠের জঙ্গলে পরিণত করেনি। গাছপালায় ঢাকা জনবিরল পুরানা পল্টন তখনো ছিমছাম পরিপাটি একটা আবাসিক পাড়ার সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবু সেদিনের পুরানা পল্টনকে বুদ্ধদেব বসুর পুরানা পল্টনের মতো ঢাকা নগরীর উত্তরপ্রান্তের শেষসীমা হিসেবে আর চিহ্নিত করা যাবে না; সে-সীমা ততদিনে শান্তিনগর, সিদ্ধেশ্বরীর বৃক্ষবহুল জগতের দিকে ক্ষুধার্ত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যে-বটগাছে শকুনের কান্না শুনে বুদ্ধদেব বসু 'ভয় পেতে ভালোবাসতেন' সে- বটগাছও তখন পুরানা পল্টনের হৃদয় থেকে একটা হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতিমাত্র।

বাসার পথে একলা হতেই এতক্ষণের বিমর্ষ ও হতাশ অবস্থাটা কেটে গিয়ে আসল বাস্তবতাগুলো এক এক করে মাথার ভেতর ফিরে আসতে লাগল। ওদের বাগ্মিতার সম্মোহনে যে-কথাগুলোকে কিছুক্ষণ আগেও নিয়তির মতো অব্যর্থ বলে মনে হয়েছিল সেগুলোর অন্তঃসারশূন্যতা পাঁজর উচিয়ে দেখা দিতে লাগল। বোধ, বিশ্বাস, শিল্পাদর্শ, জীবনদৃষ্টির এত পার্থক্য নিয়ে কী করে এক মঞ্চে আসর জমাব আমরা, কী করে অভিন্ন ঐক্যতানে গান গাইব? সেবাব্রত ওদের পক্ষ থেকে সম্পাদক হলে তবুও চলত। ওদের দলের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে ভাবসাম্যসম্পন্ন, আমাদের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু জ্যোতির ব্যাপারে আমাদের ভেতর অসন্তোষ বিস্তর। জ্যোতি এমনিতেই একটু বেশিরকমের স্পর্শকাতর, অভিমানী। থেকে-থেকে সেই অভিমান ঠোঁট উল্টে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে তিক্ত অনুযোগে ফেটে পড়ে। এরি মধ্যে ওর কিছু কিছু তাচ্ছিল্যজনক উক্তি আমাদের অনেককে ক্ষিপ্ত করেছে, নানারকম ভুল-বোঝাবুঝি সৃষ্টি করেছে। ও সম্পাদক থাকলে সেই অসন্তোষ ক্ষুব্ধ শিখায় ধূমায়িত হয়ে উঠবে। তাছাড়া ওর এসব তেরচা কথা আর মতপার্থক্যের সঙ্গে আমার পক্ষেই বা কতদিন সুস্থির মাথায় কাজ করা সম্ভব সেটাও তো আরেক চিন্তার বিষয়।

সম্মেলনের পর আমাদের দলের সবার মুখে যে-প্রশান্তি আর আত্মতৃপ্তির ভাব লক্ষ্য করেছি তাতে মনে হয়েছে সবাই ফলাফলটাকে স্বস্তির সঙ্গে মেনে নিয়েছে। ফিসফিসিয়েও কাউকে এ নিয়ে অভিযোগ করতে দেখিনি। অনুষ্ঠানের পর আমরা পাবলিক লাইব্রেরির এককোণে শরিফ মিয়ার ক্যান্টিনে গিয়ে বসেছি, গল্প করে চা খেয়েছি, তারপর যে-যার পথে বাসায় ফিরে গেছি। সবাই পরিতৃপ্ত, সুস্থিত, শমিত। অথচ আসল ঘটনাটা তো একেবারেই উল্টো হবার কথা।

এমনি উল্টোপাল্টা ভাবতে ভাবতে রাত এগারোটা-সাড়ে এগারোটার দিকে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত প্রায় একটার দিকে হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে হল। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। দরজা খুলে সামনে তাকাতেই সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতরও চোখে পড়ল একজোড়া খুশি-ডগমগ চোখ আর হাস্যবিস্ফারিত দুপাটি দাঁত—উদ্ভাসিত আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। নিশ্চয়ই প্রশান্ত ঘোষাল। আমাদের মধ্যে এক প্রশান্ত ছাড়া অমন ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতর কেবল দুপাটি শাদা দাঁত আর একজোড়া বড় বড় চোখ ছাড়া বমাল লোপাট হয়ে যাবার মতো কুচকুচে কালো গায়ের রঙ আর কার আছে? প্রশান্ত মানে আমাদের মুন্সিগঞ্জের প্রশান্ত। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় বছর তিন-চার আগে। ১৯৫৯-৬০-এর দিকে। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরের ক্লাসের ছাত্র।

মুন্সিগঞ্জ শহরের শ্রীপল্লীতে প্রশান্তের পৈতৃক বাড়ি। স্কুল-কলেজে মুন্সিগঞ্জেই পড়েছে ও। আমার আব্বা মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজের অধ্যক্ষ তখন। ছুটিছাটা পেলেই আমি মুন্সিগঞ্জে গিয়ে হাজির হতাম প্রকৃতির আশ্চর্য স্নিগ্ধ সান্নিধ্যের লোভে। মুন্সিগঞ্জ কলেজের পুরো দক্ষিণদিকটা জুড়ে সবুজ শস্যক্ষেতের আদিগন্ত

বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য, তার ভেতর দিয়ে গ্রামগুলোকে সুতোর মতো গেঁথে গেঁথে এগিয়ে-যাওয়া অপরিসর মেঠো রাস্তা, পুবদিকে মেঘনার সম্পন্ন বিশাল জলধারা। যাবার পথে নদীপথের উত্তাল জলজ অনুভূতি আমার মনটাকে স্নিগ্ধ করে তুলত। সেই সময়টায় প্রথম যৌবনের কবিতায় পাওয়া আবেগ-মাতাল দিনগুলো আমি পার হচ্ছি। প্রশান্ত ছিল বিজ্ঞানের ছাত্র। আমার উদ্দীপ্ত আবৃত্তি শুনে ও একসময় কবিতার প্রেমে পড়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ভর্তি হয়েছিল বিজ্ঞানে, বোটানিতে। কবিতা-মত্ত অবস্থায় তা ছেড়ে বাংলাসাহিত্যের ছাত্র হয়ে চলে আসে বাংলা বিভাগে। আমার দ্বারা বৈষয়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অসংখ্য মানুষের মধ্যে প্রশান্ত প্রথমদিকের একজন। এরপর থেকে প্রশান্ত আমাকে 'গুরুদেব' বলে ডাকতে শুরু করে, আমাদের সেই গুরুশিষ্য সম্পর্ক আজপর্যন্ত একইরকম অম্লান।

দেখা গেল ছোটখাটো একটা দলের নেতৃত্ব দিয়েই এসেছে প্রশান্ত। ওর পেছনে দাঁড়িয়ে-থাকা পাঁচ-ছয়জন তরুণের অস্ফুট চেহারা চোখে পড়ল অন্ধকারে। এদের কারো কথাই এখন আর মনে নেই।

ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলল প্রশান্ত, ভেতরে এল না। নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করেই বলল। কথা অল্প। বড়সড় হাতটা ডাইনেবাঁয়ে নেড়ে নেড়ে সাফ জানিয়ে দিল : 'জ্যোতি সম্পাদক থাকলে আমরা কেউ নাই এর সঙ্গে।'

জ্যোতির নামটা ক্ষুব্ধভাবে উচ্চারণ করতে গিয়ে তা করল বিশুদ্ধ বিক্রমপুরী উচ্চারণে। ওর কাছ থেকেই জানা গেল সভার পর সবাই জড়ো হয়ে কথা বলেছে এ নিয়ে। সবাই ওর সঙ্গে একমত।

'তোমরাই তো মেনে নিলে তখন। সবাইকে তো খুশিই দেখলাম।'

'কেউ খুশি হয় নাই, আপনে কথা না-কওনে সবাই থুম ধইরা গেছিল। আপনার উপর সবাই চইটা গেছে।'

'সবার মত কী?'

'সবাই এর বিরুদ্ধে।'

'তাহলে?' জিজ্ঞাসা করলাম প্রশান্তকে।

'তাইলে আর কী? আমাগো দল আমাগো। আমাগো পত্রিকা আমরাই করুম।'

আমারও তো তাই ধারণা। সকলেরই তো তাই। আমাদের যাত্রাই যদি আলাদা তবে আর অযথা দোমনা হয়ে লাভ কী? নতুন সময়ের নতুন অঙ্গীকার আমাদের রক্তে, এ নিয়ে কী করে অন্যদের সঙ্গে আমরা মিলব? কেবল ভাগ্যের নয়, ভাগের মা-ও গঙ্গা পায় না। প্রেম তো একেশ্বরবাদী। সবাই তো ভাবছেও এটা।

তাহলে দ্বিধা কিসের?

তাহলে বের হোক 'কণ্ঠস্বর'।

আলাদা যাত্রার অলাদা বন্ধুত্বের উষ্ণতায় মুখর হয়ে পাল তুলুক আমাদের ভালোবাসার সাম্পান।

৩

প্রশান্তের গায়ের রং ছিল চিকচিকে কালো। ওর কালো চুলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওর মুখের সেই ভ্রমর-কালো উজ্জ্বলতা অলৌকিক আভা ছড়াত। পদবিতে ওরা ছিল ঘোষাল, ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ-সন্তানের ফরসা হওয়ার কথা। কিন্তু প্রশান্তের ত্বকের এ-ব্যাপারে যেন কোনো বোধশোধ নেই। আমার ছোটভাই মামুন, ওর বন্ধু, এ নিয়ে ওকে প্রায়ই বিদ্রূপ করত। হিন্দি ভাষায় তামাশা করে বলত, 'ব্রাহ্মণ আগর কালা হোতা তো বহত খতরনাক হোতা।'

হোক প্রশান্ত কালো, কিন্তু একদিন, ষাটের দশকে আমরা, ঐ সময়কার তরুণ-লেখকরা যে-নির্জলা বন্ধুত্বে আর সাহিত্য-উদ্দীপনায় জ্বলে উঠেছিলাম তার প্রথম সূত্রটি তো ছিল সেই প্রশান্তই। ওর সম্পর্কের সূত্রেই তো ঐ তরুণদের প্রথম ছোট্ট দলটি পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল, একখানে হয়েছিল।

জগন্নাথ হলের ১৫০ নম্বর রুমে প্রশান্ত থাকত। ওর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের পথ ধরেই ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরের দিকে ষাটের তরুণ লেখকেরা প্রথমবারের মতো একত্রিত হয় ওর রুমে। ওখানেই জন্ম নেয় আন্দোলনের অস্ফুট প্রাথমিক রূপরেখা। আন্দোলনের বছর-দুয়েকের প্রতিটি তৎপরতার ভেতর সপ্রাণভাবে জড়িয়ে থেকে এই মুখর তারুণ্যযাত্রাকে ও শক্তি দিয়েছে, বলীয়ান করেছে। ওর নিখাদ সাহিত্যপ্রেম আর ব্যক্তিগত হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে সবাইকে একখানে হতে ডাক দিয়েছে।*

মুন্সিগঞ্জে প্রশান্ত আর আমি যখন আমাদের অবিশ্রান্ত কবিতা-আবৃত্তি আর সাহিত্যালোচনা নিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে দিন কাটাচ্ছি তখন আমরা ভাবতেও পারিনি

---

* কিন্তু এর পর হঠাৎ করেই সেই ভূমিকা থেকে ঘটে ওর নিঃশব্দ প্রস্থান। এতদিনের পরিচিত বন্ধুবান্ধব, মধ্যরাতের রাজপথ, সাহিত্যের উত্তেজনার ঝাঁঝালো জগৎ—সবকিছু ছেড়েছুড়ে হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে যায় প্রশান্ত। সাংসারিকতার আবর্তে প্রায় মৌমাছির মতো প্রোথিত হয়ে যায়। কোনো অভিমান বা মতান্তর থেকে নয়, একা-একা প্রায় অকারণেই বিদায় নিয়ে যায় ও। এই বিদায় যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি ভ্রূক্ষেপহীন। এরপর আমাদের পনেরো বছরের উত্তাল হল্লার জগতে ভুল করে একবারের জন্যও উঁকি দিতে আসেনি প্রশান্ত। গত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর মুন্সিগঞ্জ থেকে নিয়মিত যাতায়াত করে দৈনিক ইত্তেফাক অফিসে সাংবাদিকতা করেছে, কিন্তু ভুলেও পুরোনো কারো ব্যাপারে কোনো খোঁজখবর করেনি। যেন এই উদ্দাম জগতের কেউ ছিল না ও কোনোদিন, কারো প্রতি প্রতিজ্ঞা বা দায় থাকারও কোনো কথা ছিল না। এমনকি বছর-কয়েক আগে যখন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ষাটের দশকের সাহিত্য-সৈনিকদের পুনর্মিলনীর উদ্যোগ নেওয়া হল তখন সেই অন্তরঙ্গ মধুর স্মৃতিবাহী সমাবেশে যে-একমাত্র মানুষটি যোগদানের সুযোগকে অবলীলায় তাচ্ছিল্য করেছে সে তো এই প্রশান্ত ঘোষালই।

ষাটের দশকের তরুণ-লেখকদের যে-বিশাল সংঘ অচিরেই দানা বাঁধতে যাচ্ছে, আমরা আমাদের অজান্তে, আমাদের আত্মিক নৈকট্যের ভেতর দিয়ে আসলে সেই সংঘের দিকেই পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে একইভাবে নিজেদের অগোচরে আরও অনেকগুলো দলই সেদিন এগিয়ে আসছিল এই অনিবার্য গন্তব্যের দিকে, আমাদের মতো তারা নিজেরাও কেউ তা জানত না। একটা দুর্জ্ঞেয় বাধ্যতা আমাদের টেনে এনেছিল সেই তরুণ বহ্নুৎসবের দিকে। আশ্চর্য জাদুতে তা আমাদের জোড়া লাগিয়ে সবাইকে এক করে দিয়েছিল। ইতিহাসের অবধারিত প্রয়োজন হয়তো চিরকালই তার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এমনিভাবে পায়ে পায়ে এগিয়ে নিয়ে আসে, সবাইকে এক সুতোয় বেঁধে তার অব্যাহতিহীন পথের সৈনিক করে দেয়।

ষাটের এই তারুণ্যমেলায় মুন্সিগঞ্জ-গ্রুপ হিসেবে আমরা যারা এসে যোগ দিয়েছিলাম তাদের মধ্যে আমি আর প্রশান্ত বাদে আরও যে-দুজন সদস্য ছিল তাদের ভেতর সিকদার আমিনুল হক একজন। সিকদারের আব্বা চাকরি করতেন রেলে। তাঁকে যখন-তখন যেখানে-সেখানে বদলি হতে হত। তাই সুযোগসুবিধা বুঝে নিজের পরিবারকে একেকবার একেক জায়গায় রাখতে হয়েছে তাঁকে। এই সূত্রে প্রথমে রাজবাড়ি ও পরে মুন্সিগঞ্জের শ্রীপল্লীতে এসে থাকতে হয়েছিল সিকদারদের। ওর সঙ্গে প্রশান্তের পরিচয় এবং বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এই সুবাদেই। এরপর ঢাকায় এসে দলেবলে ভিড়ে যায় ঐ হৈ হৈ দলে।

প্রথম থেকেই কবিতা লিখত সিকদার। স্নিগ্ধ, অনুরণিত শব্দময় সব কবিতা। শব্দে শব্দে এমন এক সৌকর্যময় ধ্বনিজগৎ প্রথম থেকেই ও রচনা করতে পারত যা কবিতাকে ব্যঞ্জিত করে। ওর কবিতা ছবির জগৎও অনবদ্য। অনেকের মতো আমি নিজেও ওর কবিতার এসব গুণের অনুরাগী। আমাদের দলের হাতে-গোনা যে-গুটিকয় কবি আজপর্যন্ত কবিতা-মত্ততার ভেতর জেগে আছে, কবিতাপ্রেমিকদের ভালোবাসা কাড়ছে, সিকদার তাদের একজন।

মুন্সিগঞ্জ গ্রুপের আর-একজন সদস্য ছিল মাহবুবুল আলম জিন্নাহ। সারাক্ষণ সবার জন্যে এক মিহি হাস্যরসের বিরতিহীন জোগানদার ছিল জিনু। পাকিস্তান হবার কিছু আগে বা পরে জন্মানোর খেসারত হিসেবে নামের সঙ্গে যাদের কায়েদে আজম জিন্নাহর 'জিন্নাহ' অংশটি, তাঁর টুপির মতোই, আজীবন বয়ে বেড়াতে হয়েছে, জিনু তাদের একজন। লেখার ব্যাপারে আদৌ উৎসাহ ছিল না ওর। কিন্তু সাহিত্য-ব্যাপারে ওর আগ্রহ যেমন ছিল জাগ্রত, সাহিত্যের বোধ তেমনি ছিল প্রখর। হাস্যকৌতুকের, বিশেষ করে চোরাগোপ্তা হাস্যরসের একধরনের সূক্ষ্ম ও বিস্ফোরক শক্তি ছিল ওর ভেতর। আমাদের প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী জিনু নামের ঐ ছোটখাটো মানুষটি—ওর সূক্ষ্ম প্রখর কৌতুকরসে আমাদের পুরো দলটাকে যেভাবে তাতিয়ে রেখেছে তেমন কে আর পেরেছে আমাদের ভেতর!

রফিক আজাদের সঙ্গে সিকদারের পরিচয় হয় ঢাকায়, একেবারে হঠাৎ করেই। টাঙ্গাইলের করটিয়ায় বাড়ি হলেও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে

রফিক নেত্রকোণা থেকে। ঢাকায় আসে ষাট সালে, এসেই ভর্তি হয়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্সে। বাষট্টির আগস্টের দিকে রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়েছিল ফিসের টাকা জমা দেবার জন্যে, দাঁড়াতে হয়েছিল লম্বা লাইনে। ওর সঙ্গে ছিল দর্শনের ছাত্র মুশফিকুর রহমান। কবিতা-অন্তপ্রাণ ছিল মুশফিকের, জীবনানন্দের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত। ওর নিজের কবিতাতেও ছিল জীবনানন্দের ধূসর আমেজ। লাইনে দাঁড়িয়ে কবিতা নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক করে যাচ্ছিল রফিক আর মুশফিক, আশেপাশের লোকজনদের অস্তিত্ব প্রায় ভুলে গিয়েই। লাইনের শেষের দিকে ছিল সিকদার। শূন্যচোখে দাঁড়িয়ে ছিল লাইনে। হঠাৎ কবিতার গন্ধ পেয়ে এক পা দু পা করে এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিল তাদের কাছে।

'আমি সিকদার আমিনুল হক।'

'আপনি সিকদার আমিনুল হক, খুব সুন্দর কবিতা ভাই আপনার!' বলে উৎসাহে হাত বাড়িয়ে সিকদারের সঙ্গে হাত মেলাল রফিক।

'আপনার পরিচয় তো' ... আমতা আমতা করে চলে সিকদার।

'আমার নাম রফিক আজাদ। বাংলায় পড়ি। পেছন থেকে চলে আসুন-না এখানে। টাকা জমা দেওয়া নিয়ে ভাববেন না। আমরা ওটা করে দেব।'

হৈ চৈ ভরা অন্তরঙ্গতায় সিকদার এসে গেল দলের ভেতর। সেই চলে আসাও যেন সমচেতনার তারুণ্যকে আসন্ন লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে নিয়ে চলল। টাকা জমা দেওয়ার পর কয়েক ঘন্টা ধরে সাহিত্যের নানা ব্যাপার নিয়ে চলল মুখর আর উত্তপ্ত আলাপ-আলোচনা। বিকেল পড়ে এলে সিকদার বলল, 'সময় থাকলে চলে আসুন-না ১৫০ জগন্নাথ হলে, প্রশান্তর ওখানে। তরুণদের সাহিত্য-আন্দোলন নিয়ে আমরা আলাপে বসছি। সায়ীদ ভাইও আসবেন।'

'বাংলা ডিপার্টমেন্টের সায়ীদ ভাই? ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজের লেকচারার?'

'হ্যাঁ।'

'কবে? কখন?'

'বুধবার বিকেল পাঁচটায়।'

'নিশ্চয়ই আসব।'

৪

আমাদের মুন্সিগঞ্জ-গ্রুপ গড়ে উঠেছিল আটান্ন-উনষাটের দিকে। ঠিক একই সময়ে ঢাকা কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের ভেতর গড়ে উঠতে শুরু করেছিল তরুণ-লেখকদের আর-একটি দল। এই দলের সদস্য-সংখ্যা পাঁচ। সৈয়দ আবদুল

মান্নান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সিকন্দার দারা শিকোহ, আমিনুল ইসলাম বেদু ও মফিজুল আলম। ওদের প্রথম তিনজন কলেজে থাকতেই লেখালেখি শুরু করে দিয়েছিল। বাকি দুজন লেখালেখিতে এসেছিল পরে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে। বহুযুগের মতো সে-সময়ও ঢাকা কলেজই ছিল দেশের শ্রেষ্ঠ কলেজ। দেশের সেরা অধ্যাপকে, জ্যোতিষ্কে-নক্ষত্রে ঝলমল করেছে এর অঙ্গন। বাংলা বিভাগ আলো করে আছেন শওকত ওসমান। ইংরেজি বিভাগে আছেন কবীর চৌধুরী, আবু রুশদ মতিনউদ্দীন, মোহাম্মদ নোমানের মতো সুপরিচিত লেখক-অধ্যাপকেরা। অন্যান্য বিভাগেও ছিলেন এমনি সব বাঘা-বাঘা শিক্ষক। সাহিত্যের জন্যে এমনি এক অনুকূল পরিবেশে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব আর উষ্ণ সাহিত্যপ্রেমের মধ্যে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে এই ছোট্ট দলটি। বিকেল হলেই সুন্দরী মেয়েদের দেখা পাবার আশায় নিউমার্কেটে নিয়মিত হাজিরা, সাহিত্য নিয়ে সারাক্ষণ তুলকালাম আড্ডা আর লেখা, আর 'ময়ুখ' নামে একটি 'কোনোদিন বের করতে না-পারা' পত্রিকার স্বপ্ন দেখতে দেখতে কেটে যাচ্ছিল তাদের কলেজ-জীবনের দিনগুলো।

পাঁচজনের মধ্যে 'গোলগাল, মোটাসোটা, ফরসা, সুদর্শন' সিকন্দার দারা শিকোহ ছিল কবি আবদুল কাদিরের বড়ছেলে। কাজী নজরুল ইসলাম তার নামকরণ করেছেন। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ তার নানা। পারিবারিক জৌলুশে দপদপ করত দারা শিকোহ। মূলত গল্প লিখত সে, অনুবাদও করত কিছু কিছু। 'মাহে নও', 'সওগাত', 'পাকিস্তানী খবরে' সে-সময় একের পর এক লেখা বের হওয়া শুরু হওয়ায় সে কল্কে পেয়ে যায় লেখক হিসেবে। কিন্তু সে কেবলই কিছুদিনের জন্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠেই বদলে যায় দারা শিকোহ। সাহিত্য ছেড়ে দেয় পুরোপুরি। বন্ধুদের সম্পর্ক ত্যাগ করে। সাহিত্যের মাদকতা থেকে সেই-যে বিদায় নিয়ে চলে যায় আর ফেরেনি কোনোদিন।

সৈয়দ আবদুল মান্নানের লেখা শুরু হয় গল্পরচনা দিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা হয়ে যায় একটি গল্প। নাম : 'আকাশটা কালো'। এর পরপরই ইউনিভার্সিটি উইমেন্স হলের প্রতিযোগিতায় গল্প পাঠিয়ে জুটে যায় দ্বিতীয় পুরস্কার। কার্জন হলে থৈ থৈ করা সুবেশী মেয়েদের ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ হেঁটে উপাচার্যের হাত থেকে পুরস্কার নিতে গিয়ে লাল-হয়ে-ওঠা কানদুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। বুকের ভেতর ভালো লেখক হবার স্বপ্ন তিরতির করে।

লেখার ব্যাপারে মান্নানের মতোই আগ্রহ ও যত্নপরতা ছিল আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের। ইলিয়াস তখনো বড়দের জন্যে লেখা শুরু করেনি। লিখে যাচ্ছে ছোটদের গল্প। 'চোর' নামে ওর একটা গল্প সে-সময় বেরিয়েছিল আজাদে, তাই নিয়ে রীতিমত ঘুম-কাড়া উত্তেজনা।

ষাটের দিকে এই ঢাকা কলেজ গ্রুপ দলসুদ্ধ উঠে আসে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। এক দারা শিকোহ ছাড়া সবাই ভর্তি হয়ে পড়ে বাংলা অনার্সে। বোটানি ছেড়ে প্রশান্তও এসে জুটে যায় ওদের দলে।

সিকদার জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হলেও বন্ধু আর সাহিত্যের টানে ওর মূল বিচরণক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল দাঁড়ায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। বাষট্টির মাঝামাঝি রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে বদলি হয়ে এসে আমি যোগ দিয়েছি তেজগাঁওয়ের ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজে, এখন এর নাম বিজ্ঞান কলেজ। নবীন প্রভাষক আমি। বছরখানেক আগে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে গেলেও সাহিত্য আর তরুণ–লেখকদের টানে তখনো ওখানে ঘুরে বেড়াই। সারাদেশের সবখান থেকে সবারই চোখ যেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগ তখন মেডিক্যাল কলেজের দক্ষিণদিকের নিষ্প্রাণ ছোট ছোট ঘরবাড়ির গেরস্থালি ছেড়ে উঠে এসেছে আলো–জানালায় ভরা আজকের আধুনিক বিশাল ঝকঝকে কলাভবনে। উজ্জ্বল হরিণীর মতো শ্রী তখন তার। আমরাও যেন সেই নতুন আলোকিত পটপরিবর্তনের সঙ্গে পা ফেলে কোনো নতুন আর অপ্রত্যাশিতের স্বপ্নে উৎকর্ণ হয়ে রয়েছি। এই বিদ্যালয় যেন সেই সময়কার সারাদেশের সাহিত্যমাতাল তরুণদের এক সাংস্কৃতিক মক্কা, যেখানে এলে যোগ দেওয়া যাবে তারুণ্যের উথলে–ওঠা মহাজমায়েতে। নতুনের, নিষিদ্ধের, অনাস্বাদিতের বহ্ন্যুৎসবে জীবন জ্বালিয়ে যৌবনকে আবিল করে তোলা যাবে অকথ্য পুলকে ।

দেখতে দেখতে দেশের নানান এলাকা থেকে এগিয়ে এল আরও অনেকে। ১৯৬০ থেকে ৬৫–এর মধ্যে একটা পুরো দল দুদ্দাড় শব্দে এসে জড়ো হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। সিলেট থেকে ভাঙা সিলেটি উচ্চারণে খো খো করতে করতে হাজির হল আফজাল চৌধুরী। এল পুরোনো ঢাকার নতুন কবি ইমরুল চৌধুরী, এক হাতে তার একালের কবিতার ইশতাহার, অন্য হাতে শিশুসাহিত্যের উৎসাহ। 'ভূতের সঙ্গে ষাট সেকেন্ড', 'ইমু মিয়ার দেশভ্রমণ' এসব বেরিয়ে গেছে ওর তখন। সুদূর বরিশালের উলানিয়া জমিদারবাড়ি থেকে এসে হাজির হল আশিক–ই–ওয়াহিদ মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম চৌধুরী, এসে হয়ে গেল আসাদ চৌধুরী। এল নামে আর চেহারায় পূর্বপুরুষের ইরানি ঐতিহ্য নিয়ে আলী আগা জ্যাকারিয়া সিরাজী, এসে হল জ্যাক সিরাজী। এল সুস্মিত কবিতা নিয়ে সুস্মিত চেহারার ফারুক আলমগীর। এল উত্তাল তারুণ্যে প্রোজ্জ্বল মোহাম্মদ রফিক, রণপায় চড়ে পুরোনো ঢাকা থেকে এল রণপা চৌধুরী (রণজিৎ কুমার পাল চৌধুরী), ঝিনাইদহ থেকে এল গল্পকার শহীদুর রহমান, যৌনতার কয়েক হাজার অশ্বশক্তি নিয়ে এসে গেল ইউসুফ পাশা, এল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মোহাম্মদ জামাল খান, এল জামাত আলী—এসে শামিল হয়ে গেল তরুণদের সেই তূরীয় জামাতে। এল সুনির্মল গাঙ্গুলী, ইয়সিন আমিন, আবদুর রশিদ–এর মতো জানা–অজানা তরুণের দল। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন মুখর হয় উঠল উষ্ণ উৎসুক সেই অপরিচিত তারুণ্যের পদপাতে।

৫

প্রথম ষাটের এই তরুণ-লেখকদের অধিকাংশই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র। যেন একই স্বপ্নের অভিন্ন হাতছানিতে জড়ো হয়ে গেল তারা ঐ বিভাগে। আবদুল মান্নান সৈয়দ, রফিক আজাদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আসাদ চৌধুরী থেকে আরমান চৌধুরী, শহীদুর রহমান, ফারুক আলমগীর, ইমরুল চৌধুরী, ইউসুফ পাশা, প্রশান্ত ঘোষাল, আমিনুল ইসলাম বেদু, মফিজুল আলম—যারা পরবর্তীতে এখানকার সাহিত্যে ক্রমান্বয়ে খ্যাতিমান বা ধীরে ধীরে বিস্মৃত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই ছিল এই বিভাগের ছাত্র। বিভাগের চৌহদ্দির ভেতরেই পেয়ে গিয়েছিল তারা পরস্পরকে। তাই পরস্পরকে খুঁজে নিতে বা চিনে নিতেও তাদের খুব-একটা দেরি হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে নানান জায়গায় জমে-ওঠা আলাপ-আলোচনা, আড্ডা আর হৈ-হুল্লোড়ের ভেতর দিয়ে তারা পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠেছে নিজেদের অগোচরেই। শুধু শিল্প-সাহিত্য নয়, বন্ধুত্বই ছিল তাদের আসল ব্যাপার। একই চেতনায় একই জীবনানুভূতির উন্মাদনায় একাত্ম হয়ে যৌবনের অমিত উত্তাল বেহিশেবি বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল আসল ব্যাপার।

পাপ ও পতন

১

একটা নতুনের নেশায় পেয়ে বসেছিল এই তরুণদের—নতুনের এবং সর্বনাশের নেশা। সে নেশা যেমন অদমিত তেমনি বেপরোয়া। যা-কিছু অচল, ঘেয়ো আর অবসিত সে-সবকে উপড়ে ফেলে সেখানে 'নতুন কিছু, ব্যতিক্রমী কিছু' নিয়ে আসতে হবে। অভিজ্ঞতার ঝাঁঝালো উন্মাদনায় জীবন তাতিয়ে উগ্র তপ্ত নতুন ও অনাস্বাদিতকে উপহার দিতে হবে :

কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি বহে আনি;
একদিন শুনেছ যে-সুর—
ফুরায়েছে,—পুরানো তা—কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
আর নাই কেউ !
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার;—শেষ মুহূর্তের
আমি এক;—সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে;
তারপর আসিয়াছি নেমে
আমি;
আমার পায়ের শব্দ শোনো;—
নতুন এ—আর সব হারানো—পুরোনো।

[কয়েকটি লাইন]

এই নতুন আর অভাবনীয়ের জন্যই সবকিছু মিলে এমন আত্মঘাতী আয়োজন। এত আগুন আর আত্মাহুতি।

দুটো 'ন'-এর নেশা পেয়ে বসেছিল তাদের—নতুনত্বের আর নষ্টের। নতুনত্বের নেশা দেখতে পাওয়া যায় প্রতিটি নতুন সাহিত্যযুগের আবির্ভাবের সময়ে। উদগ্র হিংস্রতায় গৃহপালিত জীবনের পরিচিত, নিরাপদ ও আত্মসন্তুষ্ট পথকে উপেক্ষা করে ছুটে যায় তারা অপরিচিতের রক্তাক্ত রাস্তায়; যৌবনের অবিশ্বাস্য মূল্যে খরিদ-করা কিছু অভাবিত জীবনাস্বাদকে উপহার দেবার জন্যে। কিন্তু নষ্টের নেশা কেবলমাত্র অবক্ষয়ীকালের লেখকদের সম্পত্তি।

কেন এমন নষ্টের আকুতি এই সময়ের লেখকদের মধ্যে? কেন এই বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি? তবে কি সেই যুগ কোনোভাবে সত্যি সত্যি অবক্ষয়ী হয়ে পড়েছিল? হ্যাঁ, তাই। ষাটের দশকের শুরুতেই ঘটেছিল ঘটনাটা, আমাদের জাতীয় জীবনে। রাষ্ট্র আর সমাজজীবনের পরিবর্তনের পথ ধরেই এই অবক্ষয় এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের গোটা পরিপার্শ্বে। এই রুগ্ণতা যেমন নেমেছিল সেকালের সমাজজীবনে, তেমনি এসেছিল রাজনীতিতে, মূল্যবোধে, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে। এই লেখকদের ব্যাপারে যা প্রসংশনীয় তা হল যে, সব যুগের স্পর্শকাতর শিল্পীদের মতোই এই অবক্ষয়ের নতুনত্ব, ক্লেদ ও উত্তেজনাকে তারা ধারণ করেছিল তাদের শিউড়ে-ওঠা অস্তিত্বে, এর ভেতর আগাগোড়া জড়িয়ে গিয়ে এর আবিলতাকে পুরোপুরি ধারণ করেছিল। বিনষ্টি আর ক্লেদের এই নবাস্বাদিত উত্তেজনাকে তারা উদযাপন করেছিল রক্তের প্রদীপ্ত কণিকায়, জীবনযাপনের নৈরাজ্যে। এই আত্মহননের নেশায় দলবেঁধে অনেকে হাজির হয়েছে নিষিদ্ধ পল্লীর দরোজায়। কেউ খুঁজে নিয়েছে নেশাগ্রস্ততার বিবর। এগিয়ে গেছে নানা ধরনের আততায়ী পথে। অনেকেই হয়ে পড়েছে সেই নিঃসঙ্গতাক্লিষ্ট রুগ্ণ কালের অপচিত সন্তান। তাই এত নষ্টের আকুতি। কিন্তু এই অবক্ষয় তাদের ভেতর কেবল পচনের আবেগ জাগিয়ে তোলেনি; জ্বালিয়ে তুলেছিল এর নতুনত্ব এবং উত্তেজনা, এর পাপ ও রোমাঞ্চের উষ্ণ উন্মাদনাকেও। গতানুগতিক জীবন থেকে ভিন্ন এক জীবনানুভূতিতে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিল তারা। হয়ে উঠেছিল সেই পরিবর্তিত কালের নতুন, অনাস্বাদিত ও অপরিচিত আবেগানুভূতির প্রথম উদ্বোধনের তরুণ চারণ।

এক কথায় বিনষ্টি আর পচনের ব্যতিক্রমী সরণীতে জীবনকে অর্ঘ্য দিয়েছে তারা। কেনই বা দেবে না? জীবনকে আলাদা অবস্থান থেকে স্পর্শ করার এও তো এক ভিন্নমাত্রী প্রক্রিয়া। জীবনের এও তো এক বলীয়ান উদযাপন। ছুঁৎমার্গের দোহাই দিয়ে জীবনের ভেতরকার এই নগ্ন আদিম রক্তমাংসময় মানুষটিকে কেন শুধু বাইরে রেখে দিতে হবে। কেন কেবল শুদ্ধতা আর পবিত্রতার সুন্দর মৃত গতানুগতিকতার নপুংসক স্তবে জীবনকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে যেতে হবে? তাতে জীবনের সম্পূর্ণতা কোথায়?

তাদের এই স্বেচ্ছাচারী জীবনাচরণ সেকালের পূর্ব পাকিস্তানের শান্ত নিস্তরঙ্গ সমাজজীবনে আলোড়ন তুলেছিল। ক্ষুব্ধ ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল সুশীল সামাজিকের দল। তারা বুঝতে পারেনি এইসব আপাত বিনষ্টির ভেতর দিয়ে তারা নতুন ও পরিবর্তিত কালকে আকণ্ঠ উদ্‌যাপন করতে চাইছে তাদের রক্তধারায়, বাইরের

ক্লেদাক্ত ফেনিল উদ্দামতার নিচে গাঢ় হয়ে আছে তাদের যুগ-বেদনার মূক অশ্রু।

প্রশ্ন জাগতে পারে : কোন্ বেদনার অশ্রু এ? অবক্ষয় আর আবিলতার ভেতর অশ্রুর অবকাশ কোথায়? অশ্রু এজন্যে যে তাদের তরুণহৃদয় তখন জেগে উঠেছে অমৃতের সন্ধানে কিন্তু তারা অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে যুগের অধঃপতন আর ক্লেদের পুরীষে। তাই একদিকে পাপ, ক্লেদ, পতন আর আপাতরম্যের বন্দনার উচ্ছ্বিত উৎসবে মাতলেও এর ভেতরে জেগে আছে অম্লান জীবনপিপাসার ব্যর্থতা, নৈরাশ্য আর চোখের পানি। এখানেই ছিল এই নতুন গোষ্ঠীর স্ববিরোধ আর দ্বন্দ্ব—বহুমাত্রিকতা এবং সম্পন্নতা।

যা হোক, তাদের এই নতুনত্ব-সন্ধান, তাদের ব্যতিক্রমী জীবনযাপনের মতো, প্রচলিত সাহিত্য থেকে বেরিয়ে গিয়ে সাহিত্যের নতুন দিগন্ত অন্বেষণও ছিল একইরকম সক্রিয়। প্রথানুগত্যের প্রতি তাদের ছিল সরাসরি প্রত্যাখ্যান। সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে সমকালের নতুন জীবানুভূতির সংক্রাম ঘটিয়ে, নতুন শব্দে প্রকরণে নতুন সময়কার শিল্পায়বব উপহার দিতে চেয়েছিল তারা। তাদের এই পায়ের শব্দ প্রথমে এগিয়ে আসে খুবই অস্ফুটভাবে :

> উনিশ-শ বাষট্টির দিকে এখানকার সাহিত্যক্ষেত্রে একটা নতুন পালাবদল, নতুন পাতার বর্ণে ও ব্যবহারে জনচক্ষুর প্রায় অলক্ষ্যে ঘটতে শুরু করে। প্রতিষ্ঠিতদের অসতর্ক, অমনোযোগী ও অনুদার চোখ এই তুচ্ছ ও স্পষ্ট বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও উৎসাহী ও সজাগ শরীর মাত্রেই এই পরিবর্তনের উষ্ণ আঁচ অনুভব করে ও উৎকর্ণ হয়। স্পষ্ট বোঝা যায়, এই সাহিত্যের প্রকৃতিতে একটা নতুন ঋতু, অচেনা আগন্তুকের মতো নিঃশব্দে, সবার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে—চারধারের ঝরাপাতার আর্তনাদ ও হাহাকারের মধ্যে যার অবধারিত বিজয়ী পদপাত আসন্ন। কিছুসংখ্যক নতুন গাছ নতুন ঋতুর সমর্থনপুষ্ট হওয়ায় এই সময় 'জন্মের' উদ্যোগী সম্ভাবনা রটায়। আশা করা গিয়েছিল এরা ফল দেবে।*

প্রথমে খানিক কুণ্ঠিত পায়ে এগিয়ে এলেও দেখতে দেখতে তা হয়ে উঠেছিল জোরালো।

> ১৯৬০-এর লগ্ন প্রাথমিকে আলো জ্বলেছিল, দীপের সন্তানেরা গিয়েছিল দাঁড়িয়ে সার বেঁধে, ধনুকে লেগেছিল টঙ্কার, আর এক তীব্র রণনঝননে প্রবীণেরা নড়েচড়ে বসেছিল, আমাদের সাহিত্যে একটা নবীন হৈ হৈ দল যেন খানিকটা জোর করেই প্রবেশ করেছিল রঙ্গভূমিতে।**

---

* আগন্তুক ঋতু, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ১৯৬৭

** আবদুল মান্নান সৈয়দ।

২

এই দলটির যা ছিল সবচেয়ে বড় পুঁজি, তা হল অপরিমিত সততা ও দুঃসাহস। অকপট এবং নগ্নভাবে নিষিদ্ধের জন্মান্ধ চিৎকারকে তুলে ধরেছিল তারা, কারো কোনো অনুমোদন বা পছন্দ-অপছন্দের পরোয়া না করেই। তাদের নিরাপোষ সততাই ছিল তাদের উজ্জ্বল নির্মোহ দেহচ্ছদ। তাদের উষ্ণ রক্তমাংসময় অকৃত্রিম হৃদয় ছিল এ-ব্যাপারে তাদের একমাত্র পুঁজি।

আগেই বলেছি, এই নতুন দলটি সাহিত্যক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই যুগটির সামগ্রিক অবক্ষয়ের প্রতীক হয়ে। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবও ছিল এতে। কিন্তু যেখানে যা ছিল, তা ছিল দুপুরের আলোর মতো দপদপ করা। অবরুদ্ধ দলিত মানবাত্মার মরিয়া চিৎকার ছিল এ। মানবসভ্যতার ইতিহাস অনেক সময় এমন দুরপনেয় দানবিকতার দ্বারা রাহুগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে একমাত্র অশালীন ও বেপরোয়া ভর্ৎসনা ছাড়া কার্যত কোনোকিছুই করার থাকে না তখন। ভূতে-পাওয়া অসুস্থ রোগীকে সারিয়ে তোলার জন্যে ওঝার অশালীন গালিগালাজের মতো এও এক উপায়ান্তরহীন চিকিৎসা। ষাটের দশক শুরু হওয়ার ঠিক আগখানটায় আমেরিকার এ্যালেন গিন্সবার্গের রুদ্ধ চিৎকৃত উচ্চারণ : America, fuck yourself with your atom bomb—জাতীয় উক্তিগুলো এ-কারণেই এমনি তীব্র ও অশালীন। কবির প্রতিবাদকে দেশের আত্মসন্তুষ্ট প্রভুদের স্থূল ও বধির কানে পৌঁছে দেবার এক আপ্রাণ মরিয়া প্রয়াস। কতদূর বাস্তব সাফল্য এ দিয়ে অর্জন করা যায় তা নিশ্চিত করে বলা না-গেলেও এর মনস্তাত্ত্বিক শক্তির দিকটি নিশ্চয়ই উপেক্ষণীয় নয়। এর মধ্যে সভ্যতাহীনতার অপরাধ কোথাও যদি থেকে থাকে তার দায়িত্ব কবির নয় ; সে-দায়িত্ব চারপাশের হৃদয়হীন অনুভূতিশূন্য নিঃশেষিত পৃথিবীর। বিপ্লব যা অর্জন করে অস্ত্রের শাণিত পাশব ব্যবহার দিয়ে, অনুভূতিপ্রবণ কবি তাই করেন শব্দের এমনি অসংকোচ তীক্ষ্ণ চিৎকারের ভেতর দিয়ে। প্রথম ষাটের তরুণ-লেখকদের স্পষ্টভাষিতার ভেতর যে-সৌজন্যহীন তীব্র শাণিত চিৎকার ছিল তা হয়তো এমনি একটা তেড়িয়া ব্যাপার। চারপাশের অগ্রহণযোগ্য ও অসন্তোষজনক জীবনপরিস্থিতির বিরুদ্ধে তাদের একধরনের ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ চিৎকৃত প্রতিরোধ।

এই তরুণদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধপক্ষীয়দের অভিযোগ ছিল বিস্তর। কেউ কেউ এই নতুন ধারাকে চিহ্নিত করেছিল আটলান্টিকের পশ্চিম পারের যৌনতারুগ্‌ণ, অসুস্থচিত্ত একটি লেখকগোষ্ঠীর অক্ষম ও পরোক্ষ বংশধর বলে ; কয়েক হাত ব্যবহৃত হওয়া অচল পদার্থ বলে; দেশ-কাল-পাত্রের সমর্থনহীন, অনুকরণসর্বস্ব ও অশ্লীল বলে। অনেকে একে শনাক্ত করেছিল সে-সময়কার পশ্চিমবঙ্গের 'কৃত্তিবাস'-কেন্দ্রিক তরুণ-সম্প্রদায়ের উন্মার্গধর্মী অবক্ষয়ী ধারার এদেশীয় সাঙাৎ হিসেবে। সন্দেহ নেই, সূচনার দিনগুলোয় অন্তত বছর-কয়েকের জন্যে, পুরো অবক্ষয়ের পথ ধরেই এগিয়ে গিয়েছিল এই ধারা। কিন্তু সে-অবক্ষয় কোনো সাহিত্যধারার অক্ষম অনুকরণ বা প্রতিধ্বনিমাত্র ছিল না। এ অবক্ষয় ছিল আমাদেরই সমাজের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবরুদ্ধতার গভীর ভেতর থেকে উদ্ভূত এক বাস্তবতা।

৩

তবে সুখের বিষয়, এই অবক্ষয়ের মধ্যে খুব বেশিদিন এদের বন্দি থাকতে হয়নি। কিছুদিনের ভেতরেই জীবনের সুস্থিত ভারসাম্যের দিকে যাত্রা শুরু হয়েছিল তাদের। অবক্ষয়ের পর্ব ম্রিয়মাণ হয়ে এলে এই ক্লেদ ও অন্তঃসারশূন্যতাকে আত্মস্থ করে জীবনের গভীরতর জিজ্ঞাসার ভেতর জেগেও উঠতে পেরেছিল তারা। কিন্তু ঐ সময়পর্বে তারা প্রায় আগপাশতলা যৌনতা, পচন এবং বিকারের হাতে বন্দি হয়ে পড়েছিল, পুরো সময়টা হয়ে দাঁড়িয়েছিল "নৈরাশ্যের ও নিশাচরের, লোভের ও প্রমত্ততার, রাজনৈতিক অপমৃত্যু ও অলজ্জ স্বর্ণলালসার !" এই স্থূল ও পাশব পরিপার্শ্বে তাই সবকিছুর ওপর দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল যন্ত্রণা আর আত্মহননের আবেগ। যে তরুণ-বয়সে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছিলেন জীবনের অনাবিল কামনা : 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে', সেই একই বয়সের একজন তরুণকে সেদিন বলতে হয়েছে :

দীর্ঘ আয়ু ভালোবাসিনে
মরিতে চাই দ্রুত।

এর আগে বা পরে আর কখনো আমাদের সাহিত্য এতখানি অবক্ষয়-কবলিত হয়নি। কী ঘটেছিল তাহলে এই জাতির জীবনে, ঐসময়ে?

৪

আগেই বলেছি, ঘটনাটা ঘটেছিল একটা সামাজিক পটপরিবর্তনের পথ ধরে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই আমাদের জাতীয় জীবন অবক্ষয়ী হয়ে উঠতে শুরু করে, যা ষাটের দশকের শুরুর দিকে সবার চোখে উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়ে।

উনিশ-শ সাতচল্লিশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় আমাদের জাতীয় জীবন যে-স্বপ্নের জোয়ারে জেগে উঠেছিল তা অল্পদিনের মধ্যেই নানান রকম আশাভঙ্গের ভেতর মিইয়ে আসতে শুরু করে। কিন্তু বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এবং চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের ভেতর দিয়ে জাতি আবার নতুন করে ভিন্নমুখী উদ্দীপনায় আর স্বপ্নে ফিরে ফিরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে ওঠে। এই সময়টা জাতীয় জীবনে একটা ছোটখাটো আশাবাদের কাল। এই আশাবাদ থেকেই জেগে ওঠেন পঞ্চাশ দশকের প্রধান লেখকেরা—শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ, আল মাহমুদ ও অন্যান্যেরা। দেশাত্মবোধ, দেশজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ও এর মাটির সঙ্গে সংলগ্নতা এদের প্রতিভাকে শক্তিমন্ত করেছে।

কিন্তু এ আশাবাদ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। ক্রমাগত বিশৃঙ্খলতা, রাজনৈতিক ব্যর্থতা, লক্ষ্যহীনতা ও অরাজকতার পথ ধরে এক গভীর নৈরাশ্য এবং অর্থহীনতার ভেতর সবকিছু অসাড় হয়ে আসতে থাকে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের নির্দয় সামরিক শাসন এই অর্থহীনতাকে প্রায় চিরস্থায়ী ও উদ্ধাররহিত করে দিয়ে যায়।

জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনা, উদ্যম ও স্বপ্নের ওপর সামরিক দুঃশাসন ভারী বিশাল বুটের মতো চেপে বসে। জনগণের স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বপ্ন বেদনাদায়কভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে যায়। সর্বব্যাপী ত্রাসের নিচে জাতির হৃদয়ের উত্তাল কলকণ্ঠ ভীতি ও নৈঃশব্দের ভেতর নেতিয়ে আসে।

এই পরিস্থিতিতে, মানবিক বিকাশের উচ্চতর আকাশ হারিয়ে, জাতির জীবন সংকীর্ণ ও ব্যক্তিগত বিবরের ভেতর ক্রমাগতভাবে আত্মঘাতী হয়ে উঠতে শুরু করে। বিকার এবং পতন জাতির জীবনকে রুগ্ণ করে তোলে। প্রথম ষাটের এই অনুভূতিময় তরুণেরা তারুণ্যের প্রথম দিনগুলোতেই এই অবক্ষয়ের ভেতরে পুরোপুরি জড়িয়ে যায়। তারা হয়ে পড়ে এই অবক্ষয়ের সন্তান এবং এর রূপকার। অবক্ষয়ের সেই চিত্র তাদের হাতে কতটা ভালোমন্দভাবে অঙ্কিত হয়েছে তা সমালোচকদের আলোচ্য বিষয়।

কিন্তু একটা কথা কিছুতেই উপেক্ষা করা যাবে না যে, এই দেশে ঐ অবক্ষয়ের প্রথম শিকার ও তার চিৎকৃত শনাক্তকারী ছিল এরাই—এই ছোট্ট প্রাণিত তরুণ লেখক দলটি। এরা ছিল এই ক্লেদের প্রথম বলি ও এর অশ্রুময় জীবনীলেখক। যাঁরা এই অবক্ষয়কে সমকালীন আমেরিকান বা পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্যের অবক্ষয়ী ধারার অনুকরণসর্বস্ব উত্তরপুরুষ বলে রায় দিয়েছিলেন তাঁরা এই সামাজিক পচনের ইতিহাসটি সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন না। অনুভব করেননি যে এই অবক্ষয়ের মূল প্রোথিত ছিল আমাদেরই সমাজের ক্লেদাক্ত বাস্তবতার ভেতরে এবং এই তরুণেরা আমাদের সেই জাতীয় অবক্ষয়েরই ক্লেদজ কুসম।

৫

কোনো সমাজে যখন কোনো পালাবদলের সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন তা প্রথম ধরা পড়ে সেই সমাজের অনুভূতিশীল শিল্পীদের স্পর্শকাতর হৃদয়ের এ্যানটেনায়। এর অভিঘাতে তাদের চেতনাজগতের কাঁটা কেবলই নড়ে উঠতে থাকে। তাঁরাই ঐ পরিবর্তনের আঁচ অনুভব করেন সবচেয়ে আগে, ঐ ব্যাপারে সজাগ হন। এইজন্যে শেলী কবিদের নাম দিয়েছিলেন দ্রষ্টা। এঁরা সেই মানুষ যাঁরা মানুষের পৃথিবীর আবহাওয়ার যে-কোনো পরিবর্তনকে অন্য যে-কোনো মানুষের চেয়ে আগাম টের পান; যখন অন্যেরা সুখের ঘুমে আচ্ছন্ন তখন সকালবেলার ঘুমভাঙা পাখির মতো গান গেয়ে নতুন দিনের খবরটি তাদের কানে পৌঁছে দেন।

ষাটের দশকের শুরুতে আমাদের জাতীয়জীবনে যে-অবক্ষয় শুরু হয়, এই তরুণ-লেখকদের চেতনাজগতে তা প্রথম সাড়া তোলে। কিন্তু কোনো নতুন চেতনাকে কেবলমাত্র অনুভব করার ভেতরেই একজন লেখকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, ঐ চেতনাকে শৈল্পিক পরিপূর্ণতা দেবার প্রয়োজনে এর বাস্তবতার ভেতর তাকে আমুণ্ডুপদনখ ডুবে যেতে হয়; আপেলের মতো রক্তিম সজীব ভাষায় ঐ অনুভূতিলোকের চিত্র চিরকালের জন্য তাকে এঁকে রেখে যেতে হয়। ষাটের ঐ তরুণদের মধ্যেও ছিল সেই চেষ্টা। এই ভূমিকা ঠিকমতো পালনের মধ্যদিয়ে নিজেদের অজান্তে লেখকেরা একটি বড় ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে বসেন। এর ভেতর দিয়েই তাঁরা হয়ে ওঠেন সমাজবাস্তবতা পরিবর্তনের শক্তিশালী অচেতন হাতিয়ার। রাজনীতিবিদদের কাজ শুরু হয় এর পরে। শিল্পীদের এঁকে-যাওয়া সমাজের জীবনের ঐসব বেদনাদীর্ণ চিত্র থেকে সমাজের প্রকৃত বাস্তবতা টের পেয়ে তাঁদের কাজ হয় ঐ দুঃখময় সমাজবাস্তবতাকে পাল্টে সমৃদ্ধিমুখী উচ্চতর ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া।

পঞ্চাশের দশকে আমেরিকায় অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল পুঁজিবাদী সমাজের শ্বাসরুদ্ধকর যান্ত্রিকতার চাপে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আমেরিকার বিট প্রজন্মের লেখকেরা ঐ অবক্ষয়ের বিস্রস্ত মুখাবয়ব এঁকে গিয়েছিলেন বেদনা-বিক্ষত শব্দে : "I have seen the best minds of my generation destroyed by madness". গিন্সবার্গের এই উক্তির ভেতর ঐ অধঃপতনের যন্ত্রণাবিদ্ধ আর্তনাদটি উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে। এইসব সুতীব্র চিৎকার জনসাধারণকে ধাক্কা দিয়ে সচেতন করে তুলেছিল। এসবের ভেতর নিজেদের সমাজজীবনের অধঃপতিত চেহারা দেখতে পেয়ে আমেরিকার তরুণ-সম্প্রদায় সর্বশক্তিমান ঐ যান্ত্রিকতার বর্বর বধির ও স্থূল রক্ষকদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। সারা ষাটের দশক জুড়ে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়-ক্যাম্পাসগুলো ঐ সচেতন ছাত্রবিক্ষোভের ঢেউয়ের আঘাতে হয়েছে উত্তাল। পুঁজিবাদের সার্বভৌম ও দম-আটকানো প্রতিষ্ঠা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থেকে ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গের সমাজজীবনকেও ধীরে ধীরে করে তুলেছিল অবক্ষয়ী ও আবিল। ষাটের প্রথম দিকে 'কৃত্তিবাস'-কেন্দ্রিক তরুণদের সাহিত্য-আন্দোলন, হাংরি জেনারেশনের রুগ্ণ অসুস্থ চিৎকারের ভেতর ঐ অবক্ষয়ের অন্তর্গত রূপটি প্রকট হয়ে রয়েছে।

লেখকদের হৃদয়সংবেদনের তুলিতে আঁকা যুগের ঐ অবক্ষয়ী চিত্র দেখে তার প্রতিকারে এগিয়ে এসেছে সে-সময়কার রাজনৈতিক জগতের সবচেয়ে অগ্রসর ও সচেতন দলটি—পুরো একটি দশক ধরে ব্যর্থ বিপ্লব ও অসহায় সন্ত্রাসের ভেতর দিয়ে এই বিকৃত নিষ্ঠুর ও অগ্রহণযোগ্য সামাজিক পরিস্থিতির অবসানের উপায় খুঁজে বেড়িয়েছে। পঞ্চাশ দশকের শেষ ও ষাট দশকের প্রথমপর্বের শ্বাসরুদ্ধকর সামরিক ও রাজনৈতিক দলন, শোষণ এবং বঞ্চনার হাত ধরে আমাদের সমাজে যে-অবক্ষয় প্রবেশ করেছিল; মধ্য-ষাটের পর থেকে জেগে-ওঠা প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীনতাযুদ্ধের ভেতর দিয়ে আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম জাতিকে তা থেকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করেছে।

৬

ষাটের দশকে আমাদের সমাজে অবক্ষয় এসেছিল দুটি পর্যায়ে। প্রথম ঢেউটি এসেছিল শ্বাস-চেপে-ধরা সামরিক নিগ্রহকে আশ্রয় করে। এর কথা আগে বলেছি। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২-র মধ্যে ঘটেছিল মূল ঘটনাটি, যদিও এর জের চলেছিল একাত্তর অব্দি। কেবল একাত্তর কেন, পরবর্তীকালের সব সামরিক ও সামরিকতা সমর্থিত গণতান্ত্রিক স্বৈরাচারের হাত ধরে এই ধারা জাতীয় জীবনকে ক্রমবর্ধমানভাবে অধিকার করে নব্বই দশকের শেষ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। আজও তার গ্লানি জাতীয় জীবনকে আবিল করে রেখেছে।

এর পরেরটা এসেছিল এর ঠিক পরপরই, বাষট্টি-তেষট্টির দিকে। এটা এসেছিল সামরিক স্বৈরশাসনের উপজাত হিসেবে। সামরিক শাসনের দম-আটকানো ও নিরানন্দ পরিবেশকে আইয়ুব খান পুষিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সমাজজীবনে অবাধ ও জবাবদিহিহীন বিত্তের সচ্ছল ও কল্লোলিত স্রোতধারা বইয়ে দিয়ে। অর্থ সংগ্রহের জন্য উন্নত দেশগুলোর দরজায় দরজায় ধরনা দিয়ে দেশের জন্য বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহ করে এনেছিলেন তিনি। হঠাৎ-আসা সেই সুলভ বিপুল ও অনোপার্জিত বিত্ত সমাজজীবনের বন্দরে-বন্দরে রজতধারার সচ্ছল ঢেউ জাগিয়ে তোলে।

আমাদের জাতির সুদীর্ঘ জীবনে বিত্তের পদপাতের ঘটনা এই প্রথম। বিত্তের দাঁতাল লোভ জাতির সুপ্ত চেতনার ভেতর থেকে জেগে উঠে হয়ে ওঠে উদ্দাম। বর্বর অবাধ অলজ্জ অপরিমেয় রজতলিপ্সার সামনে ধসে পড়ে শতাব্দীর পর শতাব্দীর ভেতর দিয়ে গড়ে-ওঠা এই সমাজের নৈতিকতা, আদর্শ ও মূল্যবোধের দৃঢ়প্রোথিত শক্ত ইমারত। সবরকম ন্যায়নীতি হাস্যকর, অর্থহীন ও পরিত্যাজ্য হয়ে পড়ে। এই নৈতিক বেদনার পাশেই আবার বিত্তের অমিত সম্ভাবনায় স্পন্দিত ও উচ্চকিত হয়ে ওঠা আমাদের সামাজিক অঙ্গন—রাজধানীর মন্থর মফস্বলীয় জীবনযাত্রা—উদ্দাম রজত-জৌলুশে ঝলমল করতে থাকে। "এই বৈষয়িক লিপ্সার ভেতর গত কয়েক বছরের অবরুদ্ধ সৃজনশীলতা মুক্তি পেয়ে হঠাৎ যেন হয়ে ওঠে কামান্ধ। নতুন অর্জিত মুদ্রার সঙ্গে নতুন অর্জিত পাপ এসে প্রবেশ করে সমাজজীবনে। পাপ—নির্লজ্জ এবং প্রতিকারহীন—নির্বার স্থূলতা, যৌনতা, পচন এবং বিকার—এক কথায় অধঃপতন—বিত্ত এবং অধঃপতন—এই সময়ের সর্বস্বতাকে অধিকার করে নেয়।"

আমাদের সমাজের অবক্ষয়ের যে-দুটো কারণের কথা ওপরে বলা হল তার প্রথমটির মতো দ্বিতীয়টিও শুরু হয়েছিল ষাটের দশকের প্রথম দিনগুলোতেই। কাজেই গত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে যে-ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় আমাদের সমাজকে প্লাবিত করেছে, ষাটের দশকের শুরুকেই তার সূচনাকাল বলে ধরে নেওয়া যায়। আগেই বলেছি, প্রথম ষাটের তরুণ-লেখকেরা ছিল আমাদের জাতীয় জীবনের ঐ অবক্ষয়-যুগের প্রথম লেখকগোষ্ঠী। তারাই প্রথমবারের মতো সেই

অবক্ষয়ের উদ্দামতা ও বেদনাকে আঁকতে চেষ্টা করেছে। রাজনৈতিক স্বপ্নদ্রষ্টা আর সামাজিক পবিত্রতাবাদীদের প্ররোচনায় যদি সেকালের সামাজিক রুগ্ণতাকে তুলে ধরা থেকে তাঁরা নিজেদের বিরত রাখত তবে আজ দায়িত্বহীনতার অভিযোগে তারা অভিযুক্ত হত। একজন শিল্পী কী ভালোবাসেন, কোন্ জীবনের স্বপ্ন তিনি দেখেন, মানবজন্মের সর্বোচ্চ শীর্ষ বলতে কী বোঝেন—এসব কথা তাঁকে তার শিল্পের ভেতর জানিয়ে যেতেই হয়। এটা করতে পারার ভেতর দিয়ে তিনি লেখক হিসেবে মহৎ হন।

কিন্তু একজন লেখকের আরও একটি বড় দায়িত্ব রয়েছে। তা হল : মানবজীবন ও পরিপার্শ্বের নির্ভরযোগ্য দলিল রেখে যাওয়া। এইজন্য উত্তরকালের জন্য নিজের কাল ও পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর উজ্জ্বল অকপট ছবি এঁকে রেখে যেতে হয় তাঁকে। আগেই বলেছি, এই চেষ্টাটি অন্তত তারা সাধ্যমতো করেছিল। যেভাবে সেকালের প্রবীণ লেখকেরা এদের চেষ্টাকে সর্বজনীন ধিক্কারে অসম্মানিত করেছিলেন তা তাকে এক কথায় বেদনাদায়ক বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না।

শিল্পী, এমনকি শ্রেষ্ঠ শিল্পী হবার জন্যও অবক্ষয় সবসময় অন্তরায় নয়। অবক্ষয়ের উদ্দীপনা, নিঃস্বতা, রোমাঞ্চ ও বেদনাকে সততা ও প্রতিভার সঙ্গে সাহিত্যে কাব্যে ফলিয়ে তুলে একজন লেখক বড় শিল্পীও হয়ে উঠতে পারেন। ইমরুল কায়েস, দস্তয়েভস্কি, গালিব ও বোদলেয়ার অবক্ষয়ী-যুগের বেদনা ও অনুভূতিকে শক্তিশালী ছবিতে ফুটিয়ে তুলে বড় শিল্পী হয়েছেন। ষাটের দশকে যখন আমাদের সমাজ অবক্ষয়ী হয়ে উঠতে শুরু করেছিল সেই সময়কার তরুণ-লেখকেরা যদি ঐ অবক্ষয়ের ছবি ফুটিয়ে তুলতে উৎসাহী হয়ে থাকে—বড় কিছু সৃষ্টি করতে না পারলেও—তাকে তাচ্ছিল্য করা যাবে কি?

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম কদম ফুল

১

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরের একটি দিন। ১৫০ জগন্নাথ হলে সভা বসল সময়মতো। যোগদানকারীর সংখ্যা বেশি নয়, কিন্তু সবাই উদ্দীপ্ত, উৎসুক। যেন বিরাট কিছু– একটা ঘটতে যাচ্ছে সামনে, তাকে এগিয়ে নিতে কাঁধ বাড়িয়ে দিয়েছে সবাই। হাজিরার সংখ্যা টেনেটুনে সাত–আটজন। প্রশান্তর এক–সিটের কামরায় গাদাগাদি করে যে–কজনের সংকুলান হতে পারে তাই। খুব সম্ভব প্রশান্ত, রফিক, সিকদার, জিনু, আর প্রশান্তের বন্ধু সুনির্মল ছিল ঐ সভায়। বাকিদের মুখ বিস্মৃতির কুয়াশায় অস্পষ্ট। বক্তা ছিলাম মোটামুটি আমিই। যদ্দূর মনে পড়ে চড়া গলার একটা বক্তৃতাই করে ফেলেছিলাম সেদিন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের সমাজবাস্তবতার ভেতর–যে একটা পালাবদল ঘটে গেছে এ–কথা ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম : এই নতুন সময়ের নতুন জীবনানুভূতি আর বাস্তবতাকে তুলে ধরতে হবে আজ আমাদের— আমরা যারা তরুণ, যারা উদ্যোগী, যারা মরিয়া, তাদের। আমাদের মিলিত উদ্যোগের ভেতর থেকেই কেবল জন্ম নিতে পারে সেই নতুন, ফলবান সাহিত্যঋতু। এই নতুন বসন্তের লাল ইশতাহার পুরোনোদের হাত দিয়ে লেখা হওয়া সম্ভব নয়। এ সম্ভব কেবল আমাদের দিয়েই। তাই আজ আমাদের দরকার একত্রিত হওয়া— একত্রিত, সমবেত ও শপথবদ্ধ। প্রবীণ আর প্রতিষ্ঠিতদের কাছে অবাঞ্ছিত আমরা, অদ্ভুত। তারা আমাদের বাধা দেবে, ঠেকাতে চেষ্টা করবে। পরের মঞ্চে দাঁড়িয়ে গান গাওয়া সম্ভব হবে না। নিজেদের চিহ্নিত করার জন্যে নিজেদের আলাদা জামা বানিয়ে নিতে হবে আমাদের। নিজেদের মুখপত্রে নিজেদের কথা বলতে হবে। সেজন্যে আমাদের চাই আলাদা পত্রিকা। আলাদা মুখপত্র। আলাদাভাবে আমরা আত্মপ্রকাশ করতে পারলেই আমাদের আলাদা 'কণ্ঠস্বর'কে তুলে ধরতে পারব।

গভীর আন্তরিকতা থেকেই বলেছিলাম কথাগুলো। সবার মনকে তা তাই স্পর্শ করল। তাছাড়া সবার মনেও ছিল একই ধরনের অনুভূতি। কাজেই একমত হতেও

আমাদের দেরি হল না। সভার পর তপ্ত অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনা চলল অনেকক্ষণ। ঠিক হল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পত্রিকা বের করতে হবে।

কিন্তু বলা যত সোজা পত্রিকা বের করা তত সোজা নয়। টাকাপয়সার দায়দায়িত্ব তো আছেই; তার ওপর আছে লেখা, প্রেস, প্রুফ, বাঁধাই, বিক্রি সব মিলে এ এক এলাহি কারবার। আর সবকিছু যদিও বা গায়ে-গতরে খেটে পার করা সম্ভব, কিন্তু একটা জিনিশ একেবারেই ধরাছোঁয়ার বাইরে। বিজ্ঞাপন। সেটা পুরো পাকিস্তানি জামানা। কলকারখানা মিল-ব্যবসা সবকিছু অবাঙালিদের হাতে। তাদের ক্রেতারা ইংরেজি পত্রিকার পাঠক। তাদের বিজ্ঞাপন বেরোয় ইংরেজি পত্রিকায়। ঐ দিয়েই তাদের চলে যায়। বাংলা সাহিত্যপত্রিকায় তারা বিজ্ঞাপন দিতে আসবে কেন?

ঐ সভাতেই রফিক আজাদকে আমি প্রথম দেখি। আঠারো-উনিশ বছরের তরুণ ও তখন। প্রশান্তর বিছানায় বসেছিল আমার ঠিক পাশেই। রফিক চিরকাল সবখানেই স্বল্পভাষী। কবিতায় নিজের সম্বন্ধে ও লিখেছে : 'স্বল্পভাষী সন্ত শুধু হাসে'। সেদিনও স্বল্পভাষী সন্তের মতোই সব কথাতে মৃদু হেসে সমর্থনসূচকভাবে কেবল মাথা নেড়ে গেল রফিক। ওর সমর্থন শান্ত, কিন্তু আশ্বাস জাগাবার মতো।

সভার পরপরই-যে ঘটা করে পত্রিকা বের করা গেল তা নয়। কিন্তু সভার ফল হল দারুণ। আমরা নানান জায়গা থেকে এসে জড়ো-হওয়া বেশকিছু তরুণ পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেলাম। ছোট্ট সুস্পষ্ট তরুণ-লেখকদের একটা দলই গড়ে উঠল বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে। চৈত্রের এলোমেলো হাওয়ার মতো দুরন্ত সাহিত্যপিপাসা নিয়ে আমরা ছুটে বেড়াতে লাগলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যত্রতত্র।

আগেই বলেছি, দলের মধ্যে আমার বয়সই একটু বেয়াড়ারকমে বেশি—বাইশ বা তেইশ, অন্যদের চেয়ে বছর-তিনেক বেশি। সামাজিক অবস্থানের দিকে থেকেও কিছুটা দলছুট আমি। বছরখানেক হয় বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছি। পড়াচ্ছি সরকারি কলেজে। বাকিরা সব উনিশ-কুড়ির কোঠায়—প্রায় সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষ সম্মানের ছাত্র। সবার মধ্যে আমার অবস্থা বন্ধু আর বড়ভাইয়ের মতো, যাকে একই সাথে ভালোবাসা আর মান্য করা চলে। আমার ধারণা ঐ সময় তরুণ-লেখকদের নেতৃত্ব-যে আমার ওপর এসে পড়েছিল তার একটা বড় কারণ আমার বয়স। আজ কারো সঙ্গে আমার তিন বছরের ব্যবধান এমন কোনো ঘটনা নয়, কিন্তু সেই বয়সে তিন বছরের পার্থক্য—বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষ সম্মানশ্রেণীর ছাত্রের সঙ্গে একজন কলেজের প্রভাষকের পার্থক্য অনেক।

বয়সের এই সামান্য পার্থক্য সবার জন্য প্রায় বিধিলিপির মতো হয়ে দাঁড়াল। আমি ওদের কাছে হয়ে উঠলাম একটা নির্ভরশীল জায়গা। অবশ্য এটাও ঠিক যে, প্রথম ষাটের ঐ তারুণ্যকে সংঘটিত করার ব্যাপারে আমার নিজের ভেতরেও একটা অদম্য আকুতি তখন কাজ করছিল। হয়তো আমার সেই আকুতিও এই ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছিল, আমার গ্রহণযোগ্যতাকে সবার কাছে অনিবার্য করে তুলেছিল। আমি ছিলাম তাদের ভাই, বন্ধু বা মুনীর চৌধুরীর ভাষায় 'বলবান প্রতিনিধি'। তবে এসব কিছুর চেয়ে যা সঠিক, তা হল সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর দেওয়া নামটা, যে-

নামটা সাযযাদ কাদির আমাকে মাঝেমধ্যে স্মরণ করিয়ে দিতে ভালোবাসত : 'পালের গোদা'—ভালোবাসার বড়ভাইকে আদর করে যে-নামে ডাকা যায় ঠিক সেই নামটি।

ঐ ঘটনার পর চারটি দশক পার হয়ে গেছে। কিন্তু ষাটের লেখকদের সবার সঙ্গে আমার ঐ বন্ধু আর বড়ভাই-এর সম্পর্কে এখনো এতটুকু চিড় ধরেনি।

২

দিনকয়েক জগন্নাথ হলের ক্যাফেটিরিয়ায় আড্ডা জমাবার পর আমরা উঠে এলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের মূলকেন্দ্র মধুর রেস্তোরাঁয়। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা পর্যন্ত কলাভবন ছিল বর্তমান মেডিক্যাল কলেজের দক্ষিণদিকটায়, সেখানেও মধুর রেস্তোরাঁ এমনি মধুময় মনোহারিত্ব নিয়েই মৌ মৌ করত। কিন্তু ছাত্র অবস্থায় সেখানে আমার খুব-একটা যাওয়া হয়ে ওঠেনি।* এবারেও খুব বেশিদিন মধুর রেস্তোরাঁয় আমাদের আসর জমল না, কিন্তু দল জমে ওঠার ব্যাপারে এ আমাদের সহায়ক হয়ে উঠল।

ষাটের দশকের প্রথমদিকে মধুর ক্যান্টিন আজকের মধুর ক্যান্টিন থেকে ছিল পুরোপুরি আলাদা। সৌহার্দ্য, আন্তরিকতা আর বন্ধুত্বের একটা মিলনকেন্দ্র ছিল এই রেস্তোরাঁটি। দর্শন বিজ্ঞান থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পৃথিবীর সর্বশেষ পরিস্থিতির পর্যালোচনা, ইয়োরোপ-আমেরিকার সামাজিক-রাজনৈতিক থেকে শিল্প-সাহিত্যজগতের যাবতীয় আন্দোলনের খবর নিয়ে তর্কবিতর্কের একটা রমণীয় জায়গা। একটা অদ্ভুত গণতান্ত্রিক চরিত্র ছিল কলাভবনের এই ক্যান্টিনটার। বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরা মিছিল, মিটিং, আন্দোলন সবকিছু করত এর বাইরে। সবাই সবকিছু শেষ করে এখানে এসে পাশাপাশি বসত। খেত, গল্প করত। এখানে দলীয় বিদ্বেষ বা উচ্ছৃঙ্খলতার জায়গা নেই। ওসব বাইরে। এ হল মধুর ক্যান্টিন। এখানে সবাই বন্ধু। এ হল জাতীয় সংসদের মতো; সারাদেশের ঘোষিত শত্রুরা যেখানে পাশাপাশি টেবিলে বসে হেসে হেসে চা খায়, গল্প করে ; দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে।

---

* আমাদের বন্ধুদের যে-সুপরিচিত দলটি সে-সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছিল তার নাম 'নীরব সংঘ'। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের দল ছিল এটি। মধুর ক্যান্টিনের বেশিরকম হৈ-হুল্লোড় আমাদর রুচির অনুকূল না-হওয়ায় আমরা, সংঘের বন্ধুরা, কলাভবনের পুকুরটার একটা কোণকে 'ইডিয়েটস কর্নার' নাম দিয়ে সেখানেই আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের চার-চারটা বছর।

ষাটের মাঝামাঝিতে রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের প্রতিনিধি মোনায়েম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অস্ত্র–সন্ত্রাসের সংস্কৃতি চালু করার পর মধুর ক্যান্টিনের এই চরিত্রটি আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়।

৩

প্রথমেই ধরে নিতে হল একলাফে বড়সড় সাহিত্য পত্রিকা বের করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ওর জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, লোকবল, অর্থবল কোনোটাই আমাদের নেই। ঠিক হল আমাদের অস্তিত্বের প্রথম জানানি দিতে হবে ইশতাহারের মাধ্যমে ; বের করতে হবে এই সাহিত্যাঙ্গনে আমাদের এসে দাঁড়াবার একটা জুৎসই ঘোষণাপত্র। জোরে, যতটা গলা চড়িয়ে পারা যায়, যতটা বড় অক্ষরে লেখা যায় লিখে উঁচু করে ধরতে হবে সে ফেস্টুন; বলতে হবে : শোনো হে জনতা, আমরা এসে গেছি। এখন আমরাই থাকব, আর সবার বিদায়।

উনষাট–ষাটের দিকে সাহিত্যপত্রিকা 'সমকাল'–এর পক্ষ থেকে গোটাকয়েক এক–ফর্মার সমালোচনা–পুস্তিকা বের হয়েছিল। সেগুলোর ছোট আকারের ছিমছাম পরিপাটি চেহারা এখনো আমার চোখে লেগে আছে। ঠিক করলাম ঐ সাইজেই বের করব আমাদের ইশতাহার। সাইজটা ডিমাই–এর সমান দৈর্ঘ্যের। কিন্তু প্রস্থে কিছুটা কম বলে তন্বী মেয়ের মতো এক হালকা চটুল উচ্ছলতা এর শরীরে। ডবল ডিমাই সাইজের কাগজে এর পৃষ্ঠা হয় চব্বিশটি। লেখাও আঁটে অনেক। পুস্তিকার এই সাইজটি সারাজীবন আমার প্রিয়। 'কণ্ঠস্বর'–এর দশম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে যে–চিত্তাকর্ষক পুস্তিকা বের করেছিলাম সেটাও বের করেছিলাম ঐ সাইজে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সমস্ত পুস্তিকাও এ–পর্যন্ত এই সাইজেই বের করে এসেছি।

প্রথমেই পড়তে হল নাম নিয়ে। কী হবে এই ইশতাহারের নাম? কোন্ নাম আমাদের নতুন ঘোষণার সবচেয়ে বিনীত প্রতিনিধি। বেশিক্ষণ কসরত করতে হল না। অল্প ভাবতেই মনের সামনে এসে গেল নামটা : 'বক্তব্য'। জ্বলজ্বল করে উঠল নামটা চোখের সামনে। আমরা যে–কথাগুলো তুলে ধরতে চাচ্ছি, যে–নতুন বোধগুলোর জানান দিতে চাচ্ছি, 'বক্তব্য' নামটা তো সেসবেরই মার্জিত সুস্মিত প্রতীক। আত্মদম্ভে, বর্বর চিৎকারে, বাড়াবাড়িতে, বা অতি–আড়ম্বরে এই শব্দ আবিল নয়। তাহলে থাকুক এই নাম। নতজানু শ্রদ্ধায় শুরু হোক সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সুস্মিত কথোপকথন।

'বক্তব্য'–এর জন্যে লেখা সংগ্রহ করতে অসুবিধা হল না। পত্রিকার মোট ৬টি লেখার মধ্যে ইশতাহার–সহ চারটি লেখাই ছিল আমার, একটি লিখল সেবাব্রত, একটি জ্যোতি। চেতনায় বা দৃষ্টিভঙ্গিতে ওরা আমাদের থেকে কিছুটা আলাদা হলেও তখনো আমরা একই বৃহত্তর তরুণ দলের সদস্য। আমাদের মতো ওরাও—সেবাব্রত, জ্যোতি, হায়াৎ

মামুদ, হুমায়ুন সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তরুণ ছাত্র—যে বাংলা বিভাগ গত পাঁচ দশকে আমাদের সংস্কৃতিকে গড়ে তোলার ব্যাপারে সবচেয়ে মুখ্য অবদান রেখেছে।

সেবাব্রত চৌধুরী ছিল ফরশা, ছোটখাটো, মিষ্টি চেহারার। জ্যোতি, হায়াৎ, হুমায়ুনের মতো আমার এক ক্লাস নিচে পড়ত ও। ভালো ছাত্র ছিল সেবা, অনার্স আর এম. এ. দুই পরীক্ষাতেই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। স্নিগ্ধ পরিপাটি কবিতা লিখত, কিছু কিছু প্রবন্ধও। ব্যক্তিগতভাবে ও ছিল মৃদুভাষী আর নিম্নকণ্ঠ, আদর্শগত পার্থক্যের পরও ওকে আমরা ভালোবাসতাম। চিন্তাভাবনার পার্থক্যও–যে একটা সুন্দর, শুভ ও জীবনপ্রদ ব্যাপার হতে পারে তা ওর সাহচর্য থেকে অনুভব করতাম।

কিন্তু আগেই বলেছি, জ্যোতি ছিল অভিমানী। সামান্য আঘাতেই চোখ ছলছল করে উঠত ওর, যেন কোনো দুর্জয় ও অনতিক্রম্য বিধিলিপির বিরুদ্ধে অনুযোগ জানাচ্ছে। লেখক হিসেবে জ্যোতি ছিল শক্তিশালী। বেশকিছু অসাধারণ গল্প লিখেছে ও। 'কেষ্টযাত্রা' ও 'রংরাজ ফেরে না' ওর সে-সময়ে লেখা উল্লেখযোগ্য গল্পের দুটি। তবু আমরা বুঝতাম ওর ভেতর এমন এক দুরারোগ্য জটিল গোলকধাঁধা রয়েছে যার সঙ্গে বসবাস করা কঠিন।

ওদের দলের হায়াৎ মামুদ ছিল মিষ্টি স্বভাবের, নিরুপদ্রব মানুষ। ওর আসল নাম মনিরুজ্জামান। সাহিত্যের বাজারে সে-সময় মনিরুজ্জামান নামের বিরাট যানজটে বিভ্রান্ত ও দিশাহারা হয়ে মধ্যযুগের কবি হায়াৎ মামুদ নামের আড়ালে নিজের আসল নামটাকে পাচার করে দেয় ও। এখন সেটা মোটামুটি ওর পিতৃপ্রদত্ত নামই হয়ে গেছে। এই নামেই এখন ও খ্যাতিমান। বেঁটে খাটো দোহারা মজবুত মানুষ হায়াৎ। সহজে সুখী হবার একটা ক্ষমতা ছিল ওর ভেতর। আজও আছে। রমণীয় স্নিগ্ধ স্বাদু ভাষায় প্রবন্ধ লিখত ও। ওর লেখায় বুদ্ধদেব বসুর কমনীয় গদ্যের স্বাদ পাওয়া যেত। পরের দশকগুলোয় হায়াৎ শিশুসাহিত্য, গবেষণা আর অনুবাদেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে।

লেখা জোগাড় করতে করতে একটা প্রেসেরও সন্ধান পেয়ে গেলাম পুরোনো ঢাকার আরমানিটোলা মাঠের পশ্চিমদিকের তেমাথার বিশাল বটগাছটার পাশেই। নাম সাইদা প্রেস। প্রেসের মালিক মাঝারি উচ্চতার, মজবুত গড়নের, ঝলমলে টাকওয়ালা প্রসন্ন চেহারার মানুষ—সেই ধরনের মানুষ যাঁদের অনাবিল পরিপূর্ণ চেহারা মনের মধ্যে সাহস ও আশা জাগায়। আমার মুন্সিগঞ্জের বন্ধু সিদ্দিকের দুলাভাই তিনি। সাইদা প্রেসের সাইদা সম্ভবত সিদ্দিকের বোনের নাম। হয়তো আর কারো।

নেহাতই সামান্য এক-ফর্মার একটা ইশতাহার, তবু আমাদের জীবনের প্রথম ছেপে বের-করা কাগজ এটি, একটা নতুন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার দায়িত্বে অস্বস্ত, চঞ্চল। আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব দিনরাত এক অবিশ্বাস্য উত্তেজনায় আর স্বপ্নে মাতাল হয়ে রইল। আমি, রফিক আর প্রশান্ত এর প্রধান উদ্যোক্তা। ফারুক আলমগীর, জিনু, শহীদুর রহমান ছাড়াও জনাকয়েক রয়েছে এর সহযোগিতায়।

৪

লেখা আর প্রেসের ব্যবস্থা হতেই উঠে এল প্রচ্ছদের প্রসঙ্গ। আরে, ভুলেই যে গিয়েছিলাম ব্যাপারটা। হ্যাঁ, প্রচ্ছদও চাই যে! কেবল চাই নয়, রীতিমতো ভালো করেই চাই। ওটাকেও তো হতে হবে আকর্ষণীয়, নয়নাভিরাম। ভেতরের লেখার চেয়ে বেশি না হলেও অন্তত তার সমান কিছু তো হতেই হবে। না হলে পাঠকদের কী করে ডাক দেবে চোখের রঙিন ইশারায়। অন্যের দরোজা থেকে ভুলিয়ে কী করে টেনে আনবে নিজের ছলনার কুঠুরিতে। পত্রিকার প্রচ্ছদ হল মাছ ধরার চার। স্বাদে গন্ধে এ মৌ মৌ করলে তবেই না ক্রেতাদের আনাগোনা, ছোটাছুটি। এ-কারণে কবি বা লেখক যত ভালোই লিখুন, বইয়ের প্রচ্ছদ লোভনীয় না হলে তাদের চলে না। পাঠকের চোখকে ঠিকমতো টেনে আনতে না পারলে পাঠক তো চলে যাবে অন্য বই-এর আকর্ষণে। তার বই উপেক্ষিত হয়ে পড়ে থাকবে। কী করে পাঠক চিনবে তাকে? কেন হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাবে? আর পাঠকই যদি না পড়ল তবে কী তার দাম? (কেন লিখে বেড়ানোর এই অর্থহীন অকারণ ভোগান্তি?)

কিন্তু কে আঁকবে আমাদের এই অবিশ্বাস্য প্রচ্ছদ? আমাদের ভেতর এমন শিল্পী কে? নিজেদের দিকে তাকিয়ে মুখ শুকিয়ে আসে। কারো চেহারাই চোখে ভাসে না। একসময় হঠাৎ করেই আশার আলো খেলে গেল। আছে, আছে। হুমায়ুন চৌধুরীই তো রয়েছে আমাদের ভেতর। কথায় আর কলমের আঁচড়ে যে অনিন্দ্য উজ্জ্বল বিস্ময়কর ছবি রচনা করে চলেছে সারাক্ষণ। ওই তো সেই মনোলোভা প্রচ্ছদ এঁকে দিতে পারে। আমাদের ছোট্ট প্রয়াসটিকে নয়নলোভন করে পরিবেশন করতে পারে মানুষের সামনে।

আশ্চর্য কবিত্বময় আর মদির গল্প লিখত হুমায়ুন সে-সময়। ওর মুখের অনবদ্য ভাষার চেয়েও সুন্দর ছিল সেসব গল্প। এরি মধ্যে সেগুলোর কয়েকটা 'উত্তরণ' 'সপ্তকে' বেরিয়ে আমাদের হকচকিয়ে দিয়েছে। কি মুখের কথায় কি গল্পের ভাষায় সবখানেই ওর যেন নতুন নতুন শব্দ তৈরির একটা অবিশ্রান্ত অস্থির আর সপ্রতিভ চেষ্টা। এই অস্বস্ত সংগ্রামে ওর সারাটা অস্তিত্ব যেন কেঁপে-কেঁপে উঠত। ওদের দলের ওর সঙ্গেই ছিল আমাদের মিল। ও ছিল আমাদের দলের। আমরা তো কেবল সে-সময়কার বাস্তব পালাবদলের জীবনী-লেখক হতে চাচ্ছিলাম না, সাহিত্যের গদ্যভাষাকেও শাণিত আর বুদ্ধিদীপ্ত করে তুলতে চেষ্টা করছিলাম। চারপাশের গড়পড়তা লেখকদের উদাসীনতা অযত্ন আর অবহেলায় লেখা গদ্যকে তার ছাড়া-ছাড়া এলিয়ে পড়া শিথিলতা থেকে বাঁচিয়ে সচেতন, তীক্ষ্ণ আর মননাশ্রিত করে তুলতে চাচ্ছিলাম। হুমায়ুনের গদ্য ছিল আমাদের ঐ স্বপ্নে-দেখা শিল্পিত গল্পের উদাহরণ—অবিশ্রান্ত, নিরীক্ষাধর্মী, ক্ষিপ্র, পরিস্রুত ও অশ্বস্ত। এইজন্যে জ্যোতিদের দলে থাকলেও হুমায়ুনের আসল রক্তসম্পর্ক ছিল আমাদের সঙ্গে। ও ছিল আমাদের সগোত্র। আমাদের নতুনত্ব পিপাসার দোসর।

আমার অনুরোধ হাস্যোজ্জ্বল অভিনন্দনের সঙ্গে কবুল করল হুমায়ুন। ও তখন থাকত সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের দক্ষিণদিকের একটা রুমে। এই ঘরে বসে ওর ভূস্বামী পূর্বপুরুষদের—খটাৎ খটাৎ শব্দে ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়িয়ে বাংলার বুকের ওপর দিয়ে ছুটে বেড়ানোর রোমহর্ষক কল্পকথা ওর মুখ থেকে আমি শুনেছি। উন্নত সুদর্শন হুমায়ুন ছিল আপাদমস্তক স্বপ্নেভরা। ওর গায়ের রঙ ছিল কাঁচা সোনার মতো। যখন যে-স্বপ্ন ওকে পেয়ে বসত তাই নিয়ে মাতাল হয়ে থাকত ও। পৃথিবীর সবকিছু ভুলে যেত ও তখন।

লেখা শুরু করার বছর-দুয়েকের মধ্যেই লেখা ছেড়ে দিয়েছিল হুমায়ুন। নারীপ্রেম ওকে অন্তহীনভাবে উন্মাতাল করে। বিরতিহীনভাবে প্রেমে পড়া তাই হয়ে গিয়েছিল ওর আজীবনের নিয়তি। যখন যে-প্রেমে পড়ত সেই প্রেমের আগে পৃথিবীতে-যে কোনোদিন আর-কোনো মেয়েকে ও চিনত তা ওর কথা থেকে মনে হত না। আগের প্রেমিকাদের কথা তুললে ও এমন ভাব করত যেন অনেক যুগ আগের হারিয়ে-যাওয়া কোনো অতীতকালের গল্প শুনছে। প্রতিবার প্রেমের পঙ্খীরাজে সওয়ার হয়ে মেঘ আর হাওয়ার রাজ্যে উধাও আনন্দে উড়ে বেড়ানো আর তারপর একসময় সেখান থেকে গভীর খাদে বিধ্বস্ত হওয়ার বেদনায় রক্তাক্ত হওয়া—এই করে কবে ওর জীবন পার হয়েছে।

প্রচ্ছদ আঁকার জন্যে কিছুটা সময় চাইল হুমায়ুন, সঙ্গতভাবেই চাইল। দিন-তিনেক পর আঁকা-প্রচ্ছদটা আমাদের হাতে তুলে দিল ও। দেবার সময় কবিতার মতো ভাষায় প্রচ্ছদটার অনুপম সৌন্দর্য ও অসাধারণত্ব আমাকে এমনভাবে বোঝাতে লাগল, যেভাবে প্রতিবার প্রেমে পড়লে সেই মেয়েটির উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিত ও—প্রথম প্রেমের মতো রক্তিম আবেগ নিয়ে। কিন্তু ওর প্রতিভাদীপ্ত ভাষার অনিন্দ্য ও সম্মোহনকারী প্রভাবের পরও প্রচ্ছদটার ভেতর উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পেলাম না আমি। অন্য কেউ-ও পেল না। নেহাতই শাদামাটা, গতানুগতিক একটা প্রচ্ছদ। এর আগেও একইভাবে একবার ও ওর এক প্রেমিকার বড় বড় দুই চোখের বর্ণনা দিয়ে আমাকে ও রীতিমতো বিষণ্ন করে রেখেছিল কয়েকটা দিন। কিন্তু পরে সেই প্রেমিকাকে দেখার পর সেই বিষণ্নতা থেকে মুক্তি পেয়ে হাফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। সুন্দর, তবে অত সুন্দর নয় সে-চোখ। আসলে ওটা ছিল ওর স্বপ্নের চোখে দেখা প্রেমিকার চোখের বর্ণনা। যখন যা নিয়ে ও মেতে উঠত, যখন যাকে ভালোবাসত তার ভেতর সমস্ত পৃথিবীর সৌন্দর্য বৈভব ও মাধুর্য দেখতে পেত। অন্যদেরও তা-ই দেখাত।

কিছুক্ষণ আগে আত্মসান্ত্বনা হিসেবে 'বক্তব্য' নামটাকে সুন্দর বলে চালানোর চেষ্টা করলেও আমরা মনে মনে ঠিকই জানতাম আহামরি কোনো নাম নয় ওটা। এবার প্রচ্ছদের চেহারা দেখে আরো মিইয়ে এলাম। কিন্তু তাতে আমাদের উৎসাহে ভাটা পড়ল না। আসলে এসব নিয়ে ভাবারই সময় নেই তখন আমাদের। কয়েকদিনের মধ্যেই পুস্তিকা ছাপা হয়ে বাজারে বেরোবে, এই খুশিতেই আমরা আপাতত বুঁদ হয়ে আছি। প্রচ্ছদ নিয়ে বিলাপে বসব কখন?

প্রেসে লেখা দেবার পরের দিনই প্রুফ পেলাম। প্রুফম্যান নিউজপ্রিন্টের শিটকে ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে আলতো করে ভিজিয়ে কম্পোজ-করা সীসার ম্যাটারের ওপর রেখে শক্ত চাপ দিতেই ঝকঝকে প্রুফ উঠে এল।

আজ এসব নিয়ে লিখতে বসে অনেক কথাই মনে পড়ছে। অনেক সময় লাগছে বলতে। কোন্‌টা বেশি জরুরি, কোন্‌টা কম বুঝে উঠতে পারছি না। পারছি না কারণ এসব আমাদের ভালোবাসার গল্প। আমাদের প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেমের গল্প। অল্প কথায় কী করে একে শেষ করা যায়?

প্রুফ হাতে নিয়ে মনে পড়ল, প্রুফ দেখতে জানি না। সলজ্জভাবে মাথায় এল প্রুফ-দেখার মতো সামান্য বিদ্যাটুকু না নিয়ে পত্রিকা বের করার স্বপ্ন-দেখা বড় বেশিরকমের উচ্চাভিলাষ হয়ে গেছে। এ.টি. দেবের ডিকশনারির সাহায্য নিয়ে প্রুফ কাটার চিহ্নগুলো দেখে নিয়ে আধখাচড়াভাবে প্রুফ দেখা শুরু করে দিলাম। কিন্তু কিছুটা প্রুফ দেখেই বুঝলাম প্রুফে অসংখ্য ভুল থেকে যাচ্ছে। প্রুফ আসলে আমি চোখ দিয়ে দেখছি না, দেখছি মন দিয়ে। তাছাড়া আমি দেখতে চেষ্টা করছি গোটা লেখাটা, অথচ দেখতে হবে প্রতিটি শব্দের নির্ভুল বানান। বুঝলাম, অক্ষর ধরে ধরে প্রুফ না-দেখলে প্রুফে ভুল থেকে যাবে। উপায়হীন হয়ে প্রত্যেকটা অক্ষর এক এক করে পড়ে প্রুফ কাটতে লাগলাম। এভাবে এক-ফর্মা প্রুফ দেখতে আমার কয়েক ঘণ্টা লেগে গেল। তবু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম ভুলের সংখ্যা আগের চেয়ে খুব-একটা কমেনি। সামান্য প্রুফ-দেখাই যেখানে এত কঠিন সেখানে বড় কাগজ আমরা বের করার স্বপ্ন দেখেছি কী করে! ভেবে বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। এদিকে বিপদ আঁচ করে আমার দেখার পর রফিক একবার আর প্রশান্ত দুবার প্রুফ দেখে দিয়েছিল। একদিন চলে গেল প্রুফের পেছনেই।

এদিকে প্রচ্ছদের ব্লক ছাপা হয়ে এল। পয়সার অভাবে দুরঙা প্রচ্ছদ একরঙা হয়ে গেল। এতে প্রচ্ছদের চেহারা আরও শাদামাটা হয়ে গেল। তবে সাইদা প্রেসের টাইপ নতুন থাকায় ছাপা হল ঝকঝকে। সব মিলে মাঝারি গোছের বিনীত চেহারা নিয়ে 'বক্তব্য' বেরিয়ে এল।

৫

বাইরের দিক থেকে নেহাতই একটা শাদামাঠা পত্রিকা। তবু নতুন মায়ের মতো ভালোবাসার চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইলাম পত্রিকার দিকে। বারবার দেখেও যেন মন ভরে না। মোট ছাপা হয়েছিল সাড়ে বারো-শ কপি। ভাঁজ-করা ছাপা পুস্তিকাগুলো রিকশায় তুলে নিয়ে আসা হল ঢাকা হলের (এখনকার শহীদুল্লাহ হলের) রফিকের রুমে। প্রেসে স্টেপল করার ব্যবস্থা না-থাকায় পরের দিন বিক্রির আগে সেগুলো

স্টেপল করার কাজ সেরে নিতে হবে আমাদেরই।

অসম্ভব উত্তেজনার ভেতর রাত কাটিয়ে খুব ভোরে উঠে দ্রুতপায়ে হাজির হলাম রফিকের রুমে। সকালের মধ্যে সবাই মিলে স্টেপল করে পত্রিকাগুলোকে বিলিবন্টনের ব্যবস্থা করা চাই।

হলে পৌঁছে দেখি রফিকের ঘরের দরজা খোলা, প্যান্ট শার্ট পরে ও ক্যান্টিনে নাস্তা করতে যাচ্ছে। চোখ লাল টকটকে, নিদ্রাহীনতার ছাপ স্পষ্ট। মেঝের ওপর ছড়িয়ে-থাকা পত্রিকাগুলোর ওপর চোখ পড়তেই ওর নিদ্রাহীনতার কারণ বুঝতে পারলাম। সকাল পর্যন্ত বসে থাকার উত্তেজনা সহ্য করতে না-পেরে সারারাত জেগে নিজেই ঐ এক হাজার কাগজ এক এক করে স্টেপল করে ফেলেছে।

দিন বাড়তেই এক-একজনের হাতে কিছু কিছু পুস্তিকা গছিয়ে দিয়ে স্টলগুলোয় পাঠিয়ে দেওয়া হল। এরপর শ-কয়েক কাগজ ভাগ-ভাগ করে কয়েকজনের হাতে দিয়ে দেওয়া হল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিক্রির জন্য।

পত্রিকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছোতেই ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। শিক্ষক আর ছাত্রদের ভেতর আশ্চর্য কৌতূহল আর উৎসাহ সৃষ্টি করল পুস্তিকাটি। পত্রিকার দাম দুআনা, সৌষ্ঠবের দিক থেকেও মোটামুটি চলনসই। হাতে হাতে গরম সামোচার মতো বিক্রি হয়ে যেতে লাগল। পত্রিকার উষ্ণ রগরগে ভাষা, জোর গলার চিৎকার, বক্তব্যের নতুনত্ব সবার দৃষ্টি কাড়ল। নতুন বসন্তের ধারালো স্পর্শে নতুন জীবনানুভূতির জ্বলন্ত আঁচ অনুভব করল যেন অনেকে। বিশ্ববিদ্যালয়-চত্বরে রীতিমতো আলোড়ন তুলল পুস্তিকাটি। প্রথম পদপাতের সাফল্যে আমরা প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠলাম।

'বক্তব্য'-এর প্রায় প্রতিটি লেখাই ছিল ইশতাহারধর্মী। গলার জোরে প্রাণের জোরে চড়া রঙে বলা। নতুন দলের আগমনবার্তা ঘোষিত হয়েছিল প্রায় প্রতিটি উচ্চারণে। প্রায় প্রতিটি লেখাই পাঠককে নাড়া দিল। সবচেয়ে সাড়া জাগাল আমার একটি লেখা। লেখাটির মধ্যে দলের মূল বক্তব্যটি উঠে এসেছিল। 'বক্তব্য'-এর প্রথম লেখা হিসেবে ছাপা হয়েছিল সেটি :

> 'দলটা তাদেরই—সেইসব অসন্তুষ্ট, অগতানুগতিক রাগী তরুণদের—অন্তঃসত্ত্বা রক্তের ভেতরে যাদের নতুন সৃষ্টির আগ্রহ উদগ্রীব। এখানকার সাহিত্যেরও সমাজের ভানসর্বস্ব অযোগ্য মোড়লদের প্রতি তাদের ঘৃণা, ক্ষোভ ও আক্রোশ--যার ফলশ্রুতি হিসেবে সেই ঘেয়ো, অথর্ব, নির্জীবদের বয়স্ক প্রভাব থেকে মুক্তিতে তারা কৃতশপথ—তারা একত্রিত, সমবেত, আয়োজিত। উদ্দেশ্য তাদের নতুন কিছু, মহৎ কিছু, বিস্ময়কর কিছু—প্রয়োজনে উপেক্ষিত বা হাস্যকর কিছু--অসামাজিক অশ্লীল গর্হিত কিছু, কিন্তু কিছু নতুন, কিছু অভাবনীয়। কালের বুকের ওপর নতুন স্বাক্ষরের বেগবান চিন্তায় তারা অস্বস্ত, যে স্বাক্ষর স্পষ্ট ও স্থায়ী—সাময়িক ও স্বল্পায়ু হলেও সজীব ও স্বাস্থ্যবান।'

মাত্র আড়াই দিনের মাথায় বিক্রি হয়ে গেল 'বক্তব্য'–এর সাড়ে বারো–শ কপি। কেবল সেকালে নয়, এ–যুগের নিরিখেও এমনি একটা সাহিত্যনির্ভর তুচ্ছ পুস্তিকার পক্ষে এই কাটতি বিস্ময়কর।

পাঠক খুঁজে বেড়াচ্ছে, অথচ তাদের হাতে তুলে দেবার মতো পত্রিকা নেই, হুড়মুড়িয়ে দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সেকালে কম্পিউটার ছিল না। অফসেট–প্রেসে ছাপার ভাবনাও দুঃস্বপ্ন মাত্র। নিবিষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে সীসার অক্ষরগুলোকে একের পর এক পাশাপাশি সাজিয়ে যে–ফর্মা তৈরি হয় তাতে ছাপ দিয়েই ছাপার কাজ চলে। ছাপার পরপরই 'বক্তব্য'–এর কম্পোজ ভেঙে ফেলা হয়েছিল বলে আবার প্রথম থেকে ছাপার কাজ শুরু হল। আবার নতুন করে সেই কম্পোজ, সেই প্রুফ–দেখা, সেই কাগজ–কেনা, সেই ছাপা, সেই বাঁধাই, সেই বিক্রি।

কিন্তু এবারের বিক্রি আমাদের হতাশ করল। প্রথম সংস্করণই অধিকাংশ আগ্রহী পাঠকের চাহিদা মিটিয়ে ফেলেছিল। যারা প্রথম সংস্করণ কিনতে না–পেরে আকুপাকু করেছিল তারা অন্যদের কাছ থেকে নিয়ে এরই মধ্যে তা পড়ে নিয়েছিল। অনেকের উৎসাহ এমনিতেও কমে এসেছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের এক হাজার কপির ভেতর পাঁচশ–র বেশি বিক্রি করা গেল না।

আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থার অনুসরণে সবাই নিজেদের প্রাপ্তিকে আমরা সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছিলাম, তাই পুস্তিকায় কোনো সম্পাদকের বা প্রকাশকের নাম ব্যবহার করা হয়নি। এতে কারো চেয়ে কারো বেশি মাত্রায় উৎফুল্ল বা ম্রিয়মাণ হওয়ার কারণ ঘটল না। ঝাঁঝালো উত্তেজনার ভেতর দিয়ে শেষ হল আমাদের আত্মপ্রকাশের পর্ব।

হোটেল নাইল ভ্যালি

১

'বক্তব্য' বের হওয়ার পর আমরা আরো আঁটসাঁট হয়ে বসলাম। মধুর ক্যান্টিন, জগন্নাথ হল ক্যান্টিন, ঢাকা হল ক্যান্টিনের আধখাচড়া বাস উঠিয়ে আমরা পাকাপাকিভাবে আস্তানা গাড়লাম ঠাটারিবাজারের 'হোটেল নাইল ভ্যালি'তে। নবাবপুর থেকে যে-রাস্তাটা ঠাটারিবাজারের দিকে এগিয়ে গেছে তার দক্ষিণপাশে নবাবপুর স্কুলের গা ঘেঁষে ছিল তখন এই রেস্তোরাঁটা। 'হোটেল নাইল ভ্যালি' নামটা নীলনদ অববাহিকার একটা শান্ত ছবি চোখের সামনে নিয়ে আসে। কিন্তু রেস্তোরাঁটার আসল চেহারায় তার বিন্দুমাত্র চিহ্নও ছিল না। বড়সড় আকারের নোংরা বিমর্ষ চেহারার রেস্তোরাঁ একটা।

ঢাকা হলের কাছে নাজিমুদ্দিন রোডের রেলগেট পেরোলেই বেড়ার ছাপড়া-দেওয়া এমনি একটা হোটেল ছিল সে-সময়, নাম 'ক্যাফে দ্য নোয়াখালি'। সে-সময় বুদ্ধদেব বসু অনূদিত 'বোদলেয়ারের কবিতা' বেরিয়ে গেছে। সেই কবিতার ভেতর উনিশ-শতকী অবক্ষয়াক্রান্ত প্যারিসের রমণী আর ক্লেদজ কুসুমের জগতে আমুণ্ডুপ্রোথিত হয়ে আছি আমরা। ফরাসি অনুষঙ্গের 'ক্যাফে দ্য' শব্দদুটো আমার চোখের সামনে প্যারিসের মধ্যরাত্রির উজ্জ্বল জগৎ আর বোহেমিয়ান কবিদের সম্পন্ন পৃথিবীর স্মৃতি জাগিয়ে তুলত। রক্তস্রোতে রোমাঞ্চ জাগাত। এই রোমাঞ্চতাড়িত হয়ে আমি ঐ হোটেলে যেতে শুরু করি। আমার রোমান্টিকতার খেসারত আমাকে হাড়ে হাড়েই দিতে হয়েছিল। এই হোটেলের লাল টকটকে ঝোলের মশলাসর্বস্ব-খাবার নিয়মিত খেয়ে আমি যে-মারাত্মক অন্ত্রের সমস্যায় পড়েছিলাম তা থেকে উদ্ধার পেতে আমার ফ্লাজিলের আবিষ্কার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আমার ধারণা, পাইপ-টানা মধ্যবিত্ত বাঙালির মতো ইংরেজি-ফরাসি নামওয়ালা এদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত রেস্তোরাঁগুলোর নামে আর আচরণে এমনি একটা উৎকট স্ববিরোধিতা আছে। হোটেল নাইল ভ্যালিও ছিল এমনি এক মারাত্মক রেস্তোরাঁ।

হোটেল নাইল ভ্যালির ভেতরকার রুগ্‌ণ চ্যাটচেটে পরিবেশের মতো এর বাইরের পৃথিবীটাও ছিল নোংরা আর ঘিনঘিনে। এর গা-ঘেঁষেই ঠাটারিবাজারের কসাইদের ছোট ছোট সারবাঁধা দোকান—সদ্য-জবাই-করা গরুছাগলের রক্তমাখা ঝোলানো মাংসের আকীর্ণ জগৎ। সারাটা তল্লাট যেন রেমব্রান্টের আঁকা চামড়া-ছাড়ানো কর্তিত পশুর ছবির মতো জীবন্ত, বাস্তব। বৃষ্টির দিনে রক্ত আর মাংসের ফেঁপে-ওঠা উপচানো তীক্ষ্ণ গন্ধের সঙ্গে চারপাশের দোকানের চেরাই-করা ভেজা কাঠের গন্ধ মিলেমিশে জায়গাটাকে আরও দুর্বিষহ করে তুলত। এসব সত্ত্বেও অথবা হয়তো এসব কারণেই হোটেল নাইল ভ্যালি আমাদের নিয়মিত ঠিকানা হয়ে উঠল। নাইল ভ্যালির পুতিগন্ধময় পরিবেশ আমাদের চেতনায় যেন পচনের রোমাঞ্চ জাগাত। যে ক্লেদ আর আবিলতার বিমর্ষ গান গাইতে চাচ্ছিলাম আমরা, নাইল ভ্যালি যেন ছিল তারই প্রতীক। হয়তো তাই সে আমাদের অমন তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিল।

কে প্রথম হোটেল নাইল ভ্যালি খুঁজে বের করেছিল জানি না, কিন্তু প্রায় নিয়ম ধরে আমরা এক দুই করে জুটে যেতে লাগলাম সেখানে। হোটেল নাইল ভ্যালিই আমাদের একটা বড় দল হিসেবে গড়ে তুলল। রফিক, প্রশান্ত, সিকদার, আমি তো যেতামই, মান্নানও আসত মাঝে মধ্যে। দেখতে দেখতে রফিকদের বন্ধু শহীদুর রহমান এসে জুটল সেখানে। ঢাকা কলেজে মান্নান-ইলিয়াসদের সঙ্গেই পড়ত শহীদ। কিন্তু কলেজে থাকতে ওদের সঙ্গে পরিচয় হয়নি শহীদের। আলাপ হল এখানে এসে। 'সংবাদ'-এ চাকরি করত ও। ঐ সময় ওর একটা অসম্ভব ধারালো গল্প বের হয় 'সমকাল'-এ, নাম 'বিড়াল'। একজন প্রতিশ্রুতিশীল গল্পকারের পরিচয়ে চিহ্নিত হয়ে যায় শহীদ। গল্পটার জন্যে তরুণমহলে শহীদ এতটাই বিখ্যাত হয়ে ওঠে যে আমাদের মুখে ওর নামই হয়ে দাঁড়ায় শহীদুর রহমান বিড়াল। সারাজীবনে আমাদের দেওয়া ঐ নামটা থেকে নিজেকে আর ছাড়িয়ে নিতে পারেনি ও। এরপরে আরও অনেক গল্প লিখেছে শহীদ কিন্তু কোনো গল্পই 'বিড়াল'-এর শক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। সারাজীবন আমাদের কাছে ওর 'বিড়াল' হয়ে যাবার হয়তো এটাও একটা কারণ।

ঝিনাইদহ থেকে ঢাকায় এসেছিল শহীদ। ওর গলার স্বর ছিল দরাজ, হাসি ছিল প্রাণখোলা, বুক-কাঁপানো। ওর হাসি ওর একহারা রোগা পাতলা শরীরের তুলনায় ছিল অনেক বেশি জোরালো আর উদ্দাম। ওর হৃদয়ও ছিল তাই। জীবনের আবেগে কেঁপে-কেঁপে উঠত ও। ওর স্বভাবে ছিল গ্রামবাংলার সবুজ অকৃত্রিম সরলতা। সবকিছুর ভেতরে সেই সহজিয়া আমেজ অনুভব করতাম আমরা। সে-আমেজ ছড়িয়ে ছিল ওর লেখাতেও।

গল্পের পাশাপাশি কবিতাও লিখত শহীদ। ফারুক আলমগীর সম্পাদিত 'প্রতিধ্বনি'তে ছাপা ওর ঐ সময়কার একটা কবিতায় এমনি ছোট্ট একটুকরো সহজ সবুজ গ্রামবাংলার ছবি আজো চোখের সামনে ভাসে :

আমার কিশোর বেলা কেটেছে যেখানে—ঘোড়াশাল ঃ
সে এক গ্রামের নাম, অবারিত মাঠের চত্বরে
স্মৃতির জোয়ার বয়,—অমার্জিত কিশোর দামাল,
আমি লিচু, আম, জাম, দাঁতে কেটে পুরেছি উদরে,

যেখানে গাজীর গান শুরু হলে ভীড় হত বেশ,
পুরোনো ভাসান হতো, কিংবা ছোঁড়াদের অষ্টগান,
জমাতো আসর খুব, কেষ্টযাত্রা ছড়াতো আবেশ
অথবা নৌকাবিলাস, লাইলি মজনু, রূপভান;

সাঁঝের বেলায় সব চ্যাংড়ারা মিলে সাধত গলা
'কালা আমায় পাগল কৈরাছে ঘরে রৈ কেমনে'—
হরেক রকম কণ্ঠ খেলত পাখির মতো খেলা,
ডাকা হুঁকো মুখে মুখে ঘুরতো সদাই, পড়ে মনে—

ধান-ভানা মেয়েটিরে—সেই চালকি রাঙা বড়ুর মুখ :
ঢেঁকির পাড়ের তালে পাছা-নাচা প্রাণে দিত সুখ।

[ঘোড়াশাল]

আমাদের ষাটের দশকের প্রথমপর্বের সহযাত্রীদের মধ্যে যাকে আমরা প্রথম হারিয়েছি সে শহীদ—যার যৌবনদীপ্ত প্রাণখোলা উদ্দাম হাসি মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত অপরাজিত ছিল। ১৯৯২ সালে অনেকদিন অনেকরকম অসুখে ভুগে বিদায় নেয় ও। ওকে কবর দেওয়াও হয়েছে ঝিনাইদহেই, ওদের গ্রামের নির্জন শেষপ্রান্তে। সেখানেই, সেই কবরের ভেতর, ওর বুকের ভেতরকার সেই আবহমানের ছোট্ট গ্রামবাংলাটি বৃষ্টি আর শিশিরের নিচে সুস্মিত হয়ে আজও শুয়ে আছে।

২

হোটেল নাইল ভ্যালির আসরে গ্যাণ্ডারিয়া থেকে যোগ দিয়েছিল দুজন : ইমরুল চৌধুরী আর আফজাল চৌধুরী। এদেশে জমির তুলনায় জমিদারের সংখ্যা বেশি, চৌধুরীর সংখ্যা তারও অনেক গুণ। কাজেই নামের শেষে চৌধুরী লাগিয়ে যারাই গ্যাণ্ডারিয়া থেকে আসবে তারাই-যে জমিদার বা আত্মীয় হবে এমন কোনো কথা নেই। এরাও তা ছিল না। ইমরুল ঢাকার ছেলে, থাকত গ্যাণ্ডারিয়ার নিজেদের বাসায়। আফজাল এসেছিল সিলেট থেকে। পাড়া সুবাদে দুজন ঘনঘোর বন্ধু হয়ে ওঠে একসময়। দুজনেই

এরা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে রফিক, প্রশান্ত, মান্নান, আসাদ আর ইলিয়াসের সহপাঠী। আগেই বলেছি, এর আগেই ইমরুলের 'ভূতের সাথে ষাট সেকেন্ড' বেরিয়ে গেছে। সেদিক থেকে পুরো দলটার ভেতর ও-ই একমাত্র স্বীকৃত গ্রন্থকার। এজন্য ওর উঁটপাটই তখন আলাদা। বইটা শিশুসাহিত্যের হলেও নানা জায়গায় বিজ্ঞাপন যাওয়ার ফলে ওর নাম ছড়িয়ে পড়েছে লেখকমহলের সবখানে। বন্ধু হিসেবে ওর পরিচয় দিতে পারলে দলের অনেকেই তখন বর্তে যায়।

গ্যান্ডারিয়া স্টেশন থেকে একটু দূরে মাঠের ভেতর টিলার মতো উঁচু একটা জায়গায় একটা নির্জন বিচ্ছিন্ন রহস্যময় টিনের চালওয়ালা বাসা। রাতের বেলায় দূর থেকে একটা অন্ধকার দ্বীপের মতো দেখায় সেটাকে। সেই বাসা ভাড়া নিয়ে থাকত আফজাল। লোকালয় থেকে দূরে হওয়ায় ও নিরাপত্তার দিক থেকে সুবিধাজনক বলে বেশ কিছুকাল দলের অনেকে গাঁজা খাওয়ার আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করেছিল ওটাকে।

কে বা কারা প্রথম আমাদের ভেতর গাঁজার সংক্রাম ঘটিয়েছিল এতদিন পরে তা মনে করা দুষ্কর, তবে কিছুদিনের মধ্যেই এর ওর হাত হয়ে গাঁজা এসে পৌঁছোতে শুরু করেছিল আমাদের আসরে। কল্কি নয়, সিগারেটের ভেতরকার তামাক ফেলে দিয়ে তার মধ্যে গাঁজা পুরে শুরু হত প্রস্তুতিপর্ব। তারপর সবাই গোল হয়ে বসে আরম্ভ করত এর সেবন। একেকজন দুই-এক টানের পর তা পার করে দিত পাশের জনের হাতে, সে তার পরের জনকে, এমনি করে জমে উঠতে থাকত এর পরিবেশ। দেখতে দেখতে এক অদ্ভুত আর প্রাণবন্ত স্বপ্নজগতের বাসিন্দা হয়ে উঠত সবাই। চারপাশের পৃথিবীটা ভেঙে গুঁড়িয়ে উদ্ভট অবিশ্বাস্য জগতে রূপ নিতে শুরু করত, আর সেই বেঁকে যাওয়া, উল্টো দোমড়ানো স্থানকালের ভেতর নিজেদের রাজা-বাদশা ভেবে আকণ্ঠ তৃপ্তির মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকার এক বিচিত্র অনুভূতিতে নিমগ্ন হয়ে যেত সবাই ।

আমার মনে হয় বাংলাদেশের তরুণ-লেখকদের মধ্যে গাঁজার সংক্রমণ সেই প্রথম। আমি নিজেও অন্তত তিন-চার দিন এ-ধরনের আসরে বসেছি এবং অল্প- বিস্তর অংশ নিয়েছি। একদিন খুব জমকালো আসর বসেছিল আমার নিজের বাসাতেও। গাঁজার ঘোরে কী যে অদ্ভুত আর করুণ হয়ে ওঠে একেকজনের পরিচিত অবয়ব, ভাবলে আজও হাসি পায়। মনে আছে ঘরের দরোজা-জানালাগুলো বন্ধ করে বসেছে আমাদের আসর। সবাই টানছে আনাড়ির মতো। আমি দলের মুরুব্বি, আমার কাজ তাদের অনুসরণ করা নয়, সামলানো। তাই সবার মতো এক-আধটু স্বাদ নেবার চেষ্টা করলেও নিজেকে যতটা পারা যায় সজাগ রাখতে হচ্ছে।

কিছুক্ষণ গাঁজায় টান দিতেই শুরু হল এক হাস্যকর দৃশ্য। একজন কী কারণে যেন তার ডান হাতটা উপরের দিকে তুলেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছে তার হাতটা অসীম অনন্তের পথে চিরকালের মতো রওনা হয়ে গেছে। আর ফিরবে না। হাউমাউ করে ভাঙা গলায় সে ডুকরে উঠল :

'সায়ীদ ভাই!'

'কি?'

'আমার হাতটা ওপরের দিকে চলে যাচ্ছে কেন?' হাতটা বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে বলে তাঁর এই অবচেতন ভীতি।

এমনি সব অদ্ভুত ব্যাপার চলছে চারপাশে। ঠিক যেন আফিমের নেশায়-ধরা বঙ্কিমের কমলাকান্ত।

ওদিকে আর-একজন হঠাৎ ঘরের অন্য কোণ থেকে হাউমাউ করে উঠল। কী ব্যাপার! ব্যাপার কিছু না। ঘরের লাইটটা সিলিং থেকে নেমে আসা তারের শেষ মাথায় ঝুলে দপদপ করে আলো দিচ্ছে। তাই দেখে হঠাৎ তার মনে হয়েছে কোনো-এক সুদূর নক্ষত্র অসীম মহাশূন্য থেকে খসে গিয়ে তার বরাবর এগিয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধসে পড়ে তাকে সহ পৃথিবী সভ্যতা সব লুপ্ত করে দেবে। তার ভয়ার্ত কণ্ঠ :

সায়ীদ ভাই!

কী?

'ওই দেখেন এসে পড়েছে। সব শেষ হয়ে যাবে।'

গাঁজার ঘোরে পৃথিবীর সবকিছু কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে যায়, এমনি এক আসরের পর, রফিক ওর এক কবিতায় তার বর্ণনা লিখেছিল :

যেন
পৃথিবীব্যাপী বিশাল জাহাজে সম্পূর্ণ নগ্ন আমি
ভয়ঙ্কর দুলছি

যেন
ডানায় ভর দিয়ে উড়ে চলছি কোনো রহস্যলোকে
বিরতিবিহীন এক ভ্রমণে

যেন
ভীষণ দ্রুত সিঁড়িহীন তিনশো তেত্রিশ-তলা বাড়ির
সর্বশেষ ফ্লোরে উঠে যাচ্ছি।

যেন
পার্কে শুয়ে দীর্ঘ হাত বাড়িয়ে নক্ষত্ররাজি
পকেটে পুরছি

যেন
অলৌকিকের অন্বেষণে জীবনানন্দের মতো
ক্লান্তিহীন হাঁটছি

যেন
একলক্ষ দুহাজার তিনশো চারজন রফিক আজাদ
সামরিক কায়দায় প্রতিবন্ধকহীন পাতালে নেমে যাচ্ছে

না, গাঁজা আমাদের ভেতর চালু হলেও তা আমাদের উপর বিপজ্জনক প্রভাব ফেলতে পারেনি। কেউ গাঁজায় শহীদ হয়ে জীবন উচ্ছন্ন দেয়নি। হয়তো সেদিনের সেই ছোট্ট মফস্বলীয় ঢাকা শহরে এর সরবরাহ ছিল কম, নয়তো ছিল না তেমন প্রদীপ্ত নায়ক যার সৈনাপত্যে গাঁজা পরিণত হবে সবার সর্বজনীন নিয়তিতে। একজন সাধারণ মাপের নায়ক অবশ্যি একবার দেখা দিতে শুরু করেছিল। সে টাঙ্গাইলের সাযযাদ কাদির। রফিক আজাদ আমার কাছে ওর এই প্রতিভা তুলে ধরতে গিয়ে বলেছিল, 'এখন ওই আমাদের গাঁ. গু।'

'গাঁ. গু মানে?'

'গাঁজার গুরু। ও-ই এখন আমাদের মধ্যে সেরা।' বলে দুহাত একখান করে নুয়ে পড়ে ভক্তের ভঙ্গিতে বন্দনা করেছিল—'জয় গাঁ. গু।'

আমার মনে হয় না গাঁজার ব্যাপারে এমন কোনো অঘটনঘটনপটিয়সী প্রতিভা ছিল সাযযাদের। হয়তো কোনো সীমিত পথে অল্প-বিস্তর চালান এসেছিল ওর কাছে। সেই সুবাদেই গঞ্জিকা উপাসকদের ভক্তে পরিণত করে ফেলতে পেরেছিল ও। কিন্তু সাযযাদ কাদিরের প্রসঙ্গে সময়মতোই আসা যাবে।

হায়াৎ মামুদের বিয়ের বৌভাতের রাতে অমনি একটা মহোৎসব জমে উঠেছিল আফজালের ঐ রহস্যময় বাড়িটার ভেতর। হায়াতের পৈতৃক বাড়ি গ্যাণ্ডারিয়ায়। ওদের বাসায় বৌভাতের খাওয়া শেষ হতেই রফিক চোখের ইশারায় আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল, 'আসেন।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায়?'

'কাছেই।' রফিক কথা বাড়াল না। ওর হাবভাবে একটা রহস্যময় অভিযানের প্রস্তুতি।

হায়াতের বাসা ছেড়ে অন্ধকার রাস্তায় নামতেই দেখতে দেখতে একটা বিরাট দল এসে যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। অন্ধকারের ভেতর থেকে অস্পষ্ট মুখ উঁচিয়ে থাকা আফজালের ঐ বিচ্ছিন্ন ভূতুড়ে বাড়িটার ভেতর জড়ো হল সবাই। যদ্দুর মনে পড়ে দলের বাইরেরও অনেকে ছিল সেখানে সেদিন। একটা বড়সড় আসর বসে গিয়েছিল আফজালের বড়সড় ঘরটার ভেতর। হয়তো বাড়িটার ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা সেটা। শুরু হয়েছিল গঞ্জিকাসেবীদের এক সর্বজনীন মহোৎসব। কিছু পাঁড় গাঁজাখোর আর কিছু নতুন গঞ্জিকা -সেবক অনেক রাত পর্যন্ত চিৎকারে উৎকট করে রেখেছিল বাড়ির চারপাশের সেই অন্ধকার পরিবেশটাকে। কখনো পৈশাচিক তীব্র হাসিতে নিঃশব্দ রাত্রিকে ফালি-ফালি করে, কখনো ভাঙা গলায় অঝোরে কেঁদে-কেঁদে রাতের বাতাসকে করুণ আর নারকীয় করে তুলেছিল সবাই। গাঁজার সুবিধাই এই। হৃদয় মন যা চায়, যা স্বপ্ন দেখে, কলস উপচিয়ে তাকে অনুভব করা, সেই স্বপ্নজগতে অবাধে হেঁটে বেড়াতে কোনো বাধা নেই।

৩

আফজাল প্রথম থেকেই কবিতা লিখত। পরিমিত বলীয়ান ও ভারসাম্যময় ছিল সেই কবিতা। কবিতার এই ক্ল্যাসিক গাঁথুনি এক রফিক ছাড়া দলের আর কারো মধ্যে ছিল না। ওর শৈশব-কৈশোর গড়ে উঠেছিল সিলেটি ধর্মাশ্রয়ী পরিবেশে। সময়ের বৈরিতায় একটা অবক্ষয়ী দলের খপ্পরে পড়ে গেলেও ওর ভেতরটা ছিল ধর্মীয় কল্যাণবোধে প্রদীপ্ত। কবিতার আঙ্গিকের মতো ওর কবিতার বিষয়ও ছিল বিশ্বাসে জ্বলজ্বলে। ওর প্রথম কবিতার বই 'কল্যাণব্রত'তে এই বিশ্বাসের জোরালো শব্দ শোনা যায়। সত্তরের দশকে প্রকাশিত ওর কবিতার বই 'হে পৃথিবী নিরাময় হও'-তেও সেই ধর্মীয় কল্যাণচেতনা ধ্বনিত। আজন্মের এই বিশ্বাসের কারণে প্রথম ষাটের অবক্ষয়ী ধারার সঙ্গে কিছুদিনের জন্যে একাত্ম হলেও এ থেকে ক্রমে দূরে সরে যেতে থাকে আফজাল। একসময় এর প্রতিপক্ষই হয়ে পড়ে ও। ওর প্রথম বই 'কল্যাণব্রত'-তে ওর এই বিরুদ্ধপক্ষে অবস্থান গ্রহণের ঘোষণা সরাসরি ও স্পষ্ট। 'কল্যাণব্রত' বইতে ও প্রতিটি কবিতার শুরুতে ও ওর সেই সময়কার আত্মিক সংকটের বর্ণনা দিয়েছে। কীভাবে অবক্ষয়ের হাত থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে ওর আত্মাকে বাঁচিয়েছিল তার বিবরণ আছে ঐ লেখাগুলোয়। যতদূর শুনেছি সুতীব্র ধর্মবোধের তাড়নায় একসময় কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীলই হয়ে ওঠে আফজাল। নানা সময় ওর কার্যকলাপ নিয়ে এমন অনেক অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনেছি যা আমাদের বিমর্ষ করেছে।

আফজাল পরত পাজামা-পাঞ্জাবি। ধর্মীয় প্রথামতো ওর পাজামা গোড়ালির ওপর পর্যন্ত ওঠানো থাকত। স্বাস্থ্যবান আফজালের সুঠাম শরীর থেকে স্বাস্থ্যের চিকচিকে শ্যামল শ্রী ঠিকরে পড়ত। শাদা পাঞ্জাবি আর গোড়ালির ওপর পর্যন্ত তোলা শাদা পাজামা পরা বলিষ্ঠ শরীরে ওকে ইসলামের আদিযুগের যোদ্ধাদের মতো লাগত। দেখে মনে হত 'আলী আলী' বলে বেদ্বীনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে যে-কোনো সময়ে। দৈর্ঘ্য বেশি না-হওয়ায় যুদ্ধে হজরত আলীর যেসব সুবিধা ছিল সেগুলো ওকে স্মরণ করিয়ে দিলে প্রাণখুলে হো হো করে হাসত আফজাল। ওর মন ছিল অসম্ভব দিলদরিয়া আর উদার। প্রাণখোলা, সত্যবাদী, অন্তরঙ্গ ও উদ্দীপ্ত আফজালের মোমিনের মতো সরল স্নিগ্ধ মুখ এখনো মনে পড়ে।

৪

ঢাকা কলেজ দলের যে-সদস্যটি এখানে সবচেয়ে বেশি আসত সে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। সঙ্গে আসত ওর বন্ধু জামাল খান। জামাল ছিল রাষ্ট্রনীতির ছাত্র। উজ্জ্বল

মননশীল প্রবন্ধ লিখত। মেধাবী ও প্রখর জামাল ষাটের দশকেই আমেরিকার পথে পাড়ি জমিয়েছিল, আর ফেরেনি। এখন আমেরিকার কোনো-একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। শুনেছি এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গরাজ্যে পরিণত হওয়াকে ও বাংলাদেশের একমাত্র ভবিষ্যৎ বলে মনে করে। না, হাসি নয়।

ইলিয়াসের প্রকৃতির একটি অংশ ছিল মরবিড। এজন্যেই সে-সময়কার আত্মকেন্দ্রিকতা ও রুগ্ণতার প্রায় প্রতীক হয়ে উঠেছিল ও। ষাটের পুরো অবক্ষয়কে ধারণ করে নিয়েছিল ও নিজের ভেতর। কিন্তু এই অবক্ষয়ের পাশাপাশি ওর ভেতর ছিল আরেকটা মানুষ। সে সুস্থ, সামাজিক, বলীয়ান ও মূল্যবোধসম্পন্ন। ইলিয়াস এসেছিল বগুড়া থেকে। ওদের বাড়ি অনেকদিন থেকেই রাজনৈতিক হাওয়ার সজীব চলাচলে ছিল প্রাণবন্ত। ওর আব্বা বি. এম. ইলিয়াস (বদিউজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস) প্রথমে ছিলেন মুসলিম লীগার। ১৯৪৬ সালের বেঙ্গল এসেম্বলির এবং সাতচল্লিশ-পরবর্তী পূর্ব-পাকিস্তান আইনসভার তিনি ছিলেন সদস্য। একসময় কিছুদিন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারিও ছিলেন। পরে দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতি ছেড়ে পুরোপুরি বাঙালি হয়ে শেখ মুজিবের অনুগামী হয়ে যান। ওর চাচার ইতিহাস অন্যরকম। তিনি যৌবনে ছিলেন কট্টর বামপন্থী। পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবে দেশ মানুষ সমাজ এসব ছিল ইলিয়াসের রক্তের জিনিশ। কাজেই একদিকে প্রথম ষাটের অবক্ষয়াক্রান্ত পরিবেশ ওকে যেমন রুগ্ণতা আর মরবিডিটির জগতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তেমনি অন্যদিকে ওর রক্তে চাঞ্চল্য তুলেছিল ষাটের দ্বিতীয় পর্বের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও গণমানুষের মুক্তির স্বপ্ন। ষাটের দ্বিতীয় পর্বে জাতীয়তাবাদের রক্তপতাকা উদ্দাম হাওয়ায় উড়তে শুরু করলে ও আবার নিজের রক্তপ্রকৃতির কাছে ফিরে যাবার পথ খুঁজে পায় এবং মানুষ ও দেশকে ওর লেখার উপজীব্য করে। কিন্তু অবক্ষয় ওকে কখনো পুরোপুরি মুক্তি দেয়নি। সমাজ-সভ্যতায় অবিচল বিশ্বাসের পাশাপাশি রুগ্ণতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা ওর শিল্পভাবনায় একইভাবে লেগে থেকেছে।

ঐ দশকের প্রথম পর্বের সার্বিক নৈরাজ্যকে যারা আকণ্ঠ ধারণ করেছিল তাদের মধ্যে ইলিয়াস একজন। তখন কেবল গল্প লিখত ইলিয়াস। ওর গল্পও অসাধারণ। ওর 'দোজখের ওম', ও 'তারাবিবির মরদ পোলা' দুটি স্মরণীয় গল্প। বড় আয়তনের উপন্যাসকে আশ্রয় করেছিল ও অনেক পরে—ওর নিজের ভেতরকার জীবনবোধ সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠার পর—হয়তো উপন্যাসের ভেতর দিয়ে ঐ পরিণত ও ব্যাপক জীবনচেতনার শস্য উপহার দেবার দরকারে। নাইল ভ্যালির আড্ডা শুরু হওয়ার কিছুদিন পর ১৯৬৪ সালে 'সাম্প্রতিক ধারার গল্প' নাম দিয়ে আমি সে-সময়কার তরুণতম ধারার লেখকদের একটি গল্প-সংকলন বের করেছিলাম। বইয়ের ভূমিকায় ইলিয়াস আর মান্নানের তুলনা করতে গিয়ে লিখেছিলাম : 'আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রায় একসঙ্গে সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁরা এখনো সাহিত্যিক সহযাত্রী, যদিও তাঁদের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। শক্তিমান দুজনেই, কেননা তা না হলে এতদিনে একজন আরেকজনের অনুগামী হতেন। তবু ইলিয়াস মরবিড ও

স্পর্শকাতর, সৈয়দ গ্রোটেস্ক ও অবিশ্বাসী। ইলিয়াসের গল্পে দুরপনেয় বিকৃতি দেখে যাঁরা শিউরে ওঠেন, তাঁরাও তাঁকে শক্তিশালী না বলে পারেন না।'

পরিণত পর্বের মান্নান বা ইলিয়াস সম্বন্ধে এর অনেক কথাই হয়তো খাটবে না। ইলিয়াসও শেষ অব্দি শুধু মরবিড থাকেনি, গভীর মানবিক দায়বদ্ধতার কাছে নতজানু হয়েছে। মান্নানও আর থাকেনি পুরো অবিশ্বাসী। মান্নানের 'সকল প্রশংসা তাঁর' প্রকাশের পর কে-ই বা আজ আর ওকে অবিশ্বাসীর অপবাদ দিতে সাহস করবে? কিন্তু ঐ পর্যায় পর্যন্ত মান্নান সামাজিক অনিবার্যতার ব্যাপারে নির্লিপ্ত একজন বহিরাগত, যেমন ইলিয়াস সক্রিয় রকমে বিকৃতিপরায়ণ।

উদ্দাম নজরুলি প্রাণশক্তিতে ভরপুরে হয়ে হৈ হৈ করতে করতে যে নাইল ভ্যালির আড্ডাগুলোয় এসে শামিল হত সে আসাদ। ভেতরের আনন্দে ঝলমল করত ও। যখন যেখানে থাকত সবাইকে নিয়ে জমজমাট হয়ে থাকত। এম. এ. পাস করার পর প্রথম কয়েক বছর ও ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে। সেখানেও ষাট-দশকী তরুণ-লেখকদের নিয়ে একটা প্রাণবন্ত দল গড়ে তুলেছিল। ওদের মুখপত্রের নাম ছিল 'ভেলা'। তরুণ-লেখকদের বই বের করার জন্যে একটা প্রকাশনা সংস্থাও গড়ে তুলেছিল ওরা। নাম 'কপোতাক্ষ'। সবার চাঁদায় বই বেরোত সেখান থেকে। আল মাহমুদের 'সোনালি কাবিন', আবদুস সাত্তারের 'আরবী কবিতা', মান্নানের 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ'—এমনি বেশকিছু বই বেরিয়েছিল 'কপোতাক্ষ' থেকে।

আসাদের উষ্ণ হৃদয়ের আঁচে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তরুণ-লেখকদের মধ্যে সেদিন যে উৎসাহ জেগেছিল তার রেশ ঐ শহরে এখন পর্যন্ত রয়ে গেছে। ওর সেদিনের বন্ধুবান্ধবদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আজও নেতৃত্ব চলছে। আসাদ আজও ষাটের দশকের সেই আসাদই; তেমনি উৎসাহে আর ফুর্তিতে ভরা। এর মধ্যে ও টেলিভিশনে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে বিস্তর খ্যাতি পেয়েছে। সুন্দর কণ্ঠস্বর, অনবদ্য বাচনভঙ্গি, রুচিশীল ও মার্জিত উপস্থাপনা দিয়ে দর্শকের ভালোবাসা কেড়েছে। সারাদেশের সাংস্কৃতিক মহলের প্রিয় ও পরিচিত মানুষ আজ ও। দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে ও সারাদেশে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু যেখানেই যায় সেখানেই তরুণ-সম্প্রদায়কে ও জাগিয়ে তোলে ওর প্রাণের সেই মদির মৌতাতে। বাংলাদেশী আমলে এখানকার উর্দু লেখক-কবিরা যখন পুরোপুরি বিমর্ষ ও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল তখনও উৎসাহ ও ভরসা দিয়ে আসাদই তাদের ভেতর আশা জাগিয়ে রেখেছে।

আসাদের বেশকিছু গদ্যপদ্য ছাপা হয়েছে 'কণ্ঠস্বর'-এ। ওর গদ্য প্রসাদগুণসম্পন্ন, কিন্তু ওর মূল ঝোঁক কবিতার দিকে। ওর কবিতার বই দশটি। এখানে আমি ওর প্রথম বই 'তবক দেওয়া পান' থেকে একটি কবিতা তুলে দিচ্ছি। অদ্ভুত সুন্দরভাবে কবিতাটি আবৃত্তি করে আসাদ। বছর-দশেকের ব্যবধানে আমি ওকে দিয়ে কবিতাটি আমার দুটি বিনোদনমূলক টিভি অনুষ্ঠানে দুবার আবৃত্তি করিয়েছিলাম :

কোথায় পালালো সত্য ?
দুধের বোতলে, ভাতের হাঁড়িতে ! নেই তো
রেস্টুরেন্টে, হোটেলে, সেলুনে,
গ্রন্থাগারের গভীর গন্ধে,
টেলিভিশনে বা সিনেমা, বেতারে,
নৌকার খোলে, সাপের ঝাঁপিতে নেই তো।

গুড়ের কলসি, বিষের কৌটো
চিনির বয়াম, বাজারের ব্যাগ,
সিগারেট কেস, পানের ডিব্বা,
জর্দার শিশি, লক্ষ্মীর সরা,
নকশী-পাতিল, চৌকির তলা
সবি খুঁজলাম, খুঁজে দেখলাম নেই তো !
সাংবাদিকের কাঠের ডেস্‌কে
কাগজে, কেতাবে, পুথিতে, কলমে
ইনজেকশনে, দাঁদের মলমে
ভ্যানিটি ব্যাগ বা পকেটে, আঁচলে
ড্রয়ারে, ব্যাঙ্কে, আয়রন সেফে
সত্য নামক মহান বস্তু নেই তো !

কবিতায় নেই, সঙ্গীতে নেই
রমণীর চারু ভঙ্গিতে নেই
পাগলের গাঢ় প্রলাপেও নেই
নাটকের কেনো সংলাপে নেই
শাসনেও নেই, ভাষণেও নেই,
আঁধারেও নেই, আলোকেও নেই
রেখাতেও নেই, লেখাতেও নেই,
উত্তরে নেই, প্রশ্নেও নেই
লেবাসেও নেই, সিলেবাসে নেই,
পারমিটে নেই, বোনাসেও নেই,
হতাশায় নেই, আশাতেও নেই,
প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসাতেও নেই
এমন কি কালোবাজারেও নেই
কোথায় গেলেন সত্য ?

[সত্য ফেরারী]

হ্যাঁ, মিষ্টি কৈশোরিক হাসি নিয়ে নাইল ভ্যালিতে আসত আর-একজন। আসাদদের সহপাঠী। ফারুক আলমগীর। ওর চোখমুখ চাউনি চেহারা ছিল কবিতার লাবণ্য ছড়ানো।

৫

উদ্দাম বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি নিয়ে নাইল ভ্যালিতে আসত আরও একজন, শহীদ কাদরী—আমাদের সবার বিস্ময় ও কেন্দ্রীয় আকর্ষণ। বেপরোয়া নজরুলি বন্যতা ছিল না ওর মধ্যে, ওর জীবনীশক্তি ছিল মননধর্মী—তীক্ষ্ণ, গভীর, সচেতন ও বলিষ্ঠ। বিশ শতকী ইউরোপীয় আধুনিকতার ও ছিল প্রায় মূর্ত-প্রতীক। পড়াশোনায় ও চেতনাজগতে সেই আধুনিকতাকে ও ধারণ করত। প্রথম ষাটের অনেক তরুণ-লেখকের আধুনিকতার চেতনা অনেকখানিই ওর হাত থেকে পাওয়া। আমাদের দলের কেউ ছিল না ও, কখনো হয়ও নি তা, কিন্তু যাকে ঘিরে নাইল ভ্যালির আসর সবচেয়ে ভরাট আর প্রাণবন্ত হয়ে থাকত সে ঐ শহীদ।

পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির মতো উচ্চতার মোটাসোটা দোহারা গড়নের শহীদ কাদরীর জীবনাবেগ ছিল অফুরন্ত। প্রচণ্ড আড্ডাবাজ আর আমুদে স্বভাবের ছিল ও। ওর কথাবার্তা ছিল বুদ্ধিদীপ্ত, ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ ও রসিকতায় জমজমাট। উর্দু বাংলা মেশানো পুরোনো ঢাকার ভাষার আমেজ ছিল ওর কথায়। সচেতনভাবে এটা ও করত। ওর ঘ্যাসঘেসে দরাজ কণ্ঠের উদ্দাম হাসির শব্দ সবার রক্তে কাঁপুনি ধরাত। কেবল ষাটের লেখকদের নয়, পঞ্চাশ-ষাটের প্রায় সব লেখকের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল শহীদ। এমনিতেই একটা বলিষ্ঠ মাদকতাপূর্ণ আকর্ষণ ছিল ওর ব্যক্তিত্বের, তা দিয়ে সবাইকে ও নিজের দিকে টেনে নিয়েছিল। আমাদের অগ্রজ লেখকদের থেকে শুরু করে সে-সময়কার তরুণতম লেখকটির যা ছিল সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত—সেই পশ্চিমি আধুনিকতার উন্মূল মনোভঙ্গি, নিঃস্বতা, বোদলেয়ার বা আমেরিকার বিটনিক সম্প্রদায়ের বেহিশেবি বোহেমিয়ান জীবনযাত্রা, কাম্যুর উপন্যাসের বহিরাগত মানুষ বা এলিয়টের শূন্য মানুষ—সবকিছুকে নিজের ভেতর ধারণ-করা এক রহস্যময় মানুষ হয়ে উঠেছিল ও সবার কাছে। যখন যে-রেস্টুরেন্টে ও বসত তা-ই ওর প্রাণের স্পন্দনে জমজমাট হয়ে উঠত। পঞ্চাশ দশকের শেষ থেকে শুরু করে ষাটের দশকের প্রথম অর্ধেক পর্যন্ত সময়ে ওকে ঘিরে পুরোনো ঢাকার বিউটি বোর্ডিং-এ যে-আড্ডার ঐতিহ্য জমে ওঠে তা সে-সময়কার ঢাকার শিল্প আর বুদ্ধিবৃত্তিজগতের সব উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে সংঘবদ্ধ করেছিল। বিউটি বোর্ডিং-এর সেই উষ্ণ অন্তরঙ্গ সমাবেশ আজও ঢাকার লেখক-শিল্পী-চলচ্চিত্রনির্মাতা মহলের কিংবদন্তি।

পঞ্চাশের লেখকদের ভেতর শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ থেকে শুরু করে প্রায় সবাই ছিল ওর ব্যক্তিগত বন্ধু। ষাটের লেখকরাও ছিল তাই। ওর কোনো দল ছিল না। ও ছিল একা। নিজের নিঃশব্দ একক দলের একচ্ছত্র অধিপতি।

আমি আর কাদরী ছিলাম বয়সের দিক থেকে সমান, দুজনেই ১৯৩৯ সালে কলকাতায় জন্মেছিলাম, কিন্তু আমার চেয়ে ও ছিল মানসিকভাবে অনেক পরিণত। আমার মতো অপরিণত, অসহায় আর বিষণ্ন কৈশোর ওর ছিল না। স্বস্বভাবে ও ছিল

শৈশব-কৈশোরহীন, যেন জন্ম নিয়েই যৌবনের জ্বলিত খররৌদ্রে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একাকীত্বের একটা বিশাল জমাটবাঁধা কষ্ট ছিল ওর ভেতর। সেই অব্যক্ত যন্ত্রণায় একখান থেকে অন্যখানে, বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে রাত থেকে রাতে রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়াত ও। এক বন্ধুর বাড়ি থেকে অন্য বন্ধুর বাড়ি, এক রেস্তোরাঁ থেকে অন্য রেস্তোরাঁয় ছিল ওর যাযাবরবৃত্তি।

আপাদমস্তক গৃহহীন আর অনিকেত শহীদই ছিল সে-সময়কার নতুন ঢাকা নগরের প্রথম বোহেমিয়ান চরিত্র। ওর একমাত্র ভাই শাহেদ কাদরীর সঙ্গে থাকত ও। বুদ্ধিদীপ্ত ও বলিষ্ঠ শাহেদ কাদরী সে-সময় একটা স্বায়ত্তশাসিত কর্পোরেশনে ভালো চাকরি করতেন। শহীদের এই বেহিশেবি বোহেমিয়ান জীবনের প্রতি তাঁর উৎকণ্ঠাপূর্ণ প্রশ্রয় থাকলেও ওকে নিয়ে তাঁর আশঙ্কারও অন্ত ছিল না। পিতৃমাতৃহীন ছোটভাইয়ের জন্য একটা অবোধ মমতা ছিল তাঁর মধ্যে। শহীদ এই সময় 'অগ্রজের উত্তর' নামে একটা কবিতায় সেই মমতাভরা বড়ভাইয়ের পাশাপাশি ওর নিজের ভেতরকার গৃহহীন নিঃসঙ্গ যুবকের একটি চমৎকার প্রতিকৃতি এঁকেছে :

'না, শহীদ সে তো নেই; গোধূলিতে তাকে
কখনো বাসায় কেউ কোনোদিন পায় নি, পাবে না।
নিসর্গে তেমন মন নেই, তাহলে ভালোই হতো
অন্তত চোখের রোগ সযত্নে সারিয়ে তুলতো হরিৎ পত্রালি!
কিন্তু মধ্য-রাত্রির সশব্দ কড়া তার রুক্ষ হাতের নড়ায়
(যেন দুঃসংবাদ—নিতান্ত জরুরি) আমাকে অর্ধেক স্বপ্ন থেকে
দুঃস্বপ্নে জাগিয়ে দিয়ে, তারপর যেন মর্মাহতের মতোন
এমন চিৎকার ক'রে "ভাই, ভাই, ভাই" ব'লে ডাকে,
মনে পড়ে সেবার দার্জিলিঙের সে কী পিছল রাস্তার কথা,
একটি অচেনা লোক ও-রকম ডেকে-ডেকে-ডেকে খসে পড়ে
গিয়েছিল হাজার-হাজার ফিট নীচে!

সভয়ে দরোজা খুলি—এইভাবে দেখা পাই তার—মাঝরাতে;
জানি না কোথায় যায়, কী করে, কেমন করে দিনরাত কাটে,
চাকুরিতে মন নেই, সর্বদাই রক্তনেত্র, শোকের পতাকা
মনে হয় ইচ্ছে করে উড়িয়েছে একরাশ চুলের বদলে!

না, না, তার কথা আর নয়, সেই
বেরিয়েছে সকাল বেলায় সে তো—শহীদ কাদরী বাড়ি নেই।

[অগ্রজের উত্তর]

মোটামুটি এমনিভাবে জমে উঠল ঠাটারিবাজারের হোটেল নাইল ভ্যালির আসর। নোংরা ঘিনঘিনে সুপরিসর এই রেস্তোরাঁ সাহিত্যের জন্যে পুরো বেমানান; আর বেমানান বলেই এই ক্ষয়িষ্ণু-যুগের ব্যতিক্রমী তরুণদের কাছে এত আকর্ষণীয়, এর আবেদন এমন অপ্রতিরোধ্য। যে-যুগচেতনার চিত্রকর হবার জন্যে তাদের শিল্পীসত্তা তখন আকুলিবিকুলি করছে, সেই অবক্ষয়ের মূর্ত প্রতীক যেন ঐ ক্লিন্ন রেস্তোরাঁ। এ তো হতেই হবে। সঠিক চরিত্রের সঠিক পোশাক না হলে চলবে কেন? উজ্জ্বল হবে কী করে শরীরের বৈশিষ্ট্য? জমে উঠবে কী করে নাটক?

দেখতে দেখতে এসে জড়ো হল ইউসুফ পাশা, সুনির্মল গাঙ্গুলী, ইয়াসিন খান, মুহম্মদ খসরু—এমনি আরো অনেক তরুণ, যারা প্রথম ষাটের ঐ নতুন সাহিত্যযাত্রার আয়োজনে এসে ভিড় করেছিল। নাইল ভ্যালির নিরুপদ্রব উপত্যকায় সম্পূর্ণ হয়ে গেল সেই প্রাথমিক যুদ্ধপ্রস্তুতি। প্রথম ষাটের অবক্ষয়ী ধারার সব মূল লেখকই এসে জড়ো হল সেখানে, এমনকি আবদুল মান্নান সৈয়দও; সেই রহস্যময়, নিঃসঙ্গ তরুণ, সেই একাকী, বিবরবাসী—যে তার নতুন রক্তমাংসময় কাব্যিক গদ্যে সে-সময়কে করে তুলেছিল প্রাণবন্ত, দ্যোতনাময়।

রাতের বেলার গান

১

যূথবদ্ধ হয়ে উঠতেই পত্রিকার ব্যাপারটা সামনে উঠে এল। কী হবে এ দলের মুখপত্র? দেখতেই বা হবে কেমন? কী হবে নাম? একদিন সত্যি সত্যি চিন্তাটা মাথার স্নায়ুমণ্ডলীকে ক্ষিপ্তের মতো কামড়ে ধরল। সেদিন সারারাত আর ঘুম এল না। অস্থির পায়চারি চলল সকাল অবধি। একবার মনে হল বিরাট আমাদের এই যাত্রা। সারা দেশের সমবেত তারুণ্যের একটা উপপ্লব। একটিমাত্র পত্রিকা দিয়ে এর বিশাল বহুমুখী চরিত্রকে ধরা যাবে না। পত্রিকা লাগবে আরো। দরকার হলে অনেক। সাহিত্যের প্রতিটা শাখার জন্যে থাকতে হবে একটা করে কাগজ। কবিতার, গল্পের, প্রবন্ধের, সমালোচনার—প্রত্যেকটির একটি করে। উন্মত্ত মানুষের ভাবনা যতটা ক্ষিপ্ত, মাতাল, অবাস্তব আর সৃষ্টিছাড়া হয়ে উঠতে পারে ঠিক তাই। ঐ বয়সে উদভ্রান্ত, হাস্যকর হওয়া সম্ভব, ঠিক তাই।

ভাবনার সাথে সাথে ঝট ঝট করে পত্রিকাগুলোর নামও খেলে যেতে লাগল মাথার ভেতর। প্রথমেই চলে এল কবিতা-পত্রিকার নাম। প্রায় নিজে থেকেই চলে এল নামটা: 'কণ্ঠস্বর'। আনন্দে ভেতরটা কেঁপে উঠল। সত্যি ভালোলাগার মতো একটা নাম! যেমন বলিষ্ঠ তেমনি ধ্বনিময়। একটা যৌবনদৃপ্ত তারুণ্যময় কবিগোষ্ঠীর রঙিন পতাকার এর চেয়ে সুন্দর কী নাম আর হতে পারে!

কবিতা-পত্রিকার নামের সুরাহা হতেই পড়তে হল প্রবন্ধ-পত্রিকার নাম নিয়ে। আবার সেই হিংস্র অস্থির রক্তস্রোতের মস্তিষ্কময় উন্মাদ ছোটাছুটি। আবার সেই ঘরময় পদচারণা, যন্ত্রণা আর সেই উজ্জ্বল উদ্ধার : 'সূচিপত্র'। হ্যাঁ, একেবারে অসাধারণ না হলেও প্রবন্ধপত্রের নাম হিসেবে একেবারে ফেলে দেবার মতোও নয়। 'সূচিপত্র' মানে আমাদের সবার চিন্তাভাবনার একটা সুগ্রন্থিত তালিকা, আমাদের মননজগতের সপরিসর নির্ঘণ্ট।

প্রবন্ধ-পত্রিকার দায় চুকলেও ফাঁপরে পড়তে হল গল্প-পত্রিকার নাম নিয়ে। কিছুতেই মনমতো নাম মাথায় আসে না। একরাত্রে কতগুলো নামই বা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আর না-পেলেই বা হতাশার কী আছে? কে না জানে লেখকদের সবচেয়ে বড় অগ্নিপরীক্ষাটি হয় নামকরণের বেলায়। মাসের পর মাস কষ্ট, শ্রম আর যন্ত্রণাবিদ্ধ রাতের সলতে পুড়িয়ে কোনোমতে পেল্লাই সাইজের একটা বইও হয়তো লিখে ফেলা যায়, কিন্তু তার মনের মতো নাম কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। (কী কষ্টে যে তাকে আকাশ থেকে আঁকশি দিয়ে ছিঁড়ে আনতে হয়!) বহু উল্টোপাল্টা নামের জঞ্জাল থেকে একটা নাম কষ্টেমষ্টে শেষ অব্দি টেনে তোলা গেল : 'শব্দরূপ'। কিন্তু গল্প-পত্রিকার এ কী

নামের ছিরি ! কার ভালো লাগবে এটা ? কবিতার কাজ শব্দ নিয়ে, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে, কিন্তু গল্পের সাথে এর সম্পর্ক কোথায় ?

কিন্তু আর ভাবার শক্তি নেই। হাজার হাজার শব্দ নিয়ে খ্যাঁচাখেচি করতে করতে মাথার ক্ষমতা অবসন্ন হয়ে এসেছে। তাছাড়া আমাদের মূল বা প্রধান যে–কাগজ—যা আমাদের গোটা দলটার পুরো প্রয়াসের প্রতিনিধিত্ব করবে—যাতে থাকবে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা সবকিছু—আমাদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, তার নামটাই তো এখনো ঠিক করতে পারিনি। কী হতে পারে আমাদের মূল মুখপত্রের নাম ? প্রথম থেকেই ঐ নামটার জন্যে খোঁজাখুজি চলছিল মনের ভেতর, সেই পথেই বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো, এসে হাজির নামটা : 'স্বাক্ষর'। কেবল হাজির হল না, চোখের সামনে অপ্সরীর মতো এসে যেন দাঁড়িয়ে গেল। যেন বিদ্যুৎলতা ঝলক দিয়ে উঠল চোখের আকাশে।

হ্যাঁ, স্বাক্ষর ! চমৎকার নাম। আমাদের স্বপ্নের সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যায় যেন। 'স্বাক্ষর' মানে নিজেদের হাতে নিজেদের লেখা আমাদের একান্ত পরিচয়। 'বক্তব্য'–এর ঘোষণায় যে–লেখা হয়েছিল : 'কালের বুকের ওপর নতুন স্বাক্ষরের বেগবান চিন্তায় তারা অস্বস্ত'—সেই স্বাক্ষর। এর চেয়ে জুৎসই নাম আর কী হতে পারে ! রোমাঞ্চে, স্বপ্নে, উত্তেজনায় স্নায়ুতন্ত্রে আগুন লেগে গেল। চোখের সামনে 'স্বাক্ষর'–এর আগামী প্রচ্ছদ, তার ওপর রঙিন অক্ষরে আমাদের প্রাণবহ্নির মুদ্রিত চেহারা দেখতে পেলাম।

পরের দিন সবার সামনে তুলে ধরলাম গত রাতের নাম আর পরিকল্পনাগুলো––ঠিক নাইল ভ্যালিতে নয়, কাছাকাছি একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁয়। দোকানটা নতুন। ফুলবাড়িয়া স্টেশনে ঢোকার পথের ধারে মাত্র কিছুদিন আগে শুরু হয়েছে সেটি। চেয়ার–টেবিলগুলোর রং তখনো বেশ ঝকঝকে। খুব সম্ভব অনেকের সাথে প্রশান্ত, শহীদুর রহমান, ফারুক আলমগীর, হয়তো রফিকও ছিল সেখানে।

পছন্দ হোক না–হোক, হৈ হৈ করে একসাথে সমর্থন করল সবাই—যেভাবে গণআন্দোলনের সময় স্বতঃস্ফূর্ত হর্ষধ্বনির মাধ্যমে জনতা সমর্থন করে যায় একের পর এক প্রস্তাব—বিচার–আচার বা বোঝাবুঝির তোয়াক্কা না করে। চুনে চুনে যাচিয়ে খতিয়ে দেখার সময় কোথায় তখন। এগিয়ে যাওয়াই তখন আসল। যাকে সমর্থন করা যায় সেই এগিয়ে চলে। আমরা দল বেঁধে তখন এগোচ্ছি। হোটেল নাইল ভ্যালির সরগরম উত্তেজনার ভেতর থেকে যা আমরা সমর্থন করছি তা–ই যেন তরুণ–সাহিত্যের নিয়তি হয়ে যাচ্ছে।

তবু দ্বিধা পিছু ছাড়ে না। একটা নয়, চার–চারটা পত্রিকা ! অবশ্যি প্রত্যেকটিরই সম্পাদক আছে দুজন করে। কিন্তু দুজন করে সম্পাদক থাকলেই কি একটা পত্রিকা বের হয়ে যায় ? সম্পাদক হিসেবে নাম গেলেই কি কেউ সম্পাদক হয়ে যায়। আর বের যদিও বা হয় তাই কি বছর বছর চলে। তবু সম্পাদকদের দিকে তাকিয়ে কেন যেন আশা জাগে। না, চলবে। এই বিশাল সম্ভাবনা এদের শ্রমে উদ্যমে ঠিকই এগিয়ে যাবে। জ্যোতি আর সেবার সম্পাদনায় তখন বেরিয়ে চলেছে 'সপ্তক'। দেরি না করে পত্রিকা চারটির একটি পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন ছাপার ব্যবস্থা করে ফেললাম সপ্তকে। ওদের সৌজন্যেই করলাম। অন্তত

আমাদের আসন্ন পদপাতের নাম তো জেনে যাক সকলে। জেনে যাক আমরা আসছি।

নাম পাওয়া যায়, কিন্তু পত্রিকা বের করার কথা ভাবতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। একটা নয়, চার-চারটা নিয়মিত পত্রিকা—তিনটা দ্বিমাসিক, একটা মাসিক ('স্বাক্ষর')। পত্রিকা বের করতে, নিয়মিত করতে টাকা লাগে বিস্তর। তবু সবকিছুই হওয়া সম্ভব। কেন নয়? চেতনায় চলেছে তৃষ্ণা, চোখে স্বপ্ন, হৃদয়ের ভেতর দাউ দাউ যৌবন। সারা শরীর জুড়ে বন্য চিৎকার। কে একে রোধ করবে? 'এই যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবি কী দিয়া বালির বাঁধ?'

তবু লাগে টাকা। সব সংগঠনের মতো পত্রিকাও একটা সংগঠন। টাকার রসদ ছাড়া এর চাকা ঘোরে না। কেবল কি টাকা? চাই জনবল, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, বয়সের সহযোগ। সে-সময় বাংলাভাষার সাহিত্যপত্রিকা বের করার কষ্ট ছিল আজকের থেকে অনেক বেশি, বিশেষ করে নিরীক্ষাধর্মী সাহিত্যপত্রিকা বের করার। কে এ-কাজে টাকা দেবে? তেমন কারো কথা কল্পনা করাও যে অসম্ভব। কোনোরকম সহযোগিতা নেই, বিজ্ঞাপন নেই—সব সুনিশ্চিতভাবে ধরে নিয়ে কেবল উত্তপ্ত জ্বলন্ত সাহিত্যপ্রেমের তাড়নায় আত্মবিধ্বংসীভাবে ছুটে যাওয়াই অস্তিত্বের একমাত্র শর্ত। দুঃখ-কষ্ট আর রক্তক্ষরণ সেখানে নিত্যসঙ্গী।

এই দুর্দশার কিছুটা উপশম হতে পারত সম্পাদকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা থাকলে। পঞ্চাশ দশকের শেষ থেকে শুরু করে ষাট দশক হয়ে সত্তরের মাঝামাঝি পর্যন্ত সিকানদর আবু জাফর তাঁর 'সমকাল'কে যে অমন দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে বের করে যেতে পেরেছিলেন তার একটা বড় কারণ তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা। তিনি পত্রিকা শুরু করেছিলেন পরিণত বয়সে, তাঁর বয়স যখন আটত্রিশ-চল্লিশ। এমনিতেই তিনি ছিলেন প্রতাপশালী মানুষ। তাছাড়া সে-সময়কার ঢাকার বাঙালি সমাজের কর্ণধার জগতে তাঁর প্রভাব ছিল অনেক। নাই-নাই করেও বেশকিছু বিজ্ঞাপন পেয়ে যেত তাঁর পত্রিকা। তাছাড়া আর্থিকভাবেও তিনি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। নিজের প্রেস ছিল তাঁর : 'সমকাল মুদ্রায়ণ'। কাজেই টাকার টানাটানি দেখা দিলেও প্রেসের কাজের ফাঁকে-ফাঁকে কম্পোজ ধরিয়ে পত্রিকাকে নিয়মিত করে রাখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। এর পরেও তো আর্থিক যন্ত্রণার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেননি তিনি। ভর্তুকি দিয়েই তো চিরকাল পত্রিকা টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। সেখানে আমাদের অবস্থাটা কেমন? আমার বয়স তেইশ বছর। দলের অন্যান্যদের আরো কম—কারোরই বিশের বেশি নয়। আমার থাকার মধ্যে কেবল দুশো পঞ্চাশ টাকা বেতনের একটা চাকরি। সঙ্গে মহার্ঘ ভাতা তিরিশ টাকা। এর ওপর দাঁড়িয়ে কী করা যেতে পারে? কী করতে পারে আমাদের এই নিঃসম্বল তারুণ্যের মিলিত উদ্যম? ভেবে ভেবে সমস্যার কোনো কিনারা মেলে না।

আবার একসময় নিজে থেকেই শক্তি এসে যায়। শিরা ধমনীর ভেতর দিয়ে ঝনঝন শব্দ তুলে রক্ত-জোয়ারের উন্মাদনা ভরে তোলে শরীর। অন্তহীন বিরতিহীন অফুরন্তভাবে তোলে। এই উদ্যম, এই জন্মান্ধ বেপরোয়া শক্তি আর বিশ্বাস যৌবনের নিজস্ব সম্পত্তি। আজ এই শক্তি অবিশ্বাস্য।

১৯৬৩ সালে লেখক

১৯৭৫ সালে লেখক

তৃতীয় খণ্ড

কলকাতার কলরবে

১

উনিশ-শ তেষট্টির জুলাই মাসে আমি মাস-দুয়েকের জন্য কলকাতা যাই। তরুণ বয়সে যে-ধরনের স্বপ্নের সেফটিপিনে আটকা পড়ে মানুষ জীবনের রাস্তায় ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায় তেমনি একটা সুনীল ব্যাপার ছিল আমার কলকাতা যাওয়ার কারণ। আমার ঘটনাটা ছিল আন্তর্জাতিক—ঢাকা-কলকাতা কলকাতা-ঢাকা ভিত্তিক—কাজেই ব্যাপারটা ছিল পাসপোর্ট সাপেক্ষ। কলকাতায় আমার যাতায়াতের মূল জায়গা ছিল কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউস, সকাল নটা থেকে রাত নটা অব্দি মোটামুটি ওখানেই। কলেজ স্ট্রিটের ক্যালকাটা কফি হাউসের দালানটার আগের নাম ছিল এ্যালবার্ট হল। কলেজ স্ট্রিটে প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের ঠিক উল্টোদিকেই নির্মিত হয়েছিল এককালের এই বিশাল পাঁচতলা ভবনটি। ১৮৭৫ সালের ঘটনা সেটা। প্রথমে এটা তৈরি হয় স্কুলভবন হিসেবে—প্রথমে এ্যালবার্ট স্কুল ও পরে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের ক্লাস হয়েছে এখানে। ১৯৯৩ সালে এটি সাধারণ বক্তৃতাগৃহে রূপ পায়।

এই সেই এ্যালবার্ট হল যেখানে একদিন যুবক নজরুল তাঁর সংবর্ধনা-সভায় বাবড়ি ঝাঁকিয়ে 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করে মঞ্চের ওপর কালবৈশাখীর ঝড় তুলেছিলেন, আধুনিক কবিতার ওপর রবীন্দ্রনাথের কিন্নর কণ্ঠের বক্তৃতা শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল। ১৯৪২ সালে এ্যালবার্ট হল পরিণত হয় 'ক্যালকাটা কফি হাউসে'। প্রতিদিন দোতলার বিশাল সভাকক্ষ আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার ব্যালকনি জুড়ে পেতে রাখা ছোট ছোট টেবিল আর চেয়ারগুলো সরগরম হয়ে ওঠে খেতে বা আড্ডা দিতে আসা মানুষের অবিশ্রান্ত যাতায়াতে। সকাল থেকে রাত অব্দি বয়ে চলে জনতার এই বিরতিহীন প্রবাহ। গল্পে, খুশিতে, স্বপ্নে, পরিকল্পনায় মুখরিত হয়ে থাকে দুইতলা-জোড়া এই বিশাল কফি হাউস।

একটা জায়গায় কফি হাউসের একটা বিশিষ্ট পরিচয় রয়েছে। এটা কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের কফি হাউস। গত ছয় দশকে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রায় সবকটি নতুন আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে কফি হাউস, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে। না, প্ল্যান পরিকল্পনা করে বা আটঘাট বেঁধে এসব হয়নি। নানান দিক থেকে ভেসে-আসা নানা মতের নানা পথের মানুষের অবাক যোগাযোগের মত্ততা থেকে শক্তি পেয়ে জন্ম নিয়েছে এসব। তারপর নিজ নিজ পথে বেরিয়ে গেছে, দানা বেঁধেছে।

যেসব কারণে কফি হাউস তার এই বুদ্ধিবৃত্তিক চরিত্র অর্জন করেছে তাঁর একটি হল—প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া থেকে এর নৈকট্য। আসলে ঐ দুটি খ্যাতিমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ও বইপাড়ার মূল রেস্তোরাঁই যেন এই কফি হাউস। সাধারণ মানুষ তো সারাদিন আসছেই, সেইসঙ্গে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অধ্যাপক, কবি, লেখক, বুদ্ধিজীবী, চলচ্চিত্রনির্মাতা, চিত্রশিল্পী, সম্পাদক—সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এমনি ধরনের সব উজ্জ্বল মানুষ।

কফি হাউসের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, আমার ধারণা, এর বিশালতা। মনে হয় এখানে গেলে সবাইকে একসঙ্গে খুঁজে পাওয়া যাবে, ঐ বিশালতার ভেতর একান্তে হারিয়ে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে অবসর কাটানো যাবে। একসঙ্গে শুরু করা যাবে যাত্রা। এই আকর্ষণ সবাইকে টেনে আনে, মদির করে তোলে। বছরের পর বছর ঝাঁকের পর ঝাঁক মানুষ এখানে আসে, বসে, আড্ডা দেয়। হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার প্রাপ্তি আর স্বপ্নভঙ্গের কথা নিয়ে তপ্ত আলোচনায় টেবিল তোলপাড় করে, তারপরে একসময় হারিয়ে যায়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এগিয়ে যায় এই ধারা। যারা নতুন আসে, তারা চিরদিনের স্বত্ব পেয়েছে ভেবে নতুন জমিতে নতুন সম্ভাবনার নিশান ওড়ায়। যারা চলে যায়, তাঁরা স্মৃতির কাঁধ-ব্যাগে এই দিনগুলোকে বয়ে বেড়াতে বেড়াতে একসময় জীবনের ভারে নুয়ে আসে। ষাটের দশকের কফি হাউসের আড্ডার কথা স্মরণ করে গাওয়া মান্না দে-র বেদনাবিমর্ষ গান : 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই'—সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে-থাকা বাংলাভাষাভাষীদের হৃদয়কে কয়েক দশক ধরে ভারাক্রান্ত করে আসছে।

আমি যখন কফি হাউসে যেতে শুরু করি তখন কফি হাউসকে কেন্দ্র করে কলকাতার ষাট দশকের তরুণতম লেখকদের সাহিত্য-আন্দোলন চলছে। আন্দোলনের প্রধান পতাকাবাহী দুজন—শক্তি চট্টোপাধ্যায় আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুনীল সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস' এই সাহিত্য-আন্দোলনের মুখপত্র। আন্দোলনের ব্যাপারে তরুণদের ভেতর তখন চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা প্রচণ্ড। যেন অভাবনীয় কিছু ঘটতে যাচ্ছে সামনে, তারা সবাই সেই অনিবার্যের অবশ্যম্ভাবী পতাকাবাহী। কেউ নিজেকে বহিরাগত, বিচ্ছিন্ন বা অনাহূত মনে করছে না সেখানে, যেন একই নৌকার যাত্রী সবাই। একই উদ্দেশ্যে তাদের যাত্রা : We are in the same boat brother. আমি কফি হাউসে তরুণ-লেখকদের সেই মিলিত অগ্রযাত্রা কাছে থেকে দেখেছিলাম। কেউ সেখানে কারো চেয়ে বড় বা ছোট

নয়। কে কোলকাতার, কে মফস্বল থেকে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে আসছে তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। একটা অভিন্ন উদ্দীপনায় সবাই যেন মাতাল।

আমি কফি হাউসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে পাইনি, উনি তখন পড়াশোনার জন্যে আমেরিকায় ছিলেন। অন্যেরা তাঁর পক্ষ থেকে 'কৃত্তিবাস' চালিয়ে যাচ্ছে। কৃত্তিবাস তখন তার সম্পন্নতার শীর্ষে। আমার সখ্য মূলত গড়ে উঠেছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শক্তি তখন ষাটের ঐ অবক্ষয়ী সাহিত্যধারার একচ্ছত্র ও অপ্রতিহত পতাকা। 'শক্তি–র শক্তি আছে'—এ–ধরনের একটা কথা তখন কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। তবু একই সঙ্গে তাঁর কবিতার বিকৃতি ও অনাচার কলকাতার শিষ্ট সমাজকে শিউরে তুলেছে। তাঁর কোনো একটা কবিতায় 'পোঁদের জ্বালায়' ধরনের কী–একটা কথা যেন সবার তুমুল আলোচনার বিষয়। আমি যখন কলকাতায় তখন একজন সাংবাদিক কফি হাউসে শক্তিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এত ভালো কবিতা লেখার পাশাপাশি এসব অশ্লীল আর নোংরা কবিতা তিনি লেখেন কেন। উত্তরে শক্তি বলেছিলেন : 'আমরা সারাক্ষণ তো কেবল সন্দেশ খাই না। মাঝে মাঝে হাগতেও তো যাই।'

দেখতে দেখতে শক্তি চট্টোপাধ্যায় কলকাতার তরুণ–লেখকদের নায়ক হয়ে ওঠেন। তাঁর বোহেমিয়ান উচ্ছৃঙ্খল ব্যতিক্রমী জীবন তাদের কাছে অনুকরণীয় হয়ে যায়। তাঁর কবিতায় যেসব লাইন সে–সময়কার সুধীমহলে সমালোচনার ঝড় তুলেছে সেগুলো তাঁর কবিতার ভালো এমনকি 'কাব্যিক' পঙ্‌ক্তিও হয়তো নয়, কিন্তু সময়ের স্পন্দনকে বোঝার জন্যে তারা সহায়ক। লাইনগুলো সেই সময়কার অগ্রহণযোগ্য ঘেয়ো ও কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজের বিরুদ্ধে অনুভূতিশীল শিল্পীহৃদয়ের ক্ষুব্ধ, মরিয়া ও অসহায় প্রতিবাদকে তুলে ধরেছিল। সে–সময়কার কংগ্রেসি শাসন পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনের ওপর জগদ্দলের মতো চেপে বসে যে–দুঃসহ ও উদ্ধাররহিত পরিবেশের জন্ম দিয়েছিল, এইসব বেপরোয়া উচ্চারণ আর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের ভেতর দিয়ে শিল্পীরা এসবের বিরুদ্ধে তাদের অননুমোদন প্রকাশ করে চলছিল। এগুলোকে নজরুলের 'তোর নিযুত নরকে ফুঁ দিয়ে নিবাই মৃত্যুর মুখে থুতু দিই' জাতীয় উক্তিরই নোংরা ও অনেক বেশি অশ্রাব্য সংস্করণ বলা যেতে পারে। এর কারণ : এগুলো উচ্চারিত হয়েছিল নজরুলের কালের তুলনায় আপাতভাবে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক কিন্তু আসলে অনেক বেশি বধির ও পাশব এক সমাজ–পরিবেশের বিরুদ্ধে। আগেও বলেছি, এই বেপরোয়া প্রতিরোধের ভেতর দিয়ে কবিরা পশ্চিমবঙ্গের সেই অমানবিক ও দুর্বহ সমাজ–পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তাদের হৃদয়ের বিদ্রোহ প্রসারিত করেছিলেন যে–সমাজ–পরিস্থিতি অবসানের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের নকশালপন্থীরা এর কয়েকবছরের মধ্যেই দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের পথে এগিয়ে গিয়েছিল।

২

যদ্দুর মনে পড়ে, প্রথম যৌবনের দিনগুলোয় আমি ছিলাম উচ্ছল, স্নিগ্ধ ও সপ্রতিভ স্বভাবের। জীবন-বোঝার উচ্ছ্বিত উচ্চকিত আনন্দ ছিল আমার ভেতর। পরিচয় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সবাই ভালোবেসে ফেলত। ঢাকার তরুণ-লেখকদের মতো কফি হাউসের ভালোবাসা পেতেও আমার অসুবিধা হয়নি। সাহিত্য নিয়ে আমার পড়াশোনা ছিল বয়সের তুলনায় অগ্রসর। সেই সাহিত্যবোধ আর তারুণ্যের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ঐ ভালোবাসা পাবার ব্যাপারে আমার সহায়ক হয়েছিল।

শক্তির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল প্রথমেই। সন্দীপণ চট্টোপাধ্যায় তখন কফি হাউসের আরেক তারকা। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিসম্পন্ন তীব্র ছিপছিপে চেহারার সন্দীপণের গল্পের বই 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' তখন তরুণমহলে সাড়া তুলেছে। তাঁর পরবর্তী সাহিত্যসাফল্য তেমন উজ্জ্বল হয়নি, কিন্তু তখন পর্যন্ত সবাই ভাবতেন তাঁর হাত থেকে ব্যতিক্রমী সাহিত্য উপহার পাওয়া যাবে। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতেও আমার খুব দেরি হয়নি।

কবি শামসের আনোয়ার ছিল আমার আত্মীয়—আমার সেজ খালুর ভাগনে। তার সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল, ওখানে যাওয়ায় আরও কাছাকাছি হয়ে গেলাম।

আমি থাকতাম পার্ক সার্কাসে, ১৫ সার্কাস রো-তে, নানার বাসায়। একদিন সকালে মাঝারি উচ্চতা আর পরিপাটি চেহারার ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা এক তরুণ, আমার চেয়ে পাঁচ-ছয় বছরের বড়, কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে এলেন দেখা করতে। ভদ্রলোক ছবি আঁকেন। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমি পুর্ণেন্দু পত্রী। বন্ধুদের কাছে আপনার কথা শুনে দেখা করতে এলাম।' কথায় কথায় উষ্ণ হৃদ্যতা গড়ে উঠল তাঁর সঙ্গে। এরপরেও বেশ কয়েকদিন রাস্তায় হেঁটে হেঁটে আড্ডা দিয়েছি আমরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানান গল্পে আত্মবিস্মৃত থেকেছি। বছর-তিনেক আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঢাকায়। তিনি আমাকে চিনতে পারেননি। হয়তো বিস্মৃতি, দীর্ঘদিনের অদর্শন, যোগাযোগহীনতা, নাকি আর কিছু কে জানে!

ঢাকার কবি বেলাল চৌধুরীও তখন ছিলেন সেখানে। শক্তির মতো তাঁর উদ্দাম বোহেমিয়ান জীবন নিয়েও তখন কলকাতার তরুণমহল আলোচনামুখর। অদ্ভুত সব গল্প শুনতাম তাঁর সম্বন্ধে। শোনা যেত প্রথম দিকে ডিপ সি ট্রলারে সমুদ্রের বুকে যাযাবর জীবন কাটিয়েছিলেন বেশ কিছুদিন। পরে মাছ-বেচার পয়সা দিয়ে জাপানিদের সঙ্গে কুমিরের ব্যবসা শুরু করতে চলে যান জাপানে। সেখানে ব্যবসায় মার খেয়ে নানা দেশ ঘুরে খাইবার পাস হয়ে চলে আসেন কলকাতায়, তারপর শক্তিদের সঙ্গে জুটে আবারো সেই বোহেমিয়ান জীবন শুরু করে দেন। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে না-উঠলেও কথা হয়েছে অনেক দিন। অসম্ভব আড্ডাবাজ আর আমুদে মানুষ বেলাল চৌধুরী। আজও তেমনি আছেন। ঐ অপরিচিত প্রবাসে তাঁকেই

আমার একমাত্র পরিচিত আর একান্ত মানুষ বলে মনে হত। ঐ সময়ের আগে তাঁকে কখনো দেখিনি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোথায় যেন একটা অদ্ভুত একাত্মতা অনুভব করতাম। এই একাত্মতা হয়তো এক দেশ এক জাতির মানুষের আত্মার আত্মীয়তা। একই ইতিহাস, ভূপ্রকৃতি, আর আলো হাওয়ার ভেতর দিয়ে বেড়ে-ওঠা মানুষের সগোত্রতা। তাঁকে নিয়ে অসংখ্য গল্প চালু ছিল মুখে মুখে। শুনতাম মদে চুর হয়ে সারারাত ফুটপাথের একধারে সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকেন তিনি, ভোরে বন্ধুরা এসে তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। এই জীবন তাঁকে কলকাতার তরুণ-লেখকদের মধ্যে সে-সময় বিস্ময়ের জিনিশ করে তুলেছিল। তাঁর এই সাফল্য ভেতরে-ভেতরে কোথায় যেন আমাকে গর্বিত করত। একটা অস্ফুট স্বাজাত্যবোধের গৌরব অনুভব করতাম।

বন্ধুত্ব হয়েছিল তারাপদ রায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, দীপেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শিল্পী নিখিলেশ দাশ, এমনি আরও অনেকের সঙ্গে—যাদের অনেকেই ষাট দশকের প্রথমদিকে কলকাতার তরুণ-সাহিত্য-আন্দোলনে সামনের সারিতে ছিলেন।

তারাপদ রায় টাঙ্গাইলের মানুষ। আমাদের পার্ক সার্কাসের বাসায় তাঁর ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে প্রাণখোলা আড্ডার দিনগুলো আজও আমি ভুলিনি।

আর-একজনের কথা প্রায়ই মনে পড়ে। সে নিখিলেশ। মার্জিত, সুন্দর দাড়িতে অনবদ্য চেহারার দীর্ঘদেহী নিখিলেশ আজপর্যন্ত আমার দেখা সবচেয়ে সুদর্শন বাঙালিদের একজন। দুধে আলতা রঙ ছিল নিখিলেশের। কফি হাউসে একমাত্র ওর সেই দীপান্বিত কান্তির সামনেই কিছুকিছু সময় পরাজিতের অনুভূতি জেগেছে আমার। ছবি আঁকত নিখিলেশ। ওর ছবিতে অসাধারণ কিছু থাকত না, কিন্তু রঙের তীব্রতায় তা ছিল উচ্চকণ্ঠ। তিনটি ছবি উপহার দিয়েছিল ও আমাকে। বছর-বিশেক সঙ্গে রেখে স্বভাবগত অবহেলায় হারিয়ে ফেলেছি। নিখিলেশের মতো প্রিয়দর্শন আর আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের জীবন অধিকাংশ সময় যেমন হয় ওর হয়েছিল তাই। অতি প্রাপ্তিতে জীবনের কাম্য জিনিসগুলোর মূল্য হারিয়ে ফেলেছিল ও। কলকাতার সুন্দরী মেয়েরা নিখিলেশকে ভালোবাসত। ওকে দেখলে বিষণ্ন হয়ে পড়ত। সব পেয়ে জীবনের স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছিল নিখিলেশের। এ-ধরনের অতি-পেয়ে-যাওয়া মানুষের পক্ষে শিল্পী হয়ে ওঠা কঠিন। শিল্পী হওয়ার জন্যে যে-অপ্রাপ্তির শূন্যতা দরকার এদের ভেতর তা থাকে না। এদের নিজেদের জীবনটাই হয়ে ওঠে শিল্প।

ভালো শিল্পী হয়নি শেষপর্যন্ত নিখিলেশও। মান্না দে-র গাওয়া 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই' গানটায় যে শিল্পী নিখিলেশের কথা আছে, সে কি এই নিখিলেশ?

৩

আর–একজনের কথা স্পষ্ট ভাসে চোখে। তিনি নির্মাল্য আচার্য। ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'এক্ষণ'–এর সম্পাদক। স্ফীত কলেবরের 'এক্ষণ' বেরোত অসাধারণ মুদ্রণসৌকর্যে উজ্জ্বল ও ঝকঝকে চেহারা নিয়ে। সেকালের কলকাতার অগ্রসর সাহিত্যজগতের আস্থা, রুচি আর অস্থিময়তার প্রতীক ছিল পত্রিকাটি। এমন সুরুচিপূর্ণ, পরিপাটি, নির্ভুল ও নান্দনিক পত্রিকা বাংলাসাহিত্যে খুব কমই বেরিয়েছে।

সে–সময় লাইনো টাইপই ছিল সবচেয়ে সুশ্রী ও দৃষ্টিনন্দন টাইপ। মেশিনের কী–বোর্ডে টাইপ করার সঙ্গে সঙ্গে চকচকে সীসার পাতের ওপর টাইপ হয়ে লাইনের পর লাইন সরাসরি বেরিয়ে আসত ভেতর থেকে। সেগুলোকে পরপর সাজিয়ে যে–নিখুঁত ছবির মতো অপরূপ ফর্মা তৈরি হত তা আমার চোখে অসাধারণ লাগত। লাইনো টাইপের ঐ মার্জিত সূক্ষ্ম শ্রী আমার চেতনাকে শৈল্পিক প্রভায় দীপিত করে তুলত। ঐ টাইপে 'কণ্ঠস্বর' বের করার স্বপ্নে ফিরে– ফিরে বিষণ্ন হতাম। লাইনো টাইপ ছিল ঐ সময়ের সবচেয়ে বনেদি প্রকাশনাগুলোর টাইপ। কলকাতার সিগনেট প্রেস তখন বাংলা বই–জগতের সবচেয়ে অভিজাত প্রকাশনা সংস্থা। অভিজাত এজন্যে নয় যে বিস্তর বই বের করেছিল সিগনেট, কিন্তু যা–কিছু করেছিল সেগুলোকে মুদ্রণের পরিপাট্যে, কাগজের আভিজাত্যে ও বাঁধাইয়ের মননশীল ও দীপ্র আধুনিকতায় বিস্ময়ের জিনিশ করে তুলেছিল। সিগনেটের বই বেরোত লাইনো টাইপে।

সিগনেট প্রেসের স্বত্বাধিকারী ছিলেন দিলীপ কুমার গুপ্ত। আপোষহীন, নিখুঁত ও পরিশীলিত শিল্পীরুচির মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর শৈল্পিক চেতনা ছিল সম্পন্ন চিত্রশিল্পীদের সমপর্যায়ের। উঁচুমানের বই–এর সঙ্গে উঁচুমানের বৈদগ্ধ্যময় প্রকাশনার যে–রুচিকে তিনি বাঙালি পাঠকের কাছে উপহার দিয়েছিলেন সে–রুচি পৃথিবীর যে–কোনো দেশের শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা–সাফল্যের সমকক্ষ। বইয়ের প্রচ্ছদ অঙ্কন ও অলঙ্করণে সত্যজিৎ রায়কে পাওয়ায় তাঁর এই স্বপ্ন সর্বোচ্চ শিখর স্পর্শ করেছিল। দিলীপ কুমার গুপ্ত শৈল্পিক সাফল্যের ঐ শীর্ষ থেকে একচুল সরে আসেননি কখনো। কেবল সেইকালে নয়, রুচিশীল প্রকাশনার ক্ষেত্রে সিগনেট আজপর্যন্ত বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

দিলীপ গুপ্তের সাফল্য অনেকেই হয়তো পান না। কিন্তু এমনিভাবে, শুধুমাত্র নিজেদের সাহিত্যপ্রেমের জন্য, পত্রিকা বের করে, প্রকাশনা করে, সাহিত্যকে গতিশীল রাখার দায়িত্ব নিয়ে কত সংস্কৃতি–স্বাপ্নিক আর সাহিত্যপ্রেমিক–যে এ–পর্যন্ত নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়েছে তার শেষ নেই। জমি, বাড়ি, স্ত্রীর গয়না, শখের জিনিশ বিক্রি বা বন্ধক দিয়ে, এমনকি অন্যের তহবিল তছরুফ পর্যন্ত করে মর্মান্তিক কষ্টের ভেতর নিজেদের নিঃশেষ করেছেন তাঁরা। কিন্তু প্রেমিকদের এই বেদনার যাত্রা থামেনি। দিলীপ গুপ্ত ছিলেন বাংলা প্রকাশনা জগতের ঐ যাত্রীদের মধ্যে উজ্জ্বলতম।

৪

ঝকঝকে লাইনো টাইপে মুদ্রিত হয়ে সেকালে পরিশীলিত ও নিখুঁত পারিপাট্য নিয়ে আর যে-অনন্যসাধারণ পত্রিকাটি আমার চোখে বিস্ময় জাগাত তা হল হুমায়ুন কবির সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ'। সিগনেটের প্রকাশনা-সৌকর্যের মতোই লাইনো টাইপের সর্বোচ্চ সৌন্দর্য প্রতিভাত হত 'চতুরঙ্গে'। সেকালে লাইনো টাইপে ছাপা ছিল রীতিমতো অভিজাত ব্যাপার। হ্যান্ড-কম্পোজের তুলনায় অনেক বেশি খরচ পড়ত এতে।

আগেই বলেছি, বহুদিন আমার নিজেরও স্বপ্ন ছিল 'কণ্ঠস্বর'কে লাইনো টাইপে বের করার—ঐ অপরূপ মুদ্রণসৌকর্যে পত্রিকাকে রাজশ্রী দেবার। কিন্তু টাকার অভাবে মাত্র গোটাকয় সংখ্যা ছাড়া কিছুতেই তা করতে পারিনি। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে আমাদের এখানে 'রমনা' নামে একটা মাসিক পত্রিকা বের হত। সম্পাদক ছিলেন মহিউদ্দিন আহমেদ। এই পত্রিকাও লাইনো টাইপে ছাপা হত। পত্রিকাটি হাতে নিয়ে এমনি একটা ঝকঝকে রুচির পরিচ্ছন্ন পত্রিকা বের করার দুরাশায় মন বিষণ্ন হয়েছে। তখন ঢাকার 'দৈনিক সংবাদ' ও আলেকজান্দ্রা প্রেসে লাইনো মেশিন ছিল। সেসব প্রেস থেকেও এই টাইপে ছেপে পত্রিকা বের করা যেত। কিন্তু ঐ যুগের তুলনায় বড়বেশি দরিদ্র ছিলাম আমরা। অজস্র মাথা খাটিয়েও ঐ সামান্য টাকাটুকুর অভাবে এর কোনো বাস্তবসম্মত সুরাহা করতে পারিনি। বাইরের কাজ না-করলেও সরকারি মুদ্রণালয়ের (বি. জি. প্রেসের) অধিকাংশ মেশিনই ছিল লাইনো। সরকারের প্রায় সব কাজ হত ঐ টাইপে। এমনকি 'মাহে-নও' 'পাকিস্তানী খবর'ও অনেক সময় বেরোত লাইনো টাইপে। কিন্তু মুদ্রণসৌকর্যের ঐ অনির্বচনীয় পরমা—আমাদের শিল্পরুচির ঈপ্সিত স্বর্গটি—চিরকালই বয়ে গেছে আমার নাগালের বাইরে। কেনই বা থাকবে না? হ্যান্ড-কম্পোজ প্রতি ফর্মা ছাপার খরচ যেখানে আটত্রিশ-চল্লিশ টাকা, লাইনো সেখানে পঁয়ষট্টি-সত্তর টাকা। প্রায় ডবল।

লাইনো টাইপে ছাপতে না-পেরে আমি দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে হ্যান্ড-কম্পোজের প্রগতি-টাইপে পত্রিকা ছাপাতে পেরেই খুশি হয়েছি। প্রগতি-টাইপ ভালো বলে নয়, খানিকটা লাইনোর মতো দেখতে বলে। লাইনো টাইপকে নকল করে তৈরি হয়েছিল প্রগতি-টাইপের চেহারা। আমি দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে চেষ্টা করেছিলাম।

৫

ঝকঝকে লাইনো টাইপে ছাপা হত 'চতুরঙ্গ'। প্রথম থেকেই 'চতুরঙ্গ' সম্ভ্রান্ত সাহিত্যপত্রিকার মর্যাদাবান চেহারা নিয়ে বেরিয়েছিল। সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠবে দীর্ঘদিন

নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু 'এক্ষণ' জাতের পত্রিকাগুলো ঠিক এরকম ছিল না। সাহিত্যজগতে যাদের স্ট্যান্ডার্ড ম্যাগাজিন বলে, ঠিক তা ছিল না এরা। অন্তর্গত রক্তে এরা ছিল বিদ্রোহী। কিছুটা লিটল ম্যাগাজিনের মতো। পরবর্তীকালের 'অনুষ্টুপ', 'বিভাব', 'অমৃতলোক' ছিল এই গোত্রের। এদের লেখার মান ছিল 'চতুরঙ্গ'-এর মতোই উন্নত আর মর্যাদাসম্পন্ন কিন্তু এদের জন্ম হয়েছিল চারপাশের অসন্তোষজনক সাহিত্য-পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাই আজীবন সেই বিদ্রোহকে তারা রক্তের ভেতর বহন করেছে। তাছাড়া 'চতুরঙ্গ'-এর মতো সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিকতার অভাবে এদের ভেতর মাঝে মাঝেই অনিয়মিত হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখা দিত। ঠিক লিটল ম্যাগাজিন নয়, তবু এদের স্বভাব ছিল কিছুটা লিটল ম্যাগাজিন ধাঁচের—তেজি, জেদি আর ব্যতিক্রমী। অবশ্যি এদের সুস্থিত স্বভাবের মধ্যথেকে এসব যতটুকু সম্ভব ছিল ততটুকুই।

কিন্তু 'চতুরঙ্গ' ছিল পুরোপুরি স্ট্যান্ডার্ড ম্যাগাজিন। পত্রিকাটির দিকে তাকালেই বোঝা যেত এ এমন একটা উন্নত-মানসম্পন্ন সাহিত্যপত্রিকা—যা সে-সময়কার বাংলা সাহিত্যভুবনের শ্রেষ্ঠ শৈল্পিক মূল্যবোধকে ধারণ করার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেকালের বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্রিকাটির সর্বোচ্চ যে-চেহারা কল্পনা করা যেত 'চতুরঙ্গ' ছিল তাই। সাহিত্যজগতের অন্তঃসারশূন্যতা বা রুচিহীনতার প্রতিক্রিয়া থেকে এ-পত্রিকা জন্মায়নি, গোড়া থেকেই এর চোখ ছিল ওপরের দিকে। এমনি একটি পত্রিকা বের করার সবরকম যোগ্যতাই ছিল হুমায়ুন কবিরের মধ্যে। কবি আর ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। বিদ্যায় এবং মননশীলতায় ছিলেন সেকালের অসাধারণদের একজন। এজন্যে সে-সময়কার শ্রেষ্ঠ লেখকদের একত্রিত করে নিজের স্বপ্নের সমান একটি পত্রিকা বের করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়নি। তাছাড়া তাঁর সামাজিক প্রতিপত্তিও ছিল ব্যাপক। 'চতুরঙ্গ' প্রকাশের সমসময়ে তিনি ছিলেন ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বিপুল সংখ্যক ভালো বিজ্ঞাপন পাওয়া ও তা দিয়ে পত্রিকাটিকে সুরুচিসম্মত করে তুলতে তাই তিনি সহজেই পেরেছিলেন। সুনিয়মিতভাবে প্রকাশিত অভিজাত ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' আমাদের যৌবনের দিনগুলোকে স্বপ্নে সৌন্দর্যে অপরূপ করে রেখেছিল।

৬

'এক্ষণ'-এর কথা এত করে বলেছি এজন্যে যে, 'এক্ষণ' লাইনোতে বেরোত না, বেরোত চারপাশের সব পত্রিকার মতোই—হ্যান্ড-কম্পোজে—স্মল পাইকা টাইপে। কিন্তু যত্নে ও প্রকাশনা-অভিজাত্যে তা লাইনোতে ছাপা পত্রিকার চেয়ে এতটুকু কম ছিল না। পুরোপুরি নির্ভুল ও সুরুচিপূর্ণ এই পত্রিকাটির গভীর ও উচ্চতর চরিত্র সে-

সময় প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, একটা উন্নতমানের পত্রিকা আসলে হাতে ধরে যত্ন করে বের করার জিনিশ।

এমনি অনিন্দ্য শৈল্পিক-রুচি ছিল নির্মাল্য আচার্যের। আটপৌরেকে তিনি অনুপম করে তুলতে জানতেন। দিলীপগুপ্তের মতো তাঁরও একটা আপোষহীন নান্দনিক রুচি ছিল। সেখানে সামানতম শৈথিল্য বা স্খলনের অবকাশ ছিল না। গোটা পত্রিকাটিকে দেখতে একটা ঝকঝকে ছবির মতো লাগত। পত্রিকাকে ঐ সৌকর্য দেবার জন্যে নির্মাল্য আচার্যকে যে-শ্রম দিতে হত তা প্রায় অমানুষিক। কফি হাউসে বন্ধুবান্ধব-পরিবৃত তাঁর টেবিলের দিকে তাকালেই চোখে পড়ত : মজবুত দোহারা গড়নের নির্মাল্য আচার্য তাঁর তীক্ষ্ণ নাক আর বলিষ্ঠ চোয়ালে আত্মপ্রত্যয় ফুটিয়ে একমনে প্রুফ দেখে চলেছেন। তাঁর হাতে থাকত গাদা-গাদা প্রুফের বান্ডিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেসব দেখে চলতেন তিনি। কেন যেন মনে হত মানুষটি খুব একা। দূর থেকে একাকী এই মানুষটির জন্য আমার খুব কষ্ট হত। মনে হত এভাবে এই বান্ডিল বান্ডিল প্রুফের ওপর উদগ্রীবভাবে নুয়ে থাকতে থাকতেই হয়তো তিনি একদিন শেষ হয়ে যাবেন।

একজন সম্পাদকের কষ্ট অনেক। লেখকদের কাছ থেকে ভালো লেখা জোগাড় করার ধকল; নতুন বা অর্ধমনস্ক লেখকদের সংঘবদ্ধ করে, প্রেরণা দিয়ে তাদের দিয়ে ভালো লেখানোর শ্রম ; তারপর সেই জোগাড়-করা লেখাগুলোকে তিন-চারবার করে প্রুফ দেখে ছেপে সুদৃশ্য পত্রিকা হিশেবে বের করার নির্মম কষ্ট ; এর ওপর আছে দরোজায় দরোজায় হেঁটে বিজ্ঞাপন জোগাড় করার অসম্মান আর বিড়ম্বনা; আছে সেগুলোর বিক্রির টাকা উদ্ধারের প্রাণান্তকর যন্ত্রণা; আছে সার্কুলেশন, অর্থসংকট, সমালোচনা, আক্রমণ; এমনি হাজারো ঝামেলা। এসব একজন সম্পাদক করেন সামাজিক কাজ হিসেবে ; তাঁর চারপাশের নিপতিত সাহিত্য-পরিবেশকে সুস্থতার ভেতর উদ্ধারের বেদনা থেকে, একটা উচ্চতর সাহিত্যজগৎ নির্মাণের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে। তাঁদের এই অপরাজিত সংগ্রাম আমাদেরকে যে-সম্পন্ন সাহিত্যভুবনের অধিবাসী হবার সৌভাগ্য দেয় তার বিনিময়ে কী পান এঁরা? এইসব কষ্ট, অসম্মান আর তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়ার নিগ্রহ আর নিপিষ্টতা ছাড়া?

নির্মাল্য আচার্যের কথা মনে পড়ায় অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাও মনে পড়ছে। 'এক্ষণ'-এর অন্যতম সম্পাদক তখন ছিলেন তিনি। মূলত পত্রিকাটির বিজ্ঞাপন আর আর্থিক দিক সামলাতেন মনে হয়। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে অভিনয় করে সদ্য নাম করতে শুরু করেছেন তখন। নিয়মিত আসতেন কফি হাউসে। পর্দার চেয়ে বাস্তবের সৌমিত্র ছিলেন অনেক সুন্দর। ঘর-ভরা কফি হাউসের ভেতর তাঁর স্নিগ্ধ হাসি-মাখানো চেহারা সবার ওপর দিয়ে চোখে পড়ত।

৭

জায়গাটার নাম ওয়েলেসলি। ধর্মতলা স্ট্রিট থেকে দক্ষিণদিকে বাঁক ঘুরে এগিয়ে গেলেই এসে পড়তে হবে সেখানে। যে-রাস্তার পাশে এই জায়গাটা তা এককালের ক্লাইভ স্ট্রিট, যার বর্তমান নাম রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড। এই রাস্তাটার দুপাশ জুড়ে ছিল একসময় কলকাতার এ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের বসতি। এরই পশ্চিমপাশে এককালের ইসলামিয়া কলেজ এখন মওলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ।

এইখানে, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড থেকে একটু ভেতরে ঢুকলেই চোখে পড়বে একটা টিনের-চাল-ছাওয়া বিরাট প্রশস্ত জায়গা। পুরো জায়গাটা জুড়ে শস্তা কাঠের তৈরি লম্বা সাইজের গোটা পঁচিশেক কালসিটে-পড়া সারবাঁধা টেবিল। প্রতিটা টেবিলের দুপাশে কাঠের লম্বা বেঞ্চি। পুরোটা এলাকা মাতালে, চিৎকারে, দেশী মদের নাড়ি-ওল্টানো গন্ধে ভুরভুর করছে। কলকাতার অন্যতম পেল্লাই সাইজের দেশী মদের দোকানের এটি একটি।

কফি হাউসের জনা-বিশেক তরুণ-লেখককে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে। আজকের আসরের হোস্ট আমিই। মদের তাবৎ দাম আমার পকেট থেকেই যাবে। শক্তিকে এ-ব্যাপারে আগে থেকেই কথা দেওয়া ছিল, অবশ্যি তা শক্তির চাপাচাপিতেই। 'বুঝলে হে সায়ীদ, আজকে তুমিই আপ্যায়ন করে ফ্যালো আমাদের।' বলেছিল শক্তি। ওর মুখে তখনো দেশী মদের গন্ধ। হয়তো কোথাও টেনেটুনে কফি হাউসে এসে বসেছে। আমি আমতা আমতা করেছিলাম। পকেটের কথা ভেবেই করতে হয়েছিল।

তখন ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে দারুণ বাঁধাবাঁধি। দুই দেশের মধ্যে দুর্ভেদ্য দেয়াল। সবরকম যোগাযোগ বন্ধ। পশ্চিমবঙ্গের বই এদিকে আসা বহুকাল ধরে নিষিদ্ধ। দুই বাংলা তখন পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন দুই পৃথিবী। সারা পাকিস্তান তখন অস্তিত্ব হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত। ভারত মানেই জাতশত্রু, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কমাত্রেই রাষ্ট্রদ্রোহিতা। টাকাপয়সার ব্যাপারেও অসম্ভব কড়াকড়ি, কলকাতায় যাবার সময় অনেক বলেকয়েও সাড়ে চার-শ টাকার বেশি নিয়ে যেতে পারিনি। তাই দিয়ে মাসদেড়েক কলকাতার হাতখরচ চলছে। দুটো ব্যাপারে সুবিধা ছিল বলে চালিয়ে নিতে পারছিলাম। এক, থাকতাম নানার বাসায়, কাজেই থাকা-খাওয়ার চিন্তা ছিল না। তাছাড়া সে-সময় পাকিস্তানি টাকার দাম ছিল ভারতীয় টাকার চেয়ে অনেক বেশি, প্রায় দেড়গুণ। আমাদের এক-শ টাকা দিয়ে ভারতের একশ চুয়াল্লিশ টাকা পাওয়া যেত, সাড়ে চার-শ টাকা দিয়ে পেয়েছিলাম সোয়া ছয় শ-র মতো—তাই দিয়েই দেড়মাস ধরে কফি হাউসের কোল্ড কফি, মোগলাই পরোটা, আমজাদিয়ার কাবাব আর এন্তার চারমিনার ফুঁকেও সে-টাকা শেষ করতে পারিনি। সেকালে আমাদের টাকার এতটাই ছিল কদর।

"দ্যাখো, তুমি হলে গিয়ে আমাদের অতিথি, গেস্ট। তোমাকে আমাদের বলা উচিত নয়। কিন্তু তোমার তো দেখছি হাত ঝাড়লেই টাকা ঝরে, যেমন বেলালের। তোমাদের ঢাকার লোকদের ব্যাপারস্যাপারই আলাদা।" আবদারের সপক্ষে যুক্তি দেখাল শক্তি।

কথাটা ভুল নয়। কিন্তু আমার ধারণা, আমাদের টাকা বেশি বলে যে এটা হত তা নয়। চিরকাল পশ্চিমবঙ্গের ঘটিদের তুলনায় আমাদের বাঙালদের মেজাজ অনেক খোলতাই আর দিলদরিয়া। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য আর সরস হাসির ক্যাসেটগুলোয় তার পরিচয় রয়েছে।

যাহোক, ঢাকার মুখ রাখতে শক্তির প্রস্তাবে রাজি হতে হল। ঠিক করলাম, নিজের পয়সায় না-কুলোলে খালার কাছ থেকে ধার নেব তবু পিছিয়ে গেলে চলবে না।

শুঁড়িখানায় ঢুকতেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। বড় রাস্তার গা ঘেঁষেই-যে এমন একটা হাটুরে কারবার চলছে, বাইরে থেকে বোঝারই উপায় নেই। গোটা-পঁচিশেক টেবিলের দুপাশে পাতা বেঞ্চিগুলোয় নিদেনপক্ষে শ-দেড়েক মাতাল গ্লাস আঁকড়ে জ্যৈষ্ঠের মাছির মতো ভ্যানভ্যান করছে। হঠাৎ দেখলে বিরাট মাছের বাজার মনে হয়। কেউ টানছে চুপচাপ, কেউ বকে চলেছে, কেউ শুয়ে পড়েছে টেবিলে মাথা রেখে, কেউ গলা ছেড়ে গান ধরেছে, কোনো টেবিলে হঠাৎ দাঙ্গাহাঙ্গামা পাকিয়ে উঠতেই আবার সবার আপোষ-রফায় তা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। পুরো একটা মুক্তবাজার গণতন্ত্র। তখন ঢাকা 'মদ্যপান নিষিদ্ধ দেশ', এখনো প্রায় তাই, এসব দেখে চোখ চড়কগাছ হয়ে যায় আমাদের। এতগুলো মাতাল একসঙ্গে মদ গিলে যে এমন একটা লণ্ডভণ্ড অবস্থা করে রাখতে পারে, এর বিশালতা আর নৈরাজ্য চোখের সামনে না-দেখলে কল্পনা করা কঠিন।

'মাল কুই?'

সারাটা শুঁড়িখানায় হুল্লোড় তুলে চেঁচিয়ে উঠল দরজার কাছের টেবিলে বসা একজন। লোকটা টাক-মাথা, মজবুত গড়নের বেঁটে খাটো। বয়স পঁয়তাল্লিশের মতো। তার গ্লাস শেষ হয়ে গেছে। চোখেমুখে উপচানো মউজ। কথা শেষ না-হতেই হৈ হৈ করে ফুর্তিতে যোগ দিল আশেপাশের লোকজন : হ্যাঁ কুই, মাল কুই। এরা এখানকার নিয়মিত খদ্দের, সবাই সবার চেনা। এদেরই মধ্যে দিয়ে একপাশের গোটাকয় টেবিল খালি করে আমাদের বসতে দেওয়া হয়েছে।

আমি হোস্ট, মাথা ঠিক রেখে সবার ভালোমন্দ তদারকি করে যাওয়া আমার কাজ। অপাপবিদ্ধ থাকতে পারা এই মুহূর্তে আমার জন্যে জরুরি। দোকানের ম্যানেজারকে শক্তি অনেকদিন ধরে চেনে। ও-ই তড়িঘড়ি অর্ডার দিতে লাগল।

কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতেই সবাই ফুর্তিতে মৌ মৌ করতে লাগল। জনপ্রতি গ্লাস-দুই পার হতেই বেসামাল আর বেলেল্লা হয়ে উঠতে লাগল পুরো পরিবেশ। তিন-চার গ্লাস পার হতেই আসল চেহারা বেরিয়ে পড়তে লাগল সবার। অশ্লীল দাঁতাল আর কদাকার হয়ে উঠল সবাই। চিৎকারে হল্লায় উঁচুপর্দার কুৎসিত হাসিতে সারাটা জায়গা নারকীয় হয়ে গেল। এমন কদর্য দৃশ্য জীবনে আমি কখনো দেখিনি। একপর্যায়ে সামান্যতম রাখ-ঢাক আব্রু-লেহাজ কোনোকিছুই যেন আর রইল না। বেহুঁশের মতো গিলতে লাগল একেকজন। কাউকে তখন আর চেনা যায় না। এরা, এই মানুষগুলোই কি কফি হাউসের সেই লেখক-সম্প্রদায় যারা বাংলাসাহিত্যের

পালাবদল ঘটাবে বলে শপথ করেছে? বিশ্রীরকম একটা ঘা লাগল ভেতরে। কী করে সম্ভব এটা? শক্তির জন্যে দুঃখ লাগতে লাগল।

রাত বারোটার দিকে দোকানের বিল বুঝিয়ে দিয়ে আমাকে চলে আসতে হল। আর দেরি করলে বাসায় দরজা খুলে দেবার কেউ থাকবে না। শুঁড়িখানা থেকে চলে আসার সময় শক্তি আমার চলে আসা দেখে (যেন পরাজিত হয়ে কেউ পালিয়ে যাচ্ছে এভাবে), আমার দিকে আঙুল উঁচিয়ে উৎকট পৈশাচিক হাসিতে বিশ্রীভাবে চিৎকার করতে লাগল। ওর সঙ্গে বাকিরাও গা ঢলাঢলি করে হেসে গড়িয়ে চলল অশ্লীলভাবে। সেই বিদ্রূপের তীব্র হাসির শব্দ পেছনে ফেলে আমি পথে নেমে এলাম। ওর স্যাঙাৎরা ওর সঙ্গে যোগ দিয়ে সেই হাসিকে আরও নারকীয় করে তুলল।

৮

যে-কোনো দেশ বা জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক জীবন নানান সময়ে অবক্ষয়-কবলিত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু সেকালের যে-কোনো লেখকই-যে এই অবক্ষয়কে ধারণ করে করতে পারবেন এমন নয়। এমনকি কবি হিসেবে শক্তিমান হলেই-যে তিনি ঐ অবক্ষয়ের নায়ক হয়ে বসবেন তাও নয়। আমার ধারণা, একধরনের বিশেষ মানসিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিল্পীই কেবল হয়ে ওঠেন অবক্ষয়ের শিল্পী, সে-যুগের ক্লেদ ও পাপের রূপকার, যুগের ভেঙে-পড়া মূল্যবোধের নিঃসঙ্গ ও অশ্রুময় সন্তাপকারী। উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্বের অবক্ষয়-চিহ্নিত প্যারিস শহরে অনেক লেখক, কবি, চিত্রশিল্পী ছিলেন। কিন্তু বোদলেয়ারের মতো সবাই সেই অবক্ষয়ের নায়ক হননি।

একটা সভ্যতা যখন ওপরের দিকে উঠতে থাকে তখন সেখানে যে-শক্তিটি বড়ভাবে কাজ করে তার নাম sense—সমষ্টিক মানুষের শুভবুদ্ধি আর কল্যাণের উৎকণ্ঠা। সারাটা জাতির উত্থানের স্বপ্ন সেই সময় সবাইকে তীব্রভাবে কামড়ে ধরে। এটা তার নির্মাণের আর আশাবাদের যুগ। জাতির সামগ্রিক কল্যাণকামিতা সেখানে মুখ্য, ব্যক্তি গৌণ। কিন্তু সেই সভ্যতা যখন উন্নতির শীর্ষ থেকে পতনের দিকে যেতে থাকে তখন তার ভেতর যে-প্রবণতাটি প্রধান হয়ে ওঠে তা sense নয়, sensibility। এটি সামগ্রিক সমৃদ্ধির চেতনা নয়, ব্যক্তিগত সুখের আকুতি। এটা প্রধানভাবে সে-জনগোষ্ঠীর আত্মদানের সময় নয়; উপভোগ-আস্বাদের সময়, হৃদয়-প্রাধান্যের আর অপচয়ের সময়। তাই সমষ্টিক কল্যাণ তখন গৌণ, ব্যক্তি মুখ্য। এজন্যেই সভ্যতার পতনের কাল মূলত ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার উদযাপনেরই কাল। শিল্পীহৃদয় মূলত কল্যাণকামী বলে সভ্যতার নির্মাণের যুগে শিল্পী আর সামাজিক চৈতন্য থাকে অভিন্ন। শিল্পী তখন সামাজিক চৈতন্যেরই নির্ভরযোগ্য, সর্বসম্মত ও শক্তিমান উপস্থাপক। শেখ সাদী, দান্তে বা পৃথিবীর মহাকাব্যের

রচয়িতারা সভ্যতার এমনি পর্বেই তাঁদের যুগের সর্বোচ্চ ঐশ্বর্যসম্পন্ন মূল্যবোধকে সাহিত্যে তুলে ধরে অসাধারণ রচনা উপহার দিয়েছেন।

সভ্যতার পতনের যুগে শিল্পী বা কবি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এর কারণ সোজা। সমাজ সামষ্টিক চৈতন্যের প্রতিভূ—কবি অনেকটাই ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির। তাছাড়া এই সময় সামাজিক শ্রেয়োবোধের জগতেও-যে বেদনাময় অধঃপতন দেখা দেয় তা একজন অনুভূতিশীল মানুষ হিসেবে তাঁকে বিষণ্ন করে তোলে। বিবেকের কণ্ঠস্বর হিসেবে তিনি এই অগ্রহণযোগ্য পরিস্থিতিকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন এবং তাঁর এই প্রয়াসের অসম্ভবতা টের পেয়ে নিজের অভিমানহত বিচ্ছিন্ন ভুবনে নিজের নিঃসঙ্গ আবাস তৈরি করে নেন। এই কালের কবিরা সমাজজীবনের যূথবদ্ধতা থেকে কমবেশি পলাতক। স্প্যাঙলার তার 'পাশ্চাত্যের পতন' বইয়ে ১৮০০ সালকে ইউরোপীয় সভ্যতার পতনের বছর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ঐ বছরটাকে সঠিক হিসেবে ধরে নিয়ে আমরা যদি তার পরের ইংরেজি কবিতার দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব যে আগের প্রজন্মের মতো তাঁরা আর চিরাচরিত সামাজিক ধ্যানধারণার বা সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছেন না, বরং সমাজ ও সভ্যতার নামে অনুষ্ঠিত পাশবতার চক্রবৃদ্ধি দেখে আর্তনাদে বিষণ্ন হয়ে উঠছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই বিখ্যাত উক্তি : মানুষ মানুষকে কী বানিয়ে ফেলল তা নিয়ে আমার বিলাপ করার কিছুই কি নেই (Have I nothing to lament what man has made of man) এই আর্তনাদে সেই অগ্রহণযোগ্য পৃথিবীকে প্রত্যাখ্যানের স্বর তিক্ত তীক্ষ্ণ বেদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

ইংল্যান্ডের ঐ যুগের প্রধান তিনজন কবির মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই অসন্তোষজনক ও যন্ত্রণানিপিষ্ট সামাজিক বাস্তবতা থেকে মুক্তি খুঁজেছিলেন প্রকৃতির সহজ শান্ত জগতের ভেতর। শেলি ত্রাণ চেয়েছিলেন আকাশের অনেক উঁচুতে, স্কাইলর্ক পাখির নিষ্পাপ আনন্দময় সঙ্গীত-উপচে-পড়া পবিত্রতার ভুবনে, কীটস নাইটিঙ্গেলের জরামৃত্যুহীন শান্ত সবুজ জগতে। বোদলেয়ারও উনবিংশ শতকের ক্লেদের ভেতর থেকে আত্মার শাশ্বত অমৃতলোকের স্বপ্ন দেখেছেন। ঐ কালের ইউরোপের প্রধান সাহিত্যগুলোর অনেক লেখকের মধ্যেই যন্ত্রসভ্যতার আক্রমণে রক্তাক্ত মানবহৃদয়ের সেই কান্না—আত্মিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—যান্ত্রিকতার ব্যাপারে তাদের অননুমোদন—প্রকাশিত হয়েছে।

আগেই বলেছি, কবি হলেই সবাই অবক্ষয়ের কবি হন না, কেউ কেউ হন। কবি হওয়ার মতো অবক্ষয়ের কবি হওয়াও একটা জন্মগত প্রবণতার ব্যাপার। কেবল কবি নয়, গতানুগতিক মানুষের মধ্যেও এমন অনেককেই দেখা যায় যারা জন্মগতভাবেই এই জগতে বহিরাগত এবং আত্মসর্বস্বতার ভেতরে প্রোথিত। পৃথিবীর কল্যাণ-অকল্যাণ, সুখ-দুঃখের উত্থান-পতনের সঙ্গে এঁরা সম্পৃক্ত নন। এঁরা বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ এবং একা। সমাজজীবন ভারসাম্যময়, সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকলে এঁরা উৎকট ও আত্মকেন্দ্রিক হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হন; কিন্তু জাতীয় জীবন অবক্ষয়ী হয়ে উঠলে এঁদের বৈশিষ্ট্যগুলো—যা অন্য সময়ে

সামাজিক মানুষের কাছে বিকৃতি বা অসুস্থতা হিশেবে প্রত্যাখ্যাত হত—সে-যুগের প্রতীক হিসেবে দেখা দিতে শুরু করে এবং এঁরা অবক্ষয়ের প্রতিভূ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়েন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের যে-চেহারাটি সেদিন দেখেছিলাম তা এই অবক্ষয়ী কবির চেহারা। ষাটের দশকে আমাদের এখানকার রফিক আজাদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শহীদ কাদরীর মধ্যেও ঐ একই অবক্ষয়ী প্রবণতা অল্পবিস্তর ছিল। অমি নিজেও ঐকালের অবক্ষয়ী চেতনার দ্বারা সংক্রামিত হয়েছিলাম, কিন্তু রক্তগতভাবে ছিলাম মানুষের সামাজিক যূথবদ্ধতার আবেগে উদ্বুদ্ধ। তাই শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও তার স্যাঙাৎদের ঐ নির্ভেজাল আত্মসর্বস্বতা আমাকে ওভাবে বিমর্ষ করেছিল।

৯

এই শতকের তিরিশের দশকে বাঙালির জীবনে, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনে যে-অবক্ষয় নেমে আসতে শুরু করেছিল, কল্লোল-যুগের লেখকদের লেখায় তা ব্যাপক ছাপ রেখে গেছে। এই অবক্ষয় ঘটেছিল অনেক কারণে। এসবের মধ্যে যে-কারণটিকে আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় (অথচ অধিকাংশ মানুষকে যা নিয়ে উচ্চবাচ্য করতে প্রায় দেখিই না) তা হল বৃটিশ-ভারতের রাজধানীর কলকাতা থেকে দিল্লিতে চলে যাওয়া। দেড়শো বছর ধরে শহর কলকাতার অপ্রতিহত সমৃদ্ধির বুকে এই ঘটনা মারণাস্ত্রের মতন আঘাত করে। যে-কলকাতা দেড়শো বছর ধরে সমস্ত ভারতের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল, এই ছোট্ট সিদ্ধান্তে তার সেই মহিমার পুরোপুরি অবসান ঘটে। রাজনৈতিকভাবে কলকাতা পরিত্যক্ত ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। কলকাতা পরিণত হয় প্রাদেশিক রাজধানীর অবনত মর্যাদাসম্পন্ন একটি ভেদাভেদহীন বেনিয়া নগরীতে—রজতসর্বস্ব, আত্মাহীন, নিপতিত এক নগরীতে; যেখানে কর্মক্লান্ত নগরীতে ক্লান্তি আর দীর্ঘশ্বাসই মানুষের একমাত্র নিয়তি। সমর সেনের কবিতায় সেই সময়কার নিঃস্ব নগরীর প্রেতায়িত প্রতিকৃতি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে :

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
হে শহর হে ধূসর শহর?
কালিঘাট ব্রিজের পরে লম্পটের পদধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে শহর হে ধূসর শহর?

এ সেই শহর যেখানে—

'বাতাসে ফুলের গন্ধ আর'... 'হাহাকার'।

কলকাতার পুঁজি চিরকালই অবাঙালিদের। এই বেনিয়া নগরীর মূল মালিক সবসময়েই তারা। বাঙালি জমিদারদের বিত্তের কারণে বাঙালির অস্তিত্ব সেখানে টিকে থাকলেও এই সময় অবাঙালি পুঁজির ক্রমবর্ধমান প্রতাপের মুখে তা শক্তিহীন হয়ে আসে। বাঙালি গড়পড়তাভাবে বাঁধা পড়ে যেতে থাকে সদাগরি অপিসের কেরানির বিত্তহীন জীবনের ভেতরে। রজতলিপ্সা আর পুঁজিবাদের জাঁতাকলের নিচে মধ্যবিত্ত বাঙালির সম্ভাবনা সেখানে তাই আরও নিঃস্ব আরও অপচিত :

কিন্তু সাইকেলে-ফেরা কেরানির ক্লান্তিতে
দিনের পর দিন
ঘড়ির কাঁটায় মন্থর মুহূর্তগুলি মরে;
ডাস্টবিনের সামনে
মরা কুকুরের মুখের যন্ত্রণায়
সময় এখানে কাটে
এখানে কি কোনোদিন বসন্ত নামবে
সবুজ উদ্দাম বসন্ত !

(চার অধ্যায়)

সে-শহরে প্রেমও প্রকৃতির মাধুরী হারিয়ে-ফেলা এক রাসায়নিক যৌগমাত্র :

আর আমি ভাবলাম
একটি মানুষকে ভুলতে কতদিনই আর লাগে।
কতদিনই বা লাগে শরীর থেকে মুছে ফেলতে
আর-একজনের শরীর-সর্বস্ব আলিঙ্গন
মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস,
স্যাকারিনের মতো মিষ্টি
একটি মেয়ের প্রেম !

অথচ এই দুর্দৈব ঘটার কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই কলকাতা ছিল সারা ভারতের একমাত্র ভরসাস্থল, এই উপমহাদেশের মুক্তির উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। এই কলকাতার পথে পথে রামমোহন, বিদ্যাসাগর সারা জাতির জন্যে যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা সারা ভারতের নিয়তি হয়ে গেছে। এখানকার লেখকেরা গেয়েছে প্রাচুর্য আর সম্ভাবনার গান। বঙ্কিমের স্বপ্ন কেন্দ্রীভূত হয়েছে সম্রাট, রাজা, জমিদার, আর উচ্চবিত্তের জগতে; রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের সবখানে দেখা যায় এক সম্পন্ন বাঙালিকে আকাশ যার ঈপ্সা; এমনকি মধ্যবিত্ত আর নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে লেখা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকাদের শাড়ির আঁচলে সিন্দুকের চাবি ব্যতিক্রমহীনভাবেই খুঁজে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই সময়ে এসে বিকাশমান বাঙালি জীবনের সম্পন্ন ভাঁড়ারে অনটনের ছোঁয়া প্রকট হয়ে উঠতে শুরু করে। জাতীয় জীবনের ওপর থেকে মর্যাদা আর গৌরবের বহিরাবরণ সরে যেতেই ভেতরের অনটনের কঙ্কাল করুণ পাঁজর বের করে দেখা দেয়। দেখা দেয় বৈষয়িক ও ঐহিক পৃথিবীতে পরাজিত এক শক্তিহীন মধ্যবিত্তের নিষ্ক্রিয় অক্ষম মুখাবয়ব। তিরিশের দশকে এসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় তাই আমরা দুর্জ্ঞেয় নিয়তির হাতে মানুষকে এক করুণ ক্রীড়নকে পরিণত হতে দেখি, তার ভেতরের পুরুষকারের শক্তি যেখানে পুরোপুরি নিঃশেষিত। কাহিনীর শেষপর্বে উপন্যাসের নায়ক শশী ডাক্তার স্বপ্ন এবং সম্ভাবনার সব রঙিন পালক হারিয়ে পলাতক বাপের রেখে-যাওয়া সম্পত্তি কুবেরের মতো পাহারা দিয়ে আগলে রাখার অর্থহীন কাজে মূল্যবান জীবনের অপচয় করে যাবার জন্যে নিয়তি-নির্বাচিত হয়ে বেঁচে থাকে। এই সময়কার জীবনানন্দ দাশ নৈরাশ্যে, আত্মহীনতাবোধে, মৃত্যুসর্বস্বতায়, অন্ধকার-বন্দনায় আশীর্ষপদতল নিমজ্জিত। এমনকি প্রদীপ্ত সুধীনদত্তের গলাতেও আত্মরতি আর অক্ষমতার দীর্ণ সঙ্গীত :

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি?
কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে?
কোথায় লুকাবে? ধূ-ধূ করে মরুভূমি;
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আর কত?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।
প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা॥

[উটপাখি]

১০

তিরিশের দশকের লেখকদের মধ্যে কলকাতার যে-সামাজিক অবক্ষয়ের রূপ ফুটে উঠেছিল, ষাটের দশকে পৌঁছোতে পৌঁছোতে তা প্রায় গভীর গভীরতর অসুখে পরিণত হয়। দেশবিভাগের পর লক্ষ লক্ষ দেশত্যাগী উদ্বাস্তুর চাপে ও নানান অভ্যন্তরীণ

সমস্যায় কলকাতা হতশ্রী হয়ে উঠতে থাকে। ষাটের দশকে ঢাকাতেও আমরা অবক্ষয়ের চেহারা দেখতে শুরু করেছিলাম, সে-অবক্ষয়ের রূপকার হবার জন্যে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে যেতেও শুরু করেছিলাম, কিন্তু কলকাতার লেখকদের মধ্যে অবক্ষয়ের যে-নিপতিত চেহারা সেদিন লক্ষ করেছিলাম তা ছিল আমার কল্পনারও অতীত। আর কী করেই বা তা ভাবা সম্ভব আমাদের পক্ষে? অবক্ষয়ের সঙ্গে তখন তো আমাদের সবে প্রথম পরিচয়। অনেক দুঃখের পথ পেরিয়ে কিছুদিন আগে দেশ তখন সবে স্বাধীন হয়েছে। ভাষা-আন্দোলনের জোয়ার আমাদের সামনে খুলে দিয়েছে যুগযুগের বাঙালিত্বের হিরণ্য সম্ভাবনা। বাঙালি মধ্যবিত্তের সামনে তখন সমৃদ্ধির স্বপ্ন। অবক্ষয়ের মুখোমুখি হবার সুযোগই তো পাইনি আমরা। এর পর একটা স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক নৈরাজ্য আর তারপর মার্শাল-ল আর তারপর দম-আটকানো নিগ্রহ। সব মিলে কতদিনের ব্যাপারই বা। বড় জোর সাত-আট বছরের। এই অল্প সময়ের মধ্যে অবক্ষয়কে এত ভালো করে দেখার-বোঝার সুযোগই বা কোথায় ছিল আমাদের!

ষাটের দশকে যখন কফি হাউসকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের তরুণদের সাহিত্য-আন্দোলন জন্ম নিতে শুরু করে তখন তা শুরু হয় তিনটি ধারায়। মূল ধারাটি ছিল 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাকেন্দ্রিক। ষাটের দশকের তরুণ-লেখকদের মূল অংশটি মোটামুটিভাবে জড়ো হয়েছিল এই ধারার পতাকার নিচেই। অবশ্যি শিবনারায়ণ রায় 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার ভূমিকা বা কৃত্তিবাসকেন্দ্রিক লেখকদের শক্তি—কোনোটাকেই খুব-একটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি। তাঁর বক্তব্য তুলে দিলাম :

> দেশবিভাগের আগে, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী দশকগুলিতে বাঙালি মনের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাপূর্ণ আন্দোলনগুলি কয়েকটি সাহিত্যপত্রকে কেন্দ্র করেই রূপ নিয়েছিল ;তাদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় 'সবুজপত্র', 'শিখা', 'কবিতা', 'পরিচয়', 'পূর্বাশা'। এইসব পত্রিকা শুধু নতুন লেখকদের আকৃষ্ট করেনি, বাংলা সাহিত্যে ও চিন্তার ক্ষেত্রে নানারকম পরীক্ষার ও উদ্ভাবনার সম্ভাবনা খুলে দিয়েছিল। দেশবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে আর এই ধরনের পত্রিকা অথবা সাহিত্য-আন্দোলন বড়-একটা চোখে পড়ে না। সাহিত্যজগতে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানদের বিবর্ধমান একচেটিয়া কারবার, কম্যুনিস্টদের প্রচারসর্বস্ব উচ্চরোল, ক্ষীণসমর্থ লেখকদের নিজের নিজের ক্ষণস্থায়ী পত্রিকা বের করবার অতিপ্রজ প্রচেষ্টা—সব মিলিয়ে সাহিত্য-আন্দোলনের ঐতিহ্য দ্রুত ক্ষীণ হয়ে আসে। যে-অর্থে 'সবুজপত্র' বাংলাসাহিত্যে নতুন একটি পর্ব এনে তাকে প্রকট করে তুলেছিল, যে-অর্থে ত্রিশের দশক বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্যের বিপ্লবকাল, সেই অর্থে গত তিরিশ-চল্লিশ বছরে পশ্চিমবাংলার সাহিত্যে স্মরণীয় কিছু ঘটেনি। সুরচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, এমনকি উপন্যাসও স্বল্পসংখ্যায় লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু কোনো প্রতিশ্রুতিশীল আন্দোলন বা কোনো নতুন দিগদর্শীর সন্ধান মেলে না। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সঙ্গে কিছু সমর্থ তরুণ-লেখক যুক্ত ছিলেন; তাঁদের ভেতর কয়েকজন

পরবর্তীকালে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন; কিন্তু 'কৃত্তিবাসের' চরিত্রে আন্দোলন গড়ে তোলবার অথবা নতুন দিক খুলে দেবার অভিমুখ্য বা শক্তি আদৌ ছিল না। 'সবুজপত্র', 'কবিতা', 'পরিচয়' বা 'পূর্বাশা' জাতীয় পত্রিকার সঙ্গে কৃত্তিবাসের নাম যুক্ত করা নিতান্তই অসঙ্গত। ঐ পত্রিকার প্রধান লেখকদের মধ্যে কয়েকজন পরে আনন্দবাজার, যুগান্তর, আজকাল ইত্যাদি ব্যবসায়িক পত্রিকার আশ্রয় নিয়ে বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

কথাটা অনেকটাই সত্যি। তবু মনে রাখতে হবে ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গে যেসব লেখকের উত্থান ঘটেছিল তারা কমবেশি এই কৃত্তিবাস–কেন্দ্রিক ধারাটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শক্তির দিক থেকে এইসব লেখকদের মিলিত ভূমিকা একেবারে বাতিল করে দেবার মতোও ছিল না। তাছাড়া সব কালই নিজ নিজ সাধ্যমতো সাহিত্যের ভাঁড়ারকে ফুলে ফলে পূর্ণ করে তুলতে চেষ্টা করে, কাল ও পরিপার্শ্বের নানা অনপনেয় বৈরিতার জন্যে অনেক সময়ে তা ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে না। তাই এই অভিসন্ধিহীন ব্যর্থতাকে এতখানি অকরুণ ভাষায় তিরস্কার না করলেও চলতে পারে।

কৃত্তিবাস–গোষ্ঠীর লেখকেরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমন বড় কিছু দিয়েছে এমন বলব না, কিন্তু সাধ্যমতো কিছু দেবার চেষ্টা করেছে। স্বাধীনতা–উত্তর যুগের অবক্ষয়, আশাভঙ্গ ও অর্থহীনতার অনুভূতিকে জীবনে ও সাহিত্যে ধারণ করেছিল তারা। দীর্ঘস্থায়ী কংগ্রেসী শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ ও নির্মম প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে তারা তাদের প্রতিবাদকে ধ্বনিত করেছিল। এটা তারা করেছিল প্রাণপণ চিৎকারে। এই চিৎকার চোখে আঙুল ঢুকিয়ে সত্যকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো। এই প্রতিবাদ ব্যক্তিগত জীবনাচরণের মতোই ছিল লেখার অক্ষরেও। কলকাতার সুশীল সামাজিকেরা এইসব অনাচারের অপ্রত্যাশিত খোঁচায় হতচকিতের মতো উঠে বসেছিলেন প্রথমে, তারপর তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন এর বিরুদ্ধে।

ষাটের দশকের এই ধারাটির পাশাপাশি বয়ে চলেছিল আরও দুটি ধারা, তার একটি হাংরি জেনারেশনের ধারা। এটা ছিল বেশ গরম। এই দলের নেতা ছিলেন মলয় রায় চৌধুরী। প্রথমে 'কৃত্তিবাস' ও হাংরিদের ধারা ছিল একাকার, পরে হাংরিরা স্বতন্ত্র হয়ে নিজের পথে চলতে শুরু করে। এদের প্রতিষ্ঠান–বিরোধিতা ছিল নিরঙ্কুশ, তীব্র গলার চড়া সুরে বাঁধা। মেনিফেস্টো ছেপে, নিজেদের অ্যান্টি–এসটাব্লিশমেন্ট অবস্থানকে সুতীব্রভাবে চিহ্নিত করে এরা আসরে নেমেছিল। কিন্তু এই সময়কার ভালো লেখকদের কাউকেই তারা প্রায় শেষপর্যন্ত দলে পায়নি। প্রথমদিকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো কিছু লেখক এদের দলে ভিড়লেও শেষপর্যন্ত জনাকয়েক অলেখক ছাড়া প্রায় কেউই টিকে থাকেনি। এর কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। এদের প্রতিষ্ঠান–বিরোধী অবস্থান যতটা ব্যক্তিগত জীবনাচরণে বা প্রথাবিরোধী উৎকট কার্যকলাপের ভেতর ছিল, লেখার ভেতরে ততটা ছিল না। নিত্যনতুন অদ্ভুত ঘটনায় লোকজনকে চমকে দিয়ে তাই দিয়ে নিজেদের কেউকেটা

করে তুলে এরা একধরনের আত্মতৃপ্তি খুঁজে নিতে চাইত। মলয় রায় চৌধুরীর হাংরি কিংবদন্তি থেকে একটা নমুনা তুলে দিই :

> আমি, দেবী আর সুবিমল বসাক একদিন ঘুরতে ঘুরতে বাগড়ি মার্কেটে দেখি থোক দরে মুখোশ বিক্রি হচ্ছে। অনেক শস্তা। দুশো মুখোশ কিনে নিই আমরা, রাক্ষস-জন্তু-জানোয়ার, জোকার পাখি ইডিয়ট সাধু। ওখানেই একটা জব প্রেসে ছাপতে দেওয়া হয় মুখোশগুলোর ওপর :
>
> দয়া করে মুখোশ খুলে ফেলুন
> *হাংরি জেনারেশন*
>
> কদিন ধরে মুখোশগুলো ডাকে পাঠানো হয়। অনেকের বাড়িতে গিয়ে লেটার-বক্সে। কবি-লেখকদের ছাড়াও রাজনীতিক আমলা পুলিশ অধ্যাপক সাংবাদিক ব্যবসাদার সবাইকে।

ফল যা হবার তাই হল। 'শান্তিনিকেতনের আঁতেল ঘাঁটিগুলোতে বুলেটিন বিলির কাজ ছিল প্রদীপ চৌধুরীর।..বিশ্বভারতীর অনেককে মুখোশ পাঠানো হয়েছিল।' ফলে 'রাসটিকেট হয়ে কলকাতায়'..। একরাতে কফি হাউস থেকে বেরোবার সময় 'সুরেশ সমাজপতির বাচ্চাদের' আক্রমণ। অবশ্যি সেটাও-যে গর্ব করে বলে বেড়ানোর এক মওকা এনে দিল তাতে আর ভুল কি?

গায়ে পড়ে লোককে খেপিয়ে তোলার ব্যাপারটা-যে কোন্ পর্যায়ে গিয়েছিল, গিন্সবার্গের চিঠির উত্তরে তাঁকে লেখা আবু সয়ীদ আইয়ুবের চিঠির একটা উক্তিও তার প্রমাণ :

> Recently they have hired a woman to exhibit her bosom in public and invited a lot of people including myself to witness this avantgarde exhibition.

উদ্যম ছিল এঁদের মধ্যে, বিশেষ করে মলয় রায় চৌধুরী বা দেবী রায়ের মধ্যে। আজীবন এমনি এক দুরারোগ্য স্নায়বিক অপরিণতি নিয়ে এই অর্থহীন আন্দোলনের ভেতরে সক্রিয়ভাবে নিবেদিত থেকেছেন এঁরা, কিন্তু কাউকেই প্রায় দলে পাননি।

তৃতীয় ধারাটি ছিল আলোক সরকারের 'শতভিষা' পত্রিকাকেন্দ্রিক। 'কৃত্তিবাস'-এর কণ্ঠস্বর ছিল চড়া পর্দার। কলমের মাথায় যা এসেছে লেখকেরা তা তুলে ধরেছে সেখানে। কিন্তু শতভিষার কণ্ঠস্বর ছিল সে-তুলনায় শান্ত ও শমিত। ষাটের নতুন ধারার ভেতরেই ছিল তা এক সমন্বয়ধর্মী ধারা।

পদপাতের শব্দ

১

'বক্তব্য' বেরোবার পর বছরখানেকও পেরোল না, হাংরি জেনারেশনের ঢেউ এসে লাগল আমাদের চত্বরে। সময়মতো বৃষ্টিতে মাঠ আগে থেকেই উর্বর হয়ে ছিল, বীজ পড়তেই ছোট্ট চারা হাত-পা ঝাড়া দিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াল। হাংরি জেনারেশনের বুলেটিনের আদলে বের হল আমাদের 'স্যাড জেনারেশন'। কে সম্পাদক, কে প্রকাশক, কোনোকিছুরই কোনো হদিশ নেই, বেরিয়ে গেল এক-ফর্মার মলাটহীন বুলেটিন। চেহারায় গোবেচারা, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে শহর-কাঁপানো এক বিস্ফোরণ। শান্ত ছিমছাম ঢাকা শহর ঘা খেয়ে শুরু করল কটুকাটব্য আর গালিগালাজ। বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক ছোট্ট ঢাকা শহরটা আলোচনা-সমালোচনায় যেন মারমুখো হয়ে উঠল।

গতানুগতিক সামাজিক ধ্যানধারণাকে পুরোপুরি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যেন ক্লেদ ছড়াচ্ছে মূর্তিমান অপঘাত। এই সমাজকে এর আগে এমন করে কেউ কখনো যেন আর ঘা দেয়নি। পুরোপুরি অ্যান্টি-এসটাবলিশমেন্ট যাকে বলে। সমাজ বা মানুষ কারো কাছে কোনো দায়বদ্ধতা নেই এতটুকু। হাড়ে হাড়ে চেনা হয়ে গেছে চারপাশের এইসব ভণ্ড, ঘেয়ো আর হঠকারিতায়-ভরা অন্তঃসারহীন সামাজিক মানুষগুলোকে; বাইরের আপাতলোভন প্রসাধনীর নিচে এদের পচে-গলে নষ্ট হয়ে যাওয়া চেহারাগুলোকে। কেন এই ক্ষয়িষ্ণু, ফাঁপা আর ভণ্ড মানুষগুলোকে দিনরাত সালাম দিয়ে চলতে হবে? বরং এদের ফাঁকা বুলির পাছায় লাথি মেরে নিজেদের কথা সৎভাবে বলে যাওয়াই ভালো। শ্রাব্য হোক, অশ্রাব্য হোক সেও তো একটা সততা।

'স্যাড জেনারেশন' বেরিয়েছিল ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে। প্রথম পৃষ্ঠায় মার্জিনের বাঁ দিকটা জুড়ে নিচ থেকে ওপরে বড় বড় ইংরেজি হরফে লেখা ছিল 'দ্য স্যাড জেনারেশন'। এর নিচে বাঁ দিকে 'ভল.ওয়ান', আর ডান দিকে 'নাইনটিন সিক্সটি ফোর' ইংরেজিতে লেখা।

'স্যাড জেনারেশন' ছিল দ্বিভাষিক বুলেটিন। প্রথম পৃষ্ঠায় ছিল রফিক আজাদের 'দ্য স্যাড জেনারেশন' এবং শেষ পৃষ্ঠায় প্রশান্ত ঘোষালের 'চম্পাবতী : এ ক্যাথারসিস

অফ পেন্ট আপ প্যাশনস'। এই দুটো লেখা ছিল ইংরেজিতে। দুটোই গদ্য। বাকিগুলো কবিতা, বাংলায়। কবিরা যথাক্রমে আমি, ইউসুফ পাশা, আসাদ চৌধুরী, শহীদুর রহমান, বুলবুল খান মাহবুব ও ফারুক আলমগীর। রফিক আজাদের 'দ্য স্যাড জেনারেশন' মোটামুটিভাবে ছিল স্যাড জেনারেশনের অলিখিত ইশতাহার। লেখাটির বিচ্ছিন্ন কিছু কথা একখানে করলে এই ইশতাহারের মূল প্রবণতাটা আঁচ করা যায় :

> We are poisoning us consciously. We are bearing dynamites in our blood. We have no other alternative except SELF-DESTRUCTION...
> "We hate conventional life. We cannot tolerate the conventional notions of private and public MORALITY...
> "We are guilty ... We have no friends. We have a faithful friend—CIGARETTE...
> "We are not sex-driven youths. We are faithful to ourselves, and to our `Sadness'...
> "...what do we want?— NOTHING, NOTHING,—we want nothing from our bloody society...
> "We are exhausted, annoyed, tired and `sad'.

কাঁচা ইংরেজিতে লেখা এলোমেলো উক্তিগুলের ভেতর থেকে কয়েকটা কথা সরাসরি উঠে আসে : আমরা গতানুগতিকতা বিরোধী, সমাজবিচ্ছিন্ন, আত্মধ্বংসী, মৃত্যুপরায়ণ এবং বিষণ্ন। আমাদের রক্তের মধ্যে বিস্ফোরণোন্মুখ ডিনামাইট, (জীবন নিরর্থক জেনে) আমরা নিঃশেষিত,বিব্রত, ক্লান্ত এবং বিষণ্ন।

দুটো মোদ্দা কথা উঠে আসে এই বক্তব্য থেকে : এক, এই অনুভূতিময় তারুণ্য চারপাশে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন গাঁড়ল সমাজকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে। দুই, নিজেদের অসহায় নিঃসঙ্গ ও ফন্ত্রণাদায়ক বিবরের মধ্যে তারা উদ্ধারহীনরকমে বিষণ্ন। প্রথম ষাটের তারুণ্যের মূল দুটো বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছিল এই লেখাটির ছোট্ট পরিসরে।

যাকে কেন্দ্র করে স্যাড জেনারেশন মূলত আবর্তিত হয়েছিল সে রফিক আজাদ। সে–সময়কার নতুন অবক্ষয়ী চেতনার মূল চেতনাটিকে ও–যে কেবল এই বুলেটিনে তুলে ধরেছিল তা নয় , এই বুলেটিনের অধিকাংশ লেখার মূল বিষয়বস্তুও ছিল ও–ই। বুলেটিনের দুটি কবিতা (আমার ও শহীদুর রহমানের) ও একটি গদ্য (প্রশান্ত ঘোষালের) নিবেদিত হয়েছিল মোটামুটি ওর উদ্দেশেই। রফিক ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অনুভূতিপ্রবণ। দলের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাদীপিতও মনে হত ওকে। শহীদ কাদরী বা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও ছিল আমাদের দলে। কিন্তু প্রত্যাশার দিক থেকে সবার ওপর দিয়ে তখন ওকেই চোখে পড়ছে। যৌনতার একটা জান্তব রোমশ কষ্ট ছিল

ওর ভেতর, সেই কষ্টে সারাক্ষণ ও এপাশ-ওপাশ করত। তাছাড়া স্বভাবতই ও ছিল স্বল্পভাষী আর নিঃসঙ্গ। ওর সেই নিঃসঙ্গতা আমাদের ভেতরটাকে গুমরে তুলত। ওর ভেতরকার মূক ও অবোধ কষ্ট ওকে আমাদের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল, আমরা সবাই ওর সমব্যথী হয়ে উঠেছিলাম। ওর প্রতিটা অব্যক্ত কান্নাকে আমি আমার বাৎসল্যের গভীর অনুভূতির ভেতর শুনতে পেতাম। প্রতিভাবান ছোটভাইদের জন্য বড়ভাইদের ভেতরে যেমন একটা উৎকণ্ঠা ও গর্ববোধ থাকে, ওর জন্য আমার অনুভূতি ছিল অনেকটা সেরকম।

স্যাড জেনারেশনের প্রথম কবিতা 'নির্বাচিত দূরে থেকে' ছিল আমার লেখা। ও-ই ছিল কবিতার বিষয়। ওর ভেতরকার সেই নিগ্রহকর কষ্টটাকেই তুলে ধরার চেষ্টায় ছিল এতে :

> তোমার শরীরে হাড়ে অবিশ্রান্ত করাত কলের
> নির্দয় দুঃস্বপ্ন ঘোরে। তোমার রক্তে এক নিদ্রাহীন জীবিত করাত।

শহীদুর রহমানের কবিতাও ('গন্ধ থেকে দূরে') ছিল কাছাকাছি অনুভূতির :

> তাহলে চলিরে আজাদ
> তোর ঘরের দেয়ালের গায়
> বৃষ্টিরা থুত্‌নি ঠেঙায়

প্রশান্ত ঘোষালের লেখাটাতেও (চম্পাবতী : এ ক্যাথারসিস অফ পেন্ট আপ প্যাশনস) অনুভূতি এর থেকে খুব দূরে নয় :

> Rafique, a sincere friend of mine remains always depressed in this age of reason, with what insecurity and hell-fire of the earth.
> Love : the so-called bogus prejudice. Women, Foxy and SEXY, do not know the meaning of life. Rafique, don't pay attention to a lady ...

রফিকের ব্যাপারে আমাদের তিনজনের অনুভূতি প্রায় একইরকম, অথচ তিনজন আমরা রফিককে দেখেছিলাম পুরো তিনটি আলাদা জায়গা থেকে, কিন্তু এসে দাঁড়িয়েছিলাম একই অনুভূতিতে।

আর-একটি কারণে 'স্যাড জেনারেশন' আলোড়ন তুলেছিল। তা হল এর পৃষ্ঠায় যৌনতার ভুরভুরে কাঁচা গন্ধ। এ-ব্যাপারে এই তরুণ-কবিরা যেমন ছিল বেপরোয়া তেমনি অপরিণত :

এবং কজন মেয়ের স্তন আর পাছা থেকে ঝরে
চুইংগামের মতো মিষ্টি গন্ধ..

(শহীদুর রহমান)

অথবা,

কুকুরের উত্তেজনা তিনশত অশ্বশক্তি একসাথে
কাজ করে রক্তকণিকায়

(ইউসুফ পাশা)

অথবা,

অভিজাত রমণীর সূচ্যগ্র স্তন
আমাকে বিদ্ধ করে

(বুলবুল খান মাহবুব)

আজকের তরুণ-কবিদের চোখে এইসব লাইন হয়তো কোনো নতুনত্বের আলোই জ্বালবে না। বহুলব্যবহারজীর্ণ একধরনের বিবর্ণ আর পরিত্যক্ত পঙ্‌ক্তি আজ এসব। কিন্তু প্রথম ষাটের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে এইসব পঙ্‌ক্তি অত সহনীয় ছিল না। সেদিনকার সাহিত্যে এ ছিল একেবারে নতুন জিনিশ। আনকোরা আর অত্যাচারী। সেকালের ছোট্ট সুস্থিত ঢাকা শহর এর আগে এসব কখনো শোনেনি।

২

'স্যাড জেনারেশন' বের হবার পর পেরিয়ে গেল বেশকিছুটা অজন্মা সময়। এর মধ্যে নানারকম উচ্ছৃঙ্খল ক্রিয়াকলাপ সাহিত্যের মূলক্ষেত্র থেকে অনেককে সরিয়ে নিয়েছে কিছুটা দূরে, কাউকে কাউকে নিষিদ্ধ পল্লীর অন্ধকার রাস্তায়, কেউ কেউ যোগাযোগ হারিয়ে কমবেশি বিচ্ছিন্ন। অথচ এসব ডিঙিয়ে 'নাইল ভ্যালির' মত্ত আড্ডা উপচে চলেছে আগের মতোই, কখনো কখনো সেই আড্ডা প্রসারিত হয়েছে জিন্না এ্যাভিনিউর রেক্স বা নবাবপুরের ক্যাপিট্যাল অব্দি, কিন্তু পকেটের অসহযোগিতার দরুন সেসব জায়গায় খুব-একটা সুবিধা করে ওঠা যাচ্ছে না। মোট কথা কোনোকিছু ঠিকমতো দানা বাঁধতে দেরি হয়ে গেলে যে-ধরনের গা-ছাড়া এলিয়ে-পড়া ভাব চলে আসে অনেকটা সেরকম। এর মধ্যে ১৯৬৪-এর শেষদিকে আমি আবার কলকাতা ঘুরে এসেছি মাস-দুয়েকের জন্যে, ফিরে এসেই গ্যাসট্রিক আলসারে ভুগতে শুরু করেছি।

অনুপস্থিতির ফলে খানিকটা যেন বিচ্ছিন্নই হয়ে পড়েছি মূল কার্যকলাপ থেকে। কিন্তু এগুলো হল বাইরের ঘটনা। ভেতরে ভেতরে তখন কিন্তু এগিয়ে চলেছে আসল প্রস্তুতির পালা। তিন দিক থেকে অন্তত তিনটি পত্রিকা প্রকাশের কাজ বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে।

এই তিনটির মধ্যে প্রথম যে–পত্রিকাটি বের হয়ে আমাদের তরুণ–লেখকদের ছোট্ট পরিসরটুকুকে আবার সরগরম করে তুলল তার নাম 'স্বাক্ষর'। 'স্বাক্ষর' যখন বেরোয় আমি তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, আমার চিকিৎসা চলছে সেখানে। পত্রিকাটি আমার কাছে নিয়ে এসেছিল রফিক। এর মধ্যে পাল্টে গেছে মূল পরিকল্পনা। সবরকম লেখা নিয়ে দলের মূল পত্রিকা হিসেবে বের হওয়ার কথা ছিল 'স্বাক্ষর'–এর। কিন্তু পছন্দ হয়ে যাওয়ায় ঐ নামটিকে ওরা ব্যবহার করেছে কবিতাপত্রিকার জন্যে। পূর্ণাঙ্গ পত্রিকাটি হাতে নিতেই একটা অদ্ভুত খুশিতে মন ভরে উঠল। মনে হল ইশতাহার–বুলেটিনের পর্ব ছেড়ে এবার সত্যি সত্যি আমরা শুরু করতে যাচ্ছি! বিক্ষিপ্ত ফুল–ফোটানো শেষ করে এবার শুরু হল ফলের পর্ব। এবার আমরা সত্যি সত্যি দানা বাঁধব। রূপ পাব।

'স্বাক্ষর'–এর চেহারা ছিল একেবারেই শাদামাঠা। পত্রিকাকে মোহনীয় ও রুপসী করে তোলার জন্য যে–প্রচ্ছদ নিয়ে সবার এত দুশ্চিন্তা সেই প্রচ্ছদের বালাইটুকু পর্যন্ত ছিল না এতে। মলাট বলতে নিতান্তই একটা শাদা কাগজ, ওপরে পত্রিকার নাম পর্যন্ত নেই, তার জায়গায় লম্বা চৌকো একটা পরিসরে কবিদের নামগুলো পর পর টাইপ করে সাজানো। যেন পত্রিকার নাম–টাম কিছু নয়, কবিরাই এতে মুখ্য। পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যাও হতাশাব্যঞ্জক। তবু এরই ভেতর উপস্থাপিত হয়েছে মোট এগারোজন কবি : ইমরুল চৌধুরী, সিকদার আমিনুল হক, রফিক আজাদ, আসাদুল ইসলাম চৌধুরী (আসাদ চৌধুরী), অশোক সৈয়দ (আবদুল মান্নান সৈয়দ),শহীদুর রহমান, মুশফিকুর রহমান, বুলবুল খান মাহবুব,প্রশান্ত ঘোষাল, কাজী সিরাজ ও মফিজুল আলম। প্রথম ষাটের তরুণ–কবিরা মোটামুটি দলেবলেই যেন উপস্থিত। 'স্যাড জেনারেশনের'ই যেন সম্পূর্ণতর চেহারা 'স্বাক্ষর'। তার থেকে জেগে–ওঠা তারই পরিণত অবয়ব। পত্রিকার দিকে তাকালেই বোঝা যায় সবরকম গতানুগতিকতার প্রতি পুরো তাচ্ছিল্য দেখাতেই যেন প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকা। নতুন পথে, অপরিচিতের রাস্তায়। পাথেয় নেই, সম্বল নেই, কিন্তু আত্মবিশ্বাস আর দুঃসাহসের তোয়াক্কাহীন ঔদ্ধত্যের কমতি নেই এতটুকু।

'স্বাক্ষর' প্রকাশিত হয়েছিল মোট চার সংখ্যা, বছর–কয়েক ধরে। প্রতি সংখ্যায় সম্পাদক ছিল দুজন করে। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হয়েছিল রফিক আজাদ আর সিকদার আমিনুল হকের। পত্রিকাটি বেরিয়েছিল অভিযান প্রিন্টিং হাউস, ৫৪ আগা মসিহ লেন, ঢাকা–২ থেকে। প্রেসের মালিকের নামও পত্রিকাটির খ্যাতি–কুখ্যাতির চাইতে কম নয়। তিনি শেখ মুজিবের হত্যাকারী ও তাঁর পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান স্বনামধন্য খন্দকার মোশতাক আহমেদ স্বয়ং।

৩

'বিনা ঘোষণায়, বিনা বিজ্ঞাপনে, বিনা উৎসবে' প্রকাশিত হয়েছিল 'স্বাক্ষর'। পত্রিকা ছোট। কিন্তু এমনি একটি ছোট পত্রিকা বের করার চেষ্টাও নাকানিচুবানি খাইয়ে ছাড়ল সবাইকে। লেখা নাহয় পাওয়া গেল, কিন্তু কোথায় সেই আসল অনুপান যা না হলে আর সব স্বপ্নই অসার? কোথায় টাকা বা বিজ্ঞাপন? কোথায় অর্থসংস্থান? কোনোদিকেই কোনো আশার আলো চোখে পড়ে না।

কাজেই পথ একটাই—চাঁদা। কিন্তু নগদ টাকা বের হবে এমন গাঁটই বা কার আছে? এই দুর্যোগেও মূল ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হল প্রশান্ত। জগন্নাথ হলের সাহিত্য সম্পাদক সেবার ও। হল-বার্ষিকী প্রকাশের কয়েকশো টাকা তখন ওর পকেটে। সবার চোখ ওর ঐ ট্যাকের দিকে। সেখান থেকে পথ ভুল করে অল্পকিছু এসে গেলেও তো খানিকটা এগিয়ে যায়। 'স্বাক্ষর'-এর জন্যে প্রশান্তও ভেতরে-ভেতরে অশান্ত হয়ে উঠেছিল। সবার ইশারা টের পেতেই আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। 'জয় দুর্গা' বলে প্রকাশনার ক্যাশ ভেঙে পুরো টাকাটা সোজা সেঁধিয়ে দিল 'স্বাক্ষর'-এর তহবিলে। প্রশান্তের আর জগন্নাথ হল বার্ষিকী—দুয়ের জন্যই এর খেসারত হল বেদনাদায়ক। কথা ছিল 'স্বাক্ষর' বের হয়ে গেলে টাকাটা ওকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু বিজ্ঞাপনহীন একটা পত্রিকা কীভাবে দিতে পারে তা? ফলে সেবার বেচারা জগন্নাথ হল বার্ষিকীটাই আর আলোর মুখ দেখতে পারল না। প্রশান্ত সে-বছরের মতো তা-না-না-না করে পার পেলেও ধরা পড়ে গিয়েছিল হল থেকে বিদায় নেবার সময়। হলের হিসাব বিভাগ সাঁড়াশির মতো চেপে ধরল টাকাগুলো আদায় করে নেবার জন্যে। সেই নিরাশ আঁধারে জ্যোতির্ময় দেবদূতের মতো দেখা দিলেন জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ, পরে ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চের রাতে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে শহীদ, সর্বজনশ্রদ্ধেয় ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব। প্রথমে কিছু গালমন্দ করে, পরে মানবিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে কিছু হিতোপদেশ দিয়ে ওকে মাফ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

টাকার ব্যাপারে দ্বিতীয় ভরসা হিসেবে দেখা দিল একজন অপ্রত্যাশিত সাহিত্যপ্রেমিক, নাম সিকদার মোসাদ্দেকুর রহমান। সিকদার আমিনুল হকের সম্পর্কে ভাই সে। কবিতা না-লিখলেও কবিতাকে ভালোবাসে। সরকারের গণপূর্ত বিভাগের ওয়ার্কস সরকারের চাকরি তার। চাকরি ছোট, তবু মাস শেষে বেতন তো কিছু হাতে আসে। প্রস্তাব মাত্র পকেট থেকে দেড়শো টাকা বের করে দিয়ে সত্যি সত্যিই আর-এক ভরসা হয়ে দেখা দিল। জীবনের মহিমাকে সমুন্নত রাখার জন্যে, সাহিত্যশিল্পের জন্যে এমনি কত অচেনা অপরিচিত মানুষ-যে এ-ধরনের ছোটবড় আত্মত্যাগ করে, কে তাদের মনে রাখে?

এভাবেই জোগাড় হয়ে গেল মূল টাকাটা। এরপর বাকিদের কাছ থেকে দশ বিশ করে তুলে মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হল। বেরিয়ে এল ষাটের তরুণ-কবিদের প্রথম সোনালি পতাকা—'স্বাক্ষর'।

'স্বাক্ষর'–এর চরিত্রের সবচেয়ে বড় যা পুঁজি ছিল, তা হচ্ছে এর দুঃসাহস। পত্রিকার প্রচ্ছদ থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি শব্দের নির্ভীক তীক্ষ্ণ উচ্চারণে এই সাহসিকতা উৎকীর্ণ ছিল। লুকোবার, গোপন করবার, পালাবার কোনো উদ্যোগ ছিল না কোথাও–ভয়ে, সম্ভ্রমবোধে বা 'পবিত্রে'র চোখ–রাঙানিতে কোনো শব্দ, উপমা বা বাকপ্রতিমা বর্জিত হয়নি।

বিশেষ করে যৌনতার ব্যাপারে 'স্বাক্ষর' ছিল একেবারেই শুচিবায়ুবর্জিত আর অকপট। ব্যাপারটা সেকালের ছোট শহর ঢাকার সাহিত্যাঙ্গনকে–যে চকিত ও সন্ত্রস্ত করে তুলবে তাতে আর আশ্চর্য কী। ১৯৬৪ সালের 'কবরী'র পঞ্চম সংখ্যায় লেখা হল :

> এই সংকলনের প্রায় প্রতিটি লেখাই অশ্লীল, রুচিবিগর্হিত ও অপাঠ্য। এই সংকলনের কবিতায় স্বেচ্ছাচারিতা, কল্পিত যন্ত্রণা, অন্ধকারজনিত অনেক বিকারের ভয়ংকর প্রকাশ অত্যন্ত ভীতিপ্রদ।

শুধু কবরী নয়, নানান মহল থেকেই তীব্র ও নির্মম আক্রমণ বর্ষিত হল এই নতুন অবক্ষয়ী প্রবণতার বিরুদ্ধে।

সে সময় মোহাম্মদ নূরুল ইসলামের সম্পাদনায় আরমানিটোলা থেকে বের হচ্ছে 'পূবালী'।* মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম সম্পাদক হলেও ভেতর থেকে পত্রিকার সম্পাদনার কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সে–সময়ে মাসিক 'পূবালী'তে 'ঢাকায় থাকি' নামে একটা কলাম লিখতেন, 'নাগরিক' ছদ্মনামে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বয়সে আমাদের চাইতে বড়, ইংরেজিসাহিত্যের সর্বশেষ আধুনিকতায় পরিশীলিত। আমাদের ধারণা ছিল তাঁর কাছ থেকে সমর্থন না হলেও সহানুভূতি পাব। কিন্তু তাঁর আক্রমণ হল ছুরি দিয়ে পোঁচিয়ে ত্বক ফালি–ফালি করে ফেলার মতো। এই রুগ্‌ণ দলের 'পালের গোদা' উপাধিটা তিনিই এ–লেখায় আমাকে দেন।

এইসব পথভ্রষ্ট তরুণেরা কোনো–এক সময়ে ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করে আবার শুভচেতনার মঙ্গলালোকে ফিরে আসবে, একটি পত্রিকায় সেই আশাবাদও মনে স্বস্তি আনার মতো :

---

* 'সমকাল' তখন আমাদের পত্রিকাজগতের মধ্যগগনে। 'সমকাল' 'পূর্বমেঘ' ও গুটিকয় সরকারি পত্রিকাকে বাদ দিলে আমাদের এই সময়টায় ভালো পত্রিকা বলতে ছিল এই 'পূবালী'। সুনিয়মিতভাবে সাহিত্য–উদ্দেশে নিবেদিত হয়ে বেশ কয়েক বছর একনাগাড়ে বেরিয়ে পাঠকের সাহিত্যতৃষ্ণা মিটিয়ে গিয়েছে। ডবল ক্রাউন সাইজে নিউজপ্রিন্টে ছাপা মাসিক 'পূবালী'তে 'সমকালে'র শক্তিমত্তা বা প্রভা কোনোটাই প্রতীয়মান ছিল না, কিন্তু পত্রিকার সবটা জুড়ে একটা নম্র বিনীত মাধুর্য ছিল যা হৃদয়কে স্নিগ্ধ করত।

> তাঁরা ভারকেন্দ্রে স্থিতিলাভ করবেন বলেই বলছি, 'স্বাক্ষরে' যাঁরা বিকৃত-স্বাক্ষর রেখেছেন এবং যাঁদের স্বাতন্ত্র্যবোধ উন্নাসিকতার নাম মাত্র, তাঁদের সম্পর্কেও আমরা হতাশ হই না। সংঘাতেই সুন্দরের সৃষ্টি বলেই বলছি, 'স্বাক্ষর'গোষ্ঠী প্রচণ্ড মানসিকতায় আজ পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু সাহিত্যের পরম প্রশান্তির পথ তাঁরাও নিশ্চয়ই পাবেন।

'স্বাক্ষর-এর নতুনত্ব ছিল, মারাত্মক নতুনত্ব'—লিখেছিলেন আর-একজন সমালোচক। 'স্বাক্ষর'-এর পুঁজি বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। না সম্পন্ন লেখকের, না সচ্ছলতার। তবু 'স্বাক্ষর'-এর যে-পরিচয় বেঁচে থাকবে তা হল 'স্বাক্ষর' নতুন কিছু এনেছিল। আর কারো মতো নয়, কারো আদলে নয়, কারো অনুকরণে নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নতুন এই প্রয়াস--একেবারে নিজস্ব মাপের শার্ট-প্যান্ট নিজের ব্যবহারের জন্য। আপোষহীন তারুণ্য ও দুঃসাহসকে এ তুলে ধরেছিল পতাকার মতো। 'স্বাক্ষর' ছিল ষাটের সাহিত্যধারার প্রথম আবির্ভাবের রক্তিম দলিল, এর নতুন অগ্রাভিযানের প্রথম বার্তাবাহক।

৪

'স্বাক্ষর'-এর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হতে-না-হতেই জ্বলে উঠল দলের দ্বিতীয় বর্তিকা : 'সাম্প্রতিক'। সম্পাদক শাহজাহান হাফিজ। এটি বেরোয় মূলত তরুণ-লেখকদের ঢাকা কলেজ গ্রুপের নেতৃত্বে। 'স্বাক্ষরে'র সঙ্গে এর দুটো জায়গায় পার্থক্য ছিল। এক, 'স্বাক্ষর'-এর মতো শুধুমাত্র কবিতা-পত্রিকা ছিল না এটি; কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, সমালোচনা সবকিছুই স্থান পেয়েছিল এর পাতায়। দ্বিতীয় পার্থক্য, 'স্বাক্ষর' ছিল কবিতাপ্রধান, 'সাম্প্রতিক' ছিল গদ্যপ্রধান। 'স্বাক্ষরের' পৃষ্ঠা থেকে বেরিয়ে এসেছিল প্রথম ষাটের নতুন সাহিত্যধারার শক্তিমান কবিরা : রফিক আজাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সিকদার আমিনুল হক ও অন্যান্যেরা। 'সাম্প্রতিক' থেকে বেরিয়ে এসেছিল এই ধারার মূল গদ্যলেখকেরা : আবদুল মান্নান সৈয়দ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং অন্যান্যেরা।

'স্বাক্ষর'-এর মতো আটপৌরে হলেও 'স্বাক্ষর'-এরই মতো লক্ষ্যভেদী ছিল এই পত্রিকাটি। আমাদের সাহিত্যে একটা নতুন গদ্য উপহার দিয়েছিল সাম্প্রতিক, স্বাদে চরিত্রে সে-গদ্য একেবারেই আলাদা। 'যেহেতু কোনো একটি সত্যকে আমরা বলের মতো বা স্তনের মতো হাতের মুঠোয় পেড়ে ফেলতে পারব না..'—চমকে উঠতে হল। কী শরীরী উষ্ণতায় ভরা এই গদ্য ! কী সজীব আর রোমশ !

এই গদ্য আবদুল মান্নান সৈয়দের গদ্য। তখন ও লিখত 'অশোক সৈয়দ' নামে।

প্রথম পড়ার সময় এই গদ্যের প্রতিটা শব্দ প্রতিটা রূপকল্প আমার রক্তকে চঞ্চল আর উত্তপ্ত করে তুলেছিল।

ইলিয়াসের গদ্যও প্রথম থেকেই কবিতাপ্রাণিত, সৌকর্যময় এবং সূক্ষ্ম। কিন্তু ওর আত্মোপলব্ধি এবং জীবনবোধের মতো ওর গদ্যের পরিণতিও ঘটেছিল ধীরে ধীরে, জীবনের দীর্ঘ সময় নিয়ে। ওর 'খোয়াবনামা'র গদ্যের সঙ্গে 'সাম্প্রতিক'–এর গদ্যের ফারাক অনেক। তাই ওর সাম্প্রতিকের গদ্য অতটা আলাদা হয়ে চোখে পড়েনি। কিন্তু মান্নান শুরু করেছিল গদ্যের পাকা হাত নিয়ে।

প্রথম সংখ্যার পর বেশ কয়েক বছর ধরে বেরিয়েছে 'সাম্প্রতিক', প্রথমে আমিনুল ইসলাম বেদুর সম্পাদনায় ও পরে সিকদার আমিনুল হক ও আমিনুল ইসলাম বেদুর সম্পাদনায়। কিন্তু প্রথম সংখ্যাটি যেভাবে নিখাদ সাহিত্যনিষ্ঠা আর তারুণ্যযাত্রার তীব্র অঙ্গীকারে জ্বলে উঠেছিল, এমনটি পরে আর হয়নি। এরপর এ বেঁচেছিল নেহাতই ভিন্ন এক চরিত্র নিয়ে, একেবারেই আটপৌরে চেহারায়, সাহিত্য–আন্দোলনের সঙ্গে তার সম্পর্ক সুদূর।

'সাম্প্রতিক' বেরোতে–না–বেরোতেই ফারুক আলমগীরের সম্পাদনায় জ্বলে উঠল আর–এক প্রদীপ : নাম 'প্রতিধ্বনি'। অন্যদের মতোই আটপৌরে চেহারা, নিরাভরণ, তবু ভেতরে বয়ে বেড়াচ্ছে এক জ্বলিত ইস্পাত। 'স্বাক্ষর' আর 'সাম্প্রতিক'–এর লেখকরাই উপস্থিত এখানে, কিন্তু তবু কী যেন এক নতুন উদ্দীপনার হাওয়া এর সমস্ত অবয়বে। না, 'স্বাক্ষর' বা 'সাম্প্রতিক'–এর মতো আলাদা কোনো ধারা উপহার দিতে পারেনি 'প্রতিধ্বনি', কিন্তু তুলে ধরেছিল একমুষ্টি গনগন করা জীবন, আজ এই বয়সী শীতের ঠাণ্ডা ঘরেও তার আঁচ কাঁধে এসে হাত রাখে।

এদিকে দেখতে দেখতে বেরিয়ে গেছে 'স্বাক্ষর'–এর দুটি সংখ্যা। তৃতীয় সংখ্যার প্রকাশের আগের রাতটার কথা আজও মনে পড়ে। 'স্বাক্ষর'–এর একরঙা সবুজ আর্ট কার্ডের কাভারের ওপর একটা ছবিওয়ালা কাগজ আঠা দিয়ে সাঁটতে হবে। রাত নটা–দশটা বাজতেই সবাই এসে উপস্থিত হল আমাদের পি ৪৮ পুরোনো পল্টনের সেই বাসায়। তারপর চলল হৈচৈ করে কাগজ সাঁটার অবিস্মরণীয় রাতভর উন্মাদনা। কেবলমাত্র বাইন্ডারের কটা পয়সা বাঁচানোর জন্য, পরের দিন সময়মতো স্টলের পাঠকদের হাতে পত্রিকা ধরানোর জন্যে এই হুড়োহুড়ি, আর কষ্ট। কনকনে শীতের রাত। হাতপা ঠাণ্ডায় জমে যেতে চায়। কিন্তু কে তার তোয়াক্কা করে। জীবন যখন গনগন করে জ্বলছে, তখন এইসবকে কেয়ার করার সময় কোথায় ?

রাত চারটার দিকে কাজ শেষ হলে আমরা দলবেঁধে, হৈ হৈ করে চারপাশকে সচকিত করতে করতে, হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনের পেছনে, বসলাম রাস্তার ধারের ছোট খুপরির মতো ঝুলকালিমাখা একটা চায়ের দোকানে। যাবার পথে গুলিস্তান আর নাজ সিনেমাহলের দেয়ালে সাঁটানো ইংরেজি ছবির নায়িকার অর্ধনগ্ন ছবি চোখে পড়তেই কয়েকজন দল ভেঙে হৈ হৈ করে ছুটে গেল সেদিকে। তাদের একজন ছবিটার ওপর নিজেকে সটান ছড়িয়ে দিয়ে

নায়িকাকে প্রাণভরে চুমু খেয়ে নিল কিছুক্ষণ। তারপর দৌড়ে এসে যোগ দিল আবার আমাদের সঙ্গে। আজ সেই তরুণ একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তার নাম যদি আজ প্রকাশ করে দেওয়া যায় তবে কী ভংয়কর কাণ্ডটাই না হয়।

দোকান থেকে চা খেয়ে আমরা ফিরে এলাম আবার আমার ঘরে। ঘরে একটা মাত্র সিঙ্গল খাট। অথচ মানুষ সাত–আট জন। সবাই তাড়াহুড়ো করে একসময় ঠাণ্ডা কনকনে মেঝের উপর খবরের কাগজ বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর একটানা বেঘোরে ঘুম। যখন ঘুম ভাঙল, সকাল তখন দশ–এগারোটার কম নয়।

আর–একটা সংকলনের কথা এখানে না বলে পারছি না। ঠিক আমাদের দলকে নয়, কিন্তু ষাট দশকী সাহিত্যের নতুন পদপাতকে বোঝার জন্য তা জরুরি। সংকলনটি বেরিয়েছিল আমার সম্পাদনায়। নাম 'সাম্প্রতিক ধারার গল্প'।* ১৯৬২–৬৪ সালের মধ্যেই অন্তত আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে আমাদের ছোটগল্পের ক্ষেত্রে একটি শিল্প–সচেতন ও নিরীক্ষণশীল নতুন ধারা জন্ম নিয়ে ইতিমধ্যেই অস্ফুট পায়ে এগিয়ে এসেছে, স্বাদে ও চরিত্রে যা চল্লিশ বা পঞ্চাশ দশকের গল্প থেকে আলাদা। ঐ সংকলনে আমি এই ধারাটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। সংকলনটিতে যাদের গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল গল্পের নাম সহ তাদের নাম নিচে উল্লেখ করছি :

সৈয়দ শামসুল হক (রক্তগোলাপ); হাসান আজিজুল হক (বৃত্তায়ন); শওকত আলী (চৈত্রমেঘ); মনিরুজ্জামান (চানচুরা); জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (কেষ্টযাত্রা); হুমায়ুন চৌধুরী (গ্রহণের রাত); আবদুল মান্নান সৈয়দ (মাতৃহননের নান্দীপাঠ); আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (স্বাগত মৃত্যুর পটভূমি); শহীদুর রহমান (বিড়াল)।

---

* 'সাম্প্রতিক ধারার প্রবন্ধ' সম্বন্ধে কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি বলার লোভ সামলাতে পারছি না। বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সিটি লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী শামসুদ্দীন আহমেদ। আমার লেখা একটি ইংরেজি পাঠ্য বই প্রকাশ করেছিলেন তিনি, সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ভদ্রলোক ছিলেন ধবধবে ফরসা, গাট্টাগোট্টা বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ। তাঁর চেহারা ছিল মহামতী লেনিনের মতো। লেনিনের সঙ্গে তাঁর এই মিল এমন পরিপূর্ণ যে তাকে দেখে মানুষের অবয়বের সমিলতায় আমি অবাক হতাম। খুবই প্রাণবন্ত, রসিক আর দিলদরিয়া মানুষ ছিলেন তিনি। আমাদের ফিরে ফিরে সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে উৎসাহ দিতেন। বলতেন, 'বুঝলেন সাহেব, সুন্দরী দেখে বিয়ে করবেন। সুন্দরী বউ ঘরে থাকলে অসুখ হয় না।' কথাটা বলার সময় তাঁর চোখ আনন্দে ও দুষ্টু হাসিতে জ্বলজ্বল করে উঠত। কথাগুলো আমাদের তরুণ রসনায় খুবই সুখপ্রদ লাগত। ভদ্রলোক এমনভাবে কথাগুলো বলতেন যেন গভীর উপভোগ আর পরিতৃপ্তির শিখর থেকে কথাগুলো বলছেন। তাঁর স্ত্রীকে কখনো দেখিনি। হয়তো তিনি সুন্দরী ছিলেন, সেই সৌন্দর্যসঙ্গের অনির্বচনীয় কুহকের কথা তিনি আমাদের শোনাতে চাইতেন। অথবা হয়তো ছিলেন না। নিজের সৌন্দর্যলিপ্সু মনের বিষণ্ন দীর্ঘশ্বাস থেকে তাঁর জীবনের মতো অনভিপ্রেত পরিণতি থেকে অন্যদের দূরে রাখতে চেষ্টা করতেন? কে বলতে পারে?

'সাম্প্রতিক ধারার গল্প' সম্বন্ধে মান্নান লিখেছিল :

> 'সাম্প্রতিক ধারার গল্প'ই আমাদের প্রথম গল্প-সংকলন যা ষাটের দশকের নবজাগ্রত গল্পকারদের পরিচিহ্নগুলো ধারণ করেছে।... এই ধারাটিকে অসাধারণভাবে শনাক্ত করেছিল এই সংকলন।

প্রদীপের পর প্রদীপ জ্বলে উঠতে লাগল। হয়তো কিছুটা অবিন্যস্তভাবে, বিক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ায়। তবু স্পষ্ট হয়ে উঠল : আমাদের যাত্রা চলতে শুরু করেছে। এখন শুধু এগিয়ে যাওয়া, শুধু দিগন্ত আক্রমণ। একটা ব্যাপারে শুধু কিছুটা হতাশা : টিকছে না কেউই। যেন ক্ষণিকের অতিথি সবাই। মুহূর্তের জন্য আকাশ ঝিকিয়ে আবার হারিয়ে-যাওয়া পাখি। 'প্রতিধ্বনি' ঝরে গেল দুটি সংখ্যা বেরিয়েই। 'সাম্প্রতিক' টিকে রইল, কিন্তু হারিয়ে গেল তার আন্দোলনের দীপ্তি। 'স্বাক্ষর'ও থেমে এল কয়েকটি সংখ্যা বেরোতে-না-বেরোতেই। সূচনা হল উজ্জ্বল, কিন্তু দূরদ্বীপবাসিনীর সঙ্গে যে-দুস্তর সমুদ্রের ব্যবধান এখনও। এখন চাই দীর্ঘ পথপরিক্রমী পত্রিকা। সবকিছুকে, সব প্রবণতাকে ধারণ করে, সবাইকে সেই দূরদেশে পৌঁছে দেবার মতো মুখপত্র। চাই সেই সাম্পান, সেই ভালোবাসার সাম্পান। ভালোবাসা না হলে মৃত্যু আর রক্তসঙ্কুলতার পথে কী করে বাঁচব আমরা?

চতুর্থ খণ্ড

যাত্রা শুরু

১

রাত গভীর হয়ে গিয়েছিল, প্রশান্ত বসতে চাইল না। দলবল নিয়ে ও অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যেতেই নতুন দায়িত্বের কথা ভেবে গা ছমছম করে উঠল। 'কণ্ঠস্বর'-এর দায়িত্ব নিতে হবেই তা হলে? কীভাবে পারব সব। কে জানে কতদিন, কত মাস-বছর একে বয়ে বেড়াতে হবে। ভাবতে গিয়েও আমার হাত-পা সিঁটিয়ে এল। কেন তখন এত সংশয় জেগেছিল, একটা গল্প বললে তা বুঝতে সুবিধা হবে। ঐ সময় থেকে মাত্র নয় বছর আগের ব্যাপার সেটা। ম্যাট্রিক পাস করে তখন সবে কলেজের প্রথম বছরে ভর্তি হয়েছি। আব্বার এক বন্ধুর বাড়িতে থাকতে হয়েছিল মাসখানেকের জন্যে। বাড়িটা থেকে কলেজ পৌনে এক মাইলের মতো দূরে। একটা ছায়াঢাকা সরু মেঠো পথ হেঁটে যেতে হত কলেজে। রাস্তাটা ধরে কিছুদূর এগোলে হাত-পনেরো জায়গা আধ-হাত পানির নিচে তলানো। ঐ পানির ধারে এসে আমি খুবই অসহায় হয়ে পড়তাম। একা একা দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করতাম। কীভাবে এই অন্তহীন পানি পার হব কিছুতেই ভেবে পেতাম না। জায়গাটুকুকে আমার মহাসমুদ্রের মতো মনে হত। সেদিনের সেই আমাকে আজ নিতে হবে এই অসম্ভব দায়িত্ব! মাত্র ক'টা বছরের ব্যবধানেই? সেই দিনটার অনুভূতি নির্মলেন্দু গুণের একটা কবিতার কিছু কথার সঙ্গে মিলে যায়:

অপরের ঘরে এ-জীবন কাটে যার
তুমি তুলে দিলে তার হাতে এই
তিন ভুবনের ভার!

কীভাবে এই ভার বইব আমি? এই দুর্বহ পথে কারাই বা হবে সঙ্গী? কারা দেবে সহযোগিতা? আগেই বলেছি প্রথমে 'কণ্ঠস্বর'কে ভাবা হয়েছিল কবিতা-পত্রিকার নাম হিশেবে। কিন্তু 'স্বাক্ষর' নামটা কবিতা-পত্রিকার নাম হিসেবে অনেকের পছন্দ

হয়ে যাওয়ায় ঠিক করা হয় সবরকম লেখা নিয়ে যে-পত্রিকাটা বেরোবে তার নাম হবে 'কণ্ঠস্বর'।

আমি চেয়েছিলাম একজন নয়, সবাই আলাদাভাবে বের করুক আলাদা আলাদা পত্রিকা। সবাই একসঙ্গে হাত লাগাক, সমবেতভাবে দলের প্রতিনিধিত্ব করুক। তাতে দলই মুখ্য হয়ে উঠবে, ব্যক্তি নয়। আন্দোলনটা ব্যাপকতা পাবে। এজন্যে অমন অস্বস্তভাবে রাত জেগে অতগুলো আলাদা আলাদা পত্রিকার নাম খুঁজে বের করেছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল পেছনে থেকে সবার এই মিলিত চেষ্টাকে যতটা পারি সাহায্য করে যাব। এই ভাবনার পথেই এগিয়ে চলছিল সবকিছু। কিন্তু একসময় সব কেমন যেন থিতিয়ে আসতে লাগল। দলের ভেতর দেখা দিল নিষ্ক্রিয়তার অবসাদ। 'কণ্ঠস্বর' বের করার অমোঘ ও অনিবার্য সময়টি এসে দাঁড়াল । সে-দায়িত্ব নিয়তির মতো স্থির।

২

'কণ্ঠস্বর' বের করার ব্যাপারটা তো ঠিক হলো । কিন্তু কে হবে এই পত্রিকার প্রকাশক? তখন পুরোপুরি আইয়ুবি যুগ। মার্শাল ল উঠলেও আইয়ুবি নিষ্পেষণ তখনও জাতির বুকের ওপর পাথরের মতো চেপে আছে। জনগণের স্বাধীনসত্তা কিছুতেই যেন জেগে উঠতে না পারে সেজন্যে হুঁশিয়ারির শেষ নেই। নতুন পত্রিকার ডিক্লারেশন প্রায় বন্ধ। আমরা চেষ্টাও করেছিলাম একবার ডিক্লারেশনের জন্য, কিন্তু পারিনি। তাহলে কাকে করা যায় প্রকাশক? কে প্রকাশক হিসেবে আবেদন করলে সরকারের কোনো আপত্তি থাকবে না। তাছাড়া কারো নামে কেবল ডিক্লারেশন নিলেই তো হবে না। তাঁকে তো হতে হবে আমাদেরই একজন! আমাদের সুখ-দুঃখের, বিপদ-আপদের সমব্যথী দোসর। কে পারবে আমাদের এসব দুরপনেয় স্বেচ্ছাচার আর পাগলামিকে হাসিমুখে সহ্য করতে। নিজেদের ভেতর এমন নিঃস্বার্থ, নির্ভরশীল আর ক্ষমতাশালী মানুষ কে আছে?

হঠাৎ করেই একদিন তাঁকে পেয়ে গেলাম। খালেদা আপা(খালেদা হাবীব)। হ্যাঁ, খালেদা আপাই হতে পারেন সেই মানুষটি। সেই সময় সারাদেশে সবার পরিচিত লেখক ও শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর মেয়ে তিনি, নিজেও সরকারের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি (এখনকার উপমন্ত্রীর মর্যাদার)। কাজেই প্রভাব, পরিচিতি বা পদমর্যাদা সব দিক থেকেই তাঁর ভিত পাকা। তিনি প্রকাশক হিসেবে আবেদন করলে ডিক্লারেশন তো পাওয়া যাবেই, এমনকি এর জন্য পুলিশি তদন্ত, আর্থিক সচ্ছলতার দলিলপত্র এসব নিয়েও হয়তো ঝামেলা পোহাতে হবে না। মানুষ হিসেবেও তিনি আমাদের খুবই কাছের, আমার বড়বোনের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী; তাঁর আব্বা আর আমার আব্বাও বহুদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাছাড়া দেখতে তিনি যেমন

সুন্দরী, মনটাও তেমনি তাঁর সহজ আর সরলতায় ভরা। ছেলেবেলা থেকে সবসময় স্নেহ–মমতা পেয়ে এসেছি তাঁর কাছ থেকে।

ছুটলাম খালেদা আপার কাছে। যা ভেবেছিলাম তাই হল। তিনি রাজি হয়ে গেলেন। বললেন : 'তোমরা এত কষ্ট করতে পারবে আর আমি তোমাদের জন্যে এই সামান্য কাজটুকু করতে পারব না !

খালেদা আপা ডিক্লারেশনের জন্য দরখাস্ত করায় কাজ হল ভেলকিবাজির মতো। মাত্র সাতদিনের মাথায় ডিক্লারেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে গেল। সেই থেকে 'কণ্ঠস্বর'–এর সবরকম সুখে–দুঃখে খালেদা আপা ছিলেন আমাদের পাশে। অনেকবার অনেক সমস্যা আর অসুবিধা এসেছে আমাদের, অনেকবারই তাঁকে অনেক বিপদ আর দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলেছি ,আমাদের চিরস্থায়ী দুর্নামের ভাগী হয়ে প্রতিনিয়ত মানুষের কাছে ধিক্কার শুনতে হয়েছে তাঁকে,কিন্তু মুখে হাসি নিয়ে তিনি এসব সহ্য করেছেন।

আমি জানিনা এতখানি সমর্থন আর স্বাধীনতা আর কারো কাছ থেকে পেতাম কি না।

১৯৬৫–এর শেষদিকে শুরু হল দীর্ঘযাত্রার প্রস্তুতি। লেখা নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার কিছু ছিল না। ও আমাদের ঢের আছে। এর পরিমাণ এতই যে অন্যেরা চাইলে আমরা হয়তো তাদের বরং কিছু দিয়েও দিতে পারি। তারুণ্যের এতবড় একটা সমারোহ যেখানে যূথবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে সেখানে লেখা নিয়ে চিন্তা থাকার কারণ নেই।*

'কণ্ঠস্বর'–এর প্রথম সংখ্যার লেখাও এসে গেল প্রায় চাওয়ার আগেই। পত্রিকা নিয়ে হৈ–চৈ শুরু হতেই একটা তেজি ভাব এসে গিয়েছিল সবার ভেতরে, স্বতঃস্ফূর্ত হাতে লেখা দিয়ে দিল সবাই। দেখতে দেখতে গল্প এল দুটো, কবিতা চারটি, অনুবাদ–কবিতা তিনটি, বই–সমালোচনা একটি এবং ছোট আকারের নিবন্ধ একটি। না, সংখ্যার দিক থেকে এমন কিছু নয়; একালের নবীন পত্রিকার যে–কোনো সম্পাদকই হয়তো এই সংখ্যা দেখে মুখ টিপে হাসবে, কিন্তু ডাবল ক্রাউন সাইজের যে–পত্রিকার পৃষ্ঠাই সাকুল্যে ৪০,

---

* তরুণদের বের করা ছোট পত্রিকাগুলোর অবস্থা আদৌ কিন্তু এরকম নয়। বরং এর উল্টো। এই পত্রিকাগুলোকে অধিকাংশ সময় যা নিয়ে সবচেয়ে বেশি ঝক্কি পোহাতে হয় তা হল 'লেখা'—'ভালো লেখা'। চেয়েচিন্তে পত্রিকা বের করার মতো টাকার সংস্থানও হয়তো একসময় হয়ে যায়, বিজ্ঞাপনও হয়তো কিছু জোটে, প্রুফ দেখে প্রেসের পাওনা মিটিয়ে একটা পত্রিকা বের করার ব্যবস্থাও হয়তো হয়, কিন্তু একটা পত্রিকার যা মূল প্রাণসম্পদ, যা না হলে আর সবকিছুই ব্যর্থ, সব আয়োজনই নিষ্ফল—সেই ভালো লেখাই কেবল জোগাড় করে ওঠা যায় না। তখন এই ঘাটতি মেটাতে লেখার জন্যে দলের বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে অন্য লেখকদের কাছে লেখা চেয়ে বেড়াতে হয়, নয়তো নামকরা লেখকদের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়ে তারুণ্য আর প্রাণশক্তিকে ক্ষয় করতে হয়। এতে–যে শেষঅব্দি খুব–একটা লাভ হয় তা–ও নয়। এতে না গড়ে ওঠে পত্রিকার কোনো নিজস্ব চরিত্র, না থাকে নিজের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক স্বতন্ত্র কোনো ভঙ্গি। বুড়োতে গুঁড়োতে আদাতে কাঁচকলাতে জড়িয়ে গোটা উদ্যমটাই মাটি হয়ে যায়।

এর চেয়ে বেশি লেখা দিয়ে সে করবে কী?

যা হোক, সব লেখাই মিলল, কিন্তু আসল গোল বাধাল পত্রিকার মূল প্রবন্ধ। এটা লিখবে কে? আমাদের মধ্যে এরজন্য একমাত্র যোগ্য লেখক মান্নান, এরই মধ্যে গোটাকয় প্রবন্ধ লিখে সে-যোগ্যতাও প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে ও। কিন্তু ও তো গল্প দিয়ে বসে আছে। তা হলে কে লেখে? একবার নিজের কথা মনে হল। সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। একবার মনে হল সাহিত্যের ওপর পড়াশোনা করতে গিয়ে এর নানা বিষয় নিয়ে মনের মধ্যে অনেক কথা জমাও তো হয়ে আছে। সেসব নিয়েও তো একটা কিছু লেখা যেতে পারে!

ভাবনার সুতো ধরে মনটা চলে গেল পাঁচ বছর আগে। ১৯৬০ সালের কথা সেটা। আমাদের এনাম ভাই, ড.এনামুল হক, যাঁর হাতে পরবর্তীকালে ঢাকা জাদুঘর নির্মিত হয়েছিল, 'উত্তরণ' নামে ঐ সময় একটা উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকা বের করেছিলেন। রুচিতে, পারিপাট্যে, লেখার সম্পন্নতায় পত্রিকাটি 'সমকাল'-এর প্রায় কাঁধ-ছোঁয়াই হয়ে উঠেছিল কিছুদিনের জন্যে। ঐ পত্রিকার জন্য আমাকে একটি প্রবন্ধ লেখার ফরমাশ দিয়েছিলেন তিনি। আমি তখন অনার্সের তৃতীয় বর্ষে পড়ি। সাহিত্যের ওপর নতুন আলো ফেলার বয়স আমার নয়, তবু আদাজল খেয়ে একটি লেখা তৈরি করেছিলাম। নাম 'আধুনিক কবিতায় ইঙ্গিত'। লেখাটি তাঁর পছন্দ হয়েছিল। উনি লেখাটিকে উত্তরণের তৃতীয় সংখ্যার মূল প্রবন্ধ হিসেবে ছেপেছিলেন।

আর ভাবলাম না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা বিষয় ভেবে বসে গেলাম কাগজ কলম নিয়ে। দুদিনের মধ্যে লেখা হয়ে গেল : 'দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ'।

৩

লেখা জোগাড় করতে করতে প্রেসও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। পুরোনো ঢাকার ৪৯ বীরেন বোস স্ট্রিটের ইস্ট বেঙ্গল বিউটি প্রেস। নামে ইস্ট বেঙ্গলের বিউটি, কিন্তু এই বিউটি যে বাংলাদেশের কোথায় তা খুঁজে বের করতে লিভিংস্টোনের মতো দিগ্বিজয়ী অভিযাত্রী দরকার। মৌলবীবাজার বা চকবাজারের দুর্গমতম এলাকার জটিল এক গলির ভেতরকার সবচেয়ে প্যাঁচালো জায়গার প্রেস এটি। এমন ঘোরালো যে এতবার সেই প্রেসে এসেছি গেছি তবু কোন্ এলাকার কোথায় সেই প্রেস তার কোনোকিছুই আজ আর মনে করতে পারি না। প্রেসের ভেতরটাও ছোট ছোট আঁকাবাঁকা গলিতে-সিঁড়িতে জট পাকানো। ঐ প্রেস সম্বন্ধে মান্নান লিখেছে :

> দোতলায় কম্পোজ সেকশন। সরু, দিনের বেলায় অন্ধকার, ভাঙা, পতনোন্মুখ এক সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে হয়। তখন কি জানতাম আমার চিরকালের সাহিত্যযাত্রা এমনি এক সিঁড়ি দিয়ে?

কিন্তু প্রেস যতই ঘোরালো-প্যাঁচালো হোক তার পাইকা টাইপগুলো কিন্তু একেবারে তাজা আর আনকোরা। তরুণ তুর্কিদের মতো জেল্লা তাদের শরীরে। টাইপগুলো তোলার পর সবে একটি কি দুটি বই বেরিয়েছে। (এই অবস্থাতেই হ্যান্ড কম্পোজ প্রেসের টাইপ সবচেয়ে ঝকঝকে ছাপা দেয়।) সেই জেল্লা নিয়ে বের হবে 'কণ্ঠস্বর', কথাটা ভাবতেই মনটা খুশিতে ভরে গেল। একটি সুমুদ্রিত পরিচ্ছন্ন পত্রিকার চেহারা চোখের সামনে ভাসতে লাগল। প্রেসের ব্যাপারে আর-একটা সুখবর হল এর ম্যানেজার রফিক না কার যেন আত্মীয়। মানে টাকাপয়সার টানাটানি পড়লে অল্পস্বল্প বাকি ফেলা বা দেনদরবারের অবকাশ আছে। কাগজ আটক করে রাস্তা দেখিয়ে দেবে না, যেমন দিয়েছিল 'সমকাল মুদ্রায়ণ' আমাদের 'সাম্প্রতিক'-এর সম্পাদকদের। আমাদের মতো চালচুলোহীনদের এসব না-ভেবে চট করে কোনো প্রেসে পত্রিকা ছাপতে যাওয়া ঠিক নয়। তাতে অনেক সময় ভাতে পানিতে মরার অবস্থা হতে পারে।

পত্রিকার প্রকাশনা-মানের ব্যাপারে আমি সবসময়ই খুঁতখুঁতে। আমার সাধ্যের মধ্যে পত্রিকার প্রকাশনা-সৌকর্যকে যতখানি উন্নত, বিশুদ্ধ, নিখাদ ও রুচিসম্মত করে তোলা সম্ভব তার চেয়ে এতটুকু নিচে নামতে আমি রাজি নই। আগেই বলেছি সে-সময় পর্যন্ত লাইনো টাইপই ছিল বাংলা প্রকাশনার সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন ও রুচিস্নিগ্ধ টাইপ। আমার চিরকাল ইচ্ছা ছিল 'কণ্ঠস্বর'কে আগাগোড়া লাইনো টাইপে বের করব। কিন্তু শেষের দিকের কয়েকটি সংখ্যা ছাড়া সেটা কিছুতেই পেরে উঠিনি। কিন্তু পত্রিকার কাগজের ব্যাপারে রুচির সেই আপোষ আমি করিনি। আমার সবচেয়ে প্রিয় কাগজ ছিল এ্যান্টিক। এই কাগজের বিবর্ণ ধূসরতা আমার মনে একটা আভিজাত্যমদির অতীতদিনের স্মৃতি জাগিয়ে তুলত। ('ধূসর পাণ্ডুলিপি' নামটা রাখার সময় জীবনানন্দ দাশের মনে কোনোভাবে কি এই এ্যান্টিক কাগজের স্মৃতি জেগেছিল?) হুমায়ুন কবীরের 'চতুরঙ্গ' বের হত এ্যান্টিকে। কিন্তু এ্যান্টিক সেকালে ঢাকায় পাওয়া যেত না। তাই দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে আমি চুয়াল্লিশ পাউন্ডের কার্ট্রিজ কাগজ ব্যবহার করেছি। কার্ট্রিজ ভারী, ধারালো আর মজবুত ধরনের কাগজ। একেকটা পৃষ্ঠাকে একেকটা বড় আকারের কার্ডের মতো লাগে। পৃষ্ঠাগুলোর এই বলিষ্ঠ আর সমর্থ চেহারা আমার ভালো লাগত। একে আমাদের উদ্যোগের শক্তিমত্তা আর বলিষ্ঠতার প্রতীক বলে মনে হত। কাগজের ব্যাপারে আমার এই নিরাপোষ মনোভাব 'কণ্ঠস্বর'-এর শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

ছাপার কাজ ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে চলল। সভ্যজগতের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, পুরোনো ঢাকার সেই দুর্গম প্রেসে নিয়মিত যাতায়াতে, কাগজ কেনায়, প্রুফ দেখায় আর প্রিন্ট অর্ডার দেবার স্বপ্নে আর উত্তেজনায় স্বস্তিহীন হয়ে রইল পত্রিকা প্রকাশের আসন্ন দিনগুলো। প্রথম সংখ্যার প্রেসের কাজটি সামলিয়েছিলাম আমরা তিনজন--আমি, মান্নান আর রফিক। সে-সময় আমার নিজের সাইকেলটি পত্রিকা বের করার কাজে হয়ে উঠেছিল আমার সার্বক্ষণিক নির্ভর। মান্নানেরও একটা সাইকেল

ছিল এই সময়। এই দুই সাইকেলে করে আমরা প্রেসের দুর্গম পথকে সুগম করে চললাম। রফিক যেত আমার বা মান্নানের সাইকেলের সামনে বসে।

সেই উৎসাহমদির দিনগুলোকে আজও আমি আমার চোখের সামনে দেখতে পাই। উত্তাল বাতাসে মেলে-দেওয়া কাপড়ের মতো তখন আকাশজুড়ে উড়ে চলেছে আমাদের যৌবন, নেশায় ধরা রঙিন বেলুনের মতো আমরা কেবলই ঘুরে ঘুরে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছি।

ইস্ট বেঙ্গল বিউটি প্রেসে এক অসামান্য প্রাপ্তি ঘটেছিল আমাদের। আমি, প্রথম প্রেমের মতোই, জীবনের প্রথম পত্রিকা বের করার অনির্বচনীয় আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলাম। রফিকের কাছ থেকে প্রুফ-দেখার খুঁটিনাটি আয়ত্ত করে দক্ষ প্রুফ-রিডারে পরিণত হয়েছিল মান্নান, রফিকের হাত থেকে প্রিন্ট অর্ডার নিয়ে 'কণ্ঠস্বর' একসময় প্রকাশের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। কী ফুরফুরে আর তারুণ্যমদির জীবন তখন আমাদের!

৪

'জীবনের পিছে মরণ ছুটিছে, আশার পিছনে ভয়'। সব খুশি আর উৎসবমত্ততা ছাপিয়ে আমার মাথার ওপর, ডেমক্লিসের তরবারির মতো, দিনরাত কিন্তু ভারী হয়ে ঝুলে আছে এক অমোঘ দুর্দৈব : আর্থিক অনিশ্চয়তা। কাগজ প্রতি রিম আটত্রিশ টাকা, প্রতি ফর্মার (সাড়ে বারো-শ কপির) ছাপার খরচও তাই। তাছাড়া আছে আর্টকার্ডের কাভার আর তার ছাপা—সেইসাথে পত্রিকার বাঁধাই খরচ—সব মিলে পাঁচ ফর্মার সাড়ে বারো-শ পত্রিকা বের করার ব্যয় সাত-শ টাকার নিচে নয়। কিন্তু কোথায় টাকা? আমি সরকারি কলেজের প্রভাষক, আমার বেতন ততদিনে হয়েছে তিন-শ কুড়ি টাকা। কিছুকাল আগে বিয়ে করায় বিবাহ ভাতা সহ হয়েছে তিন-শ আটত্রিশ। কিন্তু প্রতিটি সংখ্যার জন্য দরকার তো এমনি দুই মাসের বেতন। তাও যদি ঘরবাড়ি ফেলে অনাহারী সন্ন্যাসী হয়ে থাকা যায় তবেই। পত্রিকার আর্থিক সমস্যা সমাধান করা তাই আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। সব অলংঘ্য, তবু অন্ধের মতো এ-কাজে এগিয়ে যাচ্ছি। কোনো কারণ নেই তবু মনে হচ্ছে, পারব। কাগজ বেরোবেই। এ না হয়ে পারে না। কোনোদিক থেকে এমন অভাবনীয় কিছু ঘটে যাবেই যার ফলে সব সম্ভব হবে। এই হল যৌবন। সে এমনি জন্মান্ধ। অন্ধ স্যামসনের মতো শক্তিমান। সে চোখে দেখতে পায় না বলে অবলীলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমুদ্র পার হয়, পর্বত লংঘন করে।

বিজ্ঞাপনের কথা আগেই বলেছি। সেটা ঘনঘোর পাকিস্তানি যুগ। ব্যবসা-বাণিজ্য, কোম্পানি-কারখানা সব অবাঙালিদের হাতে। তারা বিজ্ঞাপন দিত মূলত

ইংরেজি পত্রিকায়। এখানকার বাংলা দৈনিকগুলোই যেখানে সেসব বিজ্ঞাপনের দিকে পিপাসার্ত কাকের মতো তাকিয়ে থাকে, সেখানে আমাদের মতো অনিয়মিত অপরিচিত বাংলাভাষার একটি সাহিত্য সংকলন কী করে বিজ্ঞাপন পাবে?

তবে হ্যাঁ, আছে একটা বিজ্ঞাপন। বাঙালি সংস্কৃতির তরুণ উদ্যোক্তাদের যে-কোনো উৎসাহকে বরাভয় দেবার জন্যে উদার হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তার দুয়ার থেকে কাউকে খালিহাতে ফিরে আসতে হয় না। সে হল সাধনা ঔষধালয়। ওখানে যাওয়ামাত্র অধ্যক্ষ যোগেশবাবুর যৌবনকালের ছবিওয়ালা অতিপুরোনো রুচির একটি পূর্ণপৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনের কালচিটে-পড়া নোংরা ব্লক হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। রেট : তিরিশ টাকা। এ রেট অনন্তকালের জন্য নির্ধারিত। কোনোভাবে এর নড়নচড়ন নেই। গ্যাণ্ডারিয়ার সেই ঔষধালয়ের বিরাট কারখানা-বাড়িটি সারাক্ষণ এ্যালকোহলের উপচানো মোদো গন্ধে ভুরভুর করছে। সেই তীব্র অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করে বিজ্ঞাপন এনে পত্রিকায় ছাপিয়ে সময়মতো পৌঁছোতে পারলে প্রাপ্তি হাতেনাতেই, কিন্তু পরম উৎসাহে বিজ্ঞাপনটি ছাপার পর ওটি ছাপার যাবতীয় খরচ হিসাব করে গভীর হতাশার সঙ্গে টের পেতাম ঐ তিরিশ টাকা থেকে একটি টাকাও আমাদের লাভ হয়নি। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনটি মোটামুটি অকারণেই আমরা ছাপছি। তবু ঐ বিজ্ঞাপন আমাদের ছাপতে হত। সুপরিচিত বিজ্ঞাপনদাতারা আমাদের পত্রিকাকে-যে বিজ্ঞাপন দেবার যোগ্য মনে করছেন সে-ব্যাপারে নতুন ও অনিশ্চিত বিজ্ঞাপনদাতাদের সংশয়মুক্ত করার জন্যেই তা করতে হত।

দু-তিন সংখ্যা পর পর আর-একটি বিজ্ঞাপন পাবার বিরল সম্ভাবনা ভাগ্যের আকাশে দুর্লভ বিদ্যুৎরেখার মতো ক্বচিৎ কদাচিৎ ঝলক দিয়ে উঠত। বিজ্ঞাপনটা বাংলা একাডেমীর। এই বিজ্ঞাপন দেবার একক ক্ষমতা ছিল প্রকাশনা কর্মকর্তা সৈয়দ ফজলে রাব্বির। ফজলে রাব্বি ছিলেন সামন্ত-পরিবারের দীর্ঘদেহী সুদর্শন মানুষ। পাশ থেকে দেখলে তাঁকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার মতো লাগত। বিজ্ঞাপনের কথা উঠলে সবসময় তিনি মুখে এমন একটি রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে আমাদের দিকে তাকাতেন যে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতাম না বিজ্ঞাপনটি তিনি দিতে চান কি চান না। কাজেই আমার চাকরি হত প্রতি সকালে ঘুম থেকে উঠে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো এবং একনাগাড়ে বিনোদনের বেহালা বাজিয়ে তাঁর মনোরঞ্জন করে চলা। 'কণ্ঠস্বর'-এ বাংলা একাডেমীর প্রতিটি বিজ্ঞাপনের পেছনে এমনি বহু ঘণ্টার প্রাণান্ত শ্রমের করুণ ইতিহাস লেখা রয়েছে।

আর-একজন ছিলেন, তাঁর নাম বলতে চাই না, তিনি ছিলেন একটি বীমা কোম্পানির জনসংযোগ কর্মকর্তা। শিশুদের জন্যে ছড়া লিখতেন তিনি। তাঁর কাছ থেকেও বারকয় বিজ্ঞাপন পেয়েছি। তাঁর বিজ্ঞাপন পাওয়ার ইতিহাস আরও করুণ। করুণাপ্রার্থীর মতো আমি তাঁর সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম, কিন্তু তিনি আমাকে দেখেও দেখতেন না, অন্যদের সঙ্গে কথা চালাতে থাকতেন। আমি তখন টেলিভিশনের মাধ্যমে মোটামুটি পরিচিত। জানি না তাই আমাকে তাঁর সামনে অমন

অসম্মানিত প্রার্থীর ভঙ্গিতে বসিয়ে রেখে তিনি আত্মতৃপ্তি অনুভব করতেন কিনা। সবার সঙ্গে কথা শেষ হলে বিরক্তির সঙ্গে জানতে চাইতেন আমি কেন এসেছি, যদিও তিনি বেশ ভালো করেই জানতেন আমি তাঁর সামনে এতক্ষণ বসে রয়েছি কেন। অপমানে যন্ত্রণায় আমার সমস্ত সত্তা কুঁকড়ে উঠত। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারতাম না। অপ্রীতিকর কোনোকিছু করাই আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পত্রিকার জন্যে বিজ্ঞাপন পাওয়া অসম্ভব জরুরি। ও না হলে পত্রিকা মরে যাবে। কাজেই ব্যক্তিগত অপমান যত অসহনীয়ই হোক আমাকে মুখ বুজে সব সহ্য করতে হত।

বিজ্ঞাপন আমাদের চাই-ই চাই। বিজ্ঞাপন মানেই টাকা যা না হলে পত্রিকা অচল। একটা লেখকগোষ্ঠী অনুপ্রেরণায় সংঘবদ্ধ হতে পারে, প্রতিভার দ্যুতিতে অসাধারণ লেখা উপহার দিতে পারে, গতরে খেটে প্রুফ-দেখা, সম্পাদনা, প্রচার, বন্টন যাবতীয় কাজ চালাতে পারে কিন্তু টাকার যোগাড় না হলে যে সবই অনর্থক। এইখানটায় এ-যুগের সাহিত্য অসহায়ভাবে বাণিজ্য আর বিজ্ঞাপনের হাতে জিম্মি। বিজ্ঞাপন বা টাকা এসব খুবই স্থূল জিনিশ কিন্তু ওইটুকু না হলে প্রতিভা, প্রেরণা, আন্দোলন, গোষ্ঠী সব মিথ্যা হয়ে যায়।

'কণ্ঠস্বর'-এর কাজে হাত দেবার পর প্রথমেই যে-ব্যাপারটা আমাকে স্বতঃসিদ্ধের মতো মেনে নিতে হয়েছিল তা হল এর আর্থিক দায়দায়িত্ব আমাকেই সামলাতে হবে। এর কারণ স্পষ্ট : দলের মধ্যে বয়সে আমি সবার চেয়ে বড় এবং একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সাত-শ টাকার মধ্যে নিজের গাঁট থেকে কিছু দিয়ে আর এর-ওর কাছ থেকে চেয়েচিন্তে শ-চারেক টাকার যোগাড় হয়েছে, বাকি তিন-শ টাকা বিজ্ঞাপন থেকে পেতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের কাজে হাত দিয়ে বুঝলাম : যে-'দীর্ঘায়ু পত্রিকার' স্বপ্ন দেখে মাঠে নেমেছিলাম সে-পত্রিকা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা লেখকেরা সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান নিয়ে বক্তৃতার খই ফোটাতে পারি কিন্তু দুটো সামান্য পয়সা কী করে পাওয়া যায় সে-বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারি না যা একটা সামান্য ঠিকাদার বা দোকানদাররাও অনায়াসে পারে। এ একটা সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ। বুঝে ফেললাম নিজের ট্যাঁকের পয়সা আর শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে ধার-করা রসদে হয়তো প্রথম সংখ্যাটা টেনেটুনে বের করতে পারব, কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যায় পৌঁছোতেই ফুরিয়ে আসবে পাথেয়। তখন ক্লান্ত শরীরে শ্রান্ত মনে হাল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

সব জানা। তবু পত্রিকার কাজ এগিয়ে চলে। রাতের প্রহর 'যন্ত্রের ঝংকৃত ছন্দে' এগোয়, মাতালের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে এগোয়; প্রুফ-দেখা, প্রিন্ট অর্ডার দেওয়া, কাগজ কেনা বা ছাপা-ফর্মার হাতে-পাওয়ার উত্তেজনার সঙ্গে , উদয়াস্ত ছোটাছুটি আর উদ্দীপনার সঙ্গে, দমকে দমকে এগোয়। পত্রিকার অগ্রগতি জোরালো হলে রক্তোচ্ছ্বাসের দুর্বার অসহ্য আনন্দ আর প্রমত্ততার সঙ্গে নেচে নেচে এগোয়।

৫

ওহ হো, একটা ব্যাপার যে ভুলেই গিয়েছি দেখি। কাভার! মনে ধরার মতো পত্রিকার একটা কাভার তো চাই বটেই? না, ভুলে যাইনি, কিন্তু অসুবিধা সেই একটাই : টাকা। এ আমাদের দলের মুখপত্র। এর প্রচ্ছদকে হতে হবে সেরা প্রচ্ছদ। 'সমকাল'-এর প্রচ্ছদ যেমন লাবণ্যে মনোহারিত্বে সবাইকে মোহিত করে বেরোয়, ঠিক তেমনি। এ-ব্যাপারে একমাত্র উদ্ধার শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। তিনিই পারেন তেমনি স্বপ্নের মতো কাভার এঁকে দিতে। ষাটের দশক থেকে আশির দশক—এই তিরিশটা বছর আমাদের প্রচ্ছদজগতের তিনিই তো একচ্ছত্র অধিপতি! আধুনিকতায়, মননশীলতায়, রুচির আভিজাত্যে বা সযত্ন পরিশীলনে তাঁর সমকক্ষ তো দূরের কথা, তাঁর কাছাকাছি কোনো প্রচ্ছদশিল্পীও ছিলেন না এই সময়ে। এই দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের বইয়ের জগৎকে মনোরম, অনিন্দ্য আর লোভনীয় করে রেখেছেন তিনি। তাঁর আঁকা সুন্দর আর অনবদ্য প্রচ্ছদওয়ালা একটি বই বের করতে পারলে যে-কোনো লেখকই তখন বর্তে যায়। কিন্তু কী করে তাঁর প্রচ্ছদ আমরা পাব? এজন্যে এক-শ টাকার যে একটি কড়কড়ে নোট নিয়ে তাঁর সামনে গলবস্ত্র হয়ে দাঁড়াতে হবে, তা আমাদের কোথায়? কাজেই নিজেই এঁকে নাও-না নিজের মুখচ্ছদ! সেরা শিল্পীর সম্মানী দেবার আর্থিক মুরোদ না-থাকলে করাটা কী? লেগে পড়তে হল প্রচ্ছদ নিয়ে। আমরা জানি, মেয়ে সুন্দরী হলে বরের অভাব নেই। বুঝি, আমাদের লেখা ভালো। ভালো প্রচ্ছদ না হলেও এ বিকোবে। তবু কোথায় যেন একটা অস্ফুট ব্যথা খচখচ করে বুকের ভেতর। এ ব্যথা অক্ষমতার, পরাজয়ের, দীনতার : এত জরুরি একটা সময়ে, আমাদের যাত্রামুহূর্তে, মাত্র এক-শ টাকার অভাবে পত্রিকাকে একটা সুন্দর অবয়ব দিতে পারিনি—সেই বিমর্ষ অসহায়তার।

উপায়হীন হয়ে 'স্বাক্ষর'-এর প্রথম সংখ্যার পথ ধরলাম—শুধুমাত্র টাইপ সাজিয়ে প্রচ্ছদ তৈরির সেই পুরোনো কায়দা। প্রচ্ছদের মাঝামাঝি জায়গায় সূচিপত্র ও কালো স্মল-পাইকা টাইপে কিছু কথা লেখা হল ওপর থেকে নিচে—লম্বাটে চারকোনা থামের আদলে—আর তার বাঁ-ধারে খানিকটা নিচের দিকে ইঞ্চিখানেক তফাতে ওপর থেকে নিচে একেকটি অক্ষর সাজিয়ে ২৪ পয়েন্টের লালরঙের পাইকা টাইপে 'কণ্ঠস্বর' কথাটি লেখা হল। 'কণ্ঠস্বর' কথার ইঞ্চিখানেক নিচে একটা মোটা কালো দাগ, তার নিচে লাল রঙে সম্পাদকের নাম। মোটামুটি মন্দ নয়। আমি জানি, আজকের পাঠকের কাছে একে হয়তো নেহাতই একটা গেঁয়ো প্রচ্ছদ বলেই মনে হবে। কিন্তু সেদিন সবুজ রঙের পুরু আর্টকার্ডের মলাটের ওপর কালো-লালের এই উড্ডীন পতাকা আমাদের রক্তে রোমাঞ্চ ছড়িয়েছিল। এই পতাকা ছিল আমাদের তরুণ-হৃদয়ের রক্তে রাঙা। আমাদের ভেতরকার উষ্ণতা, স্বপ্ন, রোমহর্ষ আর উদ্দীপনার আবেগে দীপ্যমান।

৬

প্রথম সংখ্যা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই 'কণ্ঠস্বর' পাঠকমহলে তুমুল সাড়া জাগাল। সংখ্যাটি ছাপা হয়েছিল মোট সাড়ে বারো-শ কপি। অধিকাংশ কপি ঢাকার 'ভালো' স্টলগুলোতে বিলির পর বাকিগুলোকে দেশের বড় বড় শহরের বুকস্টলগুলোতে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল। আর্টকার্ডের কাভার আর চুয়াল্লিশ পাউন্ড ডবল ক্রাউন কার্ট্রিজ কাগজে পরিপাটিভাবে ছাপা এই পত্রিকার সারা অবয়বে একটা সসম্ভ্রম পরিচ্ছন্নতা এবং মার্জিত পারিপাট্য ছিল। তাই ৫০ পয়সার সেই পত্রিকাগুলোর বিক্রি হয়ে যেতে খুব একটা দেরি হল না। পত্রিকার আপাদমস্তক স্বকীয়তা এবং ব্যতিক্রমিতাও সবাইকে কমবেশি টানল। এর বক্তব্য বা জীবনদৃষ্টিকে মেনে নেওয়া সেকালের গড়পড়তা পাঠকের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাঁরা তা নিলও না, কিন্তু পত্রিকাটির ভেতরকার বিষয় থেকে শুরু করে এর আপাদমস্তকে যে-মননশীলতা ও আধুনিকতার ছাপ ছিল তার প্রতি সপ্রশংস অনুমোদন জানাল।

তবে যে-ব্যাপারটা পাঠকমহলকে সবচেয়ে বেশি তপ্ত আর সরগরম করে তুলল তা পত্রিকার তৃতীয় কাভার পৃষ্ঠায় লাল হরফে লেখা এর ঘোষণাপত্রটি :

যারা সাহিত্যের সনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা
শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অকপট, রক্তাক্ত,
শব্দতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর; যারা
উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত,
অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী;
যারা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধাশীল, অনুপ্রাণিত;
যারা পঙ্গু, অহংকারী,
যৌনতাস্পৃষ্ট

কণ্ঠস্বর

তাদেরই পত্রিকা।

প্রবীণ মোড়ল, নবীন অধ্যাপক,
পেশাদার লেখক, মূর্খ সাংবাদিক, 'পবিত্র'
সাহিত্যিক, এবং
গৃহপালিত সমালোচক এই পত্রিকায়
অনাহূত।

কাভার ছাপার দিন হঠাৎ করেই কলমের মুখে এসে গিয়েছিল লাইনগুলো, যেভাবে অনুপ্রাণিত কবিরা কবিতা লেখে, অনেকটা সেভাবে। লেখাটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে দেখলেই আমাদের সাহিত্য-চরিত্রের কয়েকটি দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'সনিষ্ঠ প্রেমিক', 'শিল্পে উন্মোচিত', 'সৎ', 'অকপট', 'রক্তাক্ত', 'যন্ত্রণাকাতর', 'তরুণ', 'প্রতিভাবান', 'অপ্রতিষ্ঠিত', 'শ্রদ্ধাশীল', 'অনুপ্রাণিত'—এসব শব্দ বলে দেয় সৎ ও দায়িত্বশীল সাহিত্যসৃষ্টিই সাহিত্যদলের লক্ষ্য। এরই পাশাপাশি আবার 'উন্মাদ', 'অপচয়ী', 'বিবরবাসী', 'পঙ্গু', 'অহংকারী', 'যৌনতাস্পৃষ্ট'—এসব শব্দ স্পষ্ট করে তোলে এই দলের মনোলোক প্রোথিত রয়েছে অনেকটাই অবক্ষয়ের মধ্যে। পবিত্র সাহিত্যিক 'অনাহূত'—কথাটার ভেতর আছে বাতিল-হয়ে-যাওয়া রাবীন্দ্রিক ও উত্তর-রাবীন্দ্রিক ধারার সত্যশিব সুন্দরের অচলায়তনের প্রতি সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যান। বাকি আর যা-কিছু তা সবই ঐ চটুল তারুণ্যের বালখিল্যতা। মোটকথা শব্দগুলোর পরস্পরবিরোধী চরিত্রের ভেতর থেকে ফুটে উঠেছিল আমাদের সেদিনের অস্থির সুস্থ তারুণ্যযাত্রার অপচিত ও শ্রেয়পিপাসিত রূপটি যা আংশিকভাবে কীটদষ্ট হলেও ভেতরে ভেতরে মঞ্জরিত হয়ে আছে অমৃতপিপাসার সোনালি সম্ভারে।

ঘোষণাটি বেশ কয়েকদিন ধরে সবার মুখে মুখে ফিরল। ডিসেম্বরের শীতার্ত দিনগুলোতে পাঠকদের মধ্যে উষ্ণ আস্বাদ জাগাল কিছুদিন। উষ্ণতার চাইতে বড় যা লাভ হল তা হল প্রথম ষাটের তরুণ লেখকগোষ্ঠীর সামগ্রিক চেহারাটা পুরোপুরি ধরা পড়ল এই সংখ্যায়। স্পষ্ট হল সেই বৈশিষ্টগুলো যা আমাদের পঞ্চাশ বা চল্লিশের সাহিত্য থেকে আলাদা করেছে, যেসব জায়গায় আমরা তাদের থেকে পৃথক।*

---

* এই সুযোগে ষাট দশকী সাহিত্যধারাটির মূল চরিত্র-লক্ষণগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করি। ব্যাখ্যাটি পাঠকের রসনার জন্যে কিছুটা ভারী মনে হতে পারে ভেবে ফুটনোটের ভেতর আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছি :

[১] আমাদের ভেতর যে-বৈশিষ্ট্যটি সবার আগে সকলের চোখে পড়েছিল তা হল, সযত্ন পরিশীলনের মাধ্যমে সাহিত্যকে নান্দনিক শুদ্ধতা দেবার প্রবণতা। 'সমকাল'-এর আসরে ঢাকায় তখন চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশকের বিচ্ছিন্ন লেখকেরা এসে জড়ো হয়েছে। ঐ লেখকদের সঙ্গে আমাদের একটা মূল পার্থক্যটা ছিল একটি ছোট্ট জায়গায়। শিল্পের মধ্যে আমরা অন্বেষণ করছিলাম আপোষহীন নান্দনিক শুদ্ধতা ও শুচিতা যা কণ্ঠস্বরের সেই ছোট্ট সংখ্যাটি হাতে নিলে যে-কারও চোখে পড়বে। এইখানেই 'কণ্ঠস্বর' আর 'সমকাল' ছিল আলাদা। কেবল তরুণতমদের পত্রিকা ছিল বলেই-যে 'কণ্ঠস্বর' 'প্রতিষ্ঠিতদের পত্রিকা'—'সমকাল' থেকে আলাদা ছিল তা নয়; এ দুয়ের পার্থক্যের মূল কারণ ছিল এই যে 'সমকাল'-এর বিশাল লেখকভিড়ের মধ্যে [চল্লিশের শওকত ওসমান ও আবদুল হক এবং পঞ্চাশের সৈয়দ শামসুল হকের মতো হাতে-গোনা কয়েকজন লেখক ছাড়া] শিল্পের শুদ্ধতার ব্যাপারে যে-উদাসীনতা এবং শিথিলতা ছিল, 'কণ্ঠস্বর'-এর এই পর্যায়ের লেখকেরা ছিল প্রায় পুরোপুরি তার উল্টো। রক্ত-প্রকৃতিতে এই ধারা ছিল শিল্পসচেতন, প্রকরণপ্রবণ এবং মুখ্যত মননশীল। নান্দনিক পরিশীলনের ভেতর দিয়ে শিল্পের নিটোল প্রতিমাকে নির্মাণ

৭

ষাট দশকী অবক্ষয় মূলত এদেশের সামাজিক অবরুদ্ধতা থেকে উত্থিত হলেও আমেরিকান বিটনিক সাহিত্যের ও পশ্চিমবঙ্গের 'কৃত্তিবাসী' ধারা এর ভেতর বেশকিছুটা প্রাণ সঞ্চার করেছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে যে-প্রভাবটি একে আরও কিছুটা প্রাণবন্ত করে তুলেছিল তা আর-একটি পথ ধরে আসা। নিচে সেই প্রসঙ্গে কিছু কথা বলে নিচ্ছি।

'বোদলেয়ারের কবিতা' নামে বোদলেয়ারের 'লা ফ্লর দ্যু মল'-এর বুদ্ধদেব বসু-কৃত অসাধারণ অনুবাদটি বেরোয় ষাটের দশকের একেবারে প্রথমদিকে, ১৯৬১-তে। বেরোতে-না-বেরোতেই বইটি দুই বাংলার তরুণ-সম্প্রদায়কে বিপুলভাবে আলোড়িত করে। সবার হাতে প্রায় বাইবেল হয়ে ওঠে বইটি। অনুবাদে বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ারের নিজস্ব পৃথিবীটিকে—তাঁর রুগ্‌ণতা, অবক্ষয়, ক্রন্দন, মহত্ত্বপিপাসাকে—তাঁর বিশিষ্ট উপমা, রূপক, চিত্রকল্পসহ এমন জীবন্তভাবে তুলে ধরেছিলেন যে সেই অনুবাদের মধ্যে আমরাও যেন সেই জগৎকে আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম :

বলো আমাকে, রহস্যময় মানুষ, কাকে তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো :
তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা অথবা ভগ্নীকে?

করতে চেয়েছে এরা, এই প্রবণতাকে প্রায় ঈশ্বর করে তুলেছে। এই ধারার যে-তিনজন লেখক পরবর্তী সময়ে সাহিত্যপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে—আবদুল মান্নান সৈয়দ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বা রফিক আজাদ—তারা এই প্রবণতারই লেখক। জীবনবোধকে বিশুদ্ধ শৈল্পিক শুদ্ধতায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছে এরা আগাগোড়া। কেবল প্রথম ষাটের নয়, মোটামুটিভাবে পুরো ষাটের সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই মননশীলতা ও নান্দনিক শুদ্ধতার অন্বেষণ যা ষাট পেরিয়ে কয়েক দশক পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এই অর্থে এই প্রবণতা আমাদের এখানকার সাহিত্যে একটি নতুন প্রবণতারই জনক। চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের সাহিত্যের সঙ্গে ষাট দশকের সাহিত্যের প্রধান পার্থক্যও এটি।

[২] পঞ্চাশের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের আরও একটি বড় পার্থক্য ছিল। পঞ্চাশের ধারা মূলত জেগে উঠেছিল বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রেরণা থেকে। ফলে এর মধ্যে ছিল যুগযুগান্তের দেশজ ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ আবহমান বাঙালিত্বের চেতনা, মাটির গন্ধ এবং এই জাতিসত্তার ভবিষ্যতের জন্যে উৎকণ্ঠা ও স্বপ্ন। আমরা এই জাতীয়চেতনাসমৃদ্ধ ধারা থেকে অনেকখানিই দূরে সরে এসেছিলাম; নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের অবক্ষয়ী মূল্যবোধে, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় এবং প্রকরণগত পরীক্ষানিরীক্ষাগুলোর শাণিত নিপুণ কলাকৈবল্যের জগতে। এই বিচ্ছিন্নতার কারণও ছিল স্পষ্ট। পঞ্চাশের লেখকদের প্রেক্ষাপট থেকে আমাদের প্রেক্ষাপট ছিল অনেকখানিই আলাদা। আগেই বলেছি, তাঁদের উত্থান ঘটেছিল বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন-কেন্দ্রিক জাতীয়বোধের শক্তিমন্ত উত্থানের পথ ধরে—

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী—কিছুই নেই আমার।
তোমার বন্ধুরা?
ঐ শব্দের অর্থ আমি কখনো জানিনি।
তোমার দেশ?
জানি না কোন্ দ্রাঘিমায় তার অবস্থান।
সৌন্দর্য?
পারতাম বটে তাকে ভালোবাসতে—দেবী তিনি, অমরা।
কাঞ্চন?
ঘৃণা করি কাঞ্চন, যেমন তোমরা ঘৃণা করো ভগবানকে।
বলো তবে, অদ্ভুত অচেনা মানুষ, কী ভালোবাসো তুমি?

আমি ভালোবাসি মেঘ...চলিষ্ণু মেঘ...ঐ উঁচুতে...ঐ উঁচুতে..
আমি ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল।

[অচেনা মানুষ]

এমন বিচ্ছিন্ন, একক, বহিরাগত একটি মানুষকে পৃথিবীর কাছে অচেনা আর রহস্যময় মনে হবারই কথা। যার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী কিছুই নেই, বন্ধু শব্দের অর্থ অজানা, সেই দেশ-পরিচয়হীন মানুষকে সভ্যতার ইতিহাস এর আগে দেখেছে কি কখনো? কী

আবহমানের মাটি ও মানুষে সজীব এক স্বাদেশিক অনুভূতির ভেতর থেকে। কিন্তু আমাদের জন্ম হয়েছিল নেহাতই এক বন্ধ্যা সময়ে—আইয়ুবি সামরিক শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পাশবিকতার নির্দয়তম বুটের নিচে। সারা জাতির কাছে দেশ তখন বিদেশ। দেশের সবচেয়ে শক্তিমন্ত মানুষটির স্নায়ুও তখন নিঃস্বতা আর ক্লুণ্ণতায় খিন্ন। [সেই পরিত্রাণহীন অন্ধকারের সামনে শেখ মুজিবের মতো পরাক্রান্ত মানুষদের মনের অবস্থাও-যে কেমন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল তাঁর প্রমাণ আছে জুলফিকার আলী ভুট্টোর লেখায়। ভুট্টো লিখেছেন : ১৯৬২ সালে শেখ মুজিবের সঙ্গে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (এখনকার শেরাটনে) আমার দেখা। তখন তিনি সবেমাত্র জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম : রাজনীতির ব্যাপারে নতুন কিছু ভাবছেন কি? শেখ মুজিব উত্তর দিলেন : আইয়ুব খানের জেল আমার আগুন নিভিয়ে দিয়েছে। আমি বললাম : আপনাদের মতো প্রবীণ রাজনীতিবিদদের এভাবে থেমে গেলে চলবে কী করে?] এমনি সময়ে পঞ্চাশের জাতীয়তাবোধের প্রেরণা থেকে সরে এসে পচন, ক্লেদ আর ক্লুণ্ণতার নিঃসঙ্গ ঘরে নিজের ভেতর আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া আমাদের আর কী করণীয়ই বা ছিল। বলতে সংকোচ নেই আমাদের, সেই বিচ্ছিন্নতার পৃথিবীতে 'দেশ'-এর অস্তিত্ব আমাদের মন থেকে প্রায় পুরোপুরি নিশ্চিহ্নই হয়ে গিয়েছিল। আমরা মানসিক আশ্রয় খুঁজেছিলাম পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাসর্বস্ব, জীবনচেতনার অন্ধকারের ভেতর যা জীবনঘনিষ্ঠতার দিক থেকে নিঃস্ব হলেও প্রকরণের দিক থেকে ছিল উজ্জ্বল। কিন্তু ষাটের দশকের শেষ পর্বে এসে, প্রবল জাতীয়বোধের উত্থানের হাত ধরে মানুষ ও মৃত্তিকালগ্নতা এবং মাতৃভূমির ব্যাপারে উৎকণ্ঠা আমাদের লেখায় আবার ফিরে এসেছিল। এমনকি মান্নান, যে

নতুন, অচেনা আর ব্যতিক্রমী এই মানুষটি; এযাবৎকালের পৃথিবীর আর সব মানুষ থেকে কী বিষণ্নরকমে আলাদা; তবু পড়ার সময় একই সঙ্গে আমাদের মনে হয়েছে আমরা নিজেরাও যেন আসলে এই মানুষটিই; এমনি ঠিকানাহীন, নিঃসঙ্গ, অনিকেত যার মহত্ত্বপিপাসী ক্রন্দনময় আকুলতা অবক্ষয়ের কুটিল আক্রমণে কীটদষ্ট । বইটির আর-একটি কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন তুলে ধরছি :

আমি যেন রাজা যার সারাদেশ বৃষ্টিতে মলিন।

পড়তে পড়তে প্রথম ষাটের জৌলুশময় অবরুদ্ধ ঊষর প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদেরও মনে হয়েছে আমরা নিজেরাও যেন সেই রাজা যারা নিজেরাই নিজের ঘরে পরবাসী হয়ে রয়েছি। যাকে :

কিছুই দেয় না সুখ— না মৃগয়া, না শ্যেনচালন,
না তার অলিন্দতলে মৃতপ্রায় তারই প্রজাগণ।
মনঃপূত বিদূষক প্রহসনে যত গান গাঁধে,
আনত ললাট থেকে রোগচ্ছায়া পারে না সরাতে;
...এবং যার সাধনায় রাজারা সুন্দর,
জানে না সে-মেয়েরাও লজ্জাহীন কোন্ প্রসাধনে
আমোদ ফোটানো যায় এ-তরুণ কঙ্কালের মনে।

নিচে বোদলেয়ারের আর-একটি কবিতা তুলে ধরছি। জীবনের রূপলাবণ্যময়তার শেষে পুঁতিগন্ধময় শবের পরিণতি এখানে কবিকে বিমর্ষ করেছে। আমরাও তখন এই ঢাকা নগরীতে, চারপাশের বিত্ত ও আপাতরম্যের ফেনিল বন্দনার মধ্যে প্রায়

ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিবরবাসী ও সমাজবিমুখ সেও সেই জাতীয় অভ্যুত্থানে সাড়া না দিয়ে পারেনি। তার প্রমাণ ওর কবিতার বই 'ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ'। শক্তি ছিল বলেই আমরা প্রথম ষাটের সামাজিক বাস্তবতা ও অবক্ষয়কে যেমন উৎকর্ণভাবে অনুভব করেছিলাম তেমনি সাড়া দিতে পেরেছিলাম জাতীয় জীবনের এই পালাবদলে। কিন্তু পঞ্চাশ দশকের লেখকদের মধ্যে তা যেমন পরিপূর্ণ শক্তিমত্তা এবং দ্বিধাহীনতা নিয়ে উপস্থিত, আমাদের মধ্যে ঠিক তেমনটি নয়। সাহিত্যজীবনের সূচনাতেই একটা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও নেতির ভেতর দিয়ে আমাদের পথ হাঁটতে হয়েছিল বলে আমাদের দেশাত্মবোধের স্বপ্ন ও আশাবাদ কখনোই নিরঙ্কুশ বা জন্মান্ধ হতে পারেনি। ষাটের দশকের বিপুল সামষ্টিক উত্থান এবং গণজোয়ারের মুখে এই জাতির সমস্ত ব্যক্তিগত বিবেচনা যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তখনও আমাদের ধারার লেখকদের ভেতর জাতীয়তাবাদী চেতনার পাশাপাশি ব্যক্তিক মনোভঙ্গি এবং অনিকেতের চেতনা নিবিড়ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই'কে আমি এর একটি প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। ষাটের প্রায় প্রতিটি লেখকের লেখাতেই এই ব্যাপারটা কমবেশি ঘটেছিল। আগেই বলেছি, এতে আমাদের সাহিত্য বিপন্ন

একইভাবে দেখে চলেছি এমনি রুগ্‌ণ অন্তঃসারশূন্যতার এক বিমর্ষ পৃথিবীকে :

কী আমরা দেখেছিলুম হঠাৎ পথের মোড়ে
গ্রীষ্মমধুর দিনে,
শিলার শয়নে গলিত জন্তু রয়েছে প'ড়ে—
প্রেয়সী, পড়ে কি মনে?

আর্দ্র নারীর ধরনে শূন্যে পা দুটি তোলা,
তাপে, ঘামে বিষ কীর্ণ,
লজ্জাবিহীন, উদাসীনভাবে উদর খোলা,
বিকট বাষ্পে পূর্ণ।

প্রকৃতির দান এ-পূতিপুঞ্জে রাঁধবে বলে
রৌদ্ররশ্মি জ্বলছে,
ফিরে দেবে শত খণ্ডে, যা তিনি মহৎ বলে
মিলিয়েছিলেন গুচ্ছে;

উত্তম শব, আকাশ দেখছে দৃষ্টি মেলে,
ফুটল ফুলের মতো,
এমন তীব্র গন্ধ, ভেবেছ হঠাৎ টলে
ঘাসে প'ড়ে যাবে না তো?

হয়নি। বরং এই পরস্পরবিরোধী এবং বৈপরীত্যমুখী ধারা একপাত্রে সুসংহত হয়ে একে আরও পরিণত ও গাঢ় হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাস ও রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, চরম বামপন্থী হুমায়ুন কবীর, এমনকি পরম নিভৃতচারী মান্নানের কবিতাতেও এই দুই ধারার যুক্তবেণী লেখাকে বাড়তি শক্তি দিয়েছে।

[৩] চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকী লেখকদের ('সমকাল'-এর লেখকদের) সঙ্গে আমাদের আর-একটা জায়গায় পার্থক্য ছিল যা চোখে পড়ার মতো। পার্থক্যটার কথা আমি আগেই বলেছি, তবু এর কারণ অন্বেষণের জন্যে কথাটা আর-একবার টেনে আনছি। যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আবিষ্কার করেছিলাম : নিজ দেশে আমরা বহিরাগত। একটা অনিকেত উন্মূল পৃথিবীর আত্মপরিচয়হীন বাসিন্দা। উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন, নিজের ব্যক্তিগত একাকীত্বের মধ্যে অপচিত। পশ্চিম ইয়োরোপ আর আমেরিকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসর্বস্ব, রুগ্‌ণ ও অবক্ষয়ী সংস্কৃতি-ধারার খুবই কাছাকাছি এ। এ কারণেই ঐসব সাহিত্যের ঘুণেধরা ও বিকারগ্রস্ত প্রবণতাগুলো এত তাড়াতাড়ি আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। আমেরিকার বিটনিকদের প্রভাব পড়েছিল সরাসরি। পশ্চিমবঙ্গের তরুণ সাহিত্যের অবক্ষয়ী ধারাটি হয়ে উঠেছিল আমাদের একান্ত দোসর। তবে বাইরের যেসব অবক্ষয়ী প্রভাব আমাদের সাহিত্যিকভাবে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত করেছিল, তার মধ্যে, আমার মনে হয়, সবচেয়ে সর্বাত্মক ও গভীর ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি কবি বোদলেয়ারের প্রভাব।

ঝাঁকে–ঝাঁকে মাছি প'চে–ওঠা গলা জঠর ছেয়ে;
আর নামে, অবিরল,
ঘন, কালো স্রোতে সপ্রাণ, ছেঁড়া টুকরো বেয়ে
কৃমির সৈন্যদল।

আর এইসব ওঠে আর পড়ে ঢেউয়ের মতো,
কাঁপে আচমকা স্বননে;
যেন সে–শরীর, শিথিল বায়ুতে নিশ্বসিত,
জীবিত পুনর্জননে।

সে এক জগৎ, অদ্ভুত সুর ঝরে তা থেকে,
যেন জল গতিমন্ত,
কিংবা বাতাস, কিংবা কুলোয় ঘুরিয়ে ঝেঁকে
শস্য বাছার ছন্দ।

যত আছে রূপ, স্বপ্নে সকলই বিলীয়মান ;
আর, বিস্মৃত পটে,
শিল্পীর কৃতি, বিকল্পহীন স্মৃতির দান,
ধীরে রেখা ওঠে ফুটে।

দূরে, অস্থির কুক্কুরী এক, রুষ্ট চোখে
আমাদের করে লক্ষ,
কখন ফিরিয়ে নেবে কঙ্কালপিণ্ড থেকে
তার খণ্ডিত ভক্ষ্য।

---

[৪] ষাটের কবিরা আমাদের কবিতা–শরীরে যে–একটি নতুন সুরের সংযোজন করেছিল এ নিয়ে অনেকেই এযাবৎ বলেছেন। রফিক আজাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, ফরহাদ মজহার, মহাদেব সাহা, হুমায়ুন কবির, মোহাম্মদ নূরুল হুদা— মোটামুটি এদের হাতেই এই ধারার উন্মোচন ঘটেছে। কিন্তু কবিতা ছাড়াও আর–একটি জায়গায় এই ধারার লেখকেরা একটা শাণিত সাফল্য দেখিয়েছিল। সে–সাফল্য গদ্যের ক্ষেত্রে। চল্লিশ বা পঞ্চাশ দশকের গদ্য থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা একটা গদ্যধারা উপহার দিয়েছিল তাঁরা। এই গদ্য যেমন ছিল ঝকঝকে আর আনকোরা তেমনি ছিল আবেগাশ্রিত আর মননদীপ্র। যে–বৈশিষ্ট্যটি এই গদ্যে সবচেয়ে বেশি জ্বলজ্বলে হয়ে দেখা দিয়েছিল তা হল এর কবিতাক্রান্ত চরিত্র।

—আর তবু তুমি, তুমিও হবে এ-বিষ্ঠাধারা,
জঘন্য কীটপঙ্‌ক্তি,
আমার স্বভাবী সূর্য, আমার চোখের তারা,
দেবদূত, সংরক্তি !

তা-ই হবে তুমি, অন্ত্য কৃত্য সাঙ্গ হ'লে,
ওগো লাবণ্যপ্রতিমা,
যবে, অস্থির আধারে, নধর ফুলের তলে
বিনষ্ট হবে তনিমা।

তা'হলে, রূপসী, বোলো সে-কৃমির বংশে, যার
চুম্বন করে গ্রাস,
আমি বাঁচিয়েছি ধ্বস্ত প্রেমের আকৃতি, আর
স্বর্গীয় নির্যাস।

[এক শব]

আবার আছে অন্যদিকও। অম্লান সুন্দরীর কাছে জীবনের পূর্ণতা সন্ধান :

প্রিয়তমা সুন্দরীতমারে
যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার।

এ ছাড়াও আছে সুন্দর জাহাজের সঙ্গে দীপ্র উদ্যত নারীর অনিন্দ্য অবিশ্বাস্য উপমা*; আছে প্রেমিকার চুলের উষ্ণ, উদ্ধত, নরম, সৌগন্ধ্যময় গভীরে কবির তপ্ত, গাঢ়, শরীরী ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি (চুল), ঘুণে-ধরা ফরাসি সভ্যতার বিষণ্ন রাজপথে সরল নিটোল মালাবার রমণীর সম্ভাব্য নিঃশেষিত পরিণতির বেদনা। এমনি অজস্র অপরিচিত বিস্ময়কর কল্পনা আর চিত্রময়তার সিঁড়িতে সিঁড়িতে তা আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেছে।

---

* যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিমান,
তখন মানি তোরে সুতনু তরণীর সাগর-অভিযান।
তেমনি চঞ্চল উত্তাল,
শিথিল, মন্থর ছন্দে হেলে-দুলে ছড়িয়ে দিলি পাল।

দৃপ্ত গ্রীবা তোর, নধর স্কন্ধের আয়োজন
দেখায় মাথাটির কত যে অদ্ভুত বিকিরণ ;
সৌম্য বিজয়ের নির্যাস
ছড়িয়ে, ওরে শিশু-রাজ্ঞী ! তোর পথে হেলায় চলে যাস।

বুদ্ধদেব বসুর সেই চিত্ররূপশালী অনুবাদ অকারণে আমাদের তরুণ দিনগুলোকে মাতাল করে রাখেনি। একটা পুরো অনাস্বাদিত আর নতুন পৃথিবীকে তার মধ্যে আবিষ্কার করেছিলাম আমরা। যে অবক্ষয় আর নিঃস্বতার অনুভূতির মধ্যে সে-সময় আমরা বাস করছিলাম, যার ছবি আঁকার জন্যে ভেতরে ভেতরে মরে যাচ্ছিলাম— এ বইটি যেন সে-জগৎকেই আমাদের সামনে উন্মোচিত করে দিয়েছিল। না, ঠিক তাও নয়। আমাদের চোখে-দেখা সেই দৃশ্যের তুলনায়ও এ ছিল অনেক বেশি জ্যান্ত আর কল্পনাসমৃদ্ধ। সে-কল্পনা এতই শক্তিমান যে এর দ্বারা অভিভূত হওয়া ছাড়া আমাদের কোনো পথ ছিল না। স্বপ্নের মতো রমণীয় অনুবাদের ভেতর দিয়ে বুদ্ধদেব বোদলেয়ারকে—যে কেবল উনিশ-শতকী ফরাসি অবক্ষয়ের যুবরাজ হিসেবেই আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাই নয়, সেইসঙ্গে উনিশ-শতকী প্যারিসের রুগ্ণ ক্ষয়িষ্ণু বাস্তবতার রূপটিকেও আমাদের চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

যে-ব্যক্তিটি আমাদের জীবনে এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটালেন তিনি কেবল ফরাসি কবি বোদলেয়ার নন, কেবল বুদ্ধদেব বসুও নন, তিনি বুদ্ধদেবীয় বোদলেয়ার; বুদ্ধদেবের দ্বারা আবিষ্কৃত ও তাঁরই অসাধারণ ও সজীব অনুবাদে আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত করে তোলা বোদলেয়ার।

দেখতে দেখতে বোদলেয়ার আমাদের হৃদয়ের রাজা হয়ে উঠলেন। বোদলেয়ারের প্রভাব প্রায় আপাদমস্তক গ্রাস করে ফেলল আমাদের। মধ্যরাতে ঢাকার রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে একেক সময় আমাদের মনে হত, উনবিংশ শতাব্দীর আলো আত্মাহীন ঝলমলে প্যারিস শহরের ক্ষয়িষ্ণু রাস্তার ওপর দিয়ে যেন আমরা হেঁটে বেড়াচ্ছি, 'যেখানে আলোকিত রাত্রি গণিকার মতো পেটিকোট খুলে আমাদের আহ্বান করছে।' আমার ধারণা যেসব প্রভাব প্রথম ষাটের কবিতাকে ভিন্ন পথের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল বুদ্ধদেব বসু অনূদিত বোদলেয়ারের প্রভাব তার একটি।

৮

'কণ্ঠস্বর'-এর ঘোষণা সাধারণ পাঠকের রক্তে চাঞ্চল্য জাগালেও যা তাদেরকে পত্রিকাটির ব্যাপারে সত্যি সত্যি আগ্রহী করে তুলেছিল তা হল এর লেখাগুলোর শক্তি ও নতুনত্ব। বিষয় বা জীবনানুভূতি থেকে শুরু করে শব্দে , ভাষায় , প্রকরণে, সবখানেই ছিল এর নবীনতা । প্রথম সংখ্যায় লেখা খুব-একটা বেশি ছিল না। আগেই বলেছি, মূল প্রবন্ধ— 'দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ' লিখেছিলাম আমি। গল্প ছিল দুটো : একটা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'নিঃশ্বাসে যে প্রবাদ', অন্যটা আবদুল মান্নান সৈয়দের 'অতিওয়ারিশ মাল'। কবিতার সংখ্যা একটু বেশি, চারটি : রফিক আজাদের 'মৃত্যু : ২', শহীদুর রহমানের 'দুটি

কবিতা', ইমরুল চৌধুরীর 'সৌরময় নাস্তিকতা', ও হাংরি জেনারেশনের মলয় রায় চৌধুরীর দুটি কবিতা ('ও আমার বাংলা মাগো' ও 'শ্মশানে নিয়ত ফুল')। এছাড়া ছিল ইভ বন ফোয়ার তিনটি অনুবাদ-কবিতা। এর বাইরে লেখা ছিল আর মাত্র দুটি : একটি প্রশান্ত ঘোষালের বিতর্কমূলক রচনা 'নতুন বিতর্কে', অন্যটি মোহাম্মদ রফিক লিখিত হেরমান হেসের 'গোল্ডম্যান্ড'-এর সমালোচনা।

আমার 'দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ' বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। কোনোরকম রবীন্দ্রবিরোধিতা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, একজন বাঙালি সংস্কৃতিসেবীর এর কোনো দরকারও হয়তো আর নেই। তাঁর প্রতি গভীরভাবে সশ্রদ্ধ থেকেই তাঁর কিছু অসহায়তা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলাম আমি, নেহাতই তাঁর যথার্থ স্বরূপ-অন্বেষণের আকুতি থেকে । মান্নান ওর 'স্মৃতির নোটবই'য়ে এ-সম্বন্ধে লিখেছে : 'খুব স্বাভাবিকভাবেই বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের পুনর্বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম আমরা। বলা বাহুল্য, এই দশকেই অসাহিত্যিক পদ্ধতিতে রবীন্দ্রহনন শুরু হয়েছিল, তার সঙ্গে 'কণ্ঠস্বর'-কেন্দ্রী রবীন্দ্রভাবনার কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। আমাদের দৃষ্টি ছিল সাহিত্যিক..।' কিন্তু এর জন্যে আমাকে যে-খেসারত দিতে হয়েছিল তা পাপের তুলনায় অনেক বেশি। আমার ধারণা সেটা আমার বক্তব্যের জন্যে ততটা নয় যতটা আমার তরুণ-বয়সের তীব্র বেপরোয়া উচ্চারণের জন্যে। কথাগুলো আমি বলেছিলাম স্পষ্ট, অকুণ্ঠ ও নির্ভীক ভাষায়; কোনোরকম রাখঢাক বা অযথা বিনয়ের হঠকারিতা না করে; যেভাবে কথা বলাকে সেকালে আমরা সততা বলে মনে করতাম, সেইভাবে। এই নির্জলা সত্যবাদিতাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার কাল। আমাদের দেশ উদ্ভট ভক্তিবাদের দেশ। এখানে মানুষ অকাট্য সত্যকেও সরাসরি শুনতে চায় না। সত্যকথাকেও বলতে হয় অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো গলবস্ত্রে একাকার হয়ে। এ না করলে নখরের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়া হয়।*

---

* আমাদের দেশে আর-একটা বড় ধরনের অসুবিধা রয়েছে। আমার ধারণা আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে রয়েছে এক হিংস্র ও ধ্বংসকারী প্রবণতা। যে-মানুষ সবাইকে ডিঙিয়ে এখনো ওপরে চলে যেতে পারেনি, তার ব্যাপারে আমাদের আচরণ পুরোপুরি অমানুষিক ও নিষ্ঠুর। আঘাতে আঘাতে তাকে রক্তাপ্লুত ও ছিন্নভিন্ন করে নিজেদের পর্যায়ে নামিয়ে না-আনা পর্যন্ত আমাদের ক্ষান্তি নেই। কিন্তু পরাক্রান্ত ও সফল মানুষদের ব্যাপারে আমাদের আচরণ ঠিক উল্টো। দিগ্বিজয়ী সাফল্য দেখিয়ে যদি কোনো মানুষ একবার নিজেকে কোনোভাবে অপরাজেয় হিসাবে প্রমাণ করতে পারে তবে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে আমরা আভূমি প্রণত হই, বিগলিত আবেগে তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়ে দিই এবং অনন্তকালের জন্য ঘণ্টা বাজিয়ে তাকে পুজো দিতে শুরু করি। তখন আমাদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায় লণ্ঠন হাতে তাঁর পবিত্রতা এবং দেবত্বকে কঠোর সততায় আগলে দেওয়া ও সেই দেবতার পাণ্ডা হিসেবে নিজের জাগতিক মুনাফাটুকু পুরোপুরি হাতিয়ে নেওয়া।

রবীন্দ্রভক্তি আমাদের দেশে আজ একটি সন্ত্রাসী প্রতিষ্ঠান। উগ্র রবীন্দ্রভক্তদের মৌলবাদী তাণ্ডবের ফলে সাধারণের কাছে রবীন্দ্রনাথ আজ এক রক্তপিপাসু দেবতার নাম। তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন আজ প্রায় অসম্ভব । স্তব ছাড়া কোনোকিছুই তাঁর জন্যে আর প্রযোজ্য নয়। বহু মৌলবাদী রবীন্দ্রপাঠকের হৃদয়ে তিনি আজ ঈশ্বরের আসনে এবং তাঁর রচনাসমগ্র সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সম্মানে অধিষ্ঠিত। তাঁর চেয়ে শ্রেয় বা উচ্চতর কিছু মানবজাতি–যে পৃথিবীতে কোনোদিন উপহার দেয়নি এবং দেবেও না— এ–ব্যাপারে তারা নিঃসংশয়। তাঁর প্রতিভার সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোনোরকম সংশয় উত্থাপন করলে বাঙালি তো বটেই, বাংলার বাইরে কোনো মানুষের পক্ষেও টিকে থাকা কঠিন। কিছুদিন আগে ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক খুশবন্ত সিং ইংরেজিভাষায় উইলিয়ম রাদিচি–কৃত ইংরেজি অনুবাদ পড়ে রবীন্দ্র–কবিতার মহত্ত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করায় (যা করার অধিকার প্রতিটি মানুষেরই থাকা উচিত) সর্বভারতীয় রাবীন্দ্রিক মৌলবাদের হাতে অসম্মানিত ও ধিক্কৃত হয়েছেন।

উগ্র রবীন্দ্রভক্তদের দ্বারা নিন্দিত হলেও সাধারণ সাহিত্যপাঠকদের মধ্যে 'দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ' বেশ উৎসাহ জাগিয়েছিল। রবীন্দ্রভক্তদেরও কেউ কেউ পছন্দ করেছিলেন। সে–সময়কার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ আবদুল হাই যিনি বাংলাদেশে রবীন্দ্রসাহিত্যের সে–সময়কার অন্যতম ধারক ছিলেন, লেখাটি পড়ে বলেছিলেন, 'উল্টোপাল্টা লিখলেও ছোকরা লিখেছে বেশ'।

সম্পূর্ণ নতুন গদ্যভাষায় নতুন চেতনার গল্প উপহার দিয়েছিল মান্নান আর ইলিয়াস। ইলিয়াসের 'নিঃশ্বাসে যে প্রবাদ' গল্পটাতে কিছুটা অতিকাব্যিকতার আমেজ থাকলেও (যা ইলিয়াসের লেখায় শেষদিন পর্যন্ত কমবেশি ছিল), এর ভেতরকার আবেগের উচ্ছ্বিত বেগবান সোনালি স্রোত, শব্দের অবিশ্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষা, বিষয়ের জন্যে তীব্র আকুতি— এসবের ভেতর প্রতিভা ও নতুনত্বের স্বাক্ষর ছিল স্পষ্ট। মান্নানের 'অতিওয়ারিশ মাল' গল্পের সুপরিণত জমাট বাঁধুনি, কাব্যময়তা, আধুনিকতা ও চমক প্রমাণ করেছিল এমন এক নতুন ও শক্তিশালী গল্পকার ও গদ্যলেখককে যার হাত থেকে আগামীতে ভালো গল্প উপহার পাওয়া অসম্ভব নয়।

রফিকের 'মৃত্যু : ২' কবিতায় স্বভাবগত গাঢ় ও সুসংযত বাক্যবন্ধে ওর সেই সময়কার বিমর্ষ মৃত্যুভাবনা সহজ বলিষ্ঠ অকুণ্ঠ উচ্চারণে উক্ত :

হে মহিলা অম্লান গোলাপ, তুমি কী
জেনেছ মৃত্যুকেই সর্বশেষ প্রিয়জন বলে?
জানোনি কী তোমার দেহের কোমল
ও মোলায়েম স্নায়ুগুলি একদিন শক্ত ও নীরক্ত
হবে !... তোমার অকৃত্রিম ওষ্ঠের অরুণিমা
একদা কাগজের মতো শাদা হয়ে যাবে।

ফ্লোরেসেন্ট নিতম্ব তোমার, ট্রান্সপারেন্ট
উবুসন্ধি, হে মধুর মহিলা, কদর্য পুরুষকেও
আকর্ষণের ক্ষমতা হারাবে।

[মৃত্যু]

'কণ্ঠস্বর'-এর প্রথম সংখ্যার অন্য সবকিছুর মতোই ভালো ছিল এর লেখাগুলো। শহীদ, ইমরুল বা মলয় রায় চৌধুরীর কবিতা, প্রশান্ত বা মোহাম্মদ রফিকের আলোচনা—এক কথায় সবকিছু। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিটি লেখা ছিল টগবগে আর তাজা প্রাণের তারুণ্যে উচ্ছল। এই প্রাণের জোয়ার, সাধারণ পাঠকদের, বিশেষ করে তরুণ-পাঠকদের রক্তকে চঞ্চল করেছিল।

৯

মান্নানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তরুণ-লেখকদের সেই 'মহাসম্মেলনের' দিন ('মহাসম্মেলন' নামটি মান্নানেরই দেওয়া, সম্ভবত সমাবেশটির গুরুত্ব বিবেচনা করেই ও এই নামটি দিয়েছিল), যে সম্মেলনের পর, গভীর রাত্রে প্রশান্ত আর ওর বন্ধুদের অনমনীয় মনোভাবের কারণে আমরা আবার নতুন করে 'কণ্ঠস্বর' প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সম্মেলনের পর আমাদের জনাকয় গিয়ে বসেছিলাম শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনে। ক্যান্টিনটি ছিল পাবলিক লাইব্রেরির ভেতরেই, এর উত্তর-পশ্চিম কোণের দেয়ালের কোল ঘেঁষে। লাইব্রেরি-ভবন থেকে শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনে যেতে হত লাইব্রেরির উত্তরদিকের সবুজ লন পেরিয়ে, সরু পায়ে-চলা পথের দুপাশে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-থাকা নভেরা আহমদের মোজাইকের ছোট ছোট ভাস্কর্যগুলো দেখতে দেখতে। চারপাশে বাঁশের বেড়া, ওপরে টিনের ছাউনি, ভেতরে ছোট লম্বা গোটাকয় টেবিলের দুপাশে সার-ধরা কিছু ফোল্ডিং চেয়ার—এই নিয়ে এই ছোট্ট রেস্টুরেন্টের ঘরকন্না। শ্রী-ছাঁদ বা আভিজাত্য বলতে কোনোকিছুই এর ছিল না। তবু-যে সবাই রেস্টুরেন্টটার জন্যে অমন উচাটন হয়ে থাকত তার কারণ বোঝা যেত এর পিরিচ-ভর্তি ছোট ছোট মাংসের টুকরোওয়ালা বিরিয়ানির স্বাদ পেলে। ঘিয়ের গন্ধের আমেজ-মাখানো একটা রুচিকর স্বাদ ছিল এতে। কাকে ভজিয়ে যে শরীফ মিয়া এমন অবিশ্বাস্য ও আধুনিক একটা ভবনের কোণে অমন কুৎসিত একটা ঝুপড়ি বানানোর অনুমতি আদায় করে নিয়েছিল জানি না; কিন্তু ছোটখাটো, রোগা, মাথার সামনের দিকে তেলতেলে টাকওয়ালা ও একটানা কাজ করে যাওয়া স্বল্পবাক নিরীহ শরীফ মিয়ার জন্যে কেমন যেন একটা মায়া হত। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে অনেকদিন পর্যন্ত এই শরীফ মিয়ার ক্যান্টিন ছিল

ঢাকার উঠতি লেখক আর শিল্পীদের একটা অন্তরঙ্গ আড্ডার জায়গা। অনেকেই এসে জুটত সেখানে। বাইরের লেখক শিল্পীরা তো বটেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মতো আর্ট কলেজের (এখনকার চারুকলা ইনস্টিটিউটের) তরুণ ছাত্রেরা, কলেজের লাগোয়া বলেই হয়তো, সেখানে এসে জড়ো হত। আমাদেরও অনেক সুন্দর আনন্দে-ঘেরা মুহূর্ত আড্ডামাতাল হয়ে সেখানে কেটেছে।

ক্যান্টিনের কাছে আসতেই ভেতরে মান্নান আর দু-তিনজনকে চোখে পড়ল। এর আগে মান্নানের দুটো লেখা আমি পড়েছিলাম। প্রথমটা 'সাম্প্রতিক'-এ বের হওয়া ওর প্রবন্ধ 'কথাসাহিত্য : প্রাসঙ্গিক'; দ্বিতীয়টা ওর গল্প 'মাতৃহননের নান্দীপাঠ'— এটি বেরিয়েছিল 'পরিচয়'-এ। লেখাদুটোয় ওর দীপ্র গদ্যশক্তি আমাকে চমকে দিয়েছিল। 'মাতৃহননের নান্দীপাঠ' গল্পে চিন্তার গভীরতা ও আধুনিকতা, বিষয়ের নতুনত্ব, মননশীলতা ও তীক্ষ্ণতা দেখে আমি আরও অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। একজন বিশ বছরের তরুণের পক্ষে প্রতিভার ঐ পরিণত শক্তি আমার কাছে অভাবিত বলে মনে হয়েছিল । ব্যাপারটা আমাকে ভাবতে উৎসাহী করেছিল যে তিরিশের যুগের পর বাংলাসাহিত্যে আবার হয়তো একজন প্রতিভাবান গদ্যকার আমরা উপহার পেলাম, এখন দেখার বিষয় এই শক্তি শেষ অব্দি কোন্ মাপের শস্য ঘরে তোলে। প্রথম ষাটের লেখকদের মধ্যে অকাল-সাফল্যের বিদ্যুৎদ্যুতিতে মান্নানের মতো কেউ আমাদের হতচকিত করেনি। ওর ভাষার এই দীপান্বিত শক্তি ওর ছোটগল্পে, কাব্যনাটকে এবং 'আমার বিশ্বাস'-জাতীয় আত্মোদ্‌ঘাটনমূলক বেশকিছু বইয়ে এবং কিছু বিচ্ছিন্ন লেখায় জ্বলজ্বলে হয়ে আছে।

ক্যান্টিনে ঢুকেই মান্নানের সঙ্গে পরিচয় হল। সভা-ভাঙা তরুণ-লেখকরা এসে পড়তে শুরু করেছিল এক দুই করে। আড্ডায় সরগরম হয়ে উঠল ক্যান্টিন। কথাবার্তার সময় মান্নানকে খানিকটা আড়ষ্ট আর সংকুচিত লাগল। দেখে বিশ্বাসই হতে চায় না এই সেই অবিশ্বাস্য তরুণ যার হাত থেকে 'মাতৃহননের নান্দী পাঠ'-এর মতো একটি প্রখর গল্প বেরিয়েছিল। কথার তুলনায় চোখের অভিব্যক্তি দিয়েই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল যেন মান্নান। পরে বুঝেছিলাম ও আসলেই এমনি 'বিজনবাসী' আর আত্মগত। নিজের একান্ত বিবরের বাসিন্দা। এর বাইরে আসতে গেলে ও অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। ব্যক্তিস্বভাবের এই হৃদয়ারণ্য থেকে বেরোতে ওর অনেক বছর লেগেছিল।

মান্নানের সঙ্গে আমার পরিচয় আর বন্ধুত্ব প্রায় সেই থেকেই। এই বন্ধুত্বের সেই-যে শুরু, এরপর গত চল্লিশ বছর ধরে তা একইভাবে বহমান রয়েছে। কেবল বহমান নয়, প্রতিটি দিনের ভেতর দিয়ে তা কেবলই গভীর, গভীরতর হয়েছে। মান্নানের সঙ্গে কথা বলে চিরদিন আনন্দ পেয়েছি, একাত্ম বোধ করেছি। সাহিত্যের জন্যে একটা স্থির উজ্জ্বল আত্মনিবেদন দেখেছি ওর মধ্যে, এর বাইরে ও প্রায় কিছুই বুঝত না। নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো সেই অনিন্দ্য জোছনাধারার নিচে আত্মবিস্মৃত ও উদভ্রান্তের মতো জীবন কাটিয়ে গেল মান্নান। ও একজন শক্তিশালী গল্পলেখক, ভালো কবি, নিদ্রাহীন গবেষক, অবিরল পাঠক ও সর্বভুক সমালোচক। এযাবৎকালের

বাংলাসাহিত্যের ছোট বড় এমন একজন লেখকও নেই যাঁর ওপর ও বিশদ আলোচনা ও সুচিন্তিত মতামত রাখেনি। কোনো সৃষ্টিশীল লেখক এর আগে বাংলাসাহিত্যের প্রতিটি লেখকের ওপর আলাদা আলাদাভাবে এমন ব্যাপক আলো ফেলেছেন বলে মনে হয় না। মান্নানের পুরো সমালোচনামূলক লেখাগুলো সংকলিত হলে ওর এই অবদানের গোটা চেহারাটা ধরা পড়বে বলে মনে করি। জীবনানন্দের গবেষক হিসেবেও ওর জায়গা এযাবৎকালের বাংলাসাহিত্যে সবার ওপরে।

সাহিত্যের জন্যে ওর এই জন্মান্ধ ভালোবাসা আমাকে ওর প্রতি বিস্মিত ও সশ্রদ্ধ করেছে। আমি ওর এই ভালোবাসার দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছি। আজকের নিঃস্বতা-কবলিত বাংলাসাহিত্যের বন্ধ্যাপ্রান্তরে ওকে আমার মনে হয়েছে এর সর্বশেষ রক্ষকদের একজন হিশেবে। আমাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও আত্মস্বার্থসর্বস্ব সাহিত্যজগতের আবিল পরিপার্শ্বে ওকে মনে হয়েছে সেই অম্লান কারুণিকের মতো—যে তার মমতাপেলব হৃদয় ও নিবিড় ভালোবাসার ছোঁয়ায় চারপাশের প্রতিটি লেখক ও সাহিত্যকর্মীর প্রতিটি চেষ্টা ও উদ্যমকে সপ্রেম প্রশ্রয়ে হাতে তুলে নিয়েছে ও তার ভেতরকার শক্তি ও উজ্জ্বলতাকে সবার সামনে উঁচু করে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে।

সাহিত্য-ব্যাপারে আমার সঙ্গে মান্নানের মতপার্থক্য ছিল বিস্তর। মান্নান শিল্পকে স্বয়ম্ভূ সত্তা মনে করেছে, আমি একে দেখেছি সমাজবাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে। কিন্তু এটা আমাদের বন্ধুত্বের পথে কোনোরকম অসুবিধা সৃষ্টি করেনি। শিল্পের প্রতি অবিমিশ্র ভালোবাসায় আমরা পরস্পরের গভীর ও উৎকণ্ঠিত প্রয়োজন অনুভব করেছি এবং জীবনের সবরকম সুখে-দুঃখে পরস্পরের পাশে উপস্থিত থেকেছি। আমি আশা করি আরও কিছুদিন, মৃত্যুর শীতল হাত আমাদের স্পর্শ না-করা পর্যন্ত, এই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে।

১০

আগেভাগে মান্নানের গল্প বলে নেওয়ার কারণটা প্রথমে বলে নিই। 'কণ্ঠস্বর'-এর প্রথম সংখ্যা বের করতে গিয়েই টের পেয়েছিলাম আমাদের দলে কবি বা গল্পকার থাকলেও ভালো প্রবন্ধকার কম। কাজেই মান্নানই এ-ব্যাপারে এখন ভরসা। মান্নানের কাছে কথাটা পেড়েও ফেলেছিলাম পষ্টাপষ্টি : 'গল্প কবিতা যা দেবার দিও, কিন্তু প্রতি দ্বিতীয় সংখ্যায় একটা করে প্রবন্ধ চাই। না হলে পত্রিকা চালাতে অসুবিধা হয়ে যাবে।' মান্নানও রাজি হয়েছিল। ভেবেছিলাম মান্নান প্রতি দ্বিতীয় সংখ্যা সামলালে, বাকি সংখ্যাগুলো আমি নিজে আর সেই সাথে অন্যদের কাছ থেকে লেখা নিয়ে কমবেশি চালিয়ে নিতে পারব।

মান্নানের সঙ্গে কথা হবার দিন-কয়েকের মধ্যেই 'কণ্ঠস্বর'-এর দ্বিতীয় সংখ্যার জন্যে পেয়ে গেলাম ওর প্রবন্ধ : 'শব্দের পাপ ও অন্যান্য অনুষঙ্গ'। প্রবন্ধটা কিছুটা

শক্ত কিন্তু প্রতিটি লাইন কবিতার লাবণ্যে রক্তিম। চমকে দেবার মতো অনেক উক্তিও ছিল লেখাটাতে।

তখন কেবল মান্নান নয়, আমাদের সবার গদ্যই ছিল এমনি, কিছুটা দুর্বোধ্য ও কষ্টকল্পিত। হয়তো সব তরুণের লেখাই কিছুটা এরকম। অপরিণত বয়সে, বক্তব্যগুলো রক্তের ভেতর ঠিকমতো ফলে-ওঠার আগেই লেখার আসরে নেমে যেতে হয় বলে বিষয়ের সেই অনটনকে ভাষার কালোয়াতি ও দুর্বোধ্যতার চোখরাঙানি দিয়ে চাপা দেবার একটা চেষ্টা চলতে থাকে।*

মান্নানের লেখা 'চাহিবামাত্র' হাতে এসে যেতেই পত্রিকার উৎসাহ আবার জ্বলে উঠল। 'কণ্ঠস্বর'কে দীর্ঘজীবী পত্রিকা হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন আমার মনের নিভৃতে। তবু ভেতরে ভেতরে আমি জানতাম শেষপর্যন্ত হয়তো চেষ্টা সফল হবে না। মহান দারিদ্র্য আমাদের সব উদ্যমকে শ্বাসরুদ্ধ করে একসময় অবসন্ন করে আনবে। কাজেই পুরো ব্যাপারটাকে আমি নিয়েছিলাম মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গ হিসেবে—যতদিন চালানো যায় চলবে, না পারলে কুছ পরোয়া নেই, এমনি একটা মনোভাব নিয়ে ফিরে যাব প্যাভেলিয়ানে। প্রথম সংখ্যা বের করার সময় এই বেপরোয়া ভাবটা এতটাই জোরদার ছিল যে এই সংখ্যার গায়ে পত্রিকার প্রকাশকালটা পর্যন্ত লেখার দরকার মনে করিনি। মাসিক পত্রিকা হিসেবে শুরু হল 'কণ্ঠস্বর' অথচ কোন্ বছরের কোন্ মাস থেকে শুরু হল কোথাও লেখা নেই। যেন কারো কোনো মাথাব্যথাই নেই পত্রিকার বাঁচামরা নিয়ে কিংবা যেন এটা কোনো পত্রিকাই নয়, একটা সংকলন মাত্র, ক্ষণকালের আগুনে আকাশ ঝিকিয়ে যে মরে যাবার জন্যেই জন্মেছে।

দ্বিতীয় সংখ্যা নিয়ে কোমর বেঁধে নামতেই মাথায় হাত দেবার মতো একটা ঘটনা ঘটল। এবার আর হাতে পায়ে নয়, সোজা হৃৎপিণ্ডে আঘাত। বিজ্ঞাপন আমাদের একমাত্র ভরসা, অথচ যার ওপর বিজ্ঞাপনের টাকা তোলার ভার দিয়েছিলাম সে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতার কাছ থেকে পুরো টাকা তুলে সেগুলো নিজেই নিয়ে নিয়েছে। এ-ব্যাপারে সে পুরোপুরি নির্বিকার। এটা-যে অন্যায় বা তার যে এ করা উচিত হয়নি এ-বোধই যেন তার ভেতরে নেই। হতাশায় পুরোপুরি মুষড়ে পড়ার কথা ছিল, কিন্তু তা হল না। ততদিনে মাথায় খুন চেপে গেছে। যেভাবেই হোক বের করতে হবে পত্রিকা। প্রথম সংখ্যার সাফল্যের পর শরীরের

---

* তরুণ-লেখকদের লেখা দুরূহ হবার আরও একটা কারণ আছে। সব লেখকেরই জীবনের এই পর্বটা আসলে নিজের নিজের স্বতন্ত্র সাহিত্যভাষা গড়ে তোলার, নিজের কণ্ঠস্বর খুঁজে বেড়ানোর সময়। শ্রমে-যত্নে, কষ্টকর ও সচেতন পরীক্ষানিরীক্ষা ও সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এই ভাষা তিল তিল করে তাদের রোজগার করতে হয়। এই দুরূহ ও কষ্টকর সংগ্রামের ছাপ পড়ে যায় ভাষার শরীরে। ভাষা-দেহ ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। তাছাড়া লেখকজীবনের শুরুতেই অবিস্মরণীয় অবদানে পৃথিবীর চোখ ঝলসে দেবার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণেও অনেক লেখকের ভাষা যান্ত্রিক, অমসৃণ ও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠতে পারে যা লেখার সংখ্যা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নিয়মেই আবার সহজ ও সাবলীল হয়ে যায়।

প্রতিটি প্রাণকোষ যেন খেপে গেছে। কোনো প্রতিবন্ধকতাকেই মন আর স্বীকার করতে রাজি নয়। সি.এস.পি. হবার শেষপর্যায়ে লাহোর সিভিল সার্ভিস একাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের জনা-দশেক বন্ধু—আতাউল, মাসুদ, জিতু, অনু, মোহাম্মদ আলী, মওলা, সাইফুদ্দিন—এমনি আরও কয়েকজন। পরে এরা সবাই হয়েছিল দেশের শীর্ষ আমলা। মাসিক দশ টাকা চাঁদা চেয়ে সবাইকে চিঠি দিলাম। ধার নিলাম বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে। বিজ্ঞাপনের জন্যে ছোটোছুটি করে চললাম উদয়াস্ত। অনেক দূর হেঁটে ফেলেছি আমরা। আর ফেরার উপায় নেই।

১১

হ্যাঁ, আবারও সেই ব্যাপারটার কথা তো ভুলেই রয়েছি দেখছি : হ্যাঁ, একটা ভালো প্রচ্ছদ। প্রথম সংখ্যা ওটা ছাড়া কোনোমতে চালানো গেলেও এবার আর ঐ মধুতে চিঁড়ে ভিজছে না। যতই তা-না-না-না-ই করি, পত্রিকাকে জাতে ওঠাতে গেলে ওটা লাগবেই। কী রাজকীয় জৌলুশ 'সমকাল'-এর প্রচ্ছদে! একেক সংখ্যায় প্রচ্ছদ করছেন একেক খ্যাতনামা শিল্পী, ছাপা হচ্ছে চার রঙে, বৈচিত্র্যে বৈভবে আভিজাত্যের চাদর উড়িয়ে বেরোচ্ছে সে যেন। এর পাশে আমাদের এত হতদরিদ্র হলে চলবে কেন? কিন্তু এর জন্যে প্রচ্ছদশিল্পী বাবদ যে এক-শ টাকা দরকার তা যে আজ পর্যন্ত একখানে করা গেল না। ঝেড়ে পুছে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকার বেশি-যে হচ্ছে না কিছুতেই। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। নাই বা হল পুরো প্রচ্ছদ, অন্তত পত্রিকার নামটা তো লিখে দেবার জন্যে শিল্পীকে অনুরোধ করা যায় ঐ টাকা কটা হাতে তুলে দিয়ে। পত্রিকার চেহারা তাতেও তো একটু খোলে! পত্রিকা তখন প্রকাশের মুখে। দেরি করলাম না। তাড়তাড়ি হাজির হয়ে গেলাম কাইয়ুম চৌধুরীর বাসায়। উনি তখন থাকতেন নয়া পল্টনের একটা ভাড়াটে বাসায়। বাসাটা একতলা, ছোট্ট, সম্ভবত ওপরে টিনের চাল ছিল। বাসার সামনে একটা বড়সড় পুকুর।

যেমন অসাধারণ কাভার আঁকেন কাইয়ুম চৌধুরী, ঠিক তেমনি অবিশ্বাস্য সময় নেন তা এঁকে দিতে। তাঁর কাছ থেকে একটি কাভার আঁকিয়ে নেবার জন্যে যেভাবে তাঁর বাড়ির পথে মাসের পর মাস হাঁটতে হয় তাতে যে-কোনো প্রচ্ছদপ্রার্থীর অন্তত একজোড়া জুতোকে শাহাদাত বরণ করার দরকার হয়ে পড়ে।

কাইয়ুম চৌধুরীর দেরির কারণ ছিল। প্রতিটা কাভার নিয়ে অনেকদিন তিনি ভাবতেন, তারপর এক অবিশ্বাস্য সকালে সেই আইডিয়াটি মাথায় ঝলক দিয়ে যাবার পর শুরু হত তাঁর আঁকাআঁকির পর্ব। কিন্তু কী দীর্ঘ আর নির্মম-যে সেই

ভাবাভাবির সময়, কী প্রাণান্তকর সেই প্রতীক্ষা—সেটা যাঁদের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁরাই শুধু জানে। আমার ধারণা শিল্পীদের মধ্যে দুটো জাত আছে : এক. যাঁরা প্রেরণা-মাতাল হয়ে মুহূর্তের আবেগে শিল্পের ফুল ফোটাতে পারেন; দুই. যাঁরা কাজ করেন ধীর গতিতে, মননশীলতার পথে, অনেক চেষ্টা-যত্ন, ঘষামাজার ভেতর দিয়ে স্বপ্নের প্রতিমাকে একটু একটু করে রূপ দেন, তাঁরা। কাইয়ুম চৌধুরী দ্বিতীয় দলের শিল্পী। শিল্পীরা যেমন-ইচ্ছা-তেমন করে ছবি আঁকুন অসুবিধা নেই, কিন্তু যেখানে অনেক দুঃখে বেদনায় অনুরাগে লেখা একখানি বই ছেপে বের করার জন্যে লেখক করুণ-চোখে প্রতীক্ষা করছেন, প্রকাশক বইয়ের পেছনে টাকা খাটিয়ে অস্থির সময় পার করছেন বা পত্রিকা-সম্পাদকের পত্রিকা প্রকাশের নির্ধারিত দিনটি তলোয়ারের মতো মাথার ওপর আতঙ্কর ভারে ঝুলে রয়েছে সেখানে ব্যাপারটা কিছুটা বিষাদাত্মক হয়ে পড়ে বই কি !

পরবর্তীতে কাইয়ুম চৌধুরী আমাদের অনেক বড় বড় আবদার হজম করেছেন, কিন্তু তখনও তিনি আমাদের চিনতেন না। একদিন তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর কাছে পত্রিকার নামটা লিখে দেবার আরজি জানাতেই বলে উঠলেন, 'আর একদিন আসুন।' শুধু পত্রিকার নামটা লিখে দেবেন এই সামান্য সময়টুকুও হবে না, এ ব্যাপারেও 'আর একদিন'? কিন্তু এই হলেন কাইয়ুম চৌধুরী। তাঁর কাছ থেকে প্রচ্ছদ পেতে হলে দু-পাঁচদিন স্যান্ডেলের সোল খুইয়ে পরে কথা।

পত্রিকার ছাপা শেষ, তাই দেরি করলাম না, দিন-দুয়েকের মধ্যে আবার হাজির হয়ে গেলাম তাঁর বাড়িতে। এবার গেলাম জনা-তিনেক একসঙ্গে, আঁটঘাঁট বেঁধে। যেভাবেই হোক আদায় করতে হবে। বাসায় পৌঁছে দেখি উনি নেই, বাজারে গেছেন। গ্যাট হয়ে বসে রইলাম; যখনই ফিরুন, আজ আর নিস্তার নেই।

মিনিট-পনেরোর মধ্যে তিনি থলি হাতে বাজার থেকে ফিরে এলেন। আমাদের দেখেই চিনে ফেললেন তিনি। নিঃশব্দে থলি মেঝেতে রেখে কাগজ আর তুলি নিয়ে বসে গেলেন নামটা লিখতে।

একবার লিখলেন, পছন্দ হল না। নতুন কাগজ নিয়ে আবার লিখলেন। এবার পছন্দ হল। মৃদু হেসে সেটা তিনি আমার হাতে তুলে দিলেন। অদ্ভুত সুন্দর লেখা। যেমন সহজ তেমন বলিষ্ঠ। এত সুন্দর একটা লোগো হবে আমাদের পত্রিকার ভাবতেও পারিনি। 'কণ্ঠস্বর' শব্দটার মধ্যে যেমন একটা বলিষ্ঠ উদ্যত দ্যোতনা আছে, ঠিক যেন তারই প্রতিমা। মাথা নিচু করে জানতে চাইলাম, কত দিতে হবে। কাইয়ুম চৌধুরী বিব্রত অস্ফুট উচ্চারণে বুঝিয়ে দিলেন, কিছু দিতে হবে না। আমরা চলে যেতে পারি। কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা। কাইয়ুম চৌধুরী টাকা নিতে চাচ্ছেন না টের পেয়ে আরও জোরেশোরে তাঁকে সাধাসাধি শুরু করলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই নিতে রাজি হলেন না।

বিজয়ের আনন্দ আর টাকা বেঁচে যাওয়ার বিপুল স্বস্তি নিয়ে রাস্তায় নেমে প্রাণভরে নিশ্বাস নিলাম।

১২

'কণ্ঠস্বর'–এর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রথম সংখ্যার মতো অতটা হৈচৈ ফেলল না, কিন্তু আমাদের প্রতি পাঠকসমাজের আস্থা টিকিয়ে রাখার মতো মানসম্পন্ন হল।

এই সময় জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম রাজশাহী থেকে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'পূর্বমেঘ' বের করতেন। রুচিতে, পারিপাট্যে, আভিজাত্যে 'পূর্বমেঘ' ছিল আমাদের সময়কার অন্যতম সেরা পত্রিকা। 'সমকালের' মতো দুর্ধর্ষ পৌরুষের ছাপ তার গায়ে ছিল না, কিন্তু ছিল এমন এক মার্জিত পারিপাট্য আর বৈভব যার সমকক্ষ কিছু আমাদের এখানে তখনো দেখিনি। পত্রিকাটা হাতে নিলে সাহিত্যের উচ্চতর মর্যাদাকে স্পর্শ করা যেত। সেই স্নিগ্ধ বৈদগ্ধ্যের স্মৃতি এখনো আমার অনুভূতিতে বেঁচে আছে। দীর্ঘ বারো বছর ধরে প্রায় একটানা প্রকাশিত হয়েছিল 'পূর্বমেঘ'। কতটা নিষ্ঠা আর একাগ্রতা থাকলে রাজধানী থেকে অত দূরে বসে এমন একটা পত্রিকা বের করা সম্ভব তা এখনো ভাবি।

এই 'পূর্বমেঘ'–এ হাসান আজিজুল হকের 'বৃত্তায়ন' নামে একটি শক্তিশালী অস্তিত্ববাদী গল্প পড়ে আমি এই সময় অসম্ভব অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল আমরা সত্যিকার একজন কৃতী গল্পকারকে আমাদের সাহিত্যে পেয়ে গেছি যাঁর রেশ দীর্ঘস্থায়ী হবে। গল্পটার শক্তিশালী ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি আমাকে অসম্ভব উৎসাহী করে তোলে। আমি গল্পটিকে 'সাম্প্রতিক ধারার গল্প'–এ অন্তর্ভুক্ত করে নিই।

চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছিল হাসান আজিজুল হকের সঙ্গে। আমার চাইতে বছর তিন–চারের বড় তিনি। অধ্যাপনা করতেন খুলনা বি. এল. কলেজের দর্শন বিভাগে। পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সবে তাঁর একটা–দুটো করে গল্প বেরোতে শুরু করেছে পত্রপত্রিকায়। 'সমকাল'–এ প্রকাশিত 'শকুন' গল্পের জন্যে তিনি তখন রীতিমতো আলোচিত।

দ্বিতীয় সংখ্যায় ছিল হাসান আজিজুল হকের গল্প 'আপন অন্ধকারে'। ডাকে পাঠিয়েছিলেন তিনি লেখাটি। হাসান আজিজুল হকের বেশকিছু লেখা এই সময় পর্যন্ত ছিল অবক্ষয়ী চেতনায় আক্রান্ত, আমাদেরই মতো অন্ধকারের ভেতর প্রোথিত। তাঁর 'আপন অন্ধকারে'–এর নায়িকার মধ্যেও ছিল সেই অসীম নিঃস্বতার অনুভূতি :

> এখন কী করে আমি ওপরে উঠব, এই সিঁড়িগুলোর ধাপ বেয়ে ওপরে উঠে ওকে..কী করে বলি, আমি শুয়ে পড়তে চাই। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, তোমার দিকে চাইতে পারি না, নিজের দিকে না, পৃথিবীর দিকে না, কোনোদিকে না—আমি এখন অন্ধকার চাই, একাকী হতে চাই, এবং ঘুমিয়ে পড়তে চাই এবং ঘুমিয়ে পড়তে চাই এবং ঘুমিয়ে পড়তে চাই।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই হাসানের চেতনাজগতে পরিবর্তন আসে, ষাটের শেষের দিকে মার্কসবাদী বিপ্লবের স্বপ্নে উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন তিনি। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের কল্যাণের অঙ্গীকার তাঁর স্নায়ু-ধমনীকে অধিকার করে। তাঁর লেখা সামাজিক বাস্তবতার পথে পা বাড়ায়। এই পথে তাঁর সাফল্য অনেক। কিন্তু তাঁর চেতনাজগতের এই পরিবর্তন একটা জায়গায় আমাদের জন্যে বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। এর ফলে আমাদের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক সম্পর্কের সাময়িক ইতি ঘটে যায়। তিনি আমাদের কাছে দূর থেকে দূরতর হয়ে উঠতে থাকেন। হয়তো শ্রেণীশত্রুর সারিতেই একসময় গণ্য হতে শুরু করি আমরা। হয়তো (প্লেটোর মতো) আদর্শ সমাজের জন্যে ক্ষতিকর উপাদান বলেই মনে হতে থাকি। তিনি এবং তাঁর মার্কসীয় সহযোদ্ধারা আমাদের কোন্ শ্রেণীতে গণ্য করেছিলেন জানি না, কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলেই তাঁরা হয়তো টের পেতেন যে প্রথম-ষাটের লেখকদের মধ্যে অবক্ষয়ের প্রবণতা থাকলেও 'কণ্ঠস্বর' কেবল সেই চরিত্রটিকেই ধারণ করেনি। অবক্ষয়ের পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণকামিতাও একইভাবে এই পত্রিকার আরাধ্য ছিল। বহুমাত্রিকতা ছিল এর অন্বিষ্ট। তৃতীয় সংখ্যায় পা দিতে-না-দিতেই নিজের আত্মপরিচয়টি খুঁজে পেয়েছিল 'কণ্ঠস্বর' :

যাঁরা জীবনকে অনুভব করতে চান
শততলে, শতপথে, বিঘ্নিত
রাস্তায় ;
আঙ্গিকের জটিলাক্ষরে, চিন্তার বিচিত্র
সরণীতে ; কটু স্বাদে ও
লোনা আঘ্রাণে ; সততায়, শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে
অভিভূতিতে ও পাপে ;
মহত্ত্বে ও রিরংসায়; উৎকণ্ঠায় ও
আলিঙ্গনে,
'কণ্ঠস্বর' সেইসব পদপাতবিরল তরুণ লেখকদের পত্রিকা।

এ-কথা ঠিক যে অবক্ষয়কে শরীরে জড়িয়েই মঞ্চে এসে হাজির হয়েছিল 'কণ্ঠস্বর', কিন্তু প্রায় প্রথম থেকেই তার উত্তরণ ঘটে গিয়েছিল এক জানালাওয়ালা ঔদার্যের সড়কে। 'কণ্ঠস্বর' ছিল তারুণ্যের পত্রিকা। যা-কিছু নতুন, যা-কিছু তারুণ্যদীপ্ত বা প্রতিভান্বিত তারই কেবল সেখানে ছিল উদার আমন্ত্রণ। স্বকীয়তা এবং প্রতিভাই ছিল তার মূল আরাধ্য। শিল্পের একটা উচ্চায়ত মানদণ্ড ছিল তার। সেই নিরিখে উত্তীর্ণ হলেই কেবল তার পৃষ্ঠায় যে-কোনো লেখার ছিল উদার অভ্যর্থনা।

'কণ্ঠস্বর' আন্দোলন ছিল একটি শিল্প-আন্দোলনের নাম। দল, মত, বিশ্বাস বা আদর্শের জাতপাতের তোয়াক্কা তার ছিল না। লেখার বিষয় বা বক্তব্য নিয়ে কোনো

মাথাব্যথা ছিল না আমাদের। আমাদের চাহিদা ছিল একটাই—ন্যূনতম শিল্পশক্তির পরিচয় দিতেই হবে লেখায়, তাহলেই লেখা প্রকাশিত হবে। ওটি ছাড়া আর কিছু দিয়েই এ শিকে ছিঁড়বে না। হ্যাঁ, সেইসঙ্গে ছিল আরেকটা শর্ত : তরুণ হতেই হবে তোমাকে। তোমাকে হতে হবে জেদি, তেজি, টাটকা, তাজা তরুণ—একরোখা, রাগি, অসন্তুষ্ট তরুণ। হ্যাঁ, রাগি। কেননা রাগ না-থাকলে প্রতিষ্ঠিতদের অচলায়তন ভেঙে নতুন পথ সৃষ্টির বল্গাহীন উল্লাস কোথা থেকে অনুভব করবে রক্তের ভেতর ? কী করে চারপাশের ভণ্ডামির ডেরাকে ছিন্নভিন্ন করবে ?

১৩

আগেই বলেছি মান্নান ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে একান্তচারী। কিন্তু 'কণ্ঠস্বর'-এর প্রকাশনার দৌড়োদৌড়িতে আমরা কাছাকাছি এসে গেলাম। এ সম্বন্ধে মান্নান লিখেছে :

> 'কণ্ঠস্বর'-এর প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসেই খুব সম্ভবত। তখন আমার সামান্য খ্যাতি গল্পকার হিসেবে। 'কণ্ঠস্বর'-এর প্রথম সংখ্যায় গল্পই লিখেছিলাম। একদিন আমার বিজন দুপুরবেলা চমকে ওঠে সাইকেলের ঘণ্টার শব্দে। কে ? বাইরে এসে দেখি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর তখনকার বাহন সাইকেল হাতে দাঁড়িয়ে। ঠিকানা জানলেন কী করে? আর আমার মতো বিজনবাসীর সঙ্গে প্রয়োজনটাই বা কী ? সে সব ভেসে গেল ! সেই শুরু।..

মান্নান যে-সাইকেলটার কথা লিখেছে সেটা কেনা হয়েছিল এর মাত্র মাস-কয়েক আগে। তখনও ওটাই ছিল আমার বাহন। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে আমার বিয়ের পরপরই আমি তেজগাঁর ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজ হোস্টেল ছেড়ে পরপর দুটো বাসা পাল্টে গিয়ে উঠি শাহজাহানপুরে আব্বার বাড়িতে। শাহজাহানপুর থেকে কলেজের দূরত্ব বেশি হয়ে যাওয়ায় ঐ সাইকেলটি আমি কিনেছিলাম। চালিয়েছিলামও বেশকিছু দিন। এরপর কী করে আমার বাহন বদলে গিয়ে সাইকেল থেকে প্রথমে হোন্ডা ও তারপর ভেসপা হয়ে আবার সেই পরিত্যক্ত সাইকেলে ফিরে এসেছিল, সে-বেদনার গল্প ফুটনোটে লেখা থাকল।*

---

* উনিশ তেষট্টি-চৌষট্টিতে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের (এখন বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপত্য বিভাগে আমি বছর-দুই খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে কাজ করেছিলাম। মাসে মাসে সেখানকার বেতন না-নেওয়ায় ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে আমি সেখান থেকে একথোকে হাজার-তিনেক টাকা পেয়ে যাই। এ-পর্যন্ত সাইকেলই ছিল আমার বাহন। কিন্তু ছোটাছুটির কাজে অনেক বেশি

বাসা থেকে কলেজে যাওয়ার পাশাপাশি 'কণ্ঠস্বর'–এর কাজ শুরু হওয়ায় সাইকেলটা আরও জরুরি হয়ে উঠেছিল। তখনো হোন্ডা ভেসপার পর্ব শুরু হয়নি। কাজেই ঐ সাইকেলই তখন ছিল আমার আনন্দ আর সজীবতার বিপুল উৎস। আমার প্রায় সারাদিনের সঙ্গী হয়েছিল ঐ সাইকেলটা। নিজের যাতায়াত তো চলতই, সঙ্গে আর কেউ থাকলেও অসুবিধা নেই, বসে পড়ো সাইকেলের হ্যান্ডেলে, মালিকের সঙ্গে তুমিও পৌঁছে যাবে গন্তব্যে। ঐ সাইকেল–যে কেবল আমার সারাক্ষণের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল তা নয়, সে হয়ে উঠেছিল আমার নবোদ্ভিন্ন যৌবনের অপ্রতিহত স্বাধীনতার প্রতীক। সেদিনের ছোট্ট শান্ত যানবিরল রাজধানী শহরটির একচ্ছত্র অধীশ্বর করে তুলল সে আমাকে। পিচঢালা কালো প্রশস্ত রাজপথ ধরে আমি তখন চলে যাচ্ছি যখন–যেখানে–খুশি — বাধাহীন, উধাও। কোথাও কোনো অসুবিধা নেই। সারা শহর আমার হাতের মুঠোয়। তখনও ভেসপা কেনা ও হারানোর দুঃখ আমার জীবনে আসেনি। তাই এই আনন্দ ছিল এমন নির্ভেজাল আর বিপুল। আজকের এই যানজটকণ্টকিত ঢাকা শহরে এমন মুক্ত অবাধ স্বাধীনতার কথা কেউ কল্পনাই করতে পারবে না।

সাইকেলটার এইসব সুবিধার মতো এর যে এক–আধটা বিষাদাত্মক দিকও ছিল না তা নয়। সেরকম একটি গল্প দিয়ে আপাতত শেষ করব। সাইকেলের তালা

সুবিধা ও আরাম হবে ভেবে আমি সাইকেল বাদ দিয়ে ঐ পুরো টাকা দিয়ে প্রথমে একটা হোন্ডা মোটরসাইকেল কিনি। গাড়িটা আমি মাস–কয়েক চালিয়েছিলাম। কিন্তু হোন্ডার তুলনায় ভেসপা অনেক দৃষ্টিলোভন হওয়ায় আমি সেটাকে বিক্রি করে ইতালির ভেসপা কোম্পানির একটা দৃষ্টিলোভন স্কুটার কিনে ফেলি। ভেসপায় শ্রমবিহীন যাতায়াত ছিল অনেক বেশি উপভোগ্য আর আনন্দদায়ক। ঢাকার জনবিরল রাস্তায় ভেসপায় চড়ে আমি রাজার মতো কলার উড়িয়ে ঘুরে বেড়াতাম। কিন্তু এই রাজসুখ আমার খুব বেশিদিন টেকেনি। রাত্রে গাড়িটা আমি রাখতাম আমার পাশের বাড়ির গাড়িবারান্দার নিচে, ঐ বাড়িরই এক পরিচিত ভাড়াটের একটা বড় সাইজের হোন্ডা মোটরসাইকেলের পাশে। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম ভদ্রলোকের হোন্ডা গাড়িটা ঠিকই দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আমার গাড়ির জায়গাটা খালি। বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। বুঝলাম গাড়িটা চুরি হয়ে গেছে। তালা ভেঙে হোন্ডা মোটরসাইকেল চুরি করা সম্ভব নয়, ও–গাড়ির তালা–ব্যবস্থা খুব মজবুত। তাই হোন্ডাটা রেহাই পেয়ে গেছে। কিন্তু ভেসপা নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। গাড়ি উদ্ধারের জন্য পাগলের মতো ছুটে গেলাম থানায়। গাড়ি চুরির গল্প শুনে ছোট দারোগা একগাল হেসে বললেন : 'আরে সাহেব, দিত সরকার মাসে হাজার দেড়েক টাকা, দেখতেন একদিনের মধ্যে কী করে গাড়ি ফেরত এসে যায়। কিন্তু বেতন মোটে দেড়শ টাকা। এ দিয়ে কি গাড়ি ফেরত পাওয়া যায়—' বলে আমার বিমর্ষ মুখের ওপর খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগলেন। ভেসপা হারিয়ে বেশ কিছুদিন বিষণ্ণতায় ভুগেছিলাম। সেকালে তিন হাজার টাকা আজকের হিসেবে অনেক টাকা। আমি যখন নেহাত শখের বশে তিন হাজার টাকা দিয়ে ঐ ভেসপাটা কিনেছিলাম, তখন আমার এক আত্মীয়া প্রায় একই পরিমাণ টাকা দিয়ে মগবাজারে সাত–আট কাঠা জমি কিনেছিলেন। আজ সে–জমির দাম এক–দেড় কোটি টাকার

কেনার পয়সা জোটাতে না-পেরে একটা বড় সাইজের দরজার তালা কিনেছিলাম এর নিরাপত্তার জন্যে, সেটা ঝুলিয়ে রাখা হত সিটের নিচের স্প্রিঙের সঙ্গে। সাইকেল চলার সময় তালাটা নিচের রডের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ঢনঢন শব্দ করত। ভালো রাস্তা যেমন-তেমন পার হয়ে যেত, কিন্তু রাস্তা খারাপ হলেই শব্দটার বায়ু যেন মাথায় চড়ে বসত। চারপাশের মানুষজনকে ভীত সন্ত্রস্ত করে প্রায় ফায়ার-ব্রিগেডের গাড়ির মতো ঢং ঢং করে দৌড়োতে থাকত সে। সে-সময় মতিঝিল সরকারি স্কুল থেকে আমাদের বাসা পর্যন্ত রাস্তাটা ছিল মাটির—পুরো এবড়োখেবড়ো আর উঁচুনিচু। সেই রাস্তার ওপর আসামাত্র আমার তালাটা বিপুল আবেগে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের ঝালায় পৌঁছে যেত।

৬৬ সালের প্রথমদিকে, একদিন, রাত এগারো-বারোটার দিকে শাহজাহানপুরের বাসায় ফিরছি। উঁচুনিচু রাস্তার ধাক্কায় ঢনঢন শব্দে তালার উচ্চকিত উচ্চাঙ্গসঙ্গীত চলছে। হঠাৎ রাস্তার পাশের অন্ধকারের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'ইহ্, একখেবারে ঠ্যাং ভাঙা ঘোড়াডার মতন দাবড়াইবার লাগছে।' কথাটা শুনে কেমন যেন সংকুচিত হয়ে পড়েছিলাম। নিজের লুকোনো দারিদ্র্যের জন্যে কষ্ট লেগেছিল।

দেখতে দেখতে মান্নানের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জমে উঠল। ওদের ৫০ গ্রিনরোডের বাসাটা হয়ে উঠল আমার উষ্ণ আড্ডার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। অফুরন্ত উদ্দাম হাস্যরোলমুখর সে-আড্ডার যেন শেষ নেই। একেক সময় বাড়ির বাসিন্দাদের শান্তির কথা ভেবে আমরা কেটে পড়তাম পাশের একটা রেস্টুরেন্টে,

---

মতো। অনেকদিন পর্যন্ত রাস্তায় ভেসপা দেখলে মনের ভেতরটায় ধক করে উঠত। মনে হত হয়তো আমার সেই ভেসপাটাই আসছে। কিন্তু কাছে আসতেই বুঝতাম, আমি ভুল করেছি। এটা আমার ভেসপা নয়। গাড়ির এই সমিল চেহারা আমাকে বহুদিন পর্যন্ত কষ্ট দিয়েছে। উপায়হীন হয়ে আমি আমার ফেলে-দেওয়া সাইকেলটা টেনে নিয়ে আবার চালাতে শুরু করলাম। অনেকদিন পর্যন্ত সাইকেলটাকে আমার কাছে আগের তুলনায় অনেক ভারী আর ক্লান্তিকর মনে হত। কিছুক্ষণ চালাতেই শরীর অবসন্ন হয়ে আসত। মনে হত এমনিভাবে প্রাণান্ত কষ্টে সাইকেলের প্যাডেল চেপে চেপেই হয়তো আমার জীবন শেষ হয়ে আসবে। সাইকেলটার প্যাডেল চেপে এগোবার প্রতিদিনের কষ্টের সাথে বহুদিন পর্যন্ত আমার সেই ভেসপাটার কথা মনে পড়েছে।

অনেকবারই মনে হয়েছে ভেসপাটা কিনে হয়তো আমি তখন ভুলই করেছিলাম। থোকে পাওয়া ঐ তিনহাজার টাকা ভেসপার পেছনে না-ঢেলে 'কণ্ঠস্বর'-এ দিয়ে দিলে 'কণ্ঠস্বর' সমস্যার কী অনায়াস সমাধানই না হয়ে যেত। কিন্তু আমি সেটা পারিনি। তরুণ বয়সের লোকদেখানো ফাঁপা মোহে চকিতের জন্য কর্তব্য ভুলে গিয়েছিলাম। একটা নয়নলোভন গাড়িতে চড়ে লোকজনদের সামনে দিয়ে তাদের ঈর্ষা জাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি—এই লোভটা জয় করতে পারিনি। অথচ এই সামান্য কাজটুকু করতে পারলে কত সহজেই না 'কণ্ঠস্বর' বছরের পর বছর বের করা যেত। আজকের মতো এর কষ্টের ইতিহাস এভাবে লেখার দরকার হত না।

সেখানেও চলত সেই আড্ডার মৌতাত। কেবল আমি নই, অনেকেই এসে যোগ দিতে তাতে। শিল্প-সাহিত্য, লেখালেখি, পড়াশোনা, 'কণ্ঠস্বর', পশ্চিমা সাহিত্যের সাড়া-জাগানো খবরাখবর, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ—কী না উঠত সেখানে। মান্নানদের বাসা গ্রিনরোডের ওপর, কাঁঠালবাগান বাজারে ঢোকার গলিটার সামান্য পশ্চিমপাশে। একেকদিন আড্ডা শেষ হলে মান্নান আমাকে রাস্তায় এগিয়ে দিতে এসে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে সায়েন্স ল্যাবরেটারি পর্যন্ত, সেখান থেকে আবার হাঁটতে হাঁটতে ওদের বাড়ি, এভাবে শুধু আসা আর যাওয়া।

এমনি এক আড্ডার কথা কোনোদিন ভুলব না। সেটা ১৯৭১-এর ডিসেম্বর মাসের পাঁচ-সাত তারিখের কোনো এক দিনের গল্প।* বড় বিপজ্জনক সে-আনন্দের মুহূর্ত। স্বাধীনতাযুদ্ধের শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায় তখন। ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে ঢাকার ওপর।

আমার স্ত্রী আর মেয়েদের গ্রামে রেখে আমি তখন ঢাকার নিজের বাসা ফেলে এবাড়ি-ওবাড়ি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। মান্নানদের বাসায় এই সময় ছিলাম একদিন। আমাদের থেকে মাইলখানেক দূরে বিমানবন্দর আর আশেপাশের এলাকায় তখন বুক-কাঁপানো শব্দে ভারতীয় বিমানের অবিশ্রাম বোমাবর্ষণ চলছে, আর আমি আর মান্নান সেই বিমানযুদ্ধের মধ্যে বসে আত্মবিস্মৃতের মতো সারাদিন কালিদাসের কুমারসম্ভব পড়ে চলেছি, মত্ত আত্মবিস্মৃত আবেগে।

---

* গল্পটা যে-সময়কার তখন আমার অবস্থা একেবারে ভালো নয়। ১৯৭১ সালের চৌদ্দই ডিসেম্বর যেসব বুদ্ধিজীবী ঢাকায় নিহত হন, তাঁদের প্রায় সবাই ঘাতকদের কাছ থেকে লাল কালিতে লেখা একটা করে চিঠি পেয়েছিলেন। আমি তাঁদের চেয়েও ভাগ্যবান ছিলাম। আমি পেয়েছিলাম দুটো। এর মধ্যে একটা পেয়েছিলাম আমাদের কলেজের ইসলামী ছাত্রসঙ্ঘের কর্মীদের কাছ থেকে, যারা সত্যি সত্যি আমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। ঘটনাটা আমি জানতে পেরেছিলাম বছর-পনেরো পরে, ঐ দলের একজন সক্রিয় কর্মীর কাছ থেকে। প্রথম চিঠিটাকে উপেক্ষা করলেও দ্বিতীয় চিঠি পাবার পর আমি ভেতরে ভেতরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। এই সময়ে ঢাকা কলেজের হেডক্লার্ক ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। ভদ্রলোক ছিলেন ধার্মিক এবং ভাবুক প্রকৃতির মানুষ, তাঁর শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখের নিমগ্ন ভঙ্গির সঙ্গে তাঁর ভেতরকার চিন্তাশীল মানুষটিকে আশ্চর্যভাবে চোখে পড়ত। ভদ্রলোকের লেখাপড়াও ছিল অনেক। আজকে দেশের কলেজগুলোতে এতটা লেখাপড়া করা 'অধ্যাপক' পাওয়া গেলেও শিক্ষাঙ্গনের এই দুরবস্থা হত না। আমাকে ভয় পেতে দেখে মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব বললেন, 'আপনার কোনো ছাত্র আপনাকে মারবে, এ আমি বিশ্বাসই করতে পারি না।' আমি বললাম, 'মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব,মানবচরিত্রের রহস্য আপনাকে আরও অনেক দিন অধ্যয়ন করতে হবে। মানুষের পতন হয় তার নিকটতমের হাতেই। দুটো কারণে এটা হয়। এক. যে তার সবচেয়ে কাছের তার চেয়ে অব্যর্থ আঘাত কেউ তাকে করতে পারে না। দুই. তার দুর্বলতা ঐ মানুষটির চেয়ে বেশি কেউ জানে না।'

১৪

'কণ্ঠস্বর' বের হবার পর আমাদের আড্ডার মূলকেন্দ্র হয়ে উঠল আমার শাহাজাহানপুরের বাসা। আসলে আড্ডার প্রাণকেন্দ্র হওয়ার কথা ছিল 'কণ্ঠস্বর' অফিসের, আমার বাসার নয়; যেমন 'সওগাত', 'চতুরঙ্গ', 'সমকাল'-এর আড্ডা বসত ওইসব পত্রিকার অফিসগুলোয়। কিন্তু অফিস কোথায় আমাদের? আমাদের তো তা হবার নয়! আমরা তো গানের পাখি—কোকিল। আমাদের তো বাসা হয় না। বাসা হলে যে কোকিল গান ভুলে যায়। আমরা তো স্ট্যান্ডার্ড ম্যাগাজিন বা উচ্চমানসম্পন্ন সাহিত্যপত্রিকা বার করতে বসিনি যে তা যুগীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম মান বা মূল্যবোধকে ধারণ করবে বা হবে সে-যুগের সবচেয়ে নামিদামি লেখকদের প্রতিনিধিত্বশীল কাগজ! আমরা তো বের করতে বসেছি লিটল ম্যাগাজিন—ছোটপত্রিকা, সঙ্গতিহীনদের মুখপত্র, নেহাতই অন্ত্যজ অপরিচিত অপরিগণিতদের কাগজ,—বড় পত্রিকার বৈভব আর জেল্লা আমাদের থাকবে কী করে?

তবু যত দীন আর নিঃস্বই আমরা হই না কেন, একটা জায়গায় আমরা কিন্তু সবার চেয়ে শক্তিশালী। আমাদের সে-শক্তি এতটাই যে, এত বৈভব আর প্রতিষ্ঠার শীর্ষে থেকেও স্ট্যান্ডার্ড ম্যাগাজিন তা কোনোদিন অর্জন করতে পারে না। আমাদের এত শক্তি, কারণ আমরা নতুন। আমরা ভোরের আলোর মতো উপচানো আর অপরিমেয়। আকাশের তারার মতো, জলার পাখির মতো, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো,বালুর মতো আমরা অন্তহীন,অগণ্য। সেইজন্যে আমাদের আপোষহীনতার পত্রিকা, দুঃসাহস আর বিদ্রোহের পত্রিকা। আমাদের এইসব পত্রিকার ভেতর দিয়ে একটা সাহিত্য নতুনদিকে মোড় নেয়, নতুন পথে পা ফেলে। আমরা সাহিত্যের নতুন পালাবদলকে ধারণ করি, নতুন যুগের জন্ম দিই। আমরা ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণিকের জোনাকি। নিজেদের জ্বালিয়ে আমরা অনাগত পৃথিবীকে পথ দেখিয়ে যাই।

লিটল-ম্যাগাজিনের বিদ্রোহ লিটল-ম্যাগাজিনকে বাসিন্দা করে তোলে এক রক্তাক্ত ও নিঃসঙ্গ রাস্তার। নিজের অহংকারী ঔদ্ধত্য ও আপোষহীন অগতানুগতিকতার ভেতর নিরন্তর ও অব্যাহতিহীন সংগ্রামই হয়ে ওঠে তার একমাত্র বিধিলিপি। একটি সত্যিকার লিটল ম্যাগাজিন ও তার সম্পাদকের জীবন ও সংগ্রাম আমাদের দেশে-যে কতখানি মর্মান্তিক আর বেদনাদায়ক হতে পারে তার একটি ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিলাম আমি একবার আমার একটা লেখায় :

> ... ব্যবসা (যা একটি পত্রিকার প্রকাশক্ষম থাকার প্রধান ভিত্তি) না-থাকায় সাহিত্যপত্রিকার, বিশেষ করে লিটল ম্যাগাজিনের কোনো সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা বা সংগঠন গড়ে ওঠে না। তবু মূলধন-আশ্রয় থেকে বঞ্চিত এই নিঃস্ব সামাজিক উচ্ছিষ্টটি আজও-যে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বিরামহীন অতিপ্রজতায় আত্মপ্রকাশ করে যাচ্ছে তার কারণ একটিই : 'সাহিত্যপ্রেম'।

এসব পত্রিকার কার্যত কোনো প্রকাশক নেই। সম্পাদকই এর প্রকাশক। শুধু প্রকাশক নন, একই সঙ্গে তিনি প্রকাশক, স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর, বিক্রয়কর্মী ও টিবয়। সাহিত্যের জন্য এক জন্মান্ধ ও দুর্দম ভালোবাসাকে সম্বল করে একটা শূন্য, নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ— এক কথায় ভয়ঙ্কর পৃথিবীর সঙ্গে প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় তাঁকে একক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। প্রায়শ তিনি একজন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র পরিবারের সভ্য বলে পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও অন্যান্য আয়োজনের যে সংগ্রাম তাঁকে করতে হয়, তার পরিমাণ অনেক হলেও, হৃদয়ের জ্বলন্ত সাহিত্যপ্রেম দিয়ে কোনোমতে হয়তো তিনি তা পার হয়ে যান। কিন্তু, তার পরেই যখন নিজের যৎসামান্য সঞ্চয়, বন্ধুদের ঋণ, সাহায্য এবং অমানুষিক শ্রম—সব মিলে প্রথম সংখ্যা প্রকাশের অভাবনীয় মুহূর্তটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় ততক্ষণে ধরা পড়ে গেছে যে এই নবাগত সম্পাদকটি, ব্যক্তিগত রক্তে যিনি আসলে একজন উজ্জীবিত সৃজনশীল লেখক কিংবা সাহিত্যপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত একজন চাঁদে-পাওয়া মানুষ—তাঁর পক্ষে তাঁর কমনীয় স্নিগ্ধ জীবনানুভূতিগুলো নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের মতো একটি রূঢ় বাস্তব ও বৈষয়িক বিষয়ের মুখোমুখি হওয়া কী নির্মমরকমে কঠিন ও স্নায়ুক্ষয়কারী ব্যাপার। প্রথমত, নগণ্য পরিমাণ অর্থের অভাবে একটি বহু-আকাঙ্ক্ষিত পত্রিকা-অফিস ভাড়া নেয়া তাঁর সাধ্যে কোনোদিন কুলোয় না। নিজের বা বন্ধুবান্ধবদের বাসার কোনো-একটি ঘর ব্যবহার করে তাকে অফিসের কাজটি সেরে নিতে হয়। প্রায় কোনো পর্যায়েই পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করার জন্য একজন ন্যূনতম কর্মচারী নিয়োগ করার সংগতি আমাদের এই শক্তিমান সাহিত্যসংগঠকটির নিয়তিতে জুটে ওঠে না। ফলে তথাকথিত বড় বড় পত্রিকার সম্পাদকেরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় বসে যখন পত্রিকার নীতি-সংক্রান্ত মূল্যবান সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ব্যস্ত, সেই সময় আমাদের ঐ সুযোগ্য কিন্তু নামহীন পত্রিকার অখ্যাত সম্পাদকটিকে শুধু 'সাহিত্যপ্রেম' নামক এক অলীক মরীচিকার আততায়ী আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের মতো সাহিত্যসংস্পর্শশূন্য একটি স্থূল প্রয়োজনের পেছনে রাস্তায় রাস্তায় যৌবনের সমস্ত লালিত্য রঙ সজীবতা নিঃশেষ করে ছুটে বেড়াতে হয়। এর পরেও আছে লেখার জন্য নামি-দামি লেখকদের দুয়ারে-দুয়ারে প্রাণপাতের এক সকরুণ অধ্যায় ; আছে প্রুফ-সংশোধনের ক্লিষ্টতা, টাকার খোঁজে বিড়ম্বিত হওয়ার কাহিনী, প্রেস ও সার্কুলেশন পর্বের হয়রানি ও হঠকারিতা এবং সবশেষে পত্রিকার ব্যর্থতা ও সাফল্যের সার্বিক দায়দায়িত্ব ও বিড়ম্বনা। এভাবে অমানুষিক শ্রমে ও হতাশায় নিঃশেষিত হতে-হতে এই উদ্দীপ্ত সম্পাদকের জীবনীশক্তি ও স্বপ্নক্ষমতা একসময় প্রকৃতির নিয়মেই ফুরিয়ে আসতে থাকে। অসহায়ভাবে তিনি টের পেতে থাকেন তাঁর চারপাশের বাড়িঘর পৃথিবী সবই যেন অবধারিতভাবে শুধু তাঁর ওপরেই ভেঙে আসতে চাইছে। তাঁর ক্লিষ্ট চেহারা মলিন হয়ে আসে দুরপনেয় কালিমায়, বন্ধু ও আত্মীয়েরা তাঁকে নিয়ে ক্রমাগত শঙ্কিত হয়ে উঠতে থাকেন। এমনি এক সময়ে তাঁর দীর্ঘকালের স্বপ্ন ও সাহিত্যপ্রেমের সামগ্রিক অর্থহীনতাকে সর্বাত্মক শক্তিতে প্রতিবাদ করে—অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁর পত্রিকার সবচেয়ে সুন্দর উজ্জ্বল

স্মরণীয় সংখ্যাটি বের করে এই উদ্দীপ্ত সম্পাদকটি কখন–যে একসময় সাহিত্য–অঙ্গন থেকে নিঃশব্দে বিদায় নেন, আমাদের জাতিগত চরিত্রের বহুপরিচিত অকৃতজ্ঞতা তার কোনো খবর রাখে না। দেখুন সম্প্রতিকালের একটি রুচিশীল লিটল ম্যাগাজিনের তরুণ–সম্পাদকের অভিজ্ঞতা কী মর্মান্তিক :

"সাহিত্যপত্রের' কাজ হাতে নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে যেন নির্বাসিত হয়েছি; এও কি আত্মক্ষয়ের বৈনাশিক আচরণ? কাজের নামে এক নিকটজনের স্বর্ণাঙ্গুরি বিক্রি করেছি। চড়া সুদে টাকা ধার নিয়েছি, আর নিজের হর–মাহিনার উপার্জন এ–কাজে বিনিয়োজিত করে প্রায় মানবেতর জীবনের স্বাদ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছি।

লেখা সংগ্রহ করতে গিয়ে পলাশীর কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে কাটিয়েছি। মুখমণ্ডলে সদ্যকৃত 'স্টিচ' নিয়ে আবারো নেমেছি সে–পথে। এ যেন এক অলিখিত বাধ্যবাধকতা।

লেখা সংগ্রহের যে–অভিজ্ঞতা তাও বিচিত্র ; লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোনো–কোনো শ্রদ্ধেয় লেখক আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু ইত্যাদি করে শেষপর্যন্ত বলেছেন, সম্ভব নয়।

একজন প্রতিষ্ঠিত কবি যাঁর কবিতা আমি সাগ্রহে পড়ে থাকি, কিছু আগাম সম্মানী নিয়ে আমাকে একটা লেখা দেন, কিন্তু ক'দিন না–পেরোতেই সেই একই রচনা তিনি একটি সাপ্তাহিকে বেশ চালিয়ে দিলেন। কিন্তু তার আগেই সাহিত্যপত্রের কবিতার ফর্মাটি মুদ্রিত হয়ে গেছে। কবির এ আচরণ কি প্রশংসনীয়?"

প্রবন্ধটা লিখেছিলাম ১৯৮৫ সালে। হয়তো লেখার সময় 'কণ্ঠস্বর' বের করার দুঃখময় স্মৃতিগুলোই ভিড় করেছিল মনের ভেতরে। যে–সম্পাদকের চিত্র তুলে ধরেছি সে হয়তো আমার নিজেরই বর্ণনা। কিন্তু আমার সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল 'সাহিত্যপত্রের' সম্পাদকের ! আসলে এই হল আমাদের জীবন, লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের জীবন। এমনি নিঃস্বতা আর হতাশার ঝুলি কাঁধে নিয়ে, সুকান্তের রানারের মতো, আমরাও পথ হাঁটি। এমনি তিলে তিলে শেষ হয়েই আজন্ম সাহিত্যপ্রেমের ঋণ শোধ করে যাই।

১৫

শাহজাহানপুরের বাসাটা আড্ডার জন্যে ছিল খুব অনুকূল। বাসার নিচের তলার একটা বড় ঘর বরাদ্দ করা হয়েছিল নবদম্পতির থাকার জন্যে, তারই অর্ধেকটা বুকশেল্‌ফ আর আলমারি দিয়ে আলাদা করে তৈরি হয়েছিল আমাদের ড্রয়িংরুম–কাম–'কণ্ঠস্বর'–এর অফিস। একটা সোফা, খানকয় বসার মোড়া, দুটো বইয়ের শেল্‌ফ–এর সাথে সামান্য কিছু অন্যান্য আসবাব— এই নিয়ে গড়ে ওঠে এর

সাময়িক ঘরকন্না। অফিসের সময়সীমা নেই, যে-কেউ যখন-তখন এসে বাসায় আমাকে পেলেই জমে ওঠে আড্ডার আসর। কখনো কখনো আড্ডার সভ্যসংখ্যা দুই থেকে বেড়ে গিয়ে ছয়-সাত বা আটে পৌঁছোয়। তখন সারা বাড়িটাই উদ্দাম হাসি আর আনন্দে কেঁপে-কেঁপে উঠতে থাকে। থেকে-থেকেই চা শিঙাড়া চানাচুরের তপ্ত সরবরাহে এই আড্ডাকে যিনি প্রাণবন্ত ও চাঙ্গা করে রাখে তিনি আমার স্ত্রী। এই সহযোগিতা এমনই অবিরল যে আড্ডা ঝিমিয়ে পড়ার আগেই তা আবার সজীব হয়ে ওঠে।

কিন্তু এখানকার আড্ডা খুব বেশিদিন চলেনি। আড্ডার রমরমা পরিবেশ ভালোমতো দানা বাঁধার আগেই আমি উঠে যাই নিউমার্কেটের পাশে আজিমপুর কলোনির ভেতরকার সদস্য-ভবনে।

সদস্য-ভবন তৈরি হয়েছিল পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের হোস্টেল হিসেবে। ষাট দশকের শেষের দিকে এ ব্যবহৃত হতে শুরু করে সরকারি কর্মকর্তাদের অস্থায়ী আবাস হিসেবে। ৯ নম্বর কামরা বরাদ্দ হয়েছিল আমার নামে। 'সদস্য-ভবন' থাকাকালে এখানকার রান্নাবান্না বা খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হত কেন্দ্রীয়ভাবে। তাই ঘরটায় সংযুক্ত টয়লেট থাকলেও তাতে রান্নার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে রান্না আমাদের ঘরের ভেতরেই করতে হত। কাজেই ঐ আঠারো-বাই-আঠারো সাইজের ঘরটা ছিল একইসঙ্গে আমাদের ড্রয়িংরুম, বেডরুম, রান্নাঘর, কিচেন, স্টোর ও সাড়া-জাগানো সাহিত্যপত্রিকা 'কণ্ঠস্বর'-এর অফিস।

এতরকম দায়দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বেচারা ঘরটা হিমশিম খেয়ে যেত। সোফার ওপর জাঁকিয়ে বসে আড্ডায় আমরা এমনই মশগুল থাকতাম যে আমাদের মনেই থাকত না যে সামনের খাটে বসে-থাকা বা ঘরের কাজকর্মে নিয়োজিত আমার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর এক-আধটু আরু বা একা থাকার প্রয়োজন থাকতে পারে। মাঝে মাঝে অবশ্যি দুয়েকটা বেরসিক ব্যাপার আমাদের এই উচ্চমার্গের আনন্দধারায় বাদ সাধত। যখন সাহিত্য, দর্শন বা ঐ ধরনের অতি উচ্চ কোনো বিষয় নিয়ে আমরা আড্ডায় বিভোর ঠিক তখনই হয়তো আমাদের পাশেই গনগনে চুলোর ওপর শুঁটকি মাছ সেঁকার উৎকট কটু গন্ধ আমাদের ঐ দুটি কাজের পরস্পরবিরোধী চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দিত। এত উৎপাতের পরেও আমার স্ত্রী এইসব মূঢ় ও নির্বিবেকদের জন্য নিয়মিত মুখরোচক খাদ্যের সরবরাহে অম্লান ছিল এবং তাঁর প্রশ্রয়ের কারণেই এই আড্ডা এতটা প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছিল।

আমার পরবর্তী বাসা, ১১/আর গ্রিন রোড স্টাফ কোয়ার্টার্স দীর্ঘ ন-বছর ধরে ছিল 'কণ্ঠস্বর'-এর অফিস। আমার বাসাকেন্দ্রিক 'কণ্ঠস্বর'-এর আড্ডার স্বর্ণযুগও ছিল এই সময়টা। পত্রিকার কাজে,আড্ডায়, পরিকল্পনায়, লেখকদের যাতায়াতে, চা-পানে আর উৎসাহ-উদ্দীপনায় দিনরাত গমগম করত দু-কামরার এই ছোট্ট ফ্ল্যাট। এখানে আড্ডার একটা নতুন ঘরানাই গড়ে উঠেছিল তখন। সপ্তাহের সব দিনই বাসায় লেখকদের যাতায়াত ছিল অবারিত, কিন্তু সাপ্তাহিক ছুটির দিনে—বিশেষ

করে রোববারের সকালে—তাদের সংখ্যা আমার আর্থিক সামর্থ্যের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়াত। লেখকেরা আমার এই করুণ অবস্থাটা আঁচ করেই হয়তো একসময় নিজেদের উদ্যোগে আমার আতিথ্যের দায়ভাগ নিজেরাই ঘাড়ে নিয়ে নিতে শুরু করে। রোববার সকালে আমার বাসায় আসার পথে অনেকেই বাজার ঘুরে অসত। ফলে কোনোদিন কেউবা মুরগি, কেউ মাছের মুড়ো, কেউ মাংসের কিমা—এমনি নানান রসনালোভন উপচার নিয়ে হাজির হত। সেসব রান্নাবান্নার পর দুপুরে জমে উঠত হৈহল্লা সমাকীর্ণ মধ্যাহ্নভোজন।

১৬

এরকম একটা গণখাবারের স্মৃতি এখনও খুব স্পষ্টভাবে মনে পড়ে। একদিন, ১৯৭৪-এর কেনো-এক দিনে, দুপুর গড়িয়ে যাবার পর শহীদ কাদরী, আল মাহমুদ, রফিক আজাদ সহ সাত-আটজনের একটা দল এসে হাজির।

বাসায় ঢুকেই শহীদ স্বভাবগত উদ্দাম হাসিতে ঘর কাঁপিয়ে বলল, 'আবে। খাইবার দে। খিদা লাগছে।' মুখে ওর সেই পেটেন্ট-করা ঢাকাইয়া ভাষা। দুপুরের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, বাসায় খাবার ছিল না। আমার স্ত্রী তাড়াতাড়ি রান্নার আয়োজনে চলে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে খাবার পরিবেশিত হল। গরম ভাত, ঘন ডাল আর সেইসাথে পিরিচ-বোঝাই ডিমের মামলেট। পৃথিবীতে ডিমের মামলেট নামের গোবেচারি জিনিশটা ছিল বলেই না বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্তেরা এভাবে হঠাৎ-অতিথিদের সামাল দিতে পারে। আমরা বাইরের ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম—কয়েকজন সোফায়, কেউ খাটে, কেউ মেঝেয় বসে। আড্ডার উদ্দাম আর প্রাণকাঁপানো হাসিতে ছোট্ট ঘরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। ঘ্যাসঘেসে ভরাট গলায় কী প্রাণখোলা হাসিই না হাসতে পারত শহীদ। আমার নিজের ভেতরেও সারাজীবন ছিল অমনি উদ্দাম হাসির দমক। আজ বৃদ্ধবয়সে সে-'উদ্দাম হাস্য' 'কাস্যে' পরিণত হয়েছে।

খাবার আসতেই সবাই যে-যার জায়গায় বসে আহারে মনোযোগী হয়ে উঠল। সবারই খিদে পেয়েছিল, তাতে গরম খাবার, গোগ্রাসে গিলতে লাগল সবাই। অনেকক্ষণ কথা নেই। খাওয়া যখন শেষের দিকে, হঠাৎ শহীদ বলে উঠল, 'অনেক টাকার ভাত খাইয়া ফালাইলাম দোস্ত।' হঠাৎ ধাক্কা খেলাম। অনেক টাকার ভাত? ভাতের আবার দাম আছে নাকি? এই তো সেদিন, একাত্তরের যুদ্ধের সময়, চালের মণ ছিল পনেরো টাকা। ঐ দামে কেনা চাল যদি অতিথি-আপ্যায়নে সের-দুয়েক বেরিয়েই যায় কেউ কি তার দাম নিয়ে হিসেব করতে পারে? মানছি যে, গত তিনবছরে মুদ্রাস্ফীতির কারণে সবকিছুর মতো চালের দামও অনেক বেড়েছে। কিন্তু তা বলেই কি তা মাথা-ঘামানোর ব্যাপার? কিন্তু একটু ভাবতেই মনে হল : না, ওর

কথাটা আসলেই ঠিক। এর ভেতর অবস্থা অনেক পাল্টে গেছে। বাজারে চালের দাম এখন বেশ চড়া। এ মাসেই তা চার–শ টাকা ছেড়েছে। চারদিকে আর্তস্বর। দুর্ভিক্ষের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে সবখানে। এর মধ্যে দুয়েকজনের মৃত্যুর খবরও পত্রিকায় বেরিয়েছে। কাজেই ভাতের দাম বলে শহীদ এমন আর ভুল বলেছে কি?

এমনি ছিল শহীদ। এমনি উৎকর্ণ আর প্রখর। বাতাসে নতুন হাওয়া সামান্যতমভাবে বইতে শুরু করলে প্রথম মুহূর্তেই ও তার আঁচ পেয়ে যেত। বাংলাদেশে সেই প্রথম ভাতের দামের কথা আমি শুনি। এখন সবকিছুর ব্যাপারে তা প্রযোজ্য।

ইংরেজিতে যাকে উইটি মানুষ বলে শহীদ ছিল তারই জীবন্ত উদাহরণ। ক্ষুরধার বুদ্ধির উদ্ভাস আর রঙ্গরসের অফুরন্ত সম্ভার ছিল ওর মধ্যে। ও বুঝে গিয়েছিল, ঢাকাইয়া কুট্টিদের হালকা উর্দুর ভিয়েন লাগানো ভাষায় তুচ্ছকথাও হাস্যরসাত্মক শোনায়, তাই আড্ডায়–ইয়ার্কিতে ঐ ভাষাই সারাক্ষণ ব্যবহার করত শহীদ। সিরিয়াস কথার সময়ও করত। উর্দু ওর মাতৃভাষা ছিল বলেই হয়তো এই ভাষাটাকে নিয়ে অমন সহজে খেলতে পারত ও। ভাষাটাকে ওর মুখে অসম্ভব মুখরোচক লাগত। বর্ষাকালের ফ্লু'র মতো এই ভাষা আমাদের সবাইকে সংক্রামিত করে ফেলেছিল। এ হয়ে উঠেছিল আমাদের সবার কথাবার্তার লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। শহীদের মার্জিত ভরাট গলায় ভাষাটার এমন একটা উজ্জ্বল নান্দনিক রূপ তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে একে আমরাও যেন আমাদের মুখের ভাষা বলেই মেনে নিয়েছিলাম। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার সময়ও আমরা প্রায়ই ঐ ভাষা ব্যবহার করতাম। কেবল আমরা না, আমাদের চেয়ে প্রবীণ লেখকদের অনেকেও ওর ঐ ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আমরা সবাই শহীদের ঐ ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু কারো কথাই ঠিক ওর মতো মুখরোচক হত না। এই অনন্য ভাষাটা শহীদের সঙ্গে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিল, ওর সঙ্গেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে।

হল্লায় আড্ডায় হাসিতে কথায় ও যেমন ছিল অফুরন্ত তেমনি চৌকশ। টেবিলের আড্ডায় ওর সাথে পারা ছিল অসম্ভব। এ–ব্যাপারে ও–যে কতটা তুখোড় ছিল ওর কয়েকদিনের কয়েকটা গল্প বলে তা বোঝানোর চেষ্টা করি।

একদিন জিন্নাহ অ্যাভিনিউর (এখনকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউর) রেক্স রেস্টুরেন্টে বসে আমি আর শহীদ আড্ডা দিচ্ছিলাম। রেক্স তখন ঢাকার উঠতি লেখক আর বুদ্ধিজীবীদের পদপাতমুখর রেস্টুরেন্ট,তার পরোটা–কাবাব ঢাকার বিখ্যাত জিনিশের একটি। শহীদ ব্যক্তিগতভাবে পড়াশোনা করেছিল বিস্তর, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার ব্যাপারে ওর কোনো উৎসাহই ছিল না। বড়ভাইয়ের আস্কারায়–আদরে এ–ব্যাপারে বখেই গিয়েছিল ও প্রায়। আমি সেদিন ব্যাপারটা নিয়ে ওর কাছে কিছুটা দুঃখ করছিলাম। বলছিলাম, 'দ্যাখ তুই এত মেধাবী মানুষ, সাহিত্যের ওপর এত ব্যক্তিত্বব্যঞ্জকভাবে কথা বলিস। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা করে পি–এইচ.ডি. ডি.লিট. হলে তুই কী হতি ভেবে দেখেছিস। একটা

আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বই হয়ে যেতি হয়তো একদিন।' আমার কথা শুনে হঠাৎ ও চুপ হয়ে গেল। তারপর, যেন নিজেকে বলছে এভাবে, ভারী গভীর গলার নিচুস্বরের বিমর্ষ স্বগতোক্তির মতো করে বলতে লাগল : 'তহন কি আর ভাবছিলাম সহীদ কাদরী হমু, তহন তো ভাবছিলাম রবীন্দ্রনাথ হমু। নোবেল প্রাইজ পাইয়া যামু। পড়নউড়ন লাগব না।' বলেই সেই দমফাটানো সংক্রামক হাসি। উদ্দাম অননুকরণীয় ভঙ্গিতে প্রতিটা শব্দকে জীবন্ত করে ও এমনভাবে ছুড়ে দিত যে, কথাটার সমস্ত শক্তি আর মত্ততা আমাদের রক্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়ত।

আর-একদিনের একটা গল্প মনে পড়ছে। আমি তখন নয়া পল্টনের ড. আইয়ুব আলির বাড়ির এককোণের একটা বিচ্ছিন্ন ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। ঘটনাটা উনিশ-শ তেষট্টি-চৌষট্টি সালের। এই সময় আমার এক শিষ্য জুটেছিল। সে আমাকে প্রকাশ্যে 'গুরুদেব' সম্বোধন করে সবার সামনে আমার অলৌকিক মহিমা কীর্তন করে আমাকে অসীম লজ্জায় ফেলত এবং সেই অনাবিল গুরুভক্তির বিনিময়ে নিয়মিত আমার অজান্তে একটা সুবিধা নিত। ঘরের বাইরে যাবার সময় ঘরের চাবিটা আমি কোথায় লুকিয়ে রেখে যেতাম তা ও দেখে নিয়েছিল। আমি যখন ঘরে থাকতাম না, ও তখন সেই চাবি দিয়ে ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে মহানন্দে পা নাচাতে থাকত আর যাবার সময় প্রতিদিনই শেল্‌ফ থেকে দু-চারটা করে বই নিয়ে বাড়ি যেত। নিতে নিতে আমার তিনভাগের একভাগ বই-ই প্রায় হাতিয়ে ফেলল ও। আমি প্রতিদিনই ব্যাপারটা টের পেতাম কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। এতবড় একজন জবরদস্ত শিষ্যকে কী করে এমন তুচ্ছ বৈষয়িক কথা তুলে বিব্রত করা যায়। উপায় না-পেয়ে কথাটা একদিন শহীদকে জানলাম। বললাম, 'বল্ তো কী করে ওকে থামানো যায়? আর তো সহ্য করতে পারছি না।' শহীদ বলল, 'এক কাম কর্ দোস্ত। পরের দিন যহন আইব, তহন পয়লা ভালো কইরা চা চু খাওয়াইয়া লইবি। তারপর কইবি : বেবাক জিনিসই তো লইয়া গেলা মিয়াঁ, এইবার ঘরের এই খাটটারে ভি লইয়া যাও। খুব ভালো ঘুম হয়।' যে-ভঙ্গিতে ও কথাগুলো বলেছিল, আমি জানি, আমার এই বিরস লেখায় সে-রসের এতটুকুও প্রকাশ করতে পারলাম না। কিন্তু এখানে না-পারলেও শিষ্যের ব্যাপারে সেটা খুবই কাজে লেগেছিল। খাট নিয়ে যেতে সে আর কোনোদিন আসেনি।

১৭

আর-একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে শহীদের। ও তখন বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান-প্রযোজক। ওর মতো জন্ম-বোহেমিয়ানের পক্ষে ওই গৎবাঁধা কেরানিগিরি-যে কতটা কষ্টকর তা আমরা সবাই বুঝতে পারতাম। আজেবাজে স্ক্রিপ্ট সংশোধন, লোকজন জোগাড় করে রিহার্সাল, প্যানেল ওয়ার্ক, দিনের পর দিন প্রোগ্রাম তৈরি-

–এসবের চাপে ও হাঁপিয়ে উঠত। ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ত একেকদিন। সবার ধারণা ছিল টেলিভিশনে শহীদ অসাধারণ কিছু দেখাবে। কিন্তু হল উল্টোটা। ও প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল। ওর এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা দেখে একদিন বললাম : সবাই ভাবল টেলিভিশনে তুই ভালো করবি, তো তুই এমন হেজে গেলি কেন?

ও বলল : দ্যাখ মাইনসে সুচ হইয়া ঢুকে, ফাল হইয়া বাইরয়। টেলিভিসনে আমার কী অইছে জানস?

'কী অইছে?'

'অইছে উল্টাডা।'

'কী সেটা?'

'আমি হালায় ফাল হইয়া ঢুকলাম আর সুচ হয়্যা রয়্যা গেলাম।'

'রয়্যা গেলাম' কথাটা বলে এমন উদ্দাম ঘর–কাঁপানো হাসি হাসতে লাগল যে আমি হাসতে হাসতে প্রায় শুয়ে পড়লাম।

আর–একদিনের একটা গল্প বলে শহীদ–প্রসঙ্গ শেষ করব। গল্পটা আল মাহমুদকে নিয়ে। বাথরুমে বরাবরই শহীদের অনেকক্ষণ সময় লাগত। সেজন্যে ও নানা জাতের বই পত্রপত্রিকা কমোডের পাশে একটা ছোট টেবিলের ওপর জমিয়ে রেখেছিল, বাথরুমের লম্বা সময়টা ওসব পড়েই কাটাত। ঘটনাটার দিন–দশেক আগে আল মাহমুদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তর' বেরিয়েছে। বইটার একটা কপি শহীদকে ও দিয়েছিল। এই বইটাও শহীদ ঐ বাথরুমে রেখে দিয়েছিল। কদিনে বারকয়েক বইটার পাতা উল্টিয়ে দেখছে। সেদিন ও বাথরুম থেকে বেরোব বেরোব করছে, এমন সময় আল মাহমুদ ওর ঘরে এসে হাজির। ঘর থেকে আল মাহমুদের উত্তেজিত গলা শোনা গেল, 'শহীদ, কই তুই দোস্ত?' শহীদ ওকে কথা দিয়েছিল আল মাহমুদ সেদিন ওর বাসায় এলে বইটা সম্বন্ধে ওর ভাবনাগুলো আল মাহমুদকে বলবে। আল মাহমুদের এত অস্থিরতা সেইজন্যে।

বাথরুম থেকেই গলা চড়িয়ে শহীদ আল মাহমুদকে বলল, 'তোর ল্যাখা পইড়া ফালাইছি দোস্ত। যা ল্যাখছস না, বাংলা সাহিত্যে বহুৎ দিন এইরকম কবিতা হয় নাই।' নিজের কবিতা নিয়ে আল মাহমুদের ভেতর বরাবরই একটা প্রচণ্ড উদ্দীপনা আছে। শহীদ সেটার সুযোগ নিয়ে মজা করতে চায়।

'কস কী?' আল মাহমুদ লাফিয়ে উঠল।

শহীদ টের পেল আল মাহমুদ ঘরের এপাশ থেকে ওপাশে উত্তেজিতভাবে হাঁটাহাঁটি করছে।

শহীদ প্রশংসার মাত্রা চড়িয়ে দিল। 'তোর কবিতা পইড়া পাগলা হইয়া গেছি দোস্ত। পড়তে পড়তে ব্যাবাক কবিতা মুখস্তই কইরা ফালাইছি।'

আল মাহমুদ পাগলের মতো হয়ে উঠল,'কস কী দোস্ত?'

'বিশ্বাস করলি না? তুই চাইলে বইয়ের পরথম থেইকা শ্যাষ পর্যন্ত মুখস্ত সুনাইবার পারি।'

'শুনা দেখি !' আল মাহমুদের গলায় সন্দেহপূর্ণ অবিশ্বাস।

'সত্যি সুনবি ?'

'শুনা না !'

'তাইলে সুন।' বলে 'লোক লোকান্তর' বইটা হাতে নিয়ে শহীদ একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করে যেতে লাগল। আনন্দে উত্তেজনায় আল মাহমুদের অবস্থা প্রায় পাগলের মতো। ছোটাছুটি ছেড়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়েছে ওর। আল মাহমুদের উত্তেজনা যখন তুঙ্গে ঠিক সেই সময় বাথরুমের দরোজা খুলে বেরিয়ে এল শহীদ, হাতে 'লোক লোকান্তর'। আল মাহমুদের মুখের ওপর বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এই যে দ্যাখ সালা !'

বই দেখে আল মাহমুদের চোখ শাদা হয়ে গেল।

'বুঝছস অহন ?' সেই খ্যা খ্যা করা প্রাণঘাতী হাসি।

শাদাসিধা সরল আল মাহমুদ মুহূর্তে করুণ হয়ে গেল। বিষণ্নমুখে বলল, 'আমার সঙ্গে এইরকম তামাশা করলি দোস্ত ?'

এই ছিল শহীদ কাদরী, আমাদের সবচেয়ে ক্ষিপ্রবুদ্ধিসম্পন্ন, আড্ডাপ্রিয়, আমুদে আর প্রাণবন্ত বন্ধু। ওর সাহচর্যের প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে আজও সপ্রাণ হয়ে আছে।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝিতে ও দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। প্রথমে গিয়েছিল জার্মানিতে, তারপর আমেরিকায়। সবার মতো আমিও ওকে ভালোবাসতাম। গত পঁচিশ বছরে মনে মনে ওকে কত খুঁজেছি, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই প্রায় রাখেনি ও। এর মধ্যে ওকে নিয়ে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা কানে এসেছে। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে ওর বিবাহ-বিচ্ছেদের গল্প, আমেরিকায় ইহুদি রমণীর পাণিগ্রহণের কাহিনী, ওর বিপুলরকমে মোটা হয়ে যাবার বর্ণনা, এমনি কত কী। বছর-দুই আগে, প্রায় পঁচিশ বছর পর ওর সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য দেখা হল বস্টনে। না, কিছুই তো বদলায়নি শহীদ। দেখতে যেমন ছিল তাই আছে, কথাবার্তাও সেই আগের মতোই, কেবল আর লেখে না ও। শূন্যতা আর নিঃসঙ্গতার আক্রমণে বিছানাজুড়ে এপাশ-ওপাশ করে না আগের মতো। সেই উদ্দাম হাসিতে ফেটে পড়ে না আর। না, আগের মতো সেই অফুরন্ত সময়ও নেই আর ওর হাতে। বন্ধুদের বাড়ি থেকে বাড়িতে আড্ডা দিয়ে রাতভর সড়ক থেকে সড়কে, রাস্তা থেকে রাস্তায় লাইটপোস্টের নিচ দিয়ে দল বেঁধে হেঁটে ষাটের দশকের সেই ছোট্ট শান্ত জনবিরল শহরটাকে সচকিত করে বেড়ানোর মতো সেই অফুরন্ত অনাবিল অপ্রয়োজনীয় সময় আর ওর হাতে নেই।

ষাটের দশকের অন্যতম শক্তিমান কবি শহীদ কাদরী। ওর ভেতরকার ব্যতিক্রমী ব্যক্তি-মানুষটির মতোই ওর কবিতাও ছিল সবার থেকে আলাদা ও স্ব-স্বভাবী। এতকাল কবিতা বলতে আমরা যা বুঝেছি বা জেনেছি, ওর কবিতা তার একেবারেই বাইরে। সবার থেকে ও এতই আলাদা যে শেষ অব্দি ও আদৌ কবি কি না তাই নিয়েই অনেক সময় সন্দেহ জেগে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে ওর কবিতার মধ্যে নিমগ্ন হতে পারলে সে ভুল সহজেই কেটে যায়। কবিতায় মাধুরী বা লাবণ্য বলতে সচরাচর আমরা যা বুঝি ওর কবিতায় তা ঠিক নেই, অবর্ণিল আর খরখরে ওর কাবতার শরীর, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারলে যে-

কেউ দেখতে পাবে ওর ভেতরকার বুদ্ধি, মেধা আর মননশীলতার সূক্ষ্ম তীব্র বিদ্যুৎরেখা কীভাবে ওর কবিতার পরতে পরতে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওর কবিতা তাই হুটহাট করে পড়ে গেলেই চলে না। আমাদের পড়তে হয় থেমে থেমে, রসিয়ে রসিয়ে, অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু যখন জীবনের গভীর কোনো আবেগ বা চরিতার্থতায় অস্তিত্ব ফলবান হয়ে ওঠে তখন ওর কবিতা হয়ে ওঠে অন্যরকম—স্বপ্নেভরা, উধাও। পুরোপুরি জনপ্রিয় কবিতাই লিখে ফেলতে পারে ও তখন :

ভয় নেই
আমি এমন ব্যবস্থা করবো যাতে সেনাবাহিনী
গোলাপের গুচ্ছ কাঁধে নিয়ে
মার্চপাস্ট ক'রে চ'লে যাবে
এবং স্যালুট করবে
কেবল তোমাকে প্রিয়তমা।

ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো
বন-বাদাড় ডিঙিয়ে
কাঁটা-তার, ব্যারিকেড পার হ'য়ে, অনেক রণাঙ্গনের স্মৃতি নিয়ে
আর্মার্ড-কারগুলো এসে দাঁড়াবে
ভায়োলিন বোঝাই করে
কেবল তোমার দোরগোড়ায় প্রিয়তমা।

ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো—
এমন ব্যবস্থা করবো
বি-৫২ আর মিগ-২১গুলো
মাথার ওপর গোঁ-গোঁ করবে
ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো
চকোলেট, টফি আর লজেন্সগুলো
প্যারাট্রুপারদের মতো ঝ'রে পড়বে
কেবল তোমার উঠোনে প্রিয়তমা।

ভয় নেই..আমি এমন ব্যবস্থা করবো
একজন কবি কমান্ড করবেন বঙ্গোপসাগরের সবগুলো রণতরী
এবং আসন্ন নির্বাচনে সমরমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায়
সবগুলো গণভোট পাবেন একজন প্রেমিক, প্রিয়তমা!

সংঘর্ষের সব সম্ভাবনা, ঠিক জেনো, শেষ হ'য়ে যাবে—
আমি এমন ব্যবস্থা করবো, একজন গায়ক

অনায়াসে বিরোধীদলের অধিনায়ক হ'য়ে যাবেন
সীমান্তের ট্রেঞ্চগুলোয় পাহারা দেবে সারাটা বৎসর
লাল নীল সোনালি মাছ—
ভালোবাসার চোরাচালান ছাড়া সবকিছু নিষিদ্ধ হ'য়ে যাবে, প্রিয়তমা।

ভই নেই
আমি এমন ব্যবস্থা করবো মুদ্রাস্ফীতি কমে গিয়ে বেড়ে যাবে
শিল্পোত্তীর্ণ কবিতার সংখ্যা প্রতিদিন
আমি এমন ব্যবস্থা করবো গণরোষের বদলে
গণচুম্বনের ভয়ে
হন্তারকের হাত থেকে প'ড়ে যাবে ছুরি, প্রিয়তমা।

ভয় নেই,
আমি এমন ব্যবস্থা করবো
শীতের পার্কের ওপর বসন্তের সংগোপন আক্রমণের মতো
অ্যাকর্ডিয়ান বাজাতে-বাজাতে বিপ্লবীরা দাঁড়াবে শহরে,

ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো
স্টেটব্যাঙ্কে গিয়ে
গোলাপ কিম্বা চন্দ্রমল্লিকা ভাঙালে অন্তত চার লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে
একটি বেলফুল দিলে চারটি কার্ডিগান।
ভয় নেই, ভয় নেই
ভয় নেই,
আমি এমন ব্যবস্থা করবো
নৌ, বিমান আর পদাতিক বাহিনী
কেবল তোমাকেই চতুর্দিক থেকে ঘিরে-ঘিরে
নিশিদিন অভিবাদন করবে, প্রিয়তমা।

[তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা]

১৮

এই পর্বের শেষের দিকে যাবার পথে আর-একজনের গল্প এখানে বলে না নিলেই নয়। তবে তার কথা বলতে হলে আমাদের ঢাকা ছেড়ে যেতে হবে উত্তরবঙ্গের পশ্চিমপ্রান্ত ছোঁয়া রাজশাহীতে; সেই ধুলো-ওড়া, আমার তরুণ-বয়সের স্বপ্ন আর বেদনায় ভারাক্রান্ত রূপসীর মুখের মতো শহরটাতে।

১৯৬২ সালের এপ্রিল মাস। রাজশাহীতে তখন সবে আমি গিয়েছি সরকারি কলেজের শিক্ষক হয়ে। সেই কলেজেই মোহাম্মদ রফিকের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। ও তখন আর ঐ কলেজের ছাত্র নয়, যদিও কিছুদিন আগেও ও ছিল ঐ কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি। আইয়ুব খান রাজশাহী গেলে তাঁর বিরুদ্ধে ছাত্রবিক্ষোভে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ও তখন বহিষ্কৃত। ধারালো ছুরির মতো ঝকঝক করছে ওর চেহারা। একহারা কালো শরীর থেকে দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে। ধ্রুপদী ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বড় বড় লেখকদের বইয়ের জগতে পাল উড়িয়ে ছুটছে তখন ও। গ্যেটে, শিলার, বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, হাইনে তখন ওর প্রিয় লেখক। একদিন ওর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল চকিতের জন্যে। কিছুক্ষণের জন্য সাহিত্য নিয়ে কথাও হয়েছিল দুয়েকটা, তারপর ব্যস্ততার কারণে ছিটকে যেতে হয়েছিল আলাদা দিকে।

এরপর ওর সঙ্গে আমার আবার দেখা ঢাকায়, হোটেল লাইন ভ্যালির আড্ডায়। আমাদের প্রতি মুহূর্তের আনন্দে, বন্ধুত্বে ও ছিল প্রাণ আর উৎসাহের অন্যতম নির্ঝর। ওর আবেগপ্রবণ চরিত্র ও উচ্চায়ত সাহিত্যের হিরণচ্ছটার বিভায় আমাদের অনুভূতিকে প্রাণবন্ত রেখেছে ও অনেকদিন। নিজের ভেতরকার মহত্ত্ব-পিপাসার কারণে ও চিরায়ত সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, নাকি চিরায়ত সাহিত্যের প্রভাবে ওর ভেতর মহত্ত্ব-পিপাসা জেগেছিল বলতে পারব না, কিন্তু একটা উচ্চতর জীবনের আকুতি-যে ওকে অহোরাত্র উন্মুখ আর উন্নিদ্র করে রাখছে তা আমরা , ওর কাছের মানুষেরা, প্রতিমুহূর্তেই অনুভব করতাম।

রফিক আজাদ থেকে পার্থক্য করার জন্যে ওকে সবাই ডাকত পি-রফিক বলে। এই 'পি' নামটা কে দিয়েছিল মনে নেই, তবে শুনেছি নামটা দেওয়া হয়েছিল দুটো উদ্দেশ্যে : পি-তে প্রফেটও ভাবতে পারো আবার পাগলও ভাবতে পারো—যে যা চাও ভেবে নাও। ভাবনার ঊর্ধ্বমার্গবাসী রফিক এসব নিয়ে মুখ টিপে হাসত। আস্তে আস্তে ঐ নামেই পরিচিত হয়ে উঠল ও। এখনও আমাদের কাছে ও তাই। যদ্দুর শুনেছি নামটা দুষ্টু ইলিয়াসই দিয়েছিল, কেননা আমাদের মধ্যে এই ধরনের প্রাণঘাতী রসিকতার ঝোঁক কেবল ওর মধ্যেই ছিল। কারো ওপর চটে গেলে ও তাকে 'গাগোল' বলে ডাকত। নিষ্পাপভাবে বলত, 'তুমি একটা আস্ত গাগোল হে, বুঝলে !' বলে খুব একগাল হেসে নিত। ভাবটা এমন : গালটা দিলাম কেমন? 'গাগোল' শব্দটা অভিধানে নেই। শব্দটা ওর নিজেরই বানানো। গাগোল হল 'গাধা আর পাগোল'-এর সন্ধি। যাকে ডাকা হল সে এর মানে বুঝছে না দেখে সেই আনন্দে ও আর-একবার হেসে নিত প্রাণ ভরে। এভাবে সারাদিনই এমনি ছোটখাটো তুচ্ছ আনন্দে অকারণ হাসির ভেতর শিশুদের মতো উচ্ছল হয়ে থাকত ইলিয়াস। ওর ভেতরকার গভীর মানুষটির চারপাশ ঘিরে এমনই ছিল একটা নির্মল চটুল আনন্দের উচ্ছল স্রোত।

ইলিয়াস রফিককে পাগল অথবা প্রফেট —এ দুয়ের যে-কোনো একটা ভাবার সুবিধা দিলেও আসলে রফিক ছিল একসঙ্গে এই দুটোই। ওর মধ্যে ছিল অতীন্দ্রিয় আনন্দানুভূতির

এক উত্তাল ঝোড়ো আবেগ। সেই আবেগ ওকে ছাপিয়ে ওর চারপাশের সবাইকে আনন্দমুখর করে রাখত। এই ব্যাপারটা ওকে কখনো নিঃসঙ্গ হতে দেয়নি। স্বভাবের এই মত্ত আনন্দ দিয়ে একদিন ওর চারপাশে বন্ধুদের ও আকর্ষণ করেছে, এখনো ছাত্র আর শুভার্থীদের আকর্ষণ করে। এটা ওর আনন্দোচ্ছল পাগলামির দিক। ওর ভেতর যে-মহত্ত্বের আকুতির কথা আগে বলেছি, তা হল ওর প্রফেটিক দিক।

ষাট দশকের শেষের দিকে ও চলে যায় চট্টগ্রামে, ওখানকার সরকারি কলেজের শিক্ষক হয়ে। আমি ঐ সময় দুবার সপরিবারে ওর বাসায় গিয়ে থেকেছি। প্রথমবার ছিলাম ওর দেবপাহাড়ের বাসায়। সে-যাত্রার প্রথম রাতটা ছিল ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের বিখ্যাত রাত। ঝড়ের সময় ঘরে শুয়ে আমরা শুধু বাতাসের উদ্দাম বুক-চাপড়ানির শব্দ আর বৃষ্টির হাহুতাশ শুনেছি; কেউ বুঝতেও পারিনি আমাদের কত কাছে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই অন্ধকার রাত্রে পাহাড়ের মতো কালো বিশাল ঠাণ্ডা ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করতে করতে গভীর সমুদ্রে হারিয়ে গেছে। মনে আছে ঝড়ের দুদিন পরে আমরা চলে গিয়েছিলাম কক্সবাজারে। সমুদ্রের একেবারে ধারেই, একটা সম্পূর্ণ জ·মানবশূন্য মোটেলে, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায়, কাটিয়েছিলাম প্রায় দেড় মাস। সেখানে যাবার সময়ও আমরা বুঝিনি কী ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটা দ্বীপকে প্রায় পুরোপুরি মুছে দিয়ে গেছে। অনেকদিন পর্যন্ত সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতাম সার-সার মানুষের আর পশুর লাশ শুধু ভেসে যাচ্ছে সমুদ্র ধরে, আমাদের চোখের সামনে দিয়ে।

কী সুন্দর একটা পাহাড়ি শহরই না ছিল তখন চট্টগ্রাম। টিলা আর পাহাড়ে ঢেউ খেলানো—উঁচুনিচু পাহাড়ের ওপরে বাড়ি, প্রকৃতি, নীলিমা—পুরোপুরি পার্বত্য শহরের একটা আমেজ। প্রকৃতির কোলে একটা রূপসীর মতো ছিল সে। মোহাম্মদ রফিক তখন সদ্য বিয়ে করেছে,স্ত্রী জিনাত আরা রফিকও কবিতা লিখছে, ওদের নতুন সংসার ভরে আছে স্বপ্নে, প্রেমে, কবিতায়, কলকাকলিতে; উত্তাল হাওয়ায় বাড়ির পর্দা উড়ছে; উৎসাহে খুশিতে চাঞ্চল্যে আলো-জ্বলা শহরের মতো, মৌচাকের মতো মধুময় আর সোনালি হয়ে আছে জীবন। কত অপ্রাপনীয় সম্পদ থাকে একসময় জীবনে, আমাদের সবারই জীবনে।

'কণ্ঠস্বর'-এর প্রথম সংখ্যা থেকেই ও ছিল এই পত্রিকার লেখক। কবিতাই লিখেছে সবসময়। ওর স্ত্রী জিনাত আরা রফিকও ছিল আমাদের দলেরই লেখিকা। জিনাতও সুন্দর কবিতা লিখত। কবিতার পাশাপাশি গদ্যও লিখত রফিক। গদ্য লেখার সময় ওর শব্দেরা ঝনঝন করে বেজে উঠত। আমার মনে হত নিমগ্ন হতে পারলে ও ভালো গদ্য লিখবে। কিন্তু গদ্য ও লিখতে আরম্ভ করেছে এই মাত্র সেদিন।

অনেক ভালো কবিতা লিখেছে রফিক। সেগুলো কবিতাপ্রেমিকদের মন ছুঁয়েছে। কিন্তু ওর যে-কবিতার লাইনটি একসময় সাধারণের মুখে-মুখে উঠেছিল সে লাইনটি হল : 'সব শালা কবি হবে'। এরশাদের সামরিক শাসনের সময় এই স্বৈরাচারীর কবি হওয়ার সাধ দেখে খেপে গিয়ে লিখেছিল ও কবিতাটা।

পঞ্চম খণ্ড

জলের আহ্বান

১

দু-মাসে 'কণ্ঠস্বর'-এর পর পর দুটো সংখ্যা বেরিয়ে যাওয়ায় আমাদের মধ্যে একধরনের আত্মবিশ্বাস এসে গেল। মনে হল টিকে থাকব আমরা। কয়েকটা সংখ্যা বের করার ফলে পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় জারিজুরি জানা হয়ে গেছে। এখন দরকার উদয়াস্ত শ্রম আর টাকার সংস্থান। শ্রম নাহয় করতে পারলাম, কিন্তু টাকা কোথায়? আমরা ভালোবাসার লক্ষ কোটি রক্তগোলাপ এনে আঙিনা ভরে দিতে পারি, কিন্তু টাকা তো আমরা চিনি না। এ কী জিনিশ! কেমন করে জোগাড় করতে হয়? কোথা থেকে আসে?

আমাদের টাকা জোগাড়ের পথ একটাই : শ্রম। বিরতিহীনভাবে উদয়াস্ত দুয়ার থেকে দুয়ারে ছুটে বেড়ানো আর হাজার কোটি ভালোবাসার রক্তকরবীর বিনিময়ে তুচ্ছ কিছু রজতমুদ্রার করুণা নিয়ে ফিরে আসা। টাকা জোগাড়ের ব্যাপারটা আমাকে দিশাহারা করে তুলল। বিজ্ঞাপনের পেছনে ছুটতে ছুটতে আমি ফুরিয়ে আসতে লাগলাম। দুয়ার থেকে দুয়ারে ধরনা দিয়ে ফিরি, কিন্তু সুসংবাদ নেই। এদিকে আছে লেখা-জোগাড়ের বিড়ম্বনা, আছে সম্পাদনার খাটুনি, আছে প্রেসে ছোটাছুটির দুর্ভোগ, ম্যানেজারের কথামতো প্রেসে গিয়ে প্রুফ না-পেয়ে ফিরে আসার মানসিক নির্যাতন—এমনি আরও কত কিছু!

আগেই বলেছি, আমার সবচেয়ে কষ্ট হত প্রুফ-দেখার সময়। আমি অস্থির স্বভাবের মানুষ। আমার মন প্রুফ-দেখার একেবারেই অনুপযোগী। মনটা প্রুফের ওপর দিয়ে খালি পাগলা ঘোড়ার মতো উড়ে যেতে চায়। তাতে ভুল থেকে যায় অনেক। তাই একটা পথই আছে প্রুফ-দেখার—শব্দ ধরে-ধরে দেখা। না, শব্দ নয়, আমাকে প্রুফ দেখতে হত অক্ষর ধরে-ধরে। প্রতি ফর্মা প্রুফ দেখতে লেগে যেত দুই থেকে তিন ঘণ্টা। এভাবে প্রতিটি ফর্মা দেখতে হত চার-পাঁচবার করে।

তারপরে পত্রিকা মোটামুটি নির্ভুল হত। কিন্তু এই চাপ আমাকে পুরোপুরি নির্জীব করে ফেলত। আমার শক্তি ক্ষয়ে আসত।

এরপর আছে কাগজ কেনা, কাভার ছাপা, বাঁধাই,পত্রিকা বেরোলে ঘাড়ে করে সেগুলো দোকানে দোকানে পৌঁছে দেওয়া, ঢাকার বাইরে পাঠানোর জন্য আলাদা করে রাখা পত্রিকাগুলোকে ছোট ছোট বান্ডিল করে পোস্টঅফিসে নিয়ে ভি.পি.পি. করে আসা, বিজ্ঞাপনের টাকা তোলা, নতুন বিজ্ঞাপনের জন্যে দুয়ারে দুয়ারে হেঁটে বেড়ানো। সে এক হিমশিম অবস্থা—বিশেষ করে আমাদের মতো মানুষের পক্ষে, যারা অতিরিক্ত কবিতা পড়ে নিজেদেরকে পৃথিবীর সবরকম কাজের জন্যে পুরোপুরি অনুপযুক্ত করে ফেলেছি। বাইরের থেকে একটা সাহিত্যপত্রিকাকে যত সামান্যই মনে হোক, কিন্তু এ একজন মানুষের সম্পূর্ণ জীবন দাবি করে। এর কমে কিছু দিয়েই হয় না।

দ্বিতীয় সংখ্যায় বিজ্ঞাপন ছিল বেশকিছু, কাজেই তৃতীয় সংখ্যা সময়মতো বেরোতে খুব-একটা অসুবিধা হল না। দেখতেও তৃতীয় সংখ্যা হল সুন্দর ও শোভন। এই সংখ্যার কয়েকটি কপি নিয়ে গিয়েছিলাম ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তানের (এখনকার সোনালী ব্যাঙ্কের) জনসংযোগ কর্মকর্তা (পরবর্তীতে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক) ডি.পি.বড়ুয়ার কাছে, বিজ্ঞাপনের আশায়। ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অফিস তখন ছিল জিন্নাহ অ্যাভিনিউয়ে (এখনকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে) বিখ্যাত লা সানি রেস্টুরেন্টের ঠিক উল্টোদিকেই। ডি. পি. বড়ুয়ার ঘরের দরোজা দিয়ে ঢুকছি, দূর থেকে পত্রিকা দেখেই তিনি বলে উঠলেন, 'বাহ্, চমৎকার পত্রিকা তো !' পত্রিকাটি নেড়েচেড়ে কিছুক্ষণ দেখলেন তিনি। উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'বের করে যান। এ-ধরনের ভালো পত্রিকা আমাদের খুবই দরকার।'

খুব অন্তরিকভাবে বললেন তিনি কথাগুলো। আমাকে তিনি চিনতেন না। কাজেই আমার কাছে তা আরও আন্তরিক মনে হল। আমাদের চেয়ে বয়সে বড় কোনো মানুষ এর আগে কখনো এভাবে এই পত্রিকার প্রশংসা করেননি। তাঁর কথাগুলো শুনে কৃতজ্ঞতায় চোখে পানি এসে গেল। তাঁর এই প্রশংসা আমাকে অনেকদিন পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে অনুপ্রাণিত করেছে।

তাঁর উৎসাহ দেখে আশা জাগল : হয়তো তিনি বিজ্ঞাপন দেবেন। হলও তাই। পরের সংখ্যায় না দিলেও তার পরের সংখ্যায় তিনি আমাদের বিজ্ঞাপন দিলেন। একলাফে কাভার-পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন। রেট-কার্ডে বিজ্ঞাপনের যে-রেট লিখেছিলাম, সেই রেটেই বিজ্ঞাপন দিলেন তিনি। কেবল দিলেন না, মাঝে মাঝেই এমনি দেবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিলেন। কাভার-পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন সেই আমাদের প্রথম। রেট-কার্ডে লেখা আছে বলেই-যে এত টাকার বিজ্ঞাপন আমাদের কেউ সত্যি সত্যি দিতে পারে এটা আমি কল্পনায়ও ভাবিনি। একেক বিজ্ঞাপনদাতা আমাদের বিজ্ঞাপন দিতেন একেক কারণে। কেউ দিতেন অনুগ্রহ করে, কেউ প্রাত্যহিক উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতি পাবার করুণ চেষ্টায়, কিন্তু ডি. পি. বড়ুয়া দিতেন আমাদের

মূল্য বুঝে, আমাদের সাহিত্যপ্রচেষ্টাকে সম্মান করে। তাঁর এই সহযোগিতা কোনোদিন ভুলব না।

ডি.পি. বড়ুয়ার আচরণ ছিল খুবই সৌজন্যপূর্ণ। বয়সে তিনি আমার চেয়ে বেশ বড় ছিলেন, কিন্তু তাঁর আচরণ থেকে মনে হত তাঁর প্রতিটি কথার ভেতর দিয়ে তিনি যেন আমাকে সম্মান করছেন। এই মর্যাদা আর সহানুভূতি আমাকে কৃতজ্ঞ করত। আমার জন্যে তিনি কেবল আর্থিক নন, মানসিক আশ্রয়ও হয়ে উঠলেন একসময়। তাঁর কাছে গেলে আমি মনের জোর ফিরে পেতাম। একবার একটা বড় বিপদ থেকে তিনি আমাকে বাঁচিয়েছিলেন, সেই গল্পটা বলেই তাঁর কথা শেষ করব। ঘটনাটা স্বাধীনতার বছরখানেক পরের।

সদ্য স্বাধীনতা-পাওয়া দেশে আমাদের হৃদয় তখন দেশপ্রেমের উদ্দীপনায় দপদপ করছে। আমাদের দুঃখী দেশ সার্বভৌমত্বে আজ অন্য সব দেশের সমান। এই দেশকে বিশ্বের মর্যাদাবান দেশগুলোর সমকক্ষতায় দাঁড় করাতে হবে, এ-স্বপ্নে তখন আমরা মরিয়া। লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত দিয়ে যেমন এ-দেশ স্বাধীন হয়েছে তেমনি লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বেদে রক্তে আত্মদানে এই দেশ সর্বোচ্চ মর্যাদায় মাথা উঁচু করবে এ-ব্যাপার তখন সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে রেখেছে। মনের মধ্যে থেকে থেকে প্রশ্ন জাগে : আমি কোন্ পথে যাব? জাতীয় জীবনের কোন্ অঙ্গনে আত্মদান করে এই সম্ভাবনাকে অর্থবান করার চেষ্টা করব? রাজনীতি সে-যুগে আমাদের অলংঘ্যনীয় নিয়তি। জাতীয় যুদ্ধের উদ্দীপনায় প্রতিটা মানুষের ভাবনা তখন রাজনীতি-উচ্চকিত। মনে হল রাজনীতি করব। রাজনীতির ভেতর দিয়ে জাতির ভাগ্য নির্মাণ করব। আত্মোৎসর্গের ওটাই সবচেয়ে বড় জায়গা। অনেক ভেবে একদিন কথাটা ডি.পি.বড়ুয়ার কাছে পাড়লাম। শুনে ডি. পি. বড়ুয়া আমার দিকে অনেকক্ষণ সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন : নিজের চেহারাটা কখনো ভালো করে দেখেছেন আয়নায়?

তাঁর কথা শুনে অবাক হলাম। বললাম : কেন?

উনি মৃদু হেসে বললেন : না-দেখে থাকলে একবার ভালো করে একটু দেখে নিন। এই চেহারা দিয়ে রাজনীতি হয় না। রাজনীতি করতে হলে চেহারাটা আরও একটু অমার্জিত হতে হয়। এটা হচ্ছে রুথলেস গেম অফ পাওয়ার। স্বার্থের নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব। এ-জায়গা আপনার হবে কী করে?

হঠাৎ যেন চোখ খুলে গেল। ঠিকই তো বলেছেন উনি। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়। আমরা ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় আমাদের নিচে। ঐ জগৎ আমাদের তুলনায় অনেক স্থূল আর অকর্ষিত। ও-কাজ আমাদের দিয়ে হতে পারে না। সাময়িক উত্তেজনায় ঐ পথে যাওয়ার কথা ভাবা আমার উচিত হয়নি। রাজনীতির কথা মন থেকে চিরদিনের জন্য ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিলাম।

ভাগ্য ভালো, বড়ুয়া বাবু সেদিন ঐ পরামর্শ আমাকে দিয়েছিলেন। নাহলে হয়তো 'কণ্ঠস্বর'-এর কাহিনী না-লিখে আজ কোনো মসনদ-দখল আর মসনদ-হারানোর নেপথ্য কাহিনী আমাকে লিখতে হত।

২

'কণ্ঠস্বর'–এর সংখ্যাগুলো দেশের ছোট বড় শহরগুলোয় পৌঁছোতে শুরু করায় সেসব জায়গার তরুণ–লেখকদের মধ্যেও একই প্রেরণার নতুন নতুন প্রদীপ জ্বলে উঠতে শুরু করল। বক্তব্য ও আঙ্গিকে তারা সাহিত্যের যে–পালাবদলের অন্বেষণ করছিল 'কণ্ঠস্বর'–এর পৃষ্ঠায় তারই প্রতিরূপ দেখতে পেয়ে রক্তের ভেতর চঞ্চল হয়ে উঠল। এ পত্রিকা হয়ে উঠল তাদের নিজেদের পত্রিকা। ষাটের দশকের সুদূর মফস্বলের তরুণ–লেখকদের মনকে 'কণ্ঠস্বর'–এর নতুনত্ব ও উষ্ণতা–যে কীভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তা ঐ সময়কার উঠতি কবি নির্মলেন্দু গুণের লেখা পড়লে বোঝা যাবে। তিনি তখন থাকতেন নেত্রকোনায়, গ্রামের বাড়িতে। গুণ লিখেছেন :

> সুভাষ আমাকে ঢাকা থেকে একটি চমৎকার লিটন ম্যাগাজিন এনে দেয়। ঐ পত্রিকাটির নাম 'কণ্ঠস্বর' [দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৬৭]। হলদে মলাটের ঐ ক্রাউন সাইজ পত্রিকাটি হাতে পেয়ে আমি খুবই উত্তেজিত বোধ করি। 'সমকাল' পত্রিকাটি আমি দেখেছি। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার মান এবং প্রকাশনা–সৌষ্ঠব ছিল খুবই উঁচুদরের। কিন্তু সেটি ছিল দেশের প্রতিষ্ঠিত নামি–দামি লেখকদের কাগজ। 'কণ্ঠস্বর' দেখে এবং পড়ে আমার মনে হয় এটিই হচ্ছে ঢাকার উঠতি নবীন লেখকদের পত্রিকা। মোটা আর্টবোর্ডের পিচ্ছিল দিকটাকে ভেতরের দিকে দিয়ে, এর কর্কশ দিকটাকে দৃশ্যমানরূপে প্রচ্ছদে ব্যবহার করা হয়েছে। আর্টবোর্ডের কর্কশ সারফেসে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর চমৎকার বর্ণবিন্যাসে সাজানো 'কণ্ঠস্বর' শব্দটিকে কী নয়নমনোহরই না মনে হয় আমার ! এখনও কাইয়ুম চৌধুরীর হাতের 'কণ্ঠস্বর' লেখাটা আমার ভালো লাগে। এর লেখকরা সবাই ছিল তরুণ এবং শক্তিমান। প্রচ্ছদের বাম দিকের সূচিপত্রে লেখক ও লেখার নাম ছাপা হয়েছে। সূচিপত্র থেকে সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের নামটিকে পৃথক করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে একটি চিকন লাইন। আর পত্রিকার নাম থেকে সূচিপত্রকে পৃথক করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে একটি মোটা লাইন।
>
> ভেতরে বাংলা একাডেমী, চন্দা ব্যাটারি ও ইস্টার্ন ফেডারেল ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স কো. লি.–এর পূর্ণ পৃষ্ঠা এবং সাজ জুয়েলার্স–এর একটি সিকি পাতা বিজ্ঞাপন ছিল। আর পূর্ব–পাকিস্তানের তরুণতম লেখকদের কয়েকটি প্রকাশিতব্য বইয়ের বিজ্ঞাপনও ছিল তাতে। লেখকরা ছিলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রফিক আজাদ, শহীদুর রহমান এবং প্রশান্ত ঘোষাল। সম্পাদকের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, 'কেবল প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের কাছ থেকেই লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। তাদের মধ্যে কোনো নতুন দৃষ্টি বা বিন্দুমাত্র প্রতিশ্রুতি লক্ষ্যযোগ্য হলেই তাঁদের সেসব রচনাকে প্রকাশিতব্য মনে করা হবে।' আমি ঐ পত্রিকাটি উল্টেপাল্টে দেখে এবং

বারবার পড়ে উত্তেজিত বোধ করি।

আবদুল মান্নান সৈয়দের 'মাংস' গল্পটি পড়ে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম। এর গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধ-আলোচনা—সবই ছিল একটু অন্যরকম। সম্পাদকের নামটিও আমার বেশ ভালো লাগে। তিনি-যে আধুনিক ও রুচিশীল মনের মানুষ তা আমার মনে হয়। এরকম একটি পত্রিকায় লেখা ছাপানোর গোপন বাসনা আমার মনে জন্মে।...

পরে 'কণ্ঠস্বর'-এর প্রথম সংখ্যাটিও আমি সংগ্রহ করি। কণ্ঠস্বর কাদের পত্রিকা এবং এই পত্রিকার দর্শন কী? এই প্রশ্নের উত্তর ছিল ব্যাককভারে মুদ্রিত একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপনে :

'যারা সাহিত্যের সনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অকপট, রক্তাক্ত, শব্দতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর; যারা উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী; যারা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধাশীল, অনুপ্রাণিত; যারা পঙ্গু, অহংকারী, যৌনতাস্পৃষ্ট—

'কণ্ঠস্বর'

তাদেরই পত্রিকা।

প্রবীণ মোড়ল, নবীন অধ্যাপক, পেশাদার লেখক, মূর্খ সাংবাদিক, 'পবিত্র' সাহিত্যিক, এবং গৃহপালিত সমালোচক এই পত্রিকায় অনাহূত।'

সুনির্বাচিত ৪৬টি শব্দবিশিষ্ট 'কণ্ঠস্বর'-এর এই ইশতেহারটি পাঠ করার পর আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই পত্রিকার মধ্যে নিজের আত্মাকে অবলোকন করি। আমার কেবলই মনে হতে থাকে যে, এটি আমার পত্রিকা। আমার কণ্ঠস্বর।

সারাদেশের তরুণ-লেখকদের কাছে তখন এই ছিল 'কণ্ঠস্বর'। তরুণ-সম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষিত ও অনিবার্য এক গন্তব্যের নাম। এখানে এসে জুটে-যাওয়া মানে পৃথিবীর সর্বশেষ জীবনাভূতির তপ্ত আঁচে শরীর তাতিয়ে নেওয়া, সর্বশেষ আধুনিকতার হাত ধরে পথ হাঁটা।

বেশিদিন গেল না, নির্মলেন্দু গুণের একটা পোস্টকার্ড পেলাম নেত্রকোনা থেকে। যে-গ্রাম থেকে চিঠিটা এসেছে তার নামটাও অনবদ্য—'কাশবন'। শোনার সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধারে কাশফুল-ফোটা একটা স্নিগ্ধ গ্রামের ছবি ভেসে ওঠে। গ্রামের নামটা পড়ে একটা মিশ্র অনুভূতির আলোছায়া আনাগোনা করল মনের ভেতর। কাশবন! এত সুন্দর একটা নাম কি হতে পারে কোনো গ্রামের? আদতেই কি এটা কোনো গ্রামের নাম? নাকি চাঁদে-পাওয়া কোনো তরুণ-কবির স্বপ্নাবিষ্ট চোখে দেখা তার গ্রামের অনাবিল সৌন্দর্যের বর্ণনা? এই গ্রামের ঠিকানায় চিঠি লিখলে পৌঁছোবে তো গিয়ে?

চিঠিতে গুণ এই সাহিত্য-আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থনের কথা উৎসাহের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন। সুযোগ পেলে তিনি ঢাকায় এসে এই আন্দোলনের একজন হতে

চান এই আভাসও চিঠিটাতে, খানিকটা প্রচ্ছন্নভাবে, উল্লেখ করেছিলেন।

'সুযোগ পেলে' কথাটার মানে কী? তিনি কি ভাবছেন যে ঢাকায় এলে পত্রিকার কাজে যোগ দিয়ে তাঁর টিকে থাকার বাস্তব ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে? তেমনটা পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু কী করে সেটা সম্ভব? 'কণ্ঠস্বর' নিজেই নিজেকে যেখানে চালাতে পারছে না, তার ওপর নির্ভর করে কি কাউকে আসতে বলা যায়?

কিন্তু উৎসাহে তখন আমরা উন্মাতাল ছিলাম। ভেবেচিন্তে হিসাব-কিতাব করে চলাটা ধাতেই ছিল না। কেউ যদি নিজেরই তাগিদে আমাদের সঙ্গে এসে জুটে যেতে চায় তো তার দিকে ঠাণ্ডা হাত বাড়িয়ে দিয়ে কী লাভ? দু-তিন দিনের মধ্যেই উত্তর পাঠালাম গুণকে : চলে আসুন ঢাকায়।

আমার চিঠি পেয়ে গুণের ধারণা হয়েছিল—'কণ্ঠস্বর'-এর দশম বর্ষে পদার্পণ উৎসবে বলেছিলেন তিনি কথাটা—ঢাকায় এলে হয়তো তাঁর আঃ বাঃ-এর কোনো একটা বন্দোবস্ত আমার সহযোগিতায় হয়ে যাবে। কিন্তু চট করে কিছুই করে ওঠা গেল না । কিছুদিন পরে একটা ব্যবস্থা অবশ্যি হয়েছিল, সে-কথা পরে বলব।

৩

দিন-কয়েকের মধ্যেই ছ-ফুট দীর্ঘ, ঋজু ও তারুণ্যদীপ্ত চেহারা নিয়ে নির্মলেন্দু গুণ এসে হাজির হলেন ঢাকায়। তার চেহারা দেখেই মনে হয় বিজয়পতাকা ওড়াবার জন্যেই দূর মফস্বল থেকে এই রাজধানী শহরে তাঁর আসা। তাঁর চেহারা যেন একটা জ্বলজ্বলে অতৃপ্ত মশাল। প্রচণ্ড একটা তারুণ্যশক্তির প্রজ্জ্বলন ছিল গুণের মধ্যে তখন। একটা কবিতার মধ্যে নিজের সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন :

তাকে চেনো? ঐ যে ছ'ফুট দীর্ঘ সীমাহীন অসীম আগুন!

সত্যি সেই 'সীমাহীন অসীম আগুন' ছিল তাঁর মধ্যে। সেই আগুন-লাগা জ্বলন্ত অস্তিত্ব নিয়ে, লেলিহান দাউ দাউ জ্বলন্ত মশাল হয়ে অস্বস্তের মতো ছুটে বেড়াতেন তিনি। এই ছোটার কোনো গন্তব্য ছিল না। নিজের হিংস্র নিষ্ঠুর যৌবনের বহ্নিতে জ্বলতে জ্বলতে ছিল তাঁর এই ছুটে-বেড়ানো। আমার মতোই গুণের পোশাক চিরকাল পাজামা আর ঘিয়া পাঞ্জাবি। কিন্তু আমার মতো দশজনের মান-রেখে-চলা বিনীত নিরীহ পাঞ্জাবি সে নয়, সে-পাঞ্জাবি এক আত্মবিশ্বাসী বলিষ্ঠ দুর্জয় ও আগ্রাসী পাঞ্জাবি যা তার সর্বভুক পকেটের ভেতর এই বিশ্বচরাচরকে গ্রাস করে ফেলতে উদগ্রীব :

আপনারা আমার সঙ্গে নদী যেমন জলের সঙ্গে
সহযোগিতা করে তেমন সহযোগিতা করবেন
অন্যথায় আমি আমার ঘিয়া পাঞ্জাবির গভীর পকেটে
আমার প্রেমিক এবং 'আ-মরি বাঙলা ভাষা' ছাড়া
অনায়াসে পল্টনের ভরাট ময়দান তুলে নেব।

মানুষ হিসেবে গুণ ছিলেন একেবারেই ব্যতিক্রমী। আমাদের পরিচিত জগতে তাঁর মতো এমন স্বস্বভাবী, স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল মানুষ আমি দেখিনি। পুরোপুরি বর্হিমুখী মানুষ বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই। জীবনের যে-কোনো বিষয়ের উচ্চারণে তিনি ছিলেন দুঃসাহসী ও অকপট। দুর্বিনীত যুবরাজের মতো মাথা উঁচিয়ে সবকিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারতেন। তাঁর মধ্যে কোনো মিথ্যাচার ছিল না; ছিল না নিজেকে নিয়ে কোনো কুণ্ঠা বা দীনতাবোধ। এইজন্যেই নিজের জীবনের যাবতীয় প্রসঙ্গ—যৌনাকাঙ্ক্ষা, প্রেম, শারীরিক কষ্ট থেকে জুয়া, যাযাবর জীবন, বেশ্যাসক্তি—সব ব্যাপারেই তিনি সন্তের মতো অকপট। যে-কবিতাটির লাইন কিছুক্ষণ আগে তুলে ধরেছি সেই পুরো কবিতাটি তুলে ধরেই এর উদাহরণ দিই :

ঐ যে ছায়ার মতো একটি মানুষ পথ হাঁটে, তাকে চেনো?
হাজার বছর নয়, এ-শহরে একযুগ কেটেছে তাহার। তাকে চেনো?
ঐ যে ছায়ার মতো বাউলের অবিন্যস্ত চুল, পরম বন্ধুর মতো
দু'টি পা, দুটি চোখে দুটি দ্বিধা, তাকে চেনো?
ঐ যে ছায়ার মতো একটি পুরুষ মধ্যরাতে, কাকভোরে, কবরের
পাশ দিয়ে প্রতিদিন হেঁটে হেঁটে গ্রীন লেনে ফেরে। তাকে চেনো?

ঐ যে উজ্জ্বল মূর্তি একটি যুবক, কৃত্রিম প্রেমিক সেজে সারাদিন
নারীসঙ্গে চুর হয়ে থেকে রাত্রি এলে গণিকার স্তন্য চুষে খায়—
তাকে চেনো? ঐ যে ছ'ফুট দীর্ঘ সীমাহীন অসীম আগুন!

হাজার বছর নয়, এ-শহরে একযুগ কেটেছে তাহার। সম্প্রতি সে
তীব্রভাবে আসক্ত নেশায়। প্রভাতে প্রেমের যোগ্য, পূজার চন্দন,
কোমল কুমারী চোখ, সলজ্জ রক্তিম নাকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম,
দেখে ভুলে মনে হবে এ-কোনো ঋষির পুত্র, অসম্ভব নারীর প্রেমিক।

অথচ সূর্যের তাপে রক্তের বীর্য গলে গেলে পাকস্থলী নেচে ওঠে
গাঁজা, মদ, মোহের নেশায়, ড্রাগের ড্রাগন যেন চেপে বসে ঘাড়ে।
ঘুঘুর চোখের মতো তার ক্লান্ত দুটি চোখ লাল গোল বৃত্ত হয়ে যায়,
তাকে চেনো? মাতৃহীন যে-যুবক রাত্রি এলে গণিকার স্তন্য চুষে খায়?

হাজার বছর নয়, এ-শহরে একযুগ কেটেছে তাহার।

[নৈশ-প্রতিকৃতি]

জীবনের প্রকাশ্য বা গোপন সবকিছুকেই তিনি এই দুর্লভ মানবজীবনের অংশ হিসেবে শ্রদ্ধেয় মনে করতেন। তাই জীবনের কোনোকিছু নিয়ে গুণের কোনো দ্বিধা বা সংকোচ ছিল না। আজীবন কবিতায় এই নগ্ন অলজ্জিত ও জ্বলন্ত মানুষটির ছবিই তিনি সততার সঙ্গে এঁকেছেন। এই ধরনের মানুষ পৃথিবীতে খুবই বিরল। বাংলাসাহিত্যে এমন অসংকোচ অসংবৃত কবি একমাত্র স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস।

গুণের চরিত্রের আর-একটি দিক হল আত্মসর্বস্বতা। তাঁর পৃথিবী তীব্রভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল শুধুমাত্র তাঁর নিজের মধ্যে—একমাত্র নিজের আত্মকেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষা আর তৃপ্তির মধ্যে—এর বাইরে কিছুই প্রায় তাঁর কাছে অস্তিত্বশীল ছিল না। আগেই বলেছি সমষ্টিবদ্ধ মানুষের পৃথিবীতে তিনি ছিলেন পুরোপুরি বহিরাগত। এই পৃথিবীর কারো বা কোনোকিছুর সঙ্গে তাঁর কোনো বন্ধন ছিল না। পৃথিবীর তিনি কারো কখনো ছিলেন না, হয়তো আজও কারো নন। নিজের কবিতা আর প্রেমের (কিছুদিন হল তাঁর একমাত্র মেয়ের প্রতিই তাঁকে স্থির অপত্যস্নেহের অনুভূতিতে কিছুটা অসহায় দেখছি) বাইরে কখনো কোথাও তাঁকে স্থির হতে দেখিনি। তাঁর লেখা 'আমার কণ্ঠস্বর' বইয়ে তাঁর এই উজ্জ্বল, ব্যতিক্রমী, বহিরাগত ও দুঃসাহসী মানুষটিকে তিনি আশ্চর্য জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন।

৪

নির্মলেন্দু গুণ যখন ঢাকায় এলেন তখন 'কণ্ঠস্বর'-এর চারটি সংখ্যা বেরিয়ে গেছে। চতুর্থ সংখ্যা ছিল কবিতা সংখ্যা, এক ফর্মার ছোট্ট এক চিলতে পত্রিকা। সংখ্যাটি ছোট হলেও দেখতে হয়েছিল চমৎকার। কাভারে লোগোর নিচে সূচিপত্রের কথাগুলো একটা ফুলদানির মতো করে সাজানো হয়েছিল। সংখ্যাটির কথা এত করে মনে আছে এজন্যে যে সংখ্যাটি যেদিন বেরোয় আমার বড়মেয়ে লুনাও ভূমিষ্ঠ হয় ঠিক সেদিনই, প্রায় একই সঙ্গে। গ্রিন রোডে যেখানে এখন অফিসারদের কলোনি, তার পাশে তখন ছিল ঢাকার সবচেয়ে নামকরা স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ড. ফিরোজা বেগমের ক্লিনিক। আমার স্ত্রী ঐ ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছিল এর দিন-তিনেক আগে। ক্লিনিকে সারাক্ষণ কাটানো বিব্রতকর মনে হওয়ায় আমি সার্বক্ষণিকভাবে জায়গা নিয়েছিলাম ক্লিনিকের উল্টোদিকের একটা রেস্টুরেন্টে। কেবল আমি নই, আমার মতন স্ত্রী-ভর্তি করে বিপাকে পড়া অনেক হবু বাবারই একমাত্র আশ্রয় ছিল ঐ জায়গাটুকু। সেখানে বসেই সারাদিন ক্লিনিকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে উৎকণ্ঠায় আর আতঙ্কে উথালপাথাল হতে-হতে তাঁদের সময় কাটত। আমার ধারণা : এতগুলো বিপদগ্রস্ত হবু বাবাকে নিয়মিতভাবে একসঙ্গে পাওয়ার ভরসা থেকেই কোনো ধুরন্ধর ব্যবসায়ী ঐ রেস্টুরেন্ট ওখানে দিয়েছিল।

পত্রিকা নিয়ে দিনকয় আগে থেকেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই স্ত্রীকে ভর্তি

করার পর স্ত্রীর উৎকণ্ঠা ও পত্রিকার উৎকণ্ঠা একসঙ্গে হয়ে আমার ওপর চেপে বসল। আমাদের আশু সন্তানের সম্ভাবনার মতো দুয়েকদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা ঐ সংখ্যাটিরও। সংখ্যাটির এক–ফর্মা হবার কারণ সময়ের অভাব নয়, টাকার অভাব। আগের সংখ্যার বিজ্ঞাপনের টাকা তুলতে না–পারায় পত্রিকা এক–ফর্মার বেশি করার উপায় ছিল না। কিন্তু পত্রিকা বেশি ছোট হয়ে গেলে অনেকের মনে এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিতে পারে মনে করে কবিতা–সংখ্যা হিসেবে এটিকে বের করে 'ভিন্ন আস্বাদের' আড়ালে এই দীনতা ঢাকার গোপন চেষ্টা নিলাম।

একটা অসুবিধা দেখা দিল পত্রিকা এক–ফর্মা হওয়ায়। ডাবল ক্রাউন সাইজের এক ফর্মা মানে মাত্র আট পৃষ্ঠা। কাগজ এত ছোট হলে মানসম্মান একেবারেই থাকে না। তাই পত্রিকার সাইজকে ডবল ক্রাউন থেকে ডবল ডিমাই করে পৃষ্ঠাসংখ্যা আটের জায়গায় ষোলো করে ফেলা হল, লেখাও ধরল ডবল ক্রাউনের থেকে অনেক বেশি। ফলে অনাহারী চেহারার কলঙ্ক থেকে পত্রিকাকে কিছুটা রেহাই দেওয়া গেল। কাভার করেছিলাম একধরনের পুরু নীলাভ বোর্ড দিয়ে, তাতে পত্রিকাটিকে কিছুটা হৃষ্টপুষ্টও দেখাল।

পত্রিকার একেক সংখ্যা যে একেক সাইজের হতে পারে না, তা তখনও আমাদের মাথায় আসেনি। বিপাকে পড়েই এসব আমরা করেছিলাম। এজন্য প্রথম তিরস্কার শুনেছিলাম বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরিয়ান শামসুল হকের কাছ থেকে। সবরকম পত্রপত্রিকার প্রতি তাঁর একটা সহজাত মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল। এসব পত্রিকার ভেতর দিয়ে–যে কালের ইতিহাস রচিত হয়ে চলে তা তিনি জানতেন। তিনিই সক্রিয় উদ্যোগ নিয়ে 'কণ্ঠস্বর'–এর একটি পুরো সেট সংগ্রহ করেছিলেন বাংলা একাডেমী লাইব্রেরিতে। সেটটি আজও আছে। আমাকে সস্নেহ ধমকের সুরে বলেছিলেন : পত্রিকার একেক সংখ্যার সাইজ একেক রকম, প্রকাশের তারিখ ঠিকমতো নেই, আপনারা কি ভাবেনও নি সংখ্যাগুলো যারা সংগ্রহ করে বাঁধাই করতে চাইবে তাদের অবস্থাটা কেমন হবে! তাঁর ধমক শুনে বোকা হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা তো তখন নিজেদের প্রকাশের আগ্রহে ব্যাকুল। এই পত্রিকা–যে কারো কোনোদিন বাঁধাই করে সংগ্রহ করার দরকার হতে পারে এ–কথা মাথায় আসার সময় কোথায় তখন? এসব নিয়ে মাথা ঘামানো যাদের দরকার সেসব ঘেয়ো গবেষকদের আমরা তো তখন করুণা করি!

স্ত্রীকে ক্লিনিকে ভর্তি করার পর অস্বস্তির শেষ ছিল না। একবার ক্লিনিকে গিয়ে তার খোঁজ নিই, জুনিয়র ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করি, আবার ফাঁক পেলেই রেস্টুরেন্টে বসে পত্রিকার প্রুফ দেখি। কখনো দোকান থেকে কাগজ কিনে প্রেসে দিয়ে আসি, কখনো প্রেসে কম্পোজিটারদের সঙ্গে বসে কাভার ছাপার ব্যাপারে তাদের সাহায্য করি, এমনি করে সময় পার হয়।

এই সময় রেস্টুরেন্টে আমাকে প্রায় সার্বক্ষণিক সঙ্গ দিয়েছিলেন আশিস কুমার লোহ। সে–সময়েই আমাদের সিনেমা ও টেলিভিশনের অন্যতম প্রতিভাবান কৌতুক–অভিনেতা

হিসেবে তিনি ছিলেন খ্যাতিমান। ক্লিনিকের কাছেই একটা বাসায় থাকতেন তিনি। সারারাত আমরা দুজন ক্লিনিকের সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতাম আর মাঝে মাঝে ভেতরে গিয়ে সর্বশেষ খবর জেনে ফিরে আসতাম।

তৃতীয় দিন রাত্রে আমার স্ত্রীর লেবার পেইন বেশ বেড়ে গেল। সবাই আশা করতে লাগল পরের দিন সকালে আমরা হয়তো সন্তানের মুখ দেখব। সারারাত ধরে আমি আর আশিস লোহ রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়ালাম। আশিস লোহ ছিলেন অসম্ভব রসিক আর দিলদরিয়া মানুষ। ক্লিনিকে আমার মোট সাড়ে তিনশ টাকা খরচ হচ্ছে শুনে তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁর পুরো রাগ ডাক্তার ছেড়ে গিয়ে পড়ল নবজাতকদের ওপর। দুঃখ করে বলতে লাগলেন : 'জানেন আমার জন্ম হতে কত লেগেছিল? হাসপাতালে নাম লেখাতে লেগেছিল এক টাকা, নার্স নিয়েছিল তিন টাকা, সুইপার আয়া আর সবাই মিলে দু টাকা। মোট ছ' টাকা। আপনার নাহয় আর দুটাকা বেশিই লেগেছিল। তা এই টাকায় আমি আশিস লোহ আর আপনি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ খারাপটা হয়েছি কী? আর এই-যে একালের ছেলেমেয়েরা যারা একেকজন হতে গিয়ে আমাদের তিনশ চারশ পাঁচশ টাকা খসিয়ে দিচ্ছে, এরা কী হবে জানেন? এরা হবে সব ডাকাত, দস্যু, মাস্তান। মাঝখান থেকে যন্ত্রণা দিয়ে মারছে আমাদের।' আমার মনে হয় সে-সময়কার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার-সমর্থিত ছাত্র-গুণ্ডাদের অসহনীয় সন্ত্রাসের কথা মনে রেখেই তিনি এই দুঃখটা করেছিলেন।

৪ ফেব্রুয়ারি বিকেলে প্রিন্ট অর্ডার দিয়ে পত্রিকা প্রেসে পাঠিয়ে দিলাম। কাভার দিনেই ছাপা হয়ে গিয়েছিল। রাত্রে ফর্মা ছাপা আর বাঁধাই হয়ে গেলে সকালে পত্রিকা আমার হাতে এসে পৌঁছোবে। খুব ভোরে আমার মেয়ে লুনার জন্ম হল। ওকে দেখে মনের মধ্যে ভারি শান্তি অনুভব করলাম। ওর ছোট্ট নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল এখন থেকে এই পৃথিবীতে আমি যেন আর একা নই। কেউ যেন আমার আছে।

লুনাকে দেখে খুশিমনে ক্লিনিক থেকে বেরোতেই দেখি বাইন্ডিংখানার একটা ছেলে একশ পত্রিকা হাতে নিয়ে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। এ যেন সোনায় সোহাগা। আমার আনন্দ আরও বেড়ে গেল। পত্রিকাটি দেখে সত্যিই ভীষণ শান্তি অনুভব করলাম। হাতে নিয়ে সেটিকে নাড়াচাড়া করে দেখতে গিয়ে এক আশ্চর্য খুশিতে মনটা ভরে উঠল। তখন শীত পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। সকালবেলার মিষ্টি উজ্জ্বল রোদে পৃথিবীটা ভরে আছে। আমি সেই অলৌকিক মুহূর্তে এক অপার্থিব চরিতার্থতার আস্বাদ পেলাম। একসঙ্গে দুটো জন্মের আনন্দ আমাকে আকণ্ঠ পরিতৃপ্ত করে দিয়ে গেল। মানুষের জীবনে সন্তানের জন্ম দুর্লভ ব্যাপার। একালে একজনের জীবনে এ-মুহূর্ত দুয়েকবারের বেশি আসে না। এর আনন্দ তুলনাহীন। কিন্তু সম্পাদকদের জীবনে পত্রিকার নতুন সংখ্যা কোনো বিরল ব্যাপার নয়। থেকে-থেকেই সে দেখা দেয়। তবু 'কণ্ঠস্বর'-এর প্রতিটা সংখ্যা বেরোবার পর প্রতিবারই এমনি আশ্চর্য খুশিতে ভরে উঠেছে আমার মন। সে খুশি অপরিমেয়। সব আর্থিক, শারীরিক আর মানসিক কষ্ট—সব দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা, অসম্মান আর অশান্তির

অবসান ঘটিয়ে, 'সকল কাঁটা ধন্য করে' যখন একেকটি সংখ্যার আবির্ভাব ঘটত—সেই ঐশ্বরিক মুহূর্তের আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

প্রতিটি সংখ্যা বেরোলে সেটাকে নেড়েচেড়ে এপাশ ওপাশ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু দেখে যেতাম, যেভাবে প্রেমিকার মুখকে মানুষ ফিরে ফিরে দেখে। সে দেখার যেন শেষ নেই। অবিশ্বাস্য রূপের সামনে দাঁড়ালে মানুষের যেরকম চন্দ্রাহত অবস্থা হয় এ যেন অনেকটা তাই। পাতা উল্টিয়ে পত্রিকার লেখাগুলোকে ঘুরেফিরে বারে বারে শুধু পড়ে যেতাম। প্রতিটা লেখাকে মনে হত নিজের লেখা। লেখাগুলোকে পড়ে পড়ে মন এমন অপার্থিব খুশিতে ভরে যেত যে আমি নিজেও–যে একজন লেখক, এই পৃথিবীতে আমারও–যে লেখার কথা আছে তা প্রায় মনেই থাকত না। মনে হত এতসব অনবদ্য লেখার পর আমার নিজের লেখার আর দরকার কি?

আশিস লোহের কথা এই মুহূর্তে ফিরে ফিরে মনে পড়ছে। অসম্ভব সপ্রতিভ, গভীর ও মনুষ্যত্বসম্পন্ন ছিলেন তিনি। নিজেও তিনি ছিলেন একজন লেখক। এই ঘটনার বছর–দশেক পরে আমি, আশিস লোহ এবং আলতাফ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে একদিন একটা ছবি তুলেছিলাম। ছবিটার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। আলতাফও ছিলেন সে–সময়ের সিনেমা এবং টেলিভিশনের একজন শ্রেষ্ঠ কৌতুক–অভিনেতা। ঐ সময় তাঁরা প্রায়ই টিভিতে আমার উপস্থাপিত বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। ছবিটিতে এঁরা দুজন দাঁড়িয়েছিলেন আমার দুইপাশে। আমি দাঁড়িয়েছিলাম মাঝখানে, আমার দুহাত তাঁদের দুজনের কাঁধের ওপর রেখে। আমার ডান হাতের নিচে ছিলেন আলতাফ, বাঁ হাতের নিচে আশিস লোহ। ছবিটা এখনও আমার কাছে আছে।

ছবিটা তোলার বছর–কয়েক পরেই আলতাফ পৃথিবী থেকে চলে যান। এরপর ছবিটার দিকে তাকালেই মনে হত আমার প্রসারিত ডান হাতটার নিচের জায়গাটা খালি। সেখানে যেন কেউ নেই। এর বছর–দশেক পরে চলে গেছেন আশিস লোহ। তার পরেও আমি ছবিটা একবার দেখেছি। তাকিয়ে মনে হয়েছে একটা বিশাল শূন্যতার মাঝখানে দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে আমি যেন একা দাঁড়িয়ে আছি, আমার দুপাশে হাতের নিচে কোথাও কিছু নেই। এখন পুরো কাগজটা শাদা হয়ে যাবার জন্যে আর একটিমাত্র বিদায়ের দরকার।

৫

সাতষট্টি সাল জুড়ে একঝাঁক ঝকঝকে নতুন কবি, ভরা বর্ষার ইলিশ–ঝাঁকের মতোই, প্রায় একসঙ্গে এসে হাজির হয়ে গেল আমাদের সেই খরস্রোতের উচ্ছ্বিত ধারায়। গুণের কথা আগেই বলেছি। তাঁরই পাশাপাশি বরিশাল থেকে এল আবুল হাসান আর হুমায়ুন কবীর, কক্সবাজার থেকে মুহাম্মদ নূরুল হুদা, রাজশাহী থেকে মহাদেব সাহা ও শেখ

আতাউর রহমান, নোয়াখালি থেকে ফরহাদ মজহার, টাঙ্গাইল থেকে সাযযাদ কাদির, নারায়ণগঞ্জ থেকে সেলিম সারোয়ার—এমনি আরও প্রায় জনা-বিশেক। আগের তুলনায় অনেক বেশি কর্মচঞ্চল আর কলরবমুখর হয়ে উঠল আমাদের আসর। আনন্দে, উষ্ণতায়, ব্যস্ততায়, হৈহৈয়ে সারাক্ষণ রমরম গমগম করতে লাগল।

এই সময়ে যারা এল তারা ষাটের দ্বিতীয় পর্বের লেখক। প্রথম ষাটের লেখকদের চেয়ে তারা-যে কিছুটা তরুণ তা-ই নয়, ভাবনা-চেতনাতেও কিছুটা আলাদা। প্রথম ষাটের লেখকদের মতো এদের ত্বকও অবক্ষয়ের ছোপ-লাগানো, কিন্তু তাদের মতো 'পুরোপুরি অবক্ষয়ী' এরা নয়। অবক্ষয়ের বাইরে আর-একটা নতুন আগ্রহ তখন এদের রক্তকে চঞ্চল করে তুলেছে। সে হল দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার স্বপ্ন। এদের আসার ঠিক আগখানটাতেই শেখ মুজিবের ছয়-দফার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদের জোয়ার শুরু হয়ে গেছে। প্রথম ষাটের অবক্ষয়ের পাশাপাশি এরা সেই উদ্বুদ্ধ জাতীয়তাবাদেরও সন্তান।

না, কেবল জাতীয়তাবাদের নয়, আরো একটা স্বপ্ন তখন রঙিন পতাকার মতো তাদের হৃদয়ে পতপত করে উড়ছে। সে-স্বপ্ন মার্কসবাদী বিপ্লবের স্বপ্ন। রুশপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রোমাঞ্চ থিতিয়ে আসার পর এবারের এই স্বপ্নের নায়ক চীন। মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে তখন চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হয়েছে। তার ঢেউ আছড়ে পড়েছে বাংলার তরুণ-সম্প্রদায়ের স্বপ্নের বেলাভূমিতে। মাও সে তুং-এর বাণী সম্বলিত লক্ষ লক্ষ লাল বই তখন দেশের পথে-প্রান্তরে মানুষের হাতে লাল পতাকার মতো উড়ছে। সে বাণীর মূল কথা : চিরযৌবনের রক্তে বিপ্লবকে মঞ্জরিত করতে হবে। চিরন্তন শ্রেণীসংগ্রামের জন্য চাই চিরন্তন বিপ্লবের চেতনা। রাষ্ট্রীয় জীবনে বিপ্লব ঘটলেও অনেকের হৃদয় থেকে যায় সেই বিপ্লবী-চেতনার বাইরে। তারা থেকে যায় জড়, নিষ্ক্রিয়। তাই প্রতিবিপ্লব ফিরে এসে সমাজকে অতীতের শ্রেণী-শোষণের ভেতর ফেরত নিয়ে যেতে চায়। তাই দরকার ফিরে-ফিরে বিপ্লব, বারে-বারে বিপ্লব। নিরন্তর আত্মশুদ্ধি। তাই কেবল গতানুগতিক বিপ্লব হলেই চলবে না। চাই সাংস্কৃতিক বিপ্লব। হৃদয়-জগতের বিপ্লব।

মাও-এর এই বাণী দেখতে দেখতে সারা বাংলাদেশের তরুণ-সমাজকে মাতাল করে তুলল। জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে হাত মিলিয়ে এ চেতনা ছড়িয়ে পড়ল সবখানে, প্রতিটি চত্বরে, চৌহদ্দিতে। সারাদেশ এই সাম্যবাদের জ্বরে তখন পুরোপুরি আক্রান্ত। আমার মনে হয় এই চেতনা সেই সময় সারা জাতির মতো শেখ মুজিবকেও উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। তাঁর দীর্ঘদিনের সামাজিক অর্থনৈতিক ভাবনায় এই বিপ্লব এনেছিল সুস্পষ্ট পালাবদল। ধনবাদী সভ্যতায় আজন্ম বিশ্বাসী এই মানুষটিকেও তা পাল্টে দিয়েছিল। বাংলাদেশের সংবিধানের চার মূলনীতির একটি হিসেবে তিনি-যে সমাজতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে দেশকে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলেন তা এই উদ্দীপনার ফসল বলেই আমার মনে হয়।

৬

ষাটের দ্বিতীয় পর্বে যারা এল তাঁদের অধিকাংশের মধ্যে ছিল এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মত্ততা। এদের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান খুব অল্পদিনের, খুব জোর পাঁচ-সাত বছরের, কিন্তু আমাদের সঙ্গে এদের পার্থক্য হয়ে গিয়েছিল এসব কারণে। যৌবনের উন্মেষের দিনগুলোয় আমরা পেয়েছিলাম একটা বিমর্ষ অবক্ষয়ী পরিবেশ, তারা পেয়েছিল এক জাগ্রত দেশকাল। আমাদের অবক্ষয়ী চেতনার দ্বারা তারাও যেমন ব্যাপকভাবে আক্রান্ত ছিল, আমরাও তেমনি পরবর্তীকালের জাতীয় উত্থানের দ্বারা গভীরভাবে উজ্জীবিত হয়েছিলাম। তবু তারা ছিল মূলত উদ্দীপনা-যুগের লেখক, আমরা অবক্ষয়ের। আমাদের কবিতা ছিল অন্তর্মুখী, আত্মরতিময়। এদের লেখা ছিল বহির্মুখী, উচ্চকণ্ঠ। জ্বলন্ত হৃদয়ের কবিতাকে তারা সেকালের জেগে-ওঠা মানুষের রক্তের ভেতর ছড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য (না, আশ্চর্য নয়, কারণ শিল্পের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক), শিল্পের অঙ্গনে আমাদের দুই দলের সাফল্য এসেছিল একেবারেই উল্টো পথে। আমাদের প্রথম তারুণ্যকে জ্বালিয়ে তুলেছিল অবক্ষয়; এ আমাদের অনুভূতিকে তীব্রভাবে উদ্দীপিত করেছিল, কিন্তু (প্রথম যৌবনের প্রচণ্ডতার ও অপরিণতির কারণে) একে আমরা ভালোভাবে আত্মস্থ করতে পারিনি। তাই অবক্ষয় নিয়ে আমরা হৈচৈ তুললেও এ-ধারায় আমাদের চোখে পড়ার মতো সাফল্য কম। কিন্তু জাগরণকে আমরা দেখেছিলাম কিছুদিন পরে, সামান্য একটু পরিণত বয়সে। তাছাড়া এর সঙ্গে শৈল্পিক দূরত্বও আমাদের ছিল দ্বিতীয় পর্বের লেখকদের চেয়ে বেশি। তাই ওদের চেয়ে একে আমরা আত্মস্থ করেছিলাম আরও নিবিড়ভাবে এবং এতে আমাদের সাফল্যও হয়েছিল ওদের চেয়ে বেশি। লেখক-জীবনের সূচনায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, বিশেষ করে রফিক আজাদ ছিল আমূণ্ডপদনখ অবক্ষয়ের চেতনায় প্রোথিত। কিন্তু ধীরে ধীরে গভীর দেশাত্মবোধ এবং উচ্চতর সংঘ-চেতনাকে তারা স্পর্শ করেছিল। দেশপ্রেমের প্রগাঢ় একাগ্রতায় রফিক আজাদ যে সোনালি সাফল্য দেখিয়েছে তা যেমন গভীর তেমনি অনুভূতিস্বপ্নিল। ওর প্রথমদিকের একটা কবিতা দিয়ে উদাহরণ দিই :

গান হ'তে বলি আজ দীর্ঘশ্বাসগুলিকে আমার,
সম্পূর্ণ লোকজ গীতি—ভাওয়াইয়া কিংবা ভাটিয়ালি—
দেশজ ঐতিহ্যময়, লোকায়ত গীতিকার মতো

মন থেকে মনে, মনে-মনে, কৃষকের ঘরে ঘরে,
দুঃখ-বেঁধা হৃদয়ে-হৃদয়ে ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালি
মধুর শীতল স্পর্শে সান্ত্বনার ঠাণ্ডা হাত রাখে।

সকরুণ সুরের মূর্ছনা সম্পূর্ণত দেশোয়ালি—
নীরবে দাঁড়িয়ে প'ড়ে শোনে এক ভিনদেশী ভাই
আবেগে একাত্ম হ'য়ে, এই গানে, স্বজনের গলা !
আত্মমগ্ন গায়কের ভরা, বিষণ্ন, দরাজ গলা
ট্রানজিস্টারে—সুরের সুতোয় গাঁথে পরস্পর
বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন গ্রাম-জনপদ, যোগাযোগ ঘটে
আত্মায়-আত্মায়, নাগরিকে-গ্রাম্যজনে,—গানে-গানে,
প্রাণে-প্রাণে; ভেদাভেদ ঘুচে যায় চাঁড়ালে পণ্ডিতে। ...
অনিদ্রারোগীর চোখে আর মস্তিষ্কের কোষে-কোষে
ফুলের পাপড়ির মতো, অতি দ্রুত, ঘুম নেমে আসে,
ব'নে যায় নেহাৎ সরল, গেঁয়ো, অভিভূত চাষা—...
যেন সে-ও, নাগরিক, চ'লে যায়
মোষের গাড়ির সাথে, উচ্চাবচ, নিধুয়া পাথারে—
মইষাল ভাইসম !—কিংবা সে-ও পাড়ি দিল খুব
দীঘল পানির পথ : ...

এই গান মানুষে-মানুষে বাঁধে
মিলনের আবশ্যিক সেতু, অর্থময় করে তোলে
প্রাত্যহিক জীবন-যাপন। বয়সের ভারে নত
বৃদ্ধেরও জীবনে কিছু অর্থ যোগ ক'রে দিতে পারে ...

মননের মন্বন্তরে এই গান খাদ্যদ্রব্যবাহী
অসংখ্য জাহাজময় সুসংবাদ বয়ে নিয়ে আসে।

নিষ্ফল ক্রন্দন নয়,—দীর্ঘশ্বাসগুলিকে আমার
তাই গান হ'তে বলি—ভাওয়াইয়া কিংবা ভাটিয়ালি।

[গান হ'তে বলি]

আরো পরে ইলিয়াসের উপন্যাসে এই অনুভূতি আত্মমগ্ন, গভীর ও শিল্পরূপিত হয়েছে।

ষাটের দ্বিতীয় পর্বের লেখকদের বেলায় ঘটেছিল ঠিক এর উল্টোটা। বিপুল জাতীয় উদ্দীপনার তোড় তাদেরকে বিস্রস্ত করে ফেলেছিল। জ্বলন্ত দেশপ্রেমকে তারা চিনেছিল যৌবনের প্রথম অনুভূতির তীব্রতায়। তাই তা ছিল আমাদের তুলনায় অনেক রগরগে ও কাঁচা। তাই যখনই দেশপ্রেমের জোরালো উদ্দীপনার কথা তারা বলতে গেছে তখনই তাদের গলা চড়ে গেছে, কবিতা না হয়ে তা অনেকখানেই হয়ে

পড়েছে চিৎকার, স্লোগান। অপরিশোধিত আবেগের হাতে পড়ে কবিতা শিল্পশুদ্ধতা হারিয়ে বসেছে। তাই দেশাত্মবোধ বা উজ্জীবনের ক্ষেত্রে তাদের শিল্পসাফল্য আমাদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু অবক্ষয়ের সঙ্গে তাদের দূরত্ব ছিল আমাদের চেয়ে বেশি। এই দূরত্ব শিল্পের অনুকূল। এটা বক্তব্য–বিষয়কে আত্মস্থ করে তাকে শিল্পে উত্তীর্ণ করতে সাহায্য করে। তাই অবক্ষয় নিয়ে তারা আমাদের চেয়ে কম লিখলেও ঐ ব্যাপারে শিল্পের ওপর তাদের অধিকার অনেক সময়েই হয়েছে আমাদের চেয়ে বেশি। নির্মলেন্দু গুণের একটি কবিতাকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরি। 'ক্লেদজ কুসুম' যে কত সুন্দর হতে পারে এই কবিতা তার উদাহরণ :

আমি কীভাবে অগ্নির সঙ্গে সঙ্গম করেছিলাম, সেই গল্পটা বলি।
একদিন ঝড়ের রাতে ঈশ্বর এসে উপস্থিত হলেন আমার ঘরে।
আমি সারাদিন পরিশ্রম শেষে, তক্তপোষে আরাম করে শুয়ে,
নিজের মনে, নিজের সঙ্গেই খেলা করছিলাম। আমার গাত্র
এবং মন উভয়ই ছিল নিরাবরণ। তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করলেন
একটি চমৎকার দৃষ্টিনন্দন আলোকবর্তিকার রূপ ধরে, এবং
গায়েবি ভাষায় বললেন : 'আমি আপনাকে শিশ্নমুক্ত করতে এসেছি,
দয়া করে আপনি দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।'

আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ, তাই যেভাবে শুয়েছিলাম,
সেরকম শুয়ে থেকেই বললাম : 'খুব ভালো কথা, কিন্তু
আমি কি জানতে পারি, কী আমার অপরাধ?'
ঈশ্বর বললেন : 'হ্যাঁ, পারেন। আপনি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রটিকে সৃষ্টির চেয়ে
অনাসৃষ্টির কাজেই বেশি ব্যবহার করেছেন। আপনি সামাজিক
নিয়ম–কানুন এবং স্থান–কাল–পাত্রের ভেদ মান্য করেনি।'

তাঁর কথা শুনে আমার খুবই রাগ হলো। এ কি ঈশ্বরের যোগ্য কথা?
নিয়ম–কানুন, স্থান–কাল–পাত্রভেদ, মানে? তিনিও যদি মানুষের
মতোই কথা বলবেন, তা হলে আর ঈশ্বর কেন? একটু রাগতস্বরেই
আমি বললাম : 'আপনি কি জানেন না, আমি অভেদপন্থী?'

ঈশ্বর বললেন : 'জানি। আমি ভুল করে আপনাকে অসময়ে
পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলাম। আপনি আদিমকালের মানুষ ;
এ–যুগ আপনার নয়। আমি আপনার প্রতি সম্মানবশত আপনাকে
উঠিয়ে নিতে নিজে এসেছি এজন্যে যে, আপনি আমার প্রিয়–কবি,
অন্যথায় আমি আমার যমদূতকেও পাঠাতে পারতাম।'

আমি বললাম : 'বেশ, ভালো কথা। কিন্তু ভুলটা যেহেতু আমার নয়,
আপনার, তাই আমার একটা শেষ-শর্ত আপনাকে পূরণ করতে হবে,
তারপর আমি আপনার কথা রাখব।'

'বলুন কী শর্ত!'—ঈশ্বর জানতে চাইলেন।
আমি আমার লালিত একটি গোপন স্বপ্নকে মনের অতল থেকে
মুক্তি দিয়ে, কামনাজড়িতকণ্ঠে বললাম :
'শুধু একটি বারের জন্যে আমি আপনার সঙ্গে মিলিত হতে চাই।'
মনে হল, আমার প্রস্তাব শুনে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে
আলোকবর্তিকাটি ঘূর্ণিহাওয়ায় দুলে উঠল।
স্থির হলে পর, গায়েবি ভাষায় ঈশ্বর বললেন : 'আমি অন্তর্যামী,
আমি আপনার এ-আকাঙ্ক্ষার কথা অনেক পূর্ব থেকেই জানি,
কিন্তু তা কখনোই পূরণ হবার নয়। আমি নারী, পুরুষ বা কোনো
সঙ্গমযোগ্য প্রাণী নই,—আমি হচ্ছি অগ্নি, সর্বপাপঘ্ন অগ্নি আমি,
আমি নিশ্ছিদ্র আপনি আমার সঙ্গে মিলিত হবেন কীভাবে?'

আমি বললাম : 'সে ভাবনা আমার, আমি আমার প্রবেশপথ
তৈরি করে নেব। আমি শুধু আপনার সম্মতিটুকু চাই।'

ঈশ্বর বললেন : 'সাবধান, আপনি আমার দিকে অগ্রসর হবেন না।
আর এক পা-ও এগুবেন না, ভস্ম হয়ে যাবেন।'

প্রজ্বলন্ত আলোকবর্তিকার মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করে আমি বললাম :
'ইতিপূর্বে বহুবার, বহুভাবে আমি ভস্ম হয়েছি, ভস্মের ভয় দেখিয়ে
আপনি আমার সঙ্গে ছলনা করছেন কেন?—আমি চাই আপনিও
আমার আনন্দের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করুন।'

নায়াগ্রা প্রপাতের অফুরন্ত জলধারার মতো আমার স্খলিত বীর্যধারায়
যখন শীতল হলো আলোকবর্তিকার সেই অগ্নিজ্বলা দেহ,
তখন গায়েবিভাষা রূপান্তরিত হলো মধুক্ষরা মানবীভাষায়।
ঈশ্বর বললেন : 'আমাকে অমান্য করার অপরাধে, দেখবেন,
একদিন আপনার খুব শাস্তি হবে।'

আমি অপসৃয়মাণ সেই আলোবর্তিকার দিকে তাকিয়ে বললাম :
'কুচযুগ শোভিত, হে অগ্নিময়ী দেবী, তবে তাই হোক।'

[অগ্নিসঙ্গম]

অবক্ষয়ের ভেতর আমণ্ডুপদনখ নিমজ্জিত থেকেও এত সুন্দর কবিতা প্রথম ষাটের কবিরা লেখেননি।

৭

আগেই বলেছি, আবুল হাসান এসেছিল বরিশাল থেকে। গুণের মতো ও আগবাড়িয়ে বা ডঙ্কা পিটিয়ে আসেনি, এসেছিল ওর নিজের স্বভাবমতো, নিঃশব্দ মৃদু পায়ে। গুণের কয়েকমাস আগেই ও এসে পৌঁছেছিল আমাদের ভেতর। সুদূর দক্ষিণবঙ্গটাকেই যেন বুকের ভেতর করে ও নিয়ে এসেছিল এখানে। ঐ এলাকার সবুজ-প্রকৃতির মতোই ও ছিল অনুভূতিময় আর সজীব। গাছের পাতাঝরার সামান্যতম শব্দেও ওর অনুভূতি-জগতে সাড়া জাগত। ওর প্রকৃতিপ্রবণ মন-যে কতটা সজাগ ছিল তা ওর প্রায় প্রতিটি কবিতার পরতে পরতে টের পাওয়া যায়। ওর চেহারা ছিল স্নিগ্ধ আর হাস্যমধুর, চোখদুটো ছিল বড় বড় আর বিস্ময়ে ভরা। সেই চোখ দিয়ে চারপাশের পৃথিবীকে ও অপলকভাবে দেখত। কবিতার কোনো বৈশিষ্ট্যেই নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গে ওর মিল ছিল না, কেবল একটা জায়গা ছাড়া, সে হল ওরা দুজনেই ছিল স্বভাব-কবি। ওদের দুজনার কবিতাই ছিল ঝরনার মতো আলোর মতো জোছনার মতো উপচে-পড়া। সে-উচ্ছলতা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত তেমনি অপরিমেয় ও নিয়ন্ত্রণহীন। কবিতা-স্বভাবে বা ব্যক্তিস্বভাবে কোনো মিল ছিল না ওদের, তবু সহজেই ওরা বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। হয়তো বন্ধুত্ব জিনিশটাই এমনি। একধরনের মানুষের চেয়ে ভিন্নধরনের মানুষকেই এ বেশি টানে। গুণ ছিল উদ্ধত ও বহির্মুখী, আবুল হাসান ছিল অন্তর্মুখী ও সলজ্জ। এই লাজুকতা ওর চেহারায় সবসময় একটা লাবণ্যের আভা ছড়িয়ে রাখত। গুণের কবিতার মূল বিষয় ছিল প্রেম ও রাজনীতি; হাসানের মূল বিষয় ছিল প্রকৃতি ও জীবনের প্রতি ভালোবাসা। গুণের কবিতা ছিল প্রদীপ্ত ও ধারালো; হাসানের কবিতা ছিল কোমল ও রহস্যময়। তবু ওরা বন্ধু হয়ে পড়েছিল। হয়তো আর্থিক কষ্ট ওদের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল; এক পরিত্রাণহীন যাযাবর জীবনের ভেতর দীর্ঘযাত্রার এক বন্ধনহীন গ্রন্থি রচনা করে দিয়েছিল।

তবু যত অমিলই থাকুক, একটা জায়গায় তারা ছিল একেবারেই একরকম। তা হল জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কবিতায় ফুটিয়ে তোলার তীব্র অতৃপ্ত উন্মাদনা। সারাক্ষণই ওদের সময় কাটত কবিতামত্ত অবস্থায়। চারপাশের প্রতিটি জিনিশ, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি উত্তেজনা ও অনুভূতিকে কবিতা করে তুলত ওরা ওদের কবিতায়। আবুল হাসান সম্বন্ধে শামসুর রাহমান লিখেছেন : 'এই কবির জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কবিতায় ভরপুর ছিল। যেন হাওয়ায়, ধুলোয়, গাছের পাতায়, পাখির ডানায়, নদীর জলে, দিনের কোলাহলে, রাত্রির নিস্তব্ধতায় তিনি কবিতা পেয়ে যেতেন।' আগেই বলেছি, দক্ষিণবঙ্গের পুরো সবুজ নিসর্গই ছিল ওর বুকের ভেতরে। সেই প্রকৃতি থেকে ইচ্ছামতো সজীব উপাদান তুলে নিয়ে ও তাকে কবিতা করে তুলত। গুণ ও হাসানের মতো এমন নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তিহীন অস্বস্ত উন্মাদ কবিতাযাপন এ-যুগে একমাত্র শামসুর রাহমান ছাড়া আমি আর কারো মধ্যে

দেখিনি। এজন্যে শামসুর রাহমানের মতো গুণের বইয়ের সংখ্যাও এমন বিপুল। আমার ধারণা হাসান বেঁচে থাকলেও হয়তো তাই হত। অপর্যাপ্ত ফুলে ভরা অফুরন্ত বসন্তসম্ভার ছিল ওদের মধ্যে।

আবুল হাসান এসেই সোজা জায়গা করে নিল 'কণ্ঠস্বর'-এর পৃষ্ঠায়। 'কণ্ঠস্বর'-এর তৃতীয় সংখ্যাতেই ওর লেখা ছাপা হয়েছিল, যে-সংখ্যা সম্বন্ধে গুণের অনুভূতি আমি কিছুক্ষণ আগে উদ্ধৃত করেছি। হাসানের স্বভাব ছিল খুবই হাস্যস্মিত আর নম্র, যে-কোনো পরিবেশেই ও নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারত। আমাদের ভেতরে একাকার হয়ে যেতেও ওর দেরি হল না।

৮

দেখতে দেখতে বরিশালের নিসর্গলোক থেকে এসে দাঁড়াল আর-এক অশ্বারোহী, তবে তা কেবল কবিতার স্বপ্নমুগ্ধ পেলবতা নিয়ে নয়, একই সঙ্গে তলোয়ারের বিদ্যুৎঝলক জাগিয়েও। সে হুমায়ুন কবির। ওর বিদ্যুৎদীপ্তির কথা পরে বলব, আপাতত ওর কবিতার কথা বলি।

কয়েক বছরের মধ্যেই হুমায়ুনের কবিতা খররৌদ্রের মতো দপদপে হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু যখন প্রথম ও আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছেছিল তখন তার হৃদয় থেকে কৈশোরিক স্নিগ্ধতার রেশ পুরোপুরি কাটেনি। আবুল হাসানের মতো সুস্মিত মাধুর্য দিয়ে ও আমাদের মনহরণ করেনি, নিজের সপ্রতিভ শক্তির অপ্রতিরোধ্যতা দিয়ে একেবারে দলের ভেতরটায় ঢুকে পড়েছিল। 'কণ্ঠস্বর'-এ ওর প্রথম কবিতা ছাপা হয় সাতষট্টির এপ্রিল সংখ্যায়, নাম 'পার্শ্ববর্তিনী সহপাঠিনীকে'। কবিতাটি পড়ার সময় বুদ্ধদেব বসুর প্রথম যৌবনের কবিতার মিষ্টি মৃদু আমেজের কথা মনে পড়ে :

কী আর এমন ক্ষতি যদি আমি চোখে চোখ রাখি
পদাবলী প'ড়ে থাক সাতাশে জুলাই বহুদূর
এ্যাখোন দুপুর দ্যাখো দোতলায় পড়ে আছে একা
চলনা সেখানে যাই। করিডোরে আজ খুব হাওয়া
বুড়ো বটে দু'টো দশে উড়ে এল ক'টা পাতিকাক।

স্নান কি করনি আজ ? চুল তাই মৃদু এলোমেলো
খেয়েছ তো ? ক্লাশ ছিল সকাল ন'টায় ?
কিছুই লাগেনা ভালো; পাজামা প্রচুর ধুলো ভরা
জামাটায় ভাঁজ নেই পাঁচদিন আজ

তুমি কি একটু এসে মৃদু হেসে তাকাবে সহজে
বলনি তো কাল রাতে চাঁদ ছিল দোতলার টবে
নিরিবিলি ক'টা ফুলে তুমি ছিলে একা।

সেদিন সকালে আমি, গায়ে ছিল ভাঁজভাঙা জামা
দাঁড়িয়েছিলাম পথে হাতে ছিল নতুন কবিতা
হেঁটে গেলে দ্রুত পায়ে তাকালে না তুমি
কাজ ছিল নাকি খুব? বুঝি তাই হবে।

ওদিকে তাকাও দ্যাখো কলরব নেই করিডোরে
সেমিনার ফাঁকা হল হেডস্যার হেঁটে গেল অই।
না-না-যেওনা তুমি চোখে আর তাকাব না আমি
বসে থাকি শুধু এই; এইটুকু দূরে বই নিয়ে
এ টেবিলে আমি আর ও টেবিলে তুমি নতমুখী।

[পার্শ্ববর্তিনী সহপাঠিনীকে]

কবিতাটি এমন কিছু নয়, কিন্তু সবটা মিলে কোথায় যেন একটা সহজ মাধুরী। হুমায়ুন জায়গা পেয়ে গেল আমাদের ভেতর। সেই-যে ও একাকার হল, ওর জীবনের শেষ-দিন পর্যন্ত সেই বাঁধন আর কাটেনি। কেবল আমাদের সঙ্গে নয়, ব্যক্তিগতভাবেও আমার খুব কাছের হয়ে উঠল হুমায়ুন। 'কণ্ঠস্বর'-এর প্রাত্যহিক কাজ আর ছোটাছুটিতে ও-যে কেবল আমার সঙ্গে সেঁটে রইল তাই নয়, ব্যক্তিগত সুখে দুঃখেও হয়ে উঠল আমার প্রতিমুহূর্তের বন্ধু ও অনুজ।

তীব্র, প্রখর ও দুঃসাহসী হুমায়ুন ছিল অমিতরকমে উচ্চাকাঙ্ক্ষী। মনের দিক থেকে ও ছিল বাংলার দুর্ধর্ষ রায়রায়ানদের উত্তরসূরি। কোনো সংঘে সর্বোচ্চ অবস্থানের নিচে নিজেকে ও কল্পনা করতে পারত না। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ওকে আত্মিক জগৎ থেকে একসময় ক্ষমতার জগতের দিকে টেনে নেয়। কবিতার চেয়ে বিপ্লবী রাজনীতির দিকে ও ঝুঁকে পড়তে থাকে। ওর ভেতর ছিল ইস্পাত আর কুসুমের সহবাস । (ওর প্রথম বই 'কুসুমিত ইস্পাত' নামটার ভেতরেই তার পরিচয় আছে।) তাই আমরা যারা ওর ভেতরকার মৃদু ও স্বপ্নমুগ্ধ কবি-মানুষটিকে চিনতাম তারা ওর এই ইস্পাতাগ্রহের প্রাবল্যে ক্রমাগতভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠছিলাম। স্বাধীনতার যুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ের রক্তপিপাসু বাংলাদেশে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ওর জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে থাকে। ওর পরিণতি হয়েছিল আমাদের সবার জন্যেই মর্মান্তিক।

৯

'কণ্ঠস্বর'-এর তৃতীয় সংখ্যা বের হবার পরেই টের পেয়েছিলাম প্রতিমাসে একটি করে পাঁচ-ফর্মার পত্রিকা বের করতে হলে আমি একসময় ক্লান্তিতে ভেঙে যাব। কিন্তু করারও কিছু ছিল না। যাকে রানিং ক্যাপিটাল বলে তা তো আমাদের নেই। পত্রিকা বের হলে বিজ্ঞাপন থেকে যে-টাকা আসবে শুধু সেটুকুই পরের সংখ্যার ভরসা। কাজেই কোনো সংখ্যা বের হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যেত সেই সংখ্যার বিজ্ঞাপনের টাকার জন্য বিজ্ঞাপনদাতাদের দরজায় একটানা ধরনার করুণ আলেখ্য। একটা কাগজে কোনো বিজ্ঞাপন ছাপা হলে তার টাকা পেতে সাধারণভাবে মাস-তিনেক সময় লাগে। এটাই নিয়ম। এর ভেতর অনেক আনুষ্ঠানিকতা, ফাইলের পুট আপ, নোটিং-এর ঝামেলা, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন, চেক তৈরির গড়িমসি—এসব আছে । তাই দেরিটাই স্বাভাবিক। অথচ ঐ টাকা আমাদের পেতেই হবে পনেরো দিনের মধ্যে। না-পেলে উপায় নেই। ও দিয়ে কাগজ কিনে প্রেসে না দিলে ছাপা শুরু হবে না পরের সংখ্যা ! তাছাড়া আগের সংখ্যার কিছু বাকি-বকেয়া প্রেসকে না-মেটালে তারাই বা কাজে উৎসাহ পাবে কেন ? এদিকে বাইন্ডারও তো তাকিয়ে আছে করুণ মুখে, তাকেও তো কিছু দিতে হয়।

কাজেই প্রতিদিন সকালে উঠে ছুটতে হত বিজ্ঞাপনদাতাদের দরোজায়। হাসিতে, কৌতুকে, প্রশংসায়, নিবেদনে তাদের মন গলিয়ে এই অন্যায় আবদার গেলাতে হত তাদের। ভজিয়ে জপিয়ে প্রায় ভিখেরির মতো পেতে হত একেকটা চেক। মনটা অসম্ভব ছোট হয়ে যেত ওগুলো হাতে নেবার সময়। আমি তখন টেলিভিশনের মোটামুটি পরিচিত মুখ, ক্লাসকক্ষের সপ্রতিভ অধ্যাপক। কলেজভর্তি ছাত্রেরা আমাকে সম্মান করে। এভাবে ছোট হতে আমি মাটির সাথে মিশে যেতাম। আর কেবল চেকের সন্ধানে থাকলেই তো চলবে না, নতুন বিজ্ঞাপনও তো চাই। কাজেই আবার বেরোতে হত পথ থেকে পথে, এক বিজ্ঞাপনদাতা থেকে আর-এক বিজ্ঞাপনদাতার কাছে। কখনো মতিঝিলে, কখনো তেজগাঁয়ে, কখনো টঙ্গি হয়ে পুরানা পল্টনে—এমনি করে এক প্রত্যাশা থেকে আরেক প্রত্যাশার চৌকাঠে—রোদে পুড়ে, গরমে ঘেমে, বৃষ্টিতে ভিজে; কখনো বাসে চড়ে, কখনো রিকশায়, কখনো সাইকেলে করে। কখনো কর্তাব্যক্তিদের দেখা পেতে ব্যর্থ হয়ে বা পরে দেখা করার নির্দেশ অবনতমস্তকে শিরোধার্য করে; অধিকাংশ সময় বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ঘিনঘিনে ও ক্লেদাক্ত একটা শরীর-মন নিয়ে ফিরে আসতাম বাসায়।

এভাবেই হয়তো ফুরিয়ে আসতাম একটু একটু করে। কিন্তু বাঁচিয়ে দিত সুন্দর বিকেল আর উন্মুখ সন্ধ্যাগুলো; বিকেল আর সন্ধ্যার প্রেস, লেখক, আড্ডা,—সেই ষাট-দশকী সাহিত্য-আন্দোলনের উচ্ছল রগরগে মৌতাত।

গুণ ঢাকায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি অবশ্যি একটা কাজ তাঁকে দেবার চেষ্টা করেছিলাম, আমার পক্ষে তখন ওটুকুই সম্ভব ছিল। 'কণ্ঠস্বর'-এর বিজ্ঞাপন

সংগ্রহের কাজ। আমার আশা ছিল কষ্টেসৃষ্টে, গুণ কাজটা চালিয়ে যেতে পারলে তাঁরও যেমন কোনোমতে চলে যাবে, 'কণ্ঠস্বর'-এর বিজ্ঞাপনের পরিস্থিতিরও তেমনি কিছুটা উন্নতি হবে। এ সম্বন্ধে গুণ লিখেছেন :

> গ্রাম থেকে লেখা আমার পত্রের উত্তরে ঢাকায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সায়ীদ ভাই আমাকে লিখেছিলেন। তাই আমার সম্পর্কে তাঁর একটা মানসিক প্রস্তুতি আগে থেকেই ছিল। পরিচয়মাত্র সায়ীদ ভাই আমাকে তাঁর স্বভাবসুলভ কৌতুকমিশ্রিত হাসিতে আপন করে নিলেন। ...অঘোষিতভাবে আমার বহুবিড়ম্বিত শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটিয়ে, 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকার একজন কর্মী হিসেবে আমার কর্মজীবন শুরু হয়। বেতন অস্থির, মানে তখনও স্থির হয়নি। সায়ীদ ভাই বললেন : নির্ধারিত বেতন না থাকলেও মাঝে মাঝে আমার কাছ থেকে খাই-খরচ বাবদ কিছু পাবেন এবং আপনি যেসব বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করবেন, তার কমিশন পাবেন ১০% হারে। তাতেই আপনার কোনোক্রমে চলে যাবে। একটু কষ্ট তো করতেই হবে। হা-হা। তাঁর বিখ্যাত প্রাণখোলা হাসি। *[আমার কণ্ঠস্বর]*

১০

'কণ্ঠস্বর'-এর বিজ্ঞাপনের কাজটি-যে কতটা আনন্দের ছিল তা বোঝানোর জন্য নির্মলেন্দু ঐ বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা পরের একটি জায়গা থেকে কিছুটা জায়গা উদ্ধৃত করছি। 'কণ্ঠস্বর'-এর দুটি মাত্র সংখ্যার বিজ্ঞাপন-সংগ্রহের কাজ করেছিলেন গুণ। তাও সব বিজ্ঞাপন নয়। আমার যা জোগাড় করার কথা তার বাইরের কিছু বাড়তি বিজ্ঞাপন। তাতেই তাঁর ভেতর কী পরিমাণ তিক্ততা জন্মেছিল তা তাঁর নিজের লেখা থেকেই তুলে দিচ্ছি :

> আমি পলিটেকনিক হোস্টেলেই নিশিযাপন করি। দিনে এখানে-ওখানে 'কণ্ঠস্বর'-এর বিজ্ঞাপনের সন্ধানে বের হই। লোকজনকে 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকা সম্পর্কে একটা খুব উঁচু ধারণা দেবার চেষ্টা করি। পত্রিকার নাম শুনে তাঁরা আঁতকে ওঠেন। কেউ হয়তো আমার কথা শোনেন। কেউ খুব বিরক্তির সঙ্গে আমাকে তাড়িয়ে দেন। কেউ পরে আসার জন্য বলেন। আমি বিজ্ঞাপনের জন্য ছোট বড় সকল প্রতিষ্ঠানের কাছেই ধর্না দিই। বলা তো যায় না, যদি লাইগা যায়! কিন্তু না, সহজে লাগে না। ...ঢাকার মানুষের মন বড় শক্ত। শিল্প-সাহিত্যের প্রতি তাদের অনুরাগেরও বড় অভাব। কোনো-কোনো ব্যক্তি আমার সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করেন যে, মনে হয় দেই শালার পেটে চাকু ঢুকিয়ে। কিন্তু

> চাকু পাব কোথায়? এটা তো আর বারহাট্টা নয়—এটা ঢাকা।...মনে হতাশা এসে ভিড় করে। তখন ভাবি, নতুন কাজে নেমেছি, ভেঙে পড়লে তো চলবে না। গুনগুন করে কবিগুগুরুর গান গাই, 'বারে বারে ঠেলতে হবে হয়তো দুয়ার খুলবে না, তা বলে তো ভাবনা করা চলবে না।'

এরপর নানানজনের কাছ থেকে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের নানান কৌশল ও বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গুণ লিখেছেন :

> বিজ্ঞাপন সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমার বিশেষ-পারদর্শিতার কথা কণ্ঠস্বর-সম্পাদক এখনও স্বীকার করেন। কিন্তু ঐ কাজ আমার বেশিদিন করা হয়নি। মাস-দুয়েকের অভিজ্ঞতা থেকেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম, এটা আমার কাজ নয়। এর চেয়ে ঢাকা শহরে রিকশা চালানো অনেক ভালো—ভালো কমলাপুরের ট্রেনযাত্রীদের মাল ওঠানো-নামানোর কাজ করা।

অসহ্য মনে হওয়ায় গুণ দু-মাস পর ঐ কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। করতে না চাইলে কে তাঁকে ধরে রাখবে? কিন্তু আমার পক্ষে কিন্তু ওভাবে চলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ঢাকা শহরে রিকশাচালানোর কাজ বা কমলাপুরের ট্রেনযাত্রীদের মাল ওঠানো-নামানোর কাজের চেয়ে অসম্মানজনক আর কষ্টকর এই কাজটিই কিন্তু আমাকে এর পরেও করে যেতে হয়েছিল আরও দশ-দশটি বছর। বিনা প্রতিবাদে, বিনা নিষ্কৃতিতে।

পত্রিকার এসব কাজকে—যা আমাদের কাছে এতখানি অমর্যাদাকর মনে হত, আসলে তা কি আসলেই ভেঙে-পড়ার মতো অপমানজনক ছিল? আমি তো ঐ সময় এমন বেশকিছু খাটুয়ে মানুষকে দেখেছি যারা তাঁদের প্রকাশিত বাণিজ্যিক পত্রিকাকে লাভজনক করার জন্য আনন্দের সঙ্গে সারাদিন এই-ধরনের কাজ করে যেতেন। আমি একজন ইংরেজি সাপ্তাহিকের নাছোড়বান্দা সম্পাদককে চিনতাম যিনি বিজ্ঞাপন জোগাড়ের জন্য প্লেনে করে সুদূর করাচি লাহোরে চলে যেতেন। শুনেছি তার বিজ্ঞাপন-সংগ্রহের থাবা থেকে বাঁচার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানের একজন শিল্পপতির দারোয়ান তাঁর পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েও তাঁকে নিরস্ত করতে পারেনি। তিনি সেই শিল্পপতির মন জয় করে শেষপর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত বিজ্ঞাপন আদায় করে ছেড়েছিলেন। সেই পাকিস্তানি শিল্পপতির মতো নিজেও আজ তিনি কোটিপতি হয়েছেন।

একেক সময় মনে হয় লাভের জন্য পত্রিকা বের করলে বা চোখের সামনে শিল্পপতি হওয়ার ঝলমলে স্বপ্ন থাকলে আমরাও কি এইসব অপমান আর লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারতাম? টাকা কি এতই শক্তিশালী! নাকি শারীরিক-মানসিকভাবেই গুণ বা আমি বা আমাদের মতো মানুষেরা ছিলাম ঐ-ধরনের কাজের অনুপযুক্ত, তাই কাজটিকে এমন কষ্টকর আর অপমানজনক মনে হত।

১১

সবচেয়ে বিপাকে পড়তে হত প্রেস-মালিকদের নিয়ে। চেহারা তাদের ভেজা বেড়ালের মতো, ভাবটা এমন যে তার প্রেসে আমরা পত্রিকা ছাপতে আসায় কতই-না কৃতার্থ! কিন্তু একবার পাণ্ডুলিপি হাতে দাও, মুহূর্তে সে স্বমূর্তিতে দেখা দেবে। হয়তো বলল, 'এই-যে আপনার সামনেই ধরাইয়া দিলাম কম্পোজ। কাইল দুপুরে আসেন, দিমুই দিমু দুই ফর্মা।' বলে হাঁকাহাঁকি করে একজন কম্পোজিটারকে বলে দিলেন, 'এ্যাক্ষনি ধরাইয়া দে। কাইল দুপুরের মধ্যে চাই কলম। সাব আইব।' পরের দিন সময়মতো যেয়ে দেখলাম কাজটা ধরাই হয়নি। আমাকে দেখেই মালিক হৈ চৈ করে উঠলেন, 'এই কে আছস, সাহেবরে শিগগির চা দে।' ধৈর্য ধরে পরের দিনও ঠিক সময়মতো গেলাম, কিন্তু পেলাম মাত্র আধ-ফর্মা। কিংবা ধরুন বললেন, 'কাইল আসেন। পুরা দুই ফর্মাই দিমু।' গিয়ে দেখলাম মাত্র কিছুক্ষণ হল লেখাটা ধরিয়ে দিয়েছেন কম্পোজিটারকে, এক ফর্মা পেতে হলেও ঘণ্টা-চারেক বসতে হবে। অগত্যা অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে বসে বসে সময় কাটানো। কিছুতেই তারা তাদের কথা রাখবে না। এ যেন তাদের এক অলিখিত শর্ত। তাদের জল্লাদী নিষ্ঠুরতা মীর্জা গালিবের প্রিয়তমার চাইতেও ভয়ংকর—হাঁটাতে হাঁটাতে জীবনটাকে শেষ করে তবে ছাড়বে। সময়-অসময় নেই, খাওয়া-দাওয়া নেই তাদের দুয়ারে ঘুরতে ঘুরতে কীভাবে একসময় সত্যিসত্যিই ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সে-গল্প পরে হবে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখতাম আমাদের এভাবে তিলে তিলে শেষ হয়ে যেতে দেখেও তাদের এতটুকু করুণা নেই। কিন্তু অভিমান করে অন্য কোথাও গিয়েও বা কী হবে? পরের মানুষটা তো এর চেয়েও বড় জল্লাদ। কাজেই আমাদের নিয়তি হল তাদের নির্দয়তার কাছে বারে বারে ফিরে আসা আর তাদের পায়ে মাথা কুটে কুটে শেষ হওয়া—হুমায়ুনের কবিতাটার মতো :

ফিরে আসি ফের ভীরু
পদাঘাতে পিষ্ট তবু কুকুর যেমন ক'রে
ফিরে আসে তার প্রভু ঘাতকের কাছে
(অথবা প্রদীপে দগ্ধ পতঙ্গের সতীদাহ ঝাঁক)।
তেমন আবার দ্যাখ ফিরে আসি তোমার দুয়ারে
তোমার আলোর দিকে ফিরে আসি— ক্লান্ত ক্রীতদাস
তোমার নিষ্ঠুর ঘরে; হে আমার পরম ঘাতক!

[কুকুর যেমন ক'রে]

কবিতাটি 'কণ্ঠস্বর'-এ বের হবার পর আমি হুমায়ুনকে পরামর্শ দিয়েছিলাম কবিতাটার নাম 'কুকুর যেমন করে' না-রেখে 'প্রেসমালিক যেমন করে' রেখে দাও, নামকরণের সার্থকতা বাড়বে।

এগারোটা বছর ধরে পত্রিকা চালিয়েছি, কিন্তু প্রেসের মালিকদের ব্যবহার থেকে একবারও বুঝতে পারিনি যে আমাদের মতো যারা মাসে পাঁচ-ফর্মার বা তিন মাসে দশ-ফর্মার কাগজ বের করতে আসে তারা আসলে তাদের কোনো গ্রাহকই নয়। পঁচিশ/পঞ্চাশ হাজার কপির নোটবইয়ের ফর্মা কিংবা লক্ষ লক্ষ কপির কেশ-তেল, বিস্কুট বা বিড়ির লেভেল ছাপার পর প্রেসের সময়ের যে-সামান্য ছোট্ট ফাঁকফোকর থাকে তারই এককোণের উপেক্ষিত এক অতি তুচ্ছ অনিশ্চিত উচ্ছিষ্টই কেবল আমাদের বরাদ্দ।

১২

আমাদের ছোট্ট কবিতাসংখ্যাটি বেরোনোর দিন-সাতেকের মধ্যে তার আগের সংখ্যার বিজ্ঞাপনের টাকা হাতে এসে যাওয়ায় পঞ্চম সংখ্যা আবার আগের মতো মোটাতাজা হয়ে বেরোল। সংখ্যাটি হলও বেশ। প্রচ্ছদে এবারও কাইয়ুম চৌধুরীর সেই বলিষ্ঠ লোগো যথারীতি উড়তে লাগল উদ্ধত পতাকার মতো।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত গল্প দিয়েই সাযযাদ কাদির জায়গা করে নেয় 'কণ্ঠস্বর'-এ। গল্পের নামটাও চমৎকার : 'রক্তের গন্ধ'। গল্পটিও সুন্দর। সাযযাদ ছিল হালকা পাতলা, ছোটখাটো। গুণ-হাসানের মতো আর্থিক সংকট ওরও ছিল খুবই প্রকট। একদিন সূর্যসেন হলের মাঠে আমি, গুণ আর সাযযাদ বসে গল্প করছিলাম। সাযযাদকে শুকনো আর বিমর্ষ লাগছিল। রসিকতা করে বললাম : 'কী, মুখ এত শুকনো কেন? প্রণয়যাতনার বেশিরকম প্রকোপ নাকি?' ও হেসে উত্তর দিল : 'প্রণয়াভাব না সায়ীদ ভাই, খাদ্যাভাব।'

সেই টাকাপয়সার টানাটানি। তরুণ-লেখকদের অর্ধেকের অবস্থাই ছিল প্রায় এমনি।

যা হোক, হালকা পাতলা হলেও ওর ভেতরটা ছিল উষ্ণ। সবকিছুর দিকে তাকানোর একটা আলাদা চাউনি ছিল সাযযাদের। আজও তা রয়ে গেছে।

প্রেস-মালিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা এরি মধ্যে তিনটি প্রেস পাল্টে তখন এসে উঠেছি সেগুনবাগানের ললনা প্রেসে। ললনা প্রেস ললনাদের প্রেস নয়, এর আসল নাম ইস্টার্ণ প্রিন্টিং পাবলিশিং অ্যান্ড প্যাকেজিং লি.। ওখান থেকে 'ললনা' নামের একটা মহিলা পত্রিকা বেরোচ্ছে বলে মুখে-মুখে ঐ প্রেসের তখন ঐ নাম। পত্রিকাটি তখন এর আধুনিকতা এবং নতুনত্বের জন্যে সেকালের তরুণীমহলে সাড়া জাগিয়েছে। এর ঝকঝকে চেহারা আর খোলামেলা হালফ্যাশানের হালকা চলন বলে দিচ্ছে এতদিনের একমাত্র মহিলা পত্রিকা 'বেগম'-এর মধ্যযুগীয় মুসলিম-নারীর একঘেয়ে ও গেঁয়ো-পর্ব পার হয়ে

একালের ফুরফুরে উচ্ছল ললনারা রঙিন পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে।

'ললনা' ললনাদের পত্রিকা হলেও কোনোদিন ঐ প্রেসে কোনো ললনাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না, এমনকি পত্রিকার সম্পাদিকা জিনিয়া সাত্তারকেও না। এসব অবশ্য নেহাতই আমাদের তরুণ লেখক–সম্পাদকদের গোপন দীর্ঘশ্বাস আর বেদনার কথা। ললনার উত্তরাপা তখন ছিলেন শাহাদত চৌধুরী। তিনিই উত্তর দিতেন চিঠিপত্রের। পরে তিনি সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' আর সাপ্তাহিক ২০০০–এর সম্পাদক হিসেবে বিখ্যাত হন। এ ছাড়াও আসত আলী ইমাম (পরবর্তীতে খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিক), আমার ছোটভাই আল মনসুর (পরে খ্যাতিমান টিভি–অভিনেতা), শাহরিয়ার কবির (পরবর্তীতে বিখ্যাত লেখক, রাজনৈতিক কর্মী ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক) সহ বেশকিছু উৎসুক ও প্রতিভাবান্বিত তরুণ তখন জড়ো হয়েছে সেই পত্রিকার টেবিল ঘিরে। মাঝে মাঝে শিল্পী রফিকুন্নবী ও হাশেম খানও আসছেন। স্বনামে বেনামে তাঁদের লেখা ছবি আর অলংকরণ নিয়েই রমরম করছে তখন ললনার পৃষ্ঠা। তার অগ্রযাত্রা কেউ আর ঠেকাতে পারবে না। পরবর্তীতে 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'র যে–ধারা তিন দশক ধরে আমাদের সাংস্কৃতিক জগতে আধিপত্য করেছে, সেই ধারার সূচনা এই ললনা থেকেই।

আজ পেছনদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে কী আশ্চর্য মিল ছিল 'ললনা' আর 'কণ্ঠস্বর'–এর মধ্যে। এর একটা একালের উঠতি মেয়েদের হাল–ফ্যাশানের পত্রিকা, একটা তরুণ–লেখকদের নতুন ফ্যাগান্তরের মুখপত্র। একই রকম নতুন, ব্যতিক্রমী আর স্বাধীন চিত্ততার অবাধ উচ্ছ্বাসে পাখা ঝাপটানো। এ মিল কি ফুগচেতনার? বহুশতাব্দী–স্থায়ী সামান্তবাদী সমাজের ভেতর পুঁজিবাদের প্রথম পদপাদে শিউরে–ওঠা মুক্ত মনের অনাবিল আনন্দ–স্বনন?

ললনা প্রেসের মালিক আবদুস সাত্তার সাহেবের বাবা আবদুল জব্বার ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চিফ ইঞ্জিনিয়ার। সেগুনবাগানে তাঁর বিরাট বাড়ির পুবদিকটায় একটা বিশাল টিনের চালা তৈরি করে বসানো হয়েছে নতুন প্রেস। যেমন বড় আর আলো–হাওয়ায় ভরা, তেমনি রাজকীয় এর হাবভাব। আগের ছোট আর ঘিনঘিনে প্রেসগুলোর শঠতা, হীনতা বা ইতরতা এখনে নেই। উদারতা আর বৈভবের ছোঁয়া যেন সবখানে ছড়ানো। এমনকি টাকাপয়সার ব্যাপারেও (যার অভাব আমাদের মনটাকে সবসময় ছোট করে রেখেছে) যেন তেমন তাড়াহুড়ো নেই। ছেপে যাও, যখন পারবে মনে করে দিয়ে দিও, এমনি একটা ভাব। আসলে প্যাকেজিংই ছিল তাঁদের প্রধান ব্যবসা। প্রেসটা বসানো হয়েছিল মূলত ললনার জন্যেই। তাই এই ছাপাছাপির তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তাঁরা তেমন মাথা ঘামাতেন না।

আমাদের বিশেষ সুবিধা হয়ে গিয়েছিল পত্রিকার ম্যানেজার মুহম্মদ আখতার আমাদের বন্ধু হওয়ায়। মুহম্মদ আখতার মানুষ হিসেবে যেমন ছিলেন উদার তেমনি তার হৃদয় ছিল উষ্ণ। প্রকাশনার ব্যাপারে তাঁর ধ্যানধারণাও ছিল খুবই উচ্চাঙ্গের। সেকালে বাংলাদেশের মুদ্রণশিল্পকে যাঁরা আধুনিকতার দোরগোড়ায় এনে দিয়েছিলেন, তিনি তাদের ছিলেন একজন। মাঝেমধ্যে ছড়াও লিখতেন মুহম্মদ আখতার। যন্ত্রসভ্যতার পদপাতে আমাদের সনাতন গ্রামীণ অর্থনীতির চেহারা–যে বিপন্ন হয়ে আসছে তার একটা বিষণ্ন ছবি ছিল সে–সময়ে 'সমকাল'–এ প্রকাশিত তাঁর একটা ছড়ায় :

কিন্তু সেদিন মালিক দিল বলে
আর এসো না ধান-ভানাব বলে।

আর ধান-ভানানো নয়, এখন ঢেঁকির যুগের অবসান। তোমরা আর এসো না হে। কল এসে গেছে, সেই এখন ছাঁটবে ধান।

সুরসিক ও স্নিগ্ধ হাসিতে ভরা মুহম্মদ আখতারের কাছ থেকে প্রেসের বিলশোধের ব্যাপারে বাড়তি সুবিধা পাওয়ার আশ্বাস পেয়েই আমরা এখানে এসেছিলাম। মুহম্মদ আখতার ছিলেন অসম্ভব রুচিশীল মানুষ। যতটা পেরেছেন তিনি আমাদের সহযোগিতা করেছেন। পত্রিকার প্রতিটি খুঁটিনাটির সঙ্গে তিনি এভাবে একাত্ম হয়ে থাকতেন, প্রতিটি নতুন সংখ্যা বেরোবার সময় এভাবে খুশি হয়ে উঠতেন যে মনে হত পত্রিকাটি তাঁরই। কিন্তু তার মৃত্যু হয় খুবই দুঃখজনকভাবে, এর মাত্র চার বছর পরে। উনি থাকতেন পুরানা পল্টনের একটা ফ্ল্যাটে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিকদের সঙ্গে আলবদর বাহিনী তাঁকেও একদিন তাঁর বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি আর ফিরে আসেননি।

১৩

আগেই বলেছি প্রুফ দেখতে আমার অসম্ভব কষ্ট হত। তাই সাযযাদ কাদিরকে অনুরোধ করেছিলাম 'কণ্ঠস্বর'-এর ঐদিকটা সামলাতে। কাজটা কয়েক সংখ্যা করেও দিয়েছিল ও। প্রথমদিন ওর প্রুফ-কাটা পৃষ্ঠা দেখে আমি তো অবাক! এ যে রীতিমতো 'শিল্প'। স্বভাবসুলভ মৃদু হাসিতে সাযযাদ কথাটায় সায়ও দিয়েছিল। সত্যি আশ্চর্য প্রুফ দেখত সাযযাদ। একে প্রুফ না বলে চিত্রকলা বলাই ভালো। প্রুফ-দেখা একেকটা পৃষ্ঠাকে মনে হত একেকটা অনবদ্য ছবি। এত সুন্দর করে প্রতিটা ভুল বানান ও কাটত, বেশি-ভুলের জায়গাগুলোকে এমন শিল্পিতভাবে লাইন টেনে ছাপা-এলাকার বাইরে নিয়ে মুক্তোর মতো সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে দিত, কাটা-প্রুফের লেখাগুলো দিয়ে সারাটা প্রুফশিটকে এমন সুচারুভাবে সাজিয়ে তুলত যে অবাক না হয়ে পারতাম না। শিল্পীর মতো গভীর মমতা আর নিমগ্নতা ছিল ওর ভেতর।

সাযযাদের গল্পের গদ্যও ছিল ঠিক ওর প্রুফ-দেখা পৃষ্ঠাগুলোর মতো, অমনি সৌকর্যময় আর নিটোল। আমি সাযযাদকে সবসময় গল্প লিখতে অনুরোধ করতাম। শুনে সাযযাদ চশমার ফাঁকে মৃদু হাসত। আমি বুঝতে পারতাম ওর আসল আকুতি গল্পের দিকে নয়, কবিতার দিকে। গদ্যও ও লিখত, কিন্তু মূলত কবিতাই ছিল ওর অন্বিষ্ট। আমি স্পষ্ট দেখতাম, ওর কবিতা ওর গদ্যের মতো হচ্ছে না, তবু কবিতাই ও লিখছে। হয়তো কবিতার ভেতর আত্মার প্রকৃত আনন্দ পেত বলেই লিখত। মানুষের প্রকৃত আনন্দ কখনো মিথ্যা হয় না। তাই লিখতে লিখতে একসময় চমৎকার কবিতা

লিখেছে সাযযাদ। মনকে আনত করার মতো কবিতা। সেসব কবিতা থেকে আমার পছন্দের একটা কবিতা এখানে তুলে দিলাম। এই কবিতাটির জন্যে আমার এই মুহূর্তের পক্ষপাত এ-কারণে যে, ষাটের দশকের জন্য যে-স্মৃতিভারাতুর হয়ে আমি এই বইটি লিখছি, এই কবিতাটিতেও সাযযাদ তেমনি স্মৃতিভারাক্রান্ত মন নিয়েই ফিরে গেছে ষাটের দশকের ফেলে-আসা ওর তরুণ-বয়সের দিনগুলোতে :

হঠাৎ কোনওদিন কবিতা লেখার সময়টায়
ভীষণ গোল বেঁধে যায়।
এই তো সেদিন যেই "রেলগাড়ি" কথাটি লিখেছি—
অমনই সেই ফুলবাড়িয়া স্টেশন থেকে
সিটি বাজিয়ে "গ্রীন অ্যারো" চলে গেল
নীলক্ষেত হাতিরপুল কাওরানবাজার তেজগাঁও নাখালপাড়া হয়ে
কোথায় কোন্ দিকে কে জানে!
কাঁটাবন পান্থপথ মহাখালী, আরও কোথায়-কোথায়,
ভীষণ যানজট লেগে গেল
সেই আকস্মিক ট্রেন-যাত্রায়।
কেউ জানলো না আমার কবিতার
তৃতীয় পঙ্‌ক্তির মাত্র একটি অতিসাধারণ শব্দ
ওই সব ঘটনার জন্য পুরোপুরি দায়ী।

আরেক দিন অন্য একটি কবিতার শুরুতে
যেই "ফুল" কথাটি লিখেছি—
অমনই সেই মর্নিং স্কুলে যাওয়ার পথে
'অর্চন-বিজন-জবা'দের বাড়ির সামনে থেকে
ভেসে আসা বকুলের গন্ধে
ভরে গেল আমার সমস্ত ঘর।
বাড়ির সবাই ইতিউতি খুঁজে গেল
সেই আশ্চর্য সুবাসের উৎস,
কিন্তু কারও চোখ পড়ল না
আমার কবিতার খাতাটির দিকে।

সেই থেকে আমার কবিতায়
আর তোমার নাম নেই।
কারণ তোমার নাম লেখা মাত্র
আমাদের সবাইকে ছেড়ে
ওই একজনের অতি কাছে চলে যাওয়াটা
তোমার মিথ্যে হয়ে যাবে।

যেই আমার কবিতায় কালির আঁখরে
ফুটে উঠবে তোমার নাম
অমনই আবার তুমি দাঁড়াবে এসে আমার পাশে,
আবার আসবে তুমি আমাদের সেই কলাভবনে।

[আবার সেই]

অনেক দিন বাঁচি আমরা পৃথিবীতে। কেউ ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বছর; কেউ ষাট, সত্তুর, আশি। অনেকগুলো দশক আসে আমাদের জীবনে। কিন্তু আমাদের প্রথম যৌবনের দশকের মতো এমন সুন্দর, অত্যাচারী, প্রিয় আর অসহায় আর কোন্ দশক?

১৪

দেখতে দেখতে 'কণ্ঠস্বর'–এর কয়েকটি সংখ্যা বেরিয়ে গেল ললনা প্রেস থেকে। কেবল বেরোল না; প্রকাশনা–সৌকর্য, লেখার মান সবদিক থেকেই যেন নিজেকেই নিজে ছাড়িয়ে যেতে লাগল। একসময় এমন অবস্থা হল, এই পত্রিকায় লেখা ছাপা হওয়াকে তরুণ–লেখকেরা লেখক হিসেবে তাদের স্বীকৃতি বলে মনে করতে লাগল।

সেদিন পত্রিকার এই মান আমরা কী করে অর্জন করেছিলাম, আজ তা ভেবে অবাক লাগে। আমার বয়স তখন সবে ছাব্বিশ, বাকিরা তেইশের নিচে, কী করে এই দিয়ে আমরা দুই বাংলার সেরা পত্রিকাগুলোর সমকক্ষ পত্রিকা বের করলাম? দেখা যেতে লাগল, কেবল তরুণরা নয়, বয়স্ক এবং প্রবীণ লেখকদের অনেকেই গোঁফ নামিয়ে এক এক করে আমাদের পত্রিকায় লেখা ছাপবার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। একদিন একজন 'খ্যাতিমান' কবি তো তাঁর লেখা ছাপি না বলে অভিমানের স্বরে অভিযুক্তই করলেন আমাকে। কেবল তিনি নন, অনেকেই লেখা দেবার জন্যে ধরাধরি করতে লাগলেন। আকারে ইঙ্গিতেও লেখা দেবার উৎসাহ প্রকাশ করলেন কেউ কেউ যাঁরা একসময় আমাদের বিদ্রূপবাণে ফালি–ফালি করেছেন।

কিন্তু আমরা তাঁদের কারো লেখা ছাপিনি। এ তাঁদের প্রতি কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে নয়, আদর্শিক কারণে। এই পত্রিকার ভেতর দিয়ে ষাটের স্বতন্ত্র সাহিত্যযাত্রাকে, তরুণ–লেখকদের আন্দোলনকে তখন আমরা উপহার দিতে চাচ্ছি। সেখানে পঞ্চাশের বা পরিত্যক্ত কোনো ধারার লেখা ছাপানোর কোনো মানে নেই। তাছাড়া একদিন এঁরাই তো আমাদের কবিতাকে 'পাগলের প্রলাপ' বলে হাসাহাসি করেছেন, গদ্যকে 'মৃগীরোগীর নান্দীপাঠ' বলে বিদ্রূপ করেছেন, এখন আমরা জিতে যাচ্ছি দেখে সাধু সেজে এসেছেন আমাদের মন ভজাতে। এতে আমরা ভুলছি না।

১৫

যে-সংখ্যায় সাযযাদের 'রক্তের গন্ধ' বেরোয় (দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা) তাতে ছিল পুরো আনকোরা আর-একজন কবির একটি কবিতা । কবিতার নাম 'বনময়ূরী'। তরুণতম এই কবির নাম আলতাফ হোসেন, ঢাকা কলেজের একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। কবিতাটির পরতে পরতে অদ্ভুত রহস্যময়তা। শব্দেরা যেন কথা বলে। একজন সতেরো বছর বয়সের কবির কাছ থেকে এ-লেখা সত্যি সত্যি প্রত্যাশার বাইরে। কে এই 'অশরীরী' কবি?

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর আর-একটি লেখা এসে গেল, তবে ঢাকা থেকে নয়, চট্টগ্রাম থেকে। ঢাকা কলেজ ছেড়ে ওখানকার সরকারি কলেজে ভর্তি হয়েছেন তখন তিনি। কবিতা নয়, গদ্য পাঠিয়েছেন এবার। নাম 'রবীন্দ্রনাথের গানের কথারা ও অতিলৌকিক অনুভব'। আশ্চর্য ইন্দ্রজালমদির লেখা। যেমন অনুভবগাঢ় তেমনি আত্মমগ্ন। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথের গানগুলোতে শব্দের শক্তি কী আশ্চর্য প্রতিভান্বিত ও দ্যুতিময়। এ বোঝাতে গিয়ে তাঁর নিজের শব্দের দীপ্তি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শব্দের রহস্যময়তাকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। 'গীতবিতান'কে তিনি বলেছেন 'সর্বকালোপযোগী এক ধর্মগ্রন্থ।' মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা নিয়ে এসব তিনি সেই সময় বলছেন যখন ঐ গানের শব্দের আশ্চর্য দীপ্রতা নিয়ে আবু সয়ীদ আইয়ুবের অসামান্য লেখাগুলো প্রকাশিত হয়নি এবং খুব বেশি মানুষের লেখায় রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীর লোকশ্রুত ধ্বনিসৌকর্যকে অনুভব করার চেষ্টা করা হয়নি।

অথচ এ মাত্র আঠারো কি উনিশ বছর বয়সের একজন তরুণের লেখা! আমাদের দলের সবারই বয়স তখন এর কাছাকাছি। কিন্তু তীব্রতা ও দ্যুতিতে প্রবীণদের চেয়ে এরা কোনোভাবেই খারাপ লিখছিল না। হয়তো এজন্যেই ওই বয়সের তরুণ-লেখকদের নিয়েও এত ভালো একটা পত্রিকা আমরা তখন চালিয়ে যেতে পারছিলাম।

আলতাফ হোসেন আত্মমগ্ন স্বভাবের মানুষ। প্রায় সাড়াশব্দহীন। স্বাভাবিক কথাও এত কম বলেন যে, কোনো কারণে বাধ্য হয়ে কথা বলতে গেলে তাঁর চেহারা করুণ হয়ে পড়ে। প্রায় ঘেমে ওঠেন তিনি। তাঁকে কুণ্ঠিত ও অপ্রতিভ দেখায়। একবার, ১৯৭০-এ চট্টগ্রাম গিয়ে তাঁকে আর তরুণ কবি দিবাকর বড়ুয়াকে সঙ্গে নিয়ে কাপ্তাই বেড়াতে গিয়েছিলাম। আশা ছিল কাপ্তাইয়ের পথে পথে ছড়িয়ে-থাকা আশ্চর্য আর বিস্ময়কর জিনিশগুলো দেখিয়ে তাঁরা আমাকে হতবাক করে দিতে চেষ্টা করবেন, যেমনটা আমাদের চেনা কোনো সুন্দর জায়গায় নতুন কাউকে নিয়ে যেতে পারলে আমরা করি। কিন্তু ব্যাপারটা হল ঠিক উল্টো। তাঁরা পুরো ভাবলেশহীন। লেক, পাহাড়, প্রকৃতি নিয়ে আমি যখন বিস্ময়ে খুশিতে পাগলের মতো ছুটাছুটি করছি তখনো তাঁরা প্রায় নিস্পৃহ। যেন এসব তুচ্ছ আর হাস্যকর ব্যাপারগুলো নিয়ে এভাবে পাগল হবার যে কী আছে তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। একবার একটা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি একটুকরো বড় কালোমেঘ পাহাড়টার মাথার একপাশে আটকে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এমন দৃশ্য তখন পর্যন্ত আমার কাছে নতুন। অসহ্য আনন্দে আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। বললাম : দেখেছেন

মেঘটা কীভাবে পাহাড়ের গায়ে আটকে আছে! দিবাকর শুকনো মুখে বললেন : ওসব আমরা অনেক দেখেছি। আমি পুরো দমে গেলাম। মনে হল, শহর থেকে আসা একজন হাড়হাভাতের আদেখলাপনা দেখে তাঁরা হয়তো করুণা করছেন!

আমার কেবল মনে হতে লাগল, এই কি সেই আলতাফ হোসেন কয়েকদিন আগে 'কণ্ঠস্বর'-এর পৃষ্ঠায় যিনি 'রবীন্দ্রনাথের গানের কথারা ও অতিলৌকিক অনুভব'-এর মতো একটি প্রায়-অলৌকিক লেখা লিখেছেন! সেদিনই আমি প্রথম টের পাই এই মৃদুভাষী, প্রকাশবিমুখ একাচোরা মানুষটি আসলে অনুভব করেন তাঁর গভীর অন্তর্প্রকৃতির ভেতর; চারপাশের প্রকৃতি ও মানুষ তাঁর চেতনার নিঃশব্দ বেদনালোকে প্রবেশ করে যে সূক্ষ্ম অস্ফুট আলোড়ন তোলে, তাঁর শিল্পীমন জেগে ওঠে সেইসব অপ্রাকৃত অনুভবে প্রায় অগোচরে সাড়া দিয়েই।

১৬

পরের সংখ্যা আবার বেরোল কবিতা-সংখ্যা হিসেবে,আগের মতোই ডিমাই সাইজের ছোট আকারে। তবে এবার আর এক-ফর্মার চটি পত্রিকা হিসেবে নয়, তিন-ফর্মার একটা ভদ্রগোছের পত্রিকার চেহারায়। ভেতরের ৪৪ পাউন্ডের কার্ট্রিজ কাগজে মোটামুটি হৃষ্টপুষ্টই লাগছিল পত্রিকাটিকে, তার ওপর কাভারের আঁশওয়ালা গাঢ় বাদামি রঙের পুরু বোর্ড এই সংখ্যার ভার আর জেল্লা দুই-ই বাড়িয়ে তুলেছিল।

সংখ্যাটি কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের উৎফুল্ল করে রাখলেও অচিরেই তা আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়াল। আতঙ্ক ঘনিয়ে তুলল রফিক আজাদের 'বেশ্যার বিড়াল' কবিতাটি। বোদলেয়রীয় ঢঙে লেখা এই সুঠাম কবিতাটির যৌনবিষয় ও রগরগে চিত্রগুলোই এই আতঙ্কের কারণ। পাঠকের কৌতূহল মেটানোর জন্যে কবিতাটি এখানে তুলে দিচ্ছি :

আলস্যে নেশায় বুঁদ—আমি এক বেশ্যার বিড়াল;
সারারাত শুয়ে থাকি অনাবৃত উষ্ণ তলপেটে
বিছিয়ে কোমল থাবা।—রিরংসায় কেঁপে ওঠে নারী
—আমি তার সর্বগ্রাসী উন্মুখর উবুর আস্বাদে।

প্রলুব্ধ করে সে এক অর্থময় ভুরু-ভঙ্গিমায়,
পরম আহ্লাদে আমি সুমসৃণ উবুর নরমে
নিয়তই কম্পমান অভিনব খেলেনা সাজাই,—
আদরে বুলাই থাবা রেশমের মত রোমে-রোমে।

আবরণহীন গরীয়ান দুই ধবল মিনারে
আরোহণে আহ্বান জানায় সেই ছিনালী রমণী;
যেন তার স্তনে কত রকমারী খেলনা ও খাদ্য
(একান্ত আমার জন্যে) এতকাল ধ'রে আছে জমা !

প্রতিদিন নাভিনিম্নে সুবিন্যস্ত কোমল শয্যায়
বিছিয়ে রাখে সে সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পের আদর :
'উত্তাপ, উত্তাপ দাও'—ব'লে ঝরে শীতার্ত আকুতি।
—সঞ্চারিত করি আমি রক্তে তার রোমশ-উত্তাপ।

যখন শীতার্ত থাকি, আমি তার শরীরের ওমে
পুনর্বার অলৌকিক শিহরণপুঞ্জে জেগে উঠি॥
আমাদের খেলা জমে শীতগ্রীষ্মে, ব্যতিক্রমহীন—
প্রণয়-রজ্জুতে বাঁধা আমি আর সেই জাদুকরী॥

[বেশ্যার বেড়াল]

সেকালের পূর্ব পাকিস্তানের নৈতিকতা ও রুচিবোধ এ-ধরনের বিষয়কে মেনে নেবার জন্যে একেবারেই তৈরি ছিল না। রফিক চিহ্নিত হয়ে গেল প্রায় যৌনকবিদের কাতারে। মুসলিম-বিশ্ব ইমরুল কায়েসকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে-চোখে দেখে এসেছে প্রায় তেমনি অবস্থায়।

আমি ভেবেছিলাম রফিক হয়তো এই দুরপনেয় লজ্জায় মাস-তিনেক ঘরে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকবে। কিন্তু রফিক ভাবলেশহীন। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখি চারপাশের কৌতূহলীর ভিড় আর অবজ্ঞা-ছুড়ে-দেওয়া মানুষদের ভেতর দিয়ে ও নির্বিকারে হেঁটে বেড়াচ্ছে। পুরোপুরি নিষ্পাপ সন্তের মতো ওর চেহারা, যেন কবিতাটা নিয়ে যে এসব তুলকালাম ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে তার কোনো খবরই ওর কাছে নেই। ওর চোখে সুদূরে-তাকিয়ে-থাকা দার্শনিকের ধ্যানী দৃষ্টি।

দেশে তখন রক্ষণশীল মুসলমান অনেক থাকলেও,আজকের মতো মৌলবাদী মুসলমানরা ছিল না। কাজেই ঠিক রক্ষণশীল পাঠক নিয়ে নয়, আমরা যা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম তা হল পুলিশি ঝামেলা। নানান সূত্র থেকে খবর আসতে লাগল, পুলিশের কাছে খবর চলে গেছে এবং তারা অচিরেই হামলা করতে আসছে। পত্রিকার বাজেয়াপ্ত হবার খুবই সম্ভাবনা।

'সমকাল'-সম্পাদক জাফর ভাইয়ের মতো আমাদের কোনো সামাজিক প্রভাব ছিল না। আমাদের একমাত্র ভরসা খালেদা আপা,আমাদের প্রকাশক। তিনি নিজে সরকারের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি। যে-কোনো অসুবিধায় তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই হল। অপর্যাপ্ত দাক্ষিণ্যের হাত বাড়িয়ে তিনি দেবীর মতো দাঁড়িয়ে আছেন।

উৎকণ্ঠা বেড়ে উঠলে একদিন খালেদা আপার কাছে গিয়ে কথাটা পাড়লাম। শুনে খালেদা আপা চিন্তিত হলেন। বললেন, দেখি কী করা যায়। শুনেছি ব্যাপারটা নিয়ে তিনি কিছু কিছু মহলে যোগাযোগ করেছিলেন। খালেদা আপার সেই চেষ্টার ফলে নাকি অন্য কোনো কারণে জানি না, সে-যাত্রা আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম। তবে আমার ধারণা সে-সময় নৈতিকতার যে-মানদণ্ড ছিল তাতে 'বেশ্যার বিড়াল' কবিতাটির জন্যে পত্রিকা বাজেয়াপ্ত হতে পারত।

১৭

আগেই বলেছি বড়ভাইদের মধ্যে ছোটভাইদের জন্যে যে-ধরনের উৎক.া ও মমতা থাকে রফিকের জন্য আমার ঠিক সে-ধরনের অনুভূতি ছিল। আমি ওকে খুবই ভালোবাসতাম। ওর জন্য গর্বিত বোধ করতাম। তাই ওর জন্য যে-কোনো কষ্ট স্বীকার করতে আমি রাজি ছিলাম।

রফিক ওর প্রতি আমার ভেতরকার এই মমতার জায়গাটাকে চিনত। তাই যখন-তখন ও ওর ইচ্ছামতো যে-কোনো জিনিশ আমার কাছে চাইত ও তা আদায় করে নিত। আমি-যে ওর যে-কোনো দাবি মেটাতে মমতাগতভাবে বাধ্য তা যেন ও প্রকৃতির ভেতর থেকে টের পেয়ে গিয়েছিল। এসব আদায় করে নিতে তাই ও এতটুকু মায়ামমতা করত না। ওর এই নির্দয়তা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে ও একসময় ঠিক করে নিয়েছিল যে আমার ঘরে এলে ও আমার অজান্তে কিছু-না-কিছু হাতিয়ে নিয়ে যাবেই। একদিন হাতের কাছে আর কিছু না-পেয়ে বাথরুমের টুথপেস্ট পকেটে পুরেই নাকি সটকে পড়েছিল। গল্পটা অবশ্য ওর কাছ থেকেই আমার শোনা। আগেই বলেছি, ওর এই দৌরাত্ম্যগুলো আমাকে অসম্ভব খুশি করত। আমি আমার ভেতরে বাৎসল্যরসের ক্ষরণ অনুভব করতাম। ওর এই নীরব দস্যুতা-যে কতটা নিয়মিত হয়ে উঠেছিল, একদিনের একটা গল্প দিয়ে তা বোঝাতে চেষ্টা করি।

আমি তখন নয়াপল্টনে ড. আইয়ুবের বাড়িতে ভাড়া থাকি। ঘরের ভেতর আমি আর রফিক দুজন বসে গল্প করছিলাম, একফাঁকে আমি উঠে গেলাম আমার সদ্য-কেনা ইকমিক-কুকারে দুপুরের রান্না চড়াতে। আমার সঙ্গে গল্প করার সময় রফিক মেঝেতে বসে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল, ফিরে এসে দেখি ও সেখানে নেই, কিছুটা দূরে আমার বুকশেল্‌ফটার কাছাকাছি একটা জায়গায় চুপ করে বসে আছে। আমার সন্দেহ হল : রফিক বসার জায়গা পাল্টাল কেন? কিছু হাতিয়ে ফেলেছে নাকি এরই মধ্যে! তখন তরুণ-লেখকদের কেউ কেউ আমার সঙ্গে দেখা করে চলে যাবার সময়, প্রায় নিয়মিতই আমার শেল্‌ফ থেকে এক-আধটা বই ভুল করে নিয়ে চলে

যেত। এই আত্মভোলাদের একজনের গল্প শহীদ কাদরী প্রসঙ্গে আমি বলেছি।

রফিককে শেল্‌ফের পাশে বসে থাকতে দেখে আমার চোখ শেল্‌ফের ওপর গিয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখি বইয়ের একটা সারির মাঝখানের কিছুটা জায়গা ফাঁকা। স্পষ্ট বোঝা যায় কেউ ওখান থেকে গোটাদুই বই সরিয়ে ফেলেছে। সন্দেহ হল, আমি পাশের ঘরে যাবার পর রফিক ওগুলোকে সরিয়ে ঘরের আর-কোথাও রেখে দিয়েছে কি না। দুষ্টুমি করে আমি রফিকের চোখে চোখ রেখে বললাম : কী রফিক, নিয়েছ নাকি ওগুলো? আমি বলেছি 'ওগুলো'। কাজেই ঠিক কী নেওয়ার কথা বলেছি, রফিকের বোঝার কথা নয়। কিন্তু দেখি ওর চোখেমুখে কিছুটা নার্ভাসভাব। ধরা পড়ে গেছে এভাবে সলজ্জ হাসিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ'। বলে হাতিয়ে-নেওয়া বই বের করার জন্যে পকেটে হাত ঢোকাতে লাগল। কিন্তু পকেটে হাত ঢোকাচ্ছে কেন রফিক? পকেটে এসব পেল্লায় সাইজের বইও ঢুকিয়ে ফেলছে নাকি ও আজকাল? কিন্তু না, বই না, যা নিয়েছিল তাই বার করল ও। দশটাকার একটা নোট। আস্তে আস্তে লাজুক ভঙ্গিতে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। না, ফেরত দিতে নয় (সে বান্দাই ও নয়), কী নিয়েছে দেখানোর জন্যে। আমি রান্না করতে গেলে আমার পাঞ্জাবির পকেট থেকে হাতিয়ে নিয়েছিল। এই ছিল রফিক আর আমার সম্পর্ক।

নির্মলেন্দু গুণের মতো রফিকও ছিল ঘরহীন অনিকেত মানুষ। বাস্তব সংসারের সঙ্গে ওদের নাড়ির যোগ ছিল না। তাই ওদের জন্যে সকলের ছিল এমন সুগভীর মায়া আর উৎকণ্ঠা। জীবন ওদের কাছে ছিল শিল্পের কাঁচামাল, ওদের কাছে এর প্রয়োজন ছিল শুধু শিল্পের জন্যেই। ওরা একাগ্রভাবে ছিল কেবল সেই উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। তাই কোনো মানুষ বা ব্যক্তিজীবনের কোনো ব্যাপার ওদের কাছে বড় হয়ে উঠত না। আমার ধারণা এই শ্বাসরুদ্ধকর ক্ষমাহীন একাকীত্বের বেদনা ওদের কবি হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

১৮

যেসব মানুষকে পৃথিবীতে সংবাদস্রষ্টা বলে—রফিক ছিল তাদেরই একজন। গুণের স্বভাবও ছিল কিছুটা এমনি। ওদের ঘিরে খ্যাতি-কুখ্যাতির নানান জাঁকালো গল্প তৈরি হচ্ছে দেখতে পেলে ওরা মনে মনে খুশি হত। জীবনের বিভিন্ন পর্বে এমনি নানা ধরনের গল্প দিয়ে একসময় সত্যি সত্যি কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিল রফিক। প্রথম যৌবনে ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল নিষিদ্ধ জগতের যুবরাজ হিসেবে। একসময় চেঙ্গিজ খানের আদলে মুখের দুপাশে গোঁফ নামিয়ে মগ-জলদস্যুদের অবয়ব ধারণ করার চেষ্টা করেছিল। একবার নির্যাতিত স্বামীদের সংঘ বানিয়ে তার স্বঘোষিত সভাপতি হয়েছে। সবশেষে 'বিরিশিরি পর্বে'ও ওর নির্বাসিত জীবনযাপনকে

উজ্জ্বলতা দেবার স্বপ্ন আছে ওর লেখায়। নিজের সবকিছু নিয়েই ও গর্বিত ছিল। ওর চেহারার গঠনে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যও ছিল ওর গর্বের জিনিশ। কিছুদিন আগে ওর কাছে একটা মজার গল্প শুনেছিলাম। গল্পটা ও বলছিল ওর চেহারায় মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য কতটা প্রকট সেটা বোঝাবার জন্যে।

কোরিয়ার ঠিকাদারেরা তখন উত্তরবঙ্গ মহাসড়ক তৈরি করছে। কুকুর ওদের খুব প্রিয় খাবার। তেতুলিয়া থেকে নগরবাড়ি পর্যন্ত রাস্তার দুপাশের প্রায় সব কুকুর খেয়ে সাবাড় করে ফেলেছিল ওরা। ওদের ভাবসাব টের পেয়ে বাকি কুকুরগুলো সেই–যে ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছিল, ওরা চলে না–যাওয়া পর্যন্ত আর ফেরেনি। রাস্তা তৈরি শেষ করে ওদের চলে যাবার বছর–দুই পর একবার রফিক বেড়াতে গিয়েছিল এই রাস্তার ধারে রংপুরের তারাগঞ্জ, মিঠাপুকুর বা এমনি কোনো–এক জায়গায়। বাস থেকে নামতেই ও দেখল সামনে বসে–থাকা কুকুরটা ওকে দেখেই হঠাৎ লাফিয়ে উঠে প্রাণপণে দিল দৌড়। যত দৌড়ায় তত প্রাণভয়ে পেছনে তাকায়। রফিক তো অবাক! রাস্তার কুকুর ওকে দেখে কেন এভাবে দৌড় দিল! পাশে দাঁড়িয়ে ছিল একজন স্থানীয় লোক। সে হেসে বলল : আপনাকে ও কোরিয়ান মনে করেছে স্যার।

নিজেকে নিয়ে কোনো সংকোচ বা হীনমন্যতা ছিল না রফিকের মধ্যে, ছিল না নিজের পাপ নিয়ে কোনো কুণ্ঠা বা আত্মগ্লানি, (সবার সঙ্গে সুবিনীত ব্যবহার করলেও) ভেতরে ভেতর কাউকে কোনোদিন তোয়াক্কা করেনি ও, জীবনের ওপর খুদে মোগল–সম্রাটদের মতো দোর্দণ্ডভাবে বেঁচে থেকে আজীবন কবিতাকে অন্বেষণ করে গেছে। আজ জীবনের এই বিস্রস্ত অপরাহ্ণ বেলাতেও ওর মাথা একইরকম উদ্ধত ও অবিনীত।

১৯

পাঠকদের হয়তো মনে আছে 'কালবেলা' বের করার যৌথ উদ্যোগ থেকে সরে এসে আমরা 'একলা চলো' নীতি নিয়ে 'কণ্ঠস্বর' বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। জ্যোতি–হায়াৎরাও বসে ছিল না। ওরাও উদ্যোগ নিয়েছিল 'কালবেলা' এককভাবে চালিয়ে যাবার। 'কণ্ঠস্বর' আর 'কালবেলা' বের হয় প্রায় একই সঙ্গে। কিন্তু তরুণ–লেখকদের খুব–একটা দলে না–পাওয়ায় 'কালবেলা' পড়ে যায় বিপাকে। নামে তরুণদের পত্রিকা হলেও বড়দের লেখা ছাপা শুরু করতে হয় ওদের। আস্তে আস্তে সিকানদর আবু জাফর, সৈয়দ আলী আহসানের মতো প্রবীণ লেখকেরা হয়ে ওঠে ওদের পত্রিকার লেখক। একসময় নবীনদের পত্রিকার চরিত্রই হারিয়ে ফেলে 'কালবেলা'।

১৯৬৭ সালে ললনা–প্রেসে কণ্ঠস্বর ছাপতে গিয়ে দেখলাম জ্যোতিরাও 'কালবেলা' ছাপতে ঐ প্রেসেই এসে হাজির হয়েছে। আবার মিলন হল দু–দলের। তবে এবার আর একই পত্রিকার অভিন্ন গোষ্ঠী হিসেবে নয়, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকার আলাদা দল হিসেবে। পত্রিকা বের করতে গিয়ে জ্যোতি অবশ্যি ততদিনে বেশ কাবু হয়ে এসেছে। 'কণ্ঠস্বর'–এর

তখন সাতটি সংখ্যা বেরিয়ে গেলেও 'কালবেলা' মাত্র প্রথম সংখ্যা ছেড়ে দ্বিতীয় সংখ্যায় পা দিয়েছে। হয়তো পত্রিকা বের করার সত্যিকার কোনো অর্থও তখন আর ওদের কাছে নেই। কেবল হেরে যাবার সংকোচই ওদের পত্রিকা টিকিয়ে রাখার একমাত্র প্রেরণা।

একসঙ্গে একটি সংখ্যা বের করলাম আমরা। আমাদের পত্রিকার স্ফীত কলেবর, দৃষ্টিনন্দন চেহারা, ভালো লেখা, তারুণ্যের খরস্রোত—সবই 'কালবেলা'কে ছাপিয়ে গেল। পুরোপরি বোঝা গেল যে 'কালবেলা' পিছিয়ে পড়ছে। এবার প্রতিযোগিতা পরবর্তী সংখ্যা নিয়ে। তাতেই নির্ধারিত হয়ে যাবে কে জয়ী, কে পরাজিত।

দুটো পত্রিকাকেই সাধ্যমতো ভালো করে তোলার চেষ্টা হতে লাগল। এবারেও আমাদের পত্রিকার লেখার মান হল ওদের চেয়ে ভালো। বাকি কেবল প্রচ্ছদ। এ ব্যাপারে জিততে পারলেই আমাদের বিজয় নিরঙ্কুশ হয়ে যায়।

এখন দুশ্চিন্তা কাভার কী করে নয়নলোভন করা যায়। কাইয়ুম ভাইয়ের এঁকে-দেওয়া লোগোটা ব্যবহার করেই আমরা এতদিন আমাদের কাভার করে আসছিলাম। লোগোটা থাকত কাভারের বাঁ-ধারের ওপরের দিকে, বাকি অংশে আমরা পত্রিকার সূচিপত্রসহ যাবতীয় তথ্য টাইপ দিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিমধুর বিন্যাসে সাজিয়ে দিতাম। ফুলদানির ছবিওয়ালা এ-ধরনের একটা কাভারের কথা আগেই বলেছি। এভাবে আমাদের কোনোমতে চলে যেত। না চলেই বা উপায় কী? ভালো কাভারের-যে কোনো সম্ভাবনাই নেই। দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে বালক একলব্য যেমন গভীর নিষ্ঠায় দ্রোণাচার্যের মূর্তি সামনে রেখে একা-একা শরচালনা শিক্ষা করেছিলেন আমরাও তেমনি কাইয়ুম চৌধুরীর কাছ থেকে পুরো কাভার পাওয়ার সম্ভাবনা না-দেখে তাঁর লোগোকে সামনে রেখে পত্রিকার কাভার করে গিয়েছি। কিন্তু বারে বারে অক্ষর সাজিয়ে কাভার করায় তা একসময় একঘেয়ে হয়ে এল। এখন দরকার পরিবর্তন—চমৎকার নয়নাভিরাম পরিবর্তন। বিশেষ করে এই সংখ্যায়। এর ওপরেই যে আমাদের আর 'কালবেলা'র জয়-পরাজয়ের নির্ভর।

কিন্তু আমি তো শিল্পী নই। কী পরিবর্তন আনতে পারি আমি? এক সন্ধ্যায় ললনা-প্রেসের বারান্দায় বসে অস্থিরভাবে চিন্তা করছিলাম এ নিয়ে। না-করে উপায়ও ছিল না। পত্রিকা বের হবে পরের দিনের পরের দিন। কাজেই কালকে সন্ধ্যার মধ্যেই কাভার ছাপা হয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। তাই এক্ষুনি মানে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কাভারের ব্যাপারে ভালো কিছু-একটা ভেবে উঠতে না-পারলে আমাদের বিজয় নিরঙ্কুশ হবে না।

হঠাৎ সামনের বাগানের দিকে চোখ পড়তেই মনের ভেতর নতুন একটা কল্পনা ঝলক দিয়ে উঠল। আমার হাত-তিনেক দূরেই একটা ছোট আকারের থুজা গাছ; তাজমহলের ছবিতে তাজমহলের সামনে রাস্তার দুপাশে যে সারবাঁধা ছোট ছোট গাছগুলোকে দেখা যায়, সেই গাছ। হঠাৎ মনে হল এর একটা পাতার ছবি দিয়ে কাভার করলে কেমন হয়? তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে একটা পাতা ছিঁড়ে আনলাম। কারুকাজে আর সৌকর্যে পাতাটা আশ্চর্য সুন্দর। তাড়াতাড়ি পাতাটার একটা ছবি তুলে সেটাকে

পাঠিয়ে দিলাম ব্লক করতে। পরের দিন সেই ব্লক ব্যবহার করে ছাপা হল কাভার।

এই কাভারের সঙ্গে অবসান ঘটল 'কণ্ঠস্বর'–এর প্রথম পর্বের প্রাণহীন, গুমোট ও একঘেয়ে কাভার–যুগের। লোগোটা ছাপা হল ভার্মিলিয়ন রঙে,প্রচ্ছদের বাঁ–দিকে, কিছুটা ওপরে। এর নিচ বরাবর ডানদিকে লেখা হল সময়–নির্দেশক কথাগুলো (দ্বিতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যা, আগস্ট ১৯৬৭)। পাতাটাকে দেওয়া হল লোগোটার বিপ্রতীপ অবস্থানে, বোতল সবুজ রঙে(ওপরের লেখাগুলোও তাই)। সম্পাদকের নাম থাকল লোগোর মতোই ভার্মিলিয়ন লালে, লোগোর সরাসরি নিচে। রঙে সুষমায় একটা সুন্দর মাধুরী তৈরি করল প্রচ্ছদটি। সে–মাধুরী সত্যিই নয়নলোভন।

প্রচ্ছদ ছাপা শেষ হতেই তা হাতে নিয়ে হই হই করতে করতে মেশিনঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা কয়েকজন। বারান্দায় বেরোতেই জ্যোতিকে সামনে পেয়ে গেলাম। হাসতে হাসতে জ্যোতির সামনে কাভারটা ধরে এদিক–ওদিক নেড়ে ভালো করতে দেখাতে লাগলাম ওকে। জ্যোতির মুখের জ্যোতি প্রায় নিভে এল। এরপর কোনোমতে 'কালবেলা'র সে–সংখ্যাটি বের করেছিল জ্যোতি। এরপরে 'কালবেলা' পুরো শুয়ে পড়ল। 'সেই যে বাচ্চা শুইলেন আর উঠিলেন না'।

পাঠকদের অনুরোধ, আমাদের এসব ছেলেবেলাকার ছেলেমিভরা গল্পগুলোকে কেউ যেন আবার গুরুত্ব দিয়ে না–দেখেন। 'কালবেলা' বা জ্যোতি–হায়াৎ–সেবাব্রত–হুমায়ুন এদের নিয়ে যা–কিছু কথা, এ কিন্তু ঠিক সাহিত্য–বিষয় নিয়ে নয়। আসলে আদৌ কোনো বিষয়ই নয় এগুলো। আমরা সবাই তখন একসঙ্গে বেড়ে–ওঠা একবয়সী কিছু তরুণ। আজও আমরা সবাই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। লেখক হিসেবেও এরা সবাই শক্তিমান। এসব গল্প নেহাতই ছেলেবেলার বন্ধুদের কিছু নির্মল আনন্দের স্মৃতিমাত্র। কেবলই কিছু রং–ছোড়াছুড়ির খেলা। সেই বয়সের ঈর্ষা উল্লাস আর হারজিতের কাহিনী। সেই হারানো দিনগুলো স্মরণ করতে গিয়ে মনে পড়ছে বলেই এসব গল্প এসে পড়েছে।

'কণ্ঠস্বর' বেঁচেছিল মোট এগারো বছর। এর মধ্যে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়কার দু–বছর বাদ দিলে এর জীবনকাল ন–বছরের মতো। এই ন–বছরের পাঁচবছরই দ্রোণাচার্যের একলব্যের মতো, কাইয়ুম চৌধুরীর লোগোটাকে নিয়তির মতো ব্যবহার করেই আমাদের কাভার করে যেতে হয়েছে। লোগোটা বসিয়ে কাভারের বাকি লেখাগুলো একেক সংখ্যায় একেকরকমভাবে সাজিয়ে কাভারকে ভালো লাগানোর চেষ্টা করেছি। এটুকুই করাই তখন সম্ভব ছিল আমাদের পক্ষে। খুব সাধারণ একটা ব্যাপার। কিন্তু এমনি করতে করতে অনেক কাভার সত্যি সত্যি মনোহর হয়ে উঠেছে অনেক সময়। কখনো হয়তো লেখাগুলোকে সাজিয়ে নিয়েছি পৃষ্ঠাজোড়া একটা বড় বরফির আকারে, কখনো শীতের মরা গাছের আদলে, কখনো হাতে–লেখা অক্ষরগুলোকে গোল সূর্যের মতো করে সাজিয়ে দিয়েছি, কখনো করে দিয়েছি নদীর ধারার মতো ঢেউ–খেলানো আঁকাবাঁকা। কিছুই নয় তেমন, তবু কোথায় যেন একটা আলাদা ভালো–লাগা ছিল এর ভেতর। পাঠকরা দেখে খুশি হত। বলত, এমন কিছু নয় তবু এভাবে কখনো কোনো পত্রিকাকে বেরোতে ঠিক দেখিনি আমরা। 'কণ্ঠস্বর'–এর এই প্রচ্ছদগুলো সম্বন্ধে ধারণা দেবার জন্যে কিছু প্রচ্ছদের ছবি এখানে ছেপে দিচ্ছি।

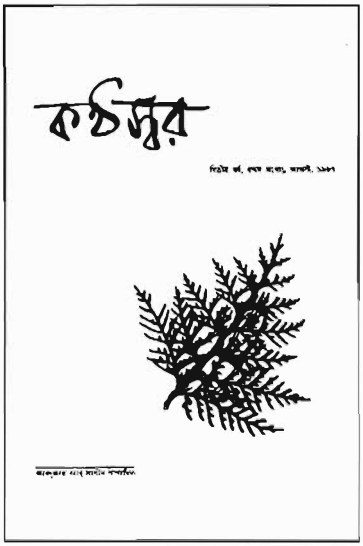
কণ্ঠস্বর

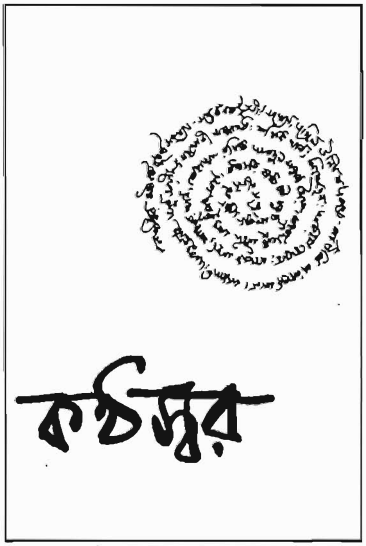
কণ্ঠস্বর

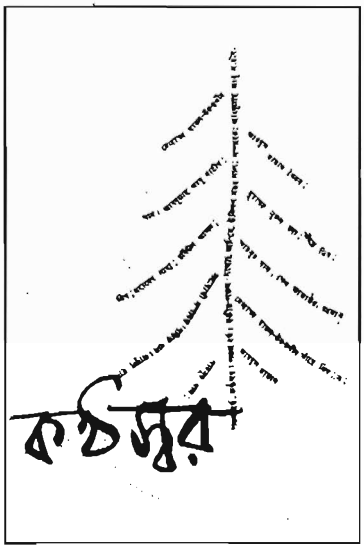
কণ্ঠস্বর

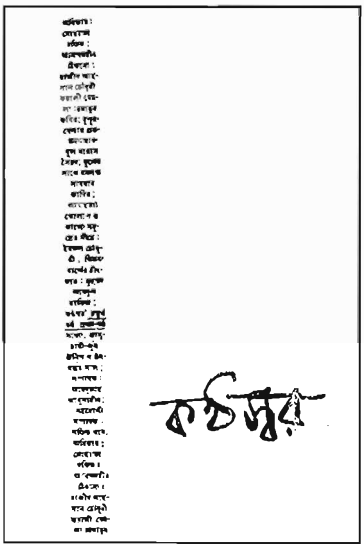
কণ্ঠস্বর

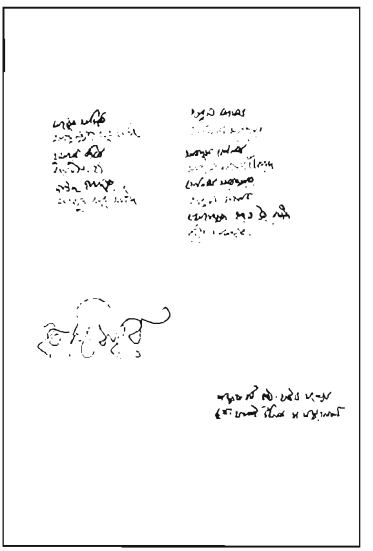

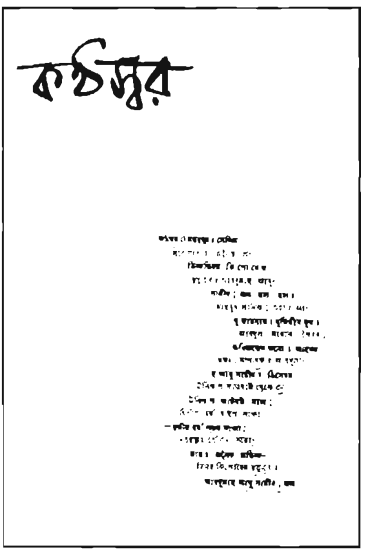
কণ্ঠস্বর

পথের গল্প

১

কার লেখায় যেন পড়েছিলাম : কোনো একটি দিনের ভেতর তোমার গোটা অতীতটাকে যদি ফিরে পেতে চাও তবে জীবনের নানান সময়ে শোনা প্রিয় গানগুলো একদিন একের পর এক শুনে যেয়ো, দেখবে গানগুলোর সঙ্গে অতীতের ওইসব দিনগুলোর আকাশ–পৃথিবী তোমার চারপাশে এসে ভিড় করে দাঁড়াবে, তুমি তোমার সারাটা জীবনকে তোমার চারপাশে প্রাণবন্তভাবে পদচারণা করতে দেখবে।

আজ সকালে 'কণ্ঠস্বর'–এর ১৯৬৭–এর সংখ্যাগুলোর পাতা উল্টিয়ে দেখার সময় আমারও ঠিক ওরকমই মনে হচ্ছিল। ঐ বছরের প্রতিটা দিন প্রতিটা মাসকে আমি যেন আলাদা আলাদাভাবে আমার সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। এগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে–থাকা আমার যত খুশি, যত ভালো–লাগা, সুখ–দুঃখের যত অনুভূতি, সব যেন কবর থেকে উঠে আমাকে ঘিরে চিৎকার করছিল। আমি আমার চারপাশে ষাটের দশকের সবুজ ছোট্ট জনবিরল ঢাকা শহরটিকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম, প্রকৃতির কোল থেকে যে নিজেকে এখনো পুরোপুরি পৃথক করে নিতে পারেনি। আধো–প্রকৃতি, আধো–শহর ঢাকার বুক তখনও সকালবেলার শেফালিফুলের গন্ধে অপরূপ হয়ে উঠছে, আর সেই গাছপালাভরা শহরের ছায়াঢাকা পথে আমাদের তরুণ–হৃদয় শীতের হাওয়ায় কী এক ব্যাখ্যাহীন বেদনার সঙ্গে যেন কনকন কাঁপছে।

'কণ্ঠস্বর'–এর পাতাগুলো ওল্টাতে গিয়ে চোখে পড়ছিল যে, ১৯৬৭ সালে 'কণ্ঠস্বর' বেরিয়েছিল মোট দশটি—আমাদের ভালোবাসার দীপ্তি শুষে কীভাবে সে ক্রমাগত রূপসী হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ছিল আমিও কবিতা লিখতাম একদিন। কবিতা আমার রক্তপ্রকৃতির জিনিশ ছিল নয়, তবু যৌবন, একদিন বিস্ময়ের রাতে, জীবনের ভিত থেকে হত্যাকারীর মতো জেগে উঠে আমাকে দিয়েও লিখিয়ে নিয়েছিল বিশৃঙ্খল একরাশ সজীব শব্দপুঞ্জ। বসন্তবল্লরীর মতো মত্ত কথারা উন্মাদ হয়ে ভিড় করেছিল মনের চৌহদ্দি জুড়ে। আজি হতে চার দশক আগে। মনে আছে বসন্ত–প্ররোচিত সেই শব্দপুঞ্জের নাম রাখতে চেয়েছিলাম 'বসন্তের জাগুয়ার'। কিন্তু কোন্‌খানে :

হারায়ে ফেলেছি সে ঘূর্ণিবায়ে,
অনেক কাজে আর অনেক দায়ে।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চোখে পড়ল : মান্নানের প্রথম কবিতার বই 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ'–এর ওপর ডাবল ক্রাউন সাইজের দীর্ঘ একুশ পৃষ্ঠার একটা আলোচনা লিখেছিলাম ১৯৬৭ সালের 'কণ্ঠস্বর'–এর মে সংখ্যায়। এর কয়েক মাস পরে আবারও একটি বড় আলোচনা লিখেছিলাম ওর দ্বিতীয় কবিতার বই 'জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা' নিয়ে। এই দীর্ঘ আলোচনাদুটি কবি হিসেবে জায়গা করে নিতে মান্নানের হয়তো কিছুটা কাজে এসে থাকবে। অন্তত যারা পাগলের প্রলাপ বলে ওর কবিতাকে পত্রপাঠ বিদায় করার পাঁয়তারা কষছিল তাদের বুকে এরা ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দিয়েছিল। কেবল আমি নই, শওকত ওসমানও একই সময় ওর প্রথম বইটি নিয়ে 'সমকাল'–এ প্রায় বিশ পৃষ্ঠা লম্বা আলোচনা করেছিলেন। তিনিই প্রথম মান্নানকে অভিহিত করেন 'পরাবাস্তব কবি' বলে।

আজ একটা কথা বারবার আমার মনে হয়। মান্নানের ওপর কেন আমি এত দীর্ঘ দুটি আলোচনা করেছিলাম? লেখাদুটো বেরোবার পর শহীদ কাদরী আমাকে বলেছিল, 'লেখাগুলো পড়ে কিন্তু মান্নানের খুশি হওয়ার খুব–একটা কারণ নেই।' আমি নিজেও জানতাম কথাটা। সত্যিই আলোচনাদুটোতে মান্নানকে আমি কোথাও 'কবি' বলিনি। মান্নানের কবিতাকে আমি স্বাগত জানিয়েছিলাম, কিন্তু স্বীকৃতি জানাতে পারিনি। তাহলে কেন লিখেছিলাম অতবড় আলোচনা যদি সেগুলো কবিতা না হয়ে থাকে? এ কি কেবল পৃষ্ঠপোষকতা? বন্ধুকৃত্য? নাকি আলোচনাগুলোর বিরুদ্ধে যে–অভিযোগ তুলে অনেকে মান্নানের কবিতার গুরুত্ব নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছে সেই 'স্বজনপ্রীতি'। এর কোনো কথাই সত্যি নয়। এতগুলো পৃষ্ঠার মধ্যদিয়ে আমি পাগলের মতো সেদিন ছুটে বেড়িয়েছিলাম কেবল একটা উত্তর খুঁজে পাবার জন্যে যে, যে-কবির ভেতর কবিতার এত সম্পন্নতা আর আলো, তার ভেতর কবিতা নেই কেন? মান্নানের কবিতায় চিত্রকল্পের শক্তি ছিল অসামান্য। আমি লিখেছিলাম :

> আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা আসলে কতকগুলো উপমা। এই কবিতাগুলো পড়ার সময় একটা আর্ট-গ্যালারির কথা মনে পড়ে–যার তাকে–তাকে, সারে–সারে সাজানো রয়েছে বিচিত্র রকমের অজস্র ছবি; যার দেয়ালে, চারপাশে, উঁচুতে,নিচুতে অজস্র ছবির সমাহার। এখানে প্রতিটি বাক্য যেন একেকটি উপমা, প্রতিটি শব্দ যেন একেকটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র।

ওর উপমার শক্তি–যে কত অসামান্য তা বোঝাবার জন্যে ওর দ্বিতীয় বইয়ের মাত্র একটি বা দুটি কবিতা থেকে কয়েকটি চিত্রকল্প তুলে দিয়েছিলাম :

ক. জাফরান রোদ সন্ধ্যার চিকুরে আঁচড়ায় সোনার চিরুনি
খ. হাবসী মেঘের দল চাঁদের রানীকে ঘিরে আসে
গ. যখন তারার আলপিনে আঁটা রাত
ঙ. জ্যোতি ফেলে লম্বা গাছগুলি—
দুমড়ানো শিক যেন সরু, প্রকৃতির বারান্দায়
চ. আংটির মতো ঠোঁট–গোল–করা এতটুকু মেয়ে
ছ. রাত্রি আকাশের গাঢ় ফেজ টুপি–পরা কালো খোজা
আর সোনালি ফরশা সুলতানা
শুয়ে আছে মেঘে আর চাঁদে আকাশের সুনীল পালঙে
জ. সূর্যাস্ত ফেলেছে নিঃশব্দে ফেরেশতাদের রঙচঙে কাপড়চোপড়
ঝ. ন্যাংটো ফরশা মেয়েমানুষের মতো আগুন জ্বলছে দূরে

কেবল চিত্রকল্প নয়, শব্দের শক্তিও ওর অসাধারণ। তবে কেন ফলে ওঠেনি কবিতা? কেন তা কেবলই হয়ে থেকেছে নিষ্প্রাণ, শুধুই বুদ্ধির নির্মাণ? এর কারণ, তখন ওর লেখায় 'চেতনা' এসে গেছে কিন্তু 'বেদনা' আসেনি। হৃদয়ের গাঢ়তায় জীবন ফলে ওঠেনি তখনো। রবীন্দ্রনাথ যেমন লিখেছিলেন, 'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে/ গুচ্ছে গুচ্ছে ধরিয়াছে ফল' তেমন ফলভারনম্র হয়নি জীবন। শুধু বাঁশি শোনা গেছে, চোখে দেখা হয়নি। এই বেদনা মান্নানের জীবনে এসেছিল দেরি করে। তাই ভালো কবিতা ও লিখেছে অনেক পরে। এর আগে শুধুই স্বপ্নের আয়োজন, শুধুই উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা। পঞ্চাশোত্তর মান্নানের কবিতা সত্যি সুন্দর। স্নিগ্ধতায়, বেদনায়,স্মৃতিতে, গাঢ়তায় নিটোল। কবিতাগুলো ছোট কিন্তু ফলভারনম্র। একটা একেবারেই ছোট্ট কবিতা শোনাই আপনাদের :

আমার ঘুমের মধ্যে
একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।
জেগে দেখি : বৃষ্টি নেই
বর্ষণের স্মৃতি আছে বেঁচে।
এখনো বাতাসে ভাসছে
উড়ো কত টুকরো স্মৃতিকণা।
হারিয়ে ফেলেছি যাকে
তার চোখ মুখের বর্ণনা।
আজ শুধু স্মৃতি থাক
মুহুর্মুহু বাতাস ঘুরুক
সে লুপ্ত মেয়েকে খুঁজে—
কখনো দেখিনি যার মুখ

[আমার ঘুমের মধ্যে]

একটা কবিতাকে ভাবনার অদ্ভুত নতুনত্বের জন্যে খুবই মনে পড়ে। কবিতার নাম : 'যে কবিতা লেখা হয়নি, সে গেল কোথায়'। সেটা শুনিয়েই এ প্রসঙ্গ শেষ করব :

—মিশে গেল সূর্যোদয়ে, মিশে গেল রাত্রির খনিতে
তারার অরণ্যে, গদ্যে, চাঁপাফুলে, স্বপ্নে, রমণীতে।
—আবার ফিরিয়ে আনা যাবে সেই লুপ্ত কবিতাকে?
জালে ধরা পড়বে ফের সোনা রুপো মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে?

—জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে মাছ নদীর ভিতরে,
শব্দ ফিরে গেছে অভিধানে, ফিরেছে সুন্দর চিরতরে,
মিশে গেছে রমণীর চাঁপাফুলে, অরণ্যে তারার।
ইস্পাতে এখন শুধু ছোপ-ছোপ মর্চের বাহার।

২

একজন সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক শেষ-পরিচয়ে একজন দলপতিই। একটি সমবেত সাহিত্যযাত্রাকে তাঁর এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তাই তাঁকে চলতে হয় দেখে-বুঝে, পা ফেলতে হয় হুঁশিয়ার হয়ে। সবার মান রেখে, মন রেখে, সবাইকে খুশিতে তৃপ্ত করে, তাদের নিয়ে তাঁকে অভীষ্ট স্বপ্ন জয় করতে হয়। চারপাশের প্রতিটি লেখকের আলাদা চাহিদার জোগান দিতে হয় তাঁর, আলাদা জিভের স্বাদ মেটাতে হয়। কাজটা সোজা নয়। এতগুলো ভিন্ন দেবতাকে তুষ্ট করা সত্যিই কঠিন। বিশেষ করে তারা যেখানে সবাই একেকজন দিগ্বিজয়ী তরুণ, মনের ভেতর প্রত্যেকেই জগতের শ্রেষ্ঠতম লেখক, অমরত্বের ব্যাপারে যাদের মনে সন্দেহের খড়কুটোও নেই।

সবচেয়ে বিপদ হয় যখন কারো কোনো লেখা 'ছাপা যাচ্ছে না' কথাটা তার মুখের ওপরে বলে দিতে হয়। এ তো সরাসরি তার হৃৎপিণ্ডে আঘাত, তার অমরত্বকেই প্রায় তাচ্ছিল্য করার শামিল। অথচ এ-কথা তো একজন সম্পাদককে হরহামেশাই বলতে হয়। বলতে তো হবেই। লেখামাত্রই যখন তাঁর পক্ষে ছাপা সম্ভব নয়, যখন তাঁর কাছে লেখা ছাপতে আসা অধিকাংশ লেখককেই তাঁর ফিরিয়ে দিতে হবে তখন ঐ কথা উচ্চারণ না-করে তার পথটা কী? লেখা মানসম্মত নয়, এজন্যেই-যে কেবল তাঁকে সবসময় ঐ কথা বলতে হয় তা নয়; তাঁর লেখার রুচি,মতামত, বক্তব্য এসব পত্রিকার নীতির পক্ষে গ্রহণীয় না হলেও তাকে এ-কথা বলতে হতে পারে। লেখাটি প্রকাশিত হলে পত্রিকার নিজেরই বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি আছে, এজন্যেও কাউকে কখনো এ-কথা বলা দরকার হতে

পারে। কিন্তু কারণ যত ছোটই হোক লেখকের মনে এতটুকু অভিমান গুমরে উঠলেই হল। ব্যস, তিনি দল থেকে চিরদিনের মতো বিদায় হয়ে গেলেন। কাজেই সম্পাদককে বিশেষ করে লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদককে কাজ করে যেতে হয় খুবই সতর্ক হয়ে। সবদিক বুঝে সামলে। সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙে এভাবে। একজন ভালো মাপের কূটনীতিকই হতে হয় তাঁকে। সব বৈরিতার মাঝখানে একটা সোনালি মধ্যবিন্দু খুঁজে বের করে, সমস্ত বৈপরীত্যের মধ্যে একটা আনন্দময় মাধুরী গড়ে তুলে, সমস্ত বৈষম্যকে মিষ্টি সামঞ্জস্যে সুস্মিত করে তাঁকে কাজ করতে হয়।

'সমকাল'–সম্পাদক সিকানদর আবু জাফর কাজটা চমৎকারভাবে পারতেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ আমুদে, আড্ডাবাজ ও বুদ্ধিমান মানুষ। কথার প্যাঁচে মন ভুলিয়ে কীভাবে–যে তিনি লেখকদের নিজেদের পকেটের ভেতর পুরে ফেলতেন, লেখকেরা নিজেরাও তা বুঝতে পারত না। যখন কাউকে নির্মম কথা বলতে হত, তখন প্রসঙ্গটি শুরু করতেন তিনি অনেক দূর থেকে; এতদূর থেকে যে, লেখক তাঁর আসল মতলবটা আঁচই করতে পারত না। তারপর নানান উল্টোপাল্টা প্রশংসায় তাঁকে তৃপ্ত ও অসহায় করে ফেলে এমন জায়গায় এসে তিনি কথাটা পাড়তেন যে, কৃতজ্ঞ লেখকের তখন আর সেটা না–গিলে উপায় থাকত না। অনেক নামকরা লেখকের লেখাও তিনি ফেরত দিয়েছেন তাদের মনে বড় ধরনের ক্ষোভের সৃষ্টি না করে। একদিন আমি তাঁকে একজন তরুণ–লেখকের লেখা ফেরত দিতে দেখেছিলাম। তিনি তাকে বলছিলেন, 'দেখ তোমার কবিখ্যাতির স্বার্থেই এই লেখাটা আমি না–ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করি তুমি এ–ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হবে। এটা ছাপলে তোমার ক্ষতি হবে।' অবাক হয়ে লক্ষ করলাম লেখা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় লেখককে বেশ উৎফুল্লই দেখাচ্ছে। যেন বড় একটা ফাঁড়া থেকে বেঁচে গেছে সে। সে দুঃখিত হবে কী, বরং তিনি–যে তাঁকে এতবড় একটা বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন সেজন্যে সে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞই হচ্ছে।

জাফর ভাই ছিলেন পরাক্রান্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর সামনে এলে অনেকেরই কথা হারিয়ে যেত। এটা তাঁর ছিল একটা বাড়তি সুবিধা। তবে কৌশল হিসেবে শহীদ কাদরীকেও আমি একই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে দেখেছি। কাউকে কড়া কথা বলতে হলে ও আগে তাকে 'ওস্তাদ' বলে ডেকে নিত। বলত : আপনে মানুসটা বিশেষ সুবিদার না ওস্তাদ। বলে বুক–কাঁপানো হাসিতে লোকটার সব বেদনা ভাসিয়ে দিত। আগে ওস্তাদ হিসেবে সম্মান পেয়ে যাওয়ায় খারাপ–মানুষের অপবাদ সহ্য করতে তার অসুবিধা হত না।

আমি মোটা বুদ্ধির মানুষ। এতসব ছলাকলা আমার আসে না। তবু আমি–যে কাজটা চালিয়ে যেতে পেরেছি তা সম্ভব হয়েছে লেখকেরা আমাকে আপন ভেবে ভালোবাসত বলে। এই ভালোবাসা জীবনের সবখানে সবার কাছ থেকে আমি পেয়েছি। তবু লেখকদের ক্ষোভ বা রোষাগ্নির হাত থেকে নিজেকে–যে সব জায়গায় বাঁচানো গেছে তা নয়। কারণে–অকারণে অনেকে ক্ষুণ্ন হয়েছেন, কেউ অভিমান করেছেন এমন সব সূক্ষ্ম

ও অবিশ্বাস্য কারণে যার তাৎপর্যই আমার পক্ষে অনেক সময় বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। নির্মলেন্দু গুণ 'কণ্ঠস্বর'–এর কাজ ছেড়ে চলে যাবার কারণ হিসেবে লিখেছেন :

> আমার 'কণ্ঠস্বর'–এর কাজ ছাড়ার পেছনে কণ্ঠস্বর–সম্পাদকের সাহিত্য–বিবেচনার সঙ্গে আমার সাহিত্য–বিবেচনার বিরোধের প্রশ্নটিও পরোক্ষে কার্যকর ছিল। আবদুল মান্নান সৈয়দের লেখার সঙ্গে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মাত্রাহীন প্রীতিবোধকে আমি একপর্যায়ে সমর্থন করতে পারিনি।

দেখুন, কত সূক্ষ্ম ব্যাপারেও একজন লেখক বিমুখ হয়ে যেতে পারে। আমি কার লেখাকে একটু বেশি পছন্দ করি তা তো আমার ব্যক্তিগত রুচির বা ভালোলাগার ব্যাপার। তা কি আরেকজনের অভিমানের কারণ হতে পারে? তবুও এটা হয়। এত সামান্য কারণেও একজন লেখককে অনেকসময় হারিয়ে ফেলতে হয়। তাহলেই দেখুন, কী সূক্ষ্ম সুতোর ওপর দিয়ে হাঁটতে হয় একজন সম্পাদককে। সেখানে সামান্যতম এদিক–ওদিক হলে, এমনকি না হলেও তাঁকে পড়ে যেতে হতে পারে।*

একবার ইলিয়াসের একটা গল্পও আমি ফেরত দিয়েছিলাম, এতে ইলিয়াস ক্ষুণ্ন হয়েছিল। গল্পটাতে সমকামিতা আর হস্তমৈথুনের রগরগে বর্ণনা ছিল। লেখাটা আমি ফেরত দিয়েছিলাম নীতিগত কারণে। পৃথিবীর কিছু কিছু মানুষের মধ্যে সমকামী প্রবণতা থাকলেও এবং কিছু কিছু দেশে সেই প্রবণতার আইনি অনুমোদন থাকলেও আমি ব্যক্তিগতভাবে একে একধরনের মানসিক অসুস্থতা বলে মনে করি। সমকামিতাকে আমার কাছে খুবই একটা নোংরা ব্যাপার বলে মনে হয়, বিশেষ করে পুরুষদের সমকামিতাকে। আমার মনে হয় জীবজগতের আর সব প্রাণীর মতো মানুষেরও এটা কোনো জৈবিক বা যৌনতাগত আকুতি নয়। বংশবৃদ্ধির যে–তাগিদ থেকে যৌনতার উদ্ভব তার সঙ্গেও সমকামিতার যোগ নেই। এটা মানুষের মধ্যে উত্তরকালে জন্ম–নেওয়া একটা বিকার মাত্র। পশুকামিতার মতো এ–ও একধরনের অসুস্থতা। আমাদের দরকার এর চিকিৎসা। বর্ণাঢ্য উদযাপন নয়।

---

* গুণের লেখাকে যদি আমি অপছন্দ করতাম তাহলেও নাহয় গুণ ক্ষুণ্ন হতে পারতেন। কিন্তু তা তো নয়। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর প্রায় সব কবিতারই আমি সপ্রশংস পাঠক। তাহলে মান্নানের প্রতি আমার 'মাত্রাতিরিক্ত প্রীতিবোধে' কেন তিনি আহত? এটা কি এজন্য যে মান্নানের লেখা 'কণ্ঠস্বর'–এ বেশি–বেশি বেরোত? এটা ঠিক যে মান্নান, 'কণ্ঠস্বর'–এর প্রায় প্রতিটা সংখ্যায় লিখেছে। কিন্তু মান্নানের প্রতি আমার মাত্রাহীন সাহিত্যপ্রীতি এর কারণ নয়। এর কারণ মান্নান লিখত নানান কিছু। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা, নাটিকা—কী নয়! এ–ধরনের বহুমুখী লেখকরা সম্পাদকদের একটা বিরাট আশ্রয়। পত্রিকায় লেখাঘটিত যে–কোনো বিপদে আপদে কাঁধ এগিয়ে দিয়ে এরা পত্রিকাকে গতিশীল করে রাখে। মান্নান তার অতিপ্রজতার কারণে যদি ঐ পত্রিকার পাতায় ঐ জায়গা করে নিয়ে থাকে তার জন্য কি আমি দায়ী হতে পারি, না পারে মান্নান?

৩

আমি মানি এ-ধরনের নৈতিক বিরোধ নিয়ে লেখকে-সম্পাদকে মন-কষাকষি হলেও এর মধ্যেও একটা বীরোচিত ব্যাপার আছে। কিন্তু মুখ কালাকালি যেখানে হয় একজন অক্ষম লেখকের লেখা ছাপতে পারা যাচ্ছে না বলে. তখনই ঘটে আসল দুঃখের কারণ। পত্রিকা তো বেরই হয় শক্তিমান লেখকদের সহযোগিতা দেবার জন্যে, তাদের লালনের জন্যে। তাদের নিয়ে সমস্যা হলে তবুও সহ্য হয়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এদের নিয়ে অসুবিধা কখনোই প্রায় হয় না। হলেও হয় সামান্য। হয়তো লেখক একদিন এসে বলল : 'সায়ীদ ভাই একটা 'অসাধারণ' লেখা লিখেছি। সামনের সংখ্যায় ছাপতেই হবে।' আমি পড়ে দেখলাম, লেখাটিকে সে যতটা অসাধারণ বলে দাবি করছে আসলে তা তত অসাধারণ নয়। স্বচ্ছন্দে একে আরও দুয়েক সংখ্যা পরে ছাপা যেতে পারে। তখন হয়তো তাকে একটা মিষ্টি হাসি ছুড়ে দিয়ে বলা গেল : 'দেখ, তুমি 'অসাধারণ' লেখা লিখে লেখকের দায়িত্ব পালন করেছ। এখন আমাকে সেটা 'অসাধারণভাবে' প্রকাশ করে সম্পাদকের দায়িত্বটা পালন করতে দাও। ছাপার তারিখটা আমার হাতেই থাক্ না।' এমনি ছোটখাটো রস-রসিকতা দিয়ে এদের থেকে রেহাই পাওয়া যায়। মেধাবী বলে রস-রসিকতা এরা বুঝতে পারে।

কিন্তু নাকের পানি চোখের পানিতে একাকার করে ছাড়ে অক্ষম লেখকেরা। ভালো লেখকেরা তাদের অক্ষম লেখাগুলোকে সহজেই চিনতে পারে। কিন্তু খারাপ লেখকেরা এটা একেবারেই পারে না। তারা বিশ্বাসই করে না যে তারা কোনো খারাপ লেখা কখনো লেখে। আমাদের এক তরুণ-লেখক একবার আমাকে একটা লেখা দিল, যার শেষ লাইন : 'অগত্যা আমাকে এক মগ মুততে হবে।' লেখকের দাবি বর্তমান সংখ্যাতেই লেখাটা ছাপতে হবে। লেখাটা ছাপা বোধগম্য কারণেই সম্ভব ছিল না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো যারপরনাই গলবস্ত্র হয়ে অনুনয়ের সুরে কথাটা তাঁকে জানাতে হল। শুনে লেখক অসম্ভব খেপে গেলেন। বললেন : 'আপনি কি জানেন লেখাটা প্রকাশ না করে বাংলাসাহিত্যকে কতবড় একটা লেখা থেকে আপনি বঞ্চিত করছেন?' অপরাধীর শাস্তিই আমার প্রাপ্য, চুপ করে রইলাম। লেখক বললেন : 'আমার দুঃখ হচ্ছে কেন একটা মোটা লাঠি নিয়ে আমি এখানে আসিনি। আপনারা কি এর চেয়ে ভদ্র কোনোকিছুর যোগ্য?' বাঁশ-লাঠির কথা যখন সে বলছিল আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম নিজের কবিতা-যে খারাপ তা সে নাহয় না-বুঝল, নিজের স্বাস্থ্যটাও-যে তালপাতার সেপাইয়ের মতো সেটুকুও কি সে বুঝতে পারবে না? ঐ রোগা পাতলা শরীরে লাঠি নিয়ে এসে আমাকে মার দিতে পারার বদলে তারই-যে উল্টো লাঠিপেটা হওয়ার সম্ভাবনা সেটুকু তো অন্তত তাকে বুঝতে হবে।

ভালো লেখকদের মোকাবেলা করতেও অনেকসময় হিমশিম খেতে হয়। একটা উদাহরণ দিই। হয়তো কেউ এসে বলল, 'একটা 'অসাধারণ' লেখা লিখেছি সায়ীদ ভাই', তার পরেই সেই পরিচিত গৎ : 'পরের সংখ্যাতেই ছাপতে হবে কিন্তু।' কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে–লেখাটিকে সে এত 'অসাধারণ' বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছে, তার চেয়ে অনেক ভালো লেখা সে আমাকে এর আগে দিয়েছে, কিন্তু কখনো বলেনি সেগুলো অসাধারণ। তাহলে কেন সে এই লেখাটাকে অসাধারণ বলল? কারণ খুঁজতে গিয়ে মনে হয়েছে : স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার মুহূর্তে লেখাটি তার হাত থেকে বেরোয়নি। লেখাটা সে লিখেছে মস্তিষ্ক দিয়ে, অনেক খেটেখুটে, অনেক পরিশ্রমে। এর ফলে লেখাটার প্রতি তার ধীরে ধীরে একধরনের ভালোবাসা জন্মে গেছে। তাই লেখটাকে একসময় তার কাছে অসাধারণ মনে হয়েছে। কিন্তু যেসব লেখা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় তার ভেতর থেকে ঝরনার মতো তরতর করে বেরিয়ে এসেছে, সেগুলোকে সে অতটা মূল্যবান মনে করেনি। এ থেকে আমার মনে হয়েছে যে যেসব লেখা সবচেয়ে অনায়াসে কলমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে, সহজে পাওয়া জিনিসের মতো তার মূল্য আমরা দিই না। কিন্তু যে–লেখার পেছনে সাহিত্যপ্রেরণা কম থাকে, যে–লেখাকে আমাদের 'বানাতে' হয়, যার পেছনে কষ্ট–শ্রমের একটা প্রাণান্তকর ইতিহাস থাকে তাঁর সঙ্গে আমাদের একাত্মতা ঘটে যায় অনেক বেশি, তাই আমাদের কাছে তা আত্মার সামগ্রী হয়ে ওঠে, সেটাকে আমরা অসাধারণ মনে করতে থাকি।

৪

রফিকের যে–গল্প আমার মনে সবচেয়ে জ্বলজ্বলে হয়ে আছে সেটি বলে ওর গল্পের পর্ব শেষ করব। রফিকের তখন খুব টাকার দরকার। পরীক্ষার ফিস বা ঐ ধরনের কিছু–একটা দিতে হবে। আমাকে এসে বলল, 'কাবলির কাছ থেকে সাত–শ টাকা ধার নিয়ে দেন। সময়মতো দিয়ে দেব।' আমার সঙ্গে কাবলিদের যোগাযোগের কথা ও জানত। আমিই সে–গল্প ওকে করেছিলাম। আমি যখন এম. এ. পরীক্ষা দিই, তখন হঠাৎ আমার টাকার দরকার হয়ে পড়ে। মানুষের কাছ থেকে ধার নিতে আমার অস্বস্তি হয়। তাই তারেক ভাইয়ের দ্বারস্থ হলাম। তারেক ভাই আমার এক ক্লাস ওপরে ইংরেজিতে পড়তেন, বড়ভাইয়ের মতো। কাবলিদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে তিনি টাকা ধার করতেন। আমার অনুরোধে তিনি আমাকে একদিন এক কাবলির কাছে নিয়ে গেলেন।

কাবলিদের ডেরা আগা মসিহ লেনের একটা কানাগলির মধ্যে। ঢাকা শহরের মাঝখানে এভাবে এরা–যে পুরোদস্তুর একটা কাবলি–পট্টি বানিয়ে বসে আছে, ভেতরে

না–গেলে বোঝারই উপায় নেই। মনে হয় পশ্চিম পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খাঁতেই ঢুকে পড়েছি বা। গলি–ঘুপচিওয়ালা একটা জটিল শহর যেন বাড়িটা। বাড়িটার গোটা–পাঁচেক ঘরের মধ্যে অন্তত পনেরো জন কাবলির ঠাসাঠাসি বাস, জীবনকে কতটা চিপে পিষে বেঁচে থাকা যায় তার উদাহরণ। পুরো বাড়িটা ঘিনঘিনে, ঘরগুলো যেমন নোংরা তেমনি অন্ধকার আর চিটচিট করা। খাটিয়াপাতা ঘরগুলোর ময়লা জিনিশপত্তরের উৎকট গন্ধে নাড়ি উল্টে আসতে চায়। তারেক ভাই আমাকে নিয়ে গেলেন এক কাবলির কাছে, নাম ইয়েদু খান। (নাম শুনেই বুকে কাঁপুনি ধরে যায়।) লোকটা মাঝারি আকৃতির, গাট্টাগোট্টা, চোখের দৃষ্টি লোভ–চকচকে। ছলে বলে কৌশলে লোকের কাছ থেকে সুদের টাকা চিপে বের করতে তার জুড়ি নেই। এ–ব্যাপারে তার ধূর্ত বুদ্ধির মতোই তার আর–এক সহায় ভাতিজা হিঙ্গু খান। বুদ্ধিতে না–কুলোলে হিঙ্গু খানের বিশাল দৈত্যর মতো চেহারাটা তার কাজে আসে। হিঙ্গু সবসময় ইয়েদুর পাশে চুপ করে বসে থাকে। লোকটা সাড়ে ছ–ফুট লম্বা, মাথার উঁচু পাগড়ি আরও ফুটখানেকের মতো। চওড়া হাড়ওয়ালা সেই যমদূতের মতো লোকটার সামনে দাঁড়ালে বুকের পানি জমে যেতে চায়। ইয়েদুর সঙ্গে খাতকের যখন কথা হয় সে তখন ইয়েদুর পাশে বসে তার বিশাল গোঁফে তা দিতে দিতে মৃদু হেসে সব শুনে যায়। কথা শেষ হলে গম্ভীরমুখে কাগজ বাড়িয়ে খাতকের সই–টিপসই নেয়। ভাবটা এমন যে এখন থেকে লেনদেনের মূল সাক্ষী সে–ই। এ ব্যাপারে এদিক–সেদিক করলে তার কাছ থেকে রেহাই হবে না।

ইয়েদু খানের কাছ থেকে আমি টাকা নিয়েছিলাম দুবার। প্রথমবার নিয়েছিলাম দু–শ। সুদ মাসে বিশ টাকা করে। পাঁচমাস সময়মতো সুদ দিয়ে টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। এর পরে নিয়েছিলাম আরও একবার। সেবার আর তারেক ভাইকে জামিন রাখতে হয়নি। আমার সদাচরণের কারণে আমাকে সরাসরিই দিয়েছিল টাকাটা। সেবারও সময়মতো ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। টাকা ফিরিয়ে দিলে তারা খুশি হত না। তারা সুদ চাইত। বলত : আসলি নেই মাংতা। ইঠরেস্ট দিউ। যাহোক, দুবার ঠিকমতো কথা রাখায় আমি তাদের আস্থাভাজন হয়ে পড়েছিলাম। তারা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল দরকারে আমাকে ধার তো দেবেই, এমনকি আমি কারো জামিন হলেও তারা তাকে ধার দেবে।

আমি রফিককে বললাম, 'সাত–শ টাকা যে নেবে, সুদ হবে মাসে সত্তুর টাকা করে। দেবে কী ভাবে?'

রফিক ডোন্ট কেয়ার ভাব দেখিয়ে বলল, 'অসুবিধা নেই।' ওর আত্মবিশ্বাস দেখে আমি জামিন হয়ে সাত–শ টাকার ব্যবস্থা করে দিলাম।

কিন্তু রফিক তো আর টাকা দেয় না। না দেয় আসল, না দেয় সুদ। আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। এক এক করে মাস–পাঁচেক চলে যায়, টাকা দেবার নাম নেই। এদিকে কাবলিরা রফিককে গরু–খোঁজার মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পাবে কী করে? ওর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে আসবে সে–সাহস ওদের নেই। আর আসলেই বা কী? ও কোথায় কখন থাকে তার হিসাব ও নিজেই জানে না, তো কাবলি। রফিককে

না-পেয়ে ওরা হয়তো আমাকেই খুঁজে বের করত কিন্তু আমার বাসাও ওরা চেনে না। কলেজের ঠিকানা ওরা জানে, কিন্তু কলেজে তখন দু-মাসের গরমের ছুটিসহ এইচ.এস.সি. পরীক্ষার লম্বা বন্ধ। একদিন রফিককে বললাম : টাকা-যে দিচ্ছ না রফিক, কাবলি ধরতে পারলে কিন্তু জান নিয়ে নেবে।

রফিক হাসতে হাসতে বলল, মাছি হয়ে গেছি সায়ীদ ভাই, কাবলির বাপের সাধ্য নেই আমাকে ধরে।

আমি বললাম, কেমন?

ও বলল, আমার সারা গায়ে এখন মাছির মতন হাজার হাজার চোখ। ওরা যেদিক থেকে আসুক, আমি ঠিকই দেখে ফেলব। ধরুন আপনার সঙ্গে গল্প করছি, হঠাৎ দেখলেন আমি সামনের দিকে দৌড়োতে শুরু করেছি, বুঝবেন পেছনে একশ গজ দূরে কাবলি এসে পড়েছে। আমাকে কিছুতেই ধরতে পারবে না।

আসলে ফেরত দেবার টাকা রফিকের ছিল না। ফিস দিতে হবে, তাই ও ধার নিয়েছিল। রফিক ছিল এমনটাই। আগামীকালের কথা ও ভাবত না। আজও ভাবে না।

ওর কথা শুনে আমি প্রমাদ গুণলাম। আমি নিশ্চিত কিছুদিনের মধ্যেই ওরা আমাকে খুঁজে বের করবে। ভোমরার মতো পঞ্চাশ হাত পানির নিচ থেকে এরা মানুষকে খুঁজে বের করে। রফিক বাঁচলেও আমার নিস্তার নেই।

বেশিদিন গেল না। একদিন শাহজাহানপুরে আমাদের একতলা ভাড়া-বাসায় বসে আছি, হঠাৎ ইয়েদু আর হিঙ্গু পাড়ার একদঙ্গল উৎসুক, কৌতূহলী ছেলেছোকরাসহ হুড়মুড় করে আমার ঘরের বারান্দায় এসে উঠল। লজ্জায় অপমানে মাটির সঙ্গে মিশে যাবার উপক্রম হল। কাবলিওয়ালা আমার কাছে! পাড়ায় মানুষের কাছে এর জবাব কী? মুখ দেখাব কী করে? আব্বা দূরে থেকে কাবলিওয়ালাদের ঢুকতে দেখেছিলেন। লজ্জায় সেই-যে তিনি পালিয়ে গেলেন ছ'ঘণ্টা পর্যন্ত তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া গেল না।

ইয়েদু খান আমাকে বলল, আমার বাসায় আসার জন্যে সে দুঃখিত। কিন্তু রফিক দেখা না-করাতেই শেষপর্যন্ত আসতে হয়েছে । বারে বারে বলে চলল : মাস্টার সাব, রফিক্ব কিদর গিয়া। কত কষ্টে আমার বাড়ির ঠিকানা পেতে হয়েছে সংক্ষেপে তার ফিরিস্তিও দিল ইয়েদু। দু-মাস ধরে সে কলেজের গেটে আমার জন্যে প্রতিদিন দু-তিন ঘণ্টা করে দাঁড়িয়ে থেকেছে, কিন্তু আমাকে একবারের জন্যেও দেখতে পায়নি। আমার ইজ্জতের কথা ইয়াদ করে কারো কাছে আমার কথা জিজ্ঞাসাও করেনি। উল্টো ছাত্রেরা নাকি তাকে ঘিরে ধরে জেরা করেছে অনেকদিন। বলেছে, 'এ কাবলি, গেটের ধারে কী চাই? কোঈ লোক তোমার টাকা নিছে?' সে মিথ্যা করে বলেছে, 'হামারা এক ভাতিজা এই কলেজমে পড়তে হ্যায়। তাকে খুঁজছি।' ছাত্রেরা বলেছে, 'নেহি নেহি এখানে কোঈ কাবলি লেড়কা পড়ছে না।' তখন আমি বলেছে যে হামারা ভাই এক বাঙ্গালি আওরতকো শাদী করছে, সেই ভাতিজা দেখতে বাঙালির মতো। তারা বলেছে, 'ভাতিজার নাম কী আছে?

কোন্ ক্লাসে পড়ছে?' তখন সে ধরা পড়ে চুপ করে থেকেছে। যা হোক, শেষে অনেকদিন চলে যাচ্ছে দেখে সে চুপিচুপি এক পিয়নের কাছ থেকে আমার ঠিকানা নিয়ে এখানে এসেছে।

কাবলি আমার সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলছে দেখে পাড়ার ছেলেমেয়েরা হতাশা অনুভব করতে লাগল। যে জমজমাট নাটক দেখার আশা নিয়ে তারা এসেছিল তার সম্ভাবনা নেই টের পেয়ে এক-দুই করে সরে পড়ল। ইয়েদু বলল, 'মাস্টার সাব, রফিক্ক কিদর গিয়া। যেভাবে পারেন ওকে নিয়ে একবার আমাদের কাছে আসেন। আমরা ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।' হিঙ্গু ইয়েদুর পাশে বসে সারাক্ষণ গোঁফ মোচড়াচ্ছিল। ভাবে ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল ও না এলে জান কবজ হয়ে যাবে।

অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রফিককে ওদের কাছে নিয়ে যাবার ব্যাপারে রাজি করলাম। সাত মাস ধরে ও একটা টাকাও দেয়নি। কাজেই কাবলিদের কাছ থেকে যে-উচ্চকিত অভ্যর্থনা জুটল তা খুব রাজোচিত নয়। 'আইয়ে আইয়ে, নবাব সাব, এতনাদিন কোথায় ছিলেন', এভাবে শুরু করে নরমে গরমে অনেক কথা বলল তারা। কথায় কথায় ইয়েদু শোনাল, হিঙ্গু বলেছিল যে হুকুম দিলে রফিককে খতম করে দিতেও তার অসুবিধা নেই। কিন্তু মাস্টার সাহেবের ইজ্জতের কথা ভেবে সে তাকে ওসব পথে পা বাড়াতে নিষেধ করেছে। ইয়েদুর কথার সময় হিঙ্গু সম্মতিসূচকভাবে মৃদু হেসে যেভাবে গোঁফে তা দিতে লাগল তা দিয়েই স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল যে, কথাটা অকাট্য সত্য। তবে এর পরে এমন করলে এ-ধরনের কিছু করা ছাড়া তার উপায় থাকবে না।

তারা বাইরে বাইরে খুব তর্জনগর্জন করলেও আমি বুঝতে পারছিলাম ভেতরে ভেতরে তাদের সুর বেশ নরম। শুরুতেই রফিকের বেপরোয়া ভাবসাব থেকে তাদের বুঝতে বাকি নেই শক্ত লোকের হাতেই তারা পড়েছে। এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। সুদ দূরে থাক, কোনোমতে 'আসলি' ফেরত পেলেই তারা বর্তে যায়। পৃথিবীটাই এমনি। কারো ভেতর বেপরোয়া শক্তি দেখলে তার সামনে মানুষ এমনি নরম হয়ে কাঁচুমাচু হয়ে যায় আর দুর্বল মানুষ পেলে হিঙ্গুর মতো গোঁফ মুচড়িয়ে তার ওপরে চড়াও হয়।

কাবলিদের ডেরা থেকে বেরিয়েই রফিক বলল : 'সায়ীদ ভাই, ক্যাপিটালে মোগলাই পরোটা খাওয়ান।' ক্যাপিটাল রেস্টুরেন্ট ছিল নবাবপুর রোডে, গুলিস্তানের দিক থেকে নবাবপুর রোড বরাবর খানিকটা এগিয়ে গেলে হাতের ডান ধারে। সে-সময় ঢাকার অন্যতম নামজাদা রেস্টুরেন্ট ছিল ক্যাপিটাল। এর খ্যাতির মতোই বিখ্যাত ছিল এর মোগলাই পরোটা। ঢাকার উঠতি লেখক আর বুদ্ধিজীবীদের এ ছিল অন্যতম আড্ডার জায়গা। তবে তা আমাদের মতো চালচুলোহীনদের নয়, যাদের ট্যাকে কাঁচা পয়সা আছে বা উঠতি পয়সাওয়ালা বন্ধুবান্ধব আছে তাদের।

এমনিতেই মেজাজ খিচড়ে ছিল। রফিকের কথা শুনে আমি রাগে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বিরক্তির স্বরে বললাম : লোকদুটো এতক্ষণ তোমাকে কী সবই না বলল! তোমার কি খারাপ লাগছে না? তুমি মোগলাই পরোটার কথা বলছ?

আমার কথা শুনে রফিক বিষম তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে উঠল : আরে ধ্যাৎ!

এসব কথা কানে ঢোকালে কবিতা লিখব কী করে? 'ধ্যাৎ' বলার সময় ওর ভেতরকার আপাদমস্তক অবজ্ঞাটা এমন উৎকটভাবে বেরিয়ে এল যে মনে হল ও বমি করে দিচ্ছে।

এই ছিল রফিক। এই লেন-দেন, লাভ-ক্ষতিসর্বস্ব দৈনন্দিনের বস্তুজগৎটা ওর কাছে ছিল প্রায় হাস্যকর। এসব থেকে অনেক ওপরে, একটা ধ্যানস্থ নিভৃত পৃথিবীতে ওর সঙ্গে ওর কাব্যদেবীর ছিল নিঃশব্দ বসবাস।

খুব শাদামাটাভাবেই কথাটা বলেছিল সেদিন রফিক। যেভাবে সবসময় বলে সেভাবেই। কিন্তু ওর কথা থেকে সেদিন একটা বড় জিনিশ আমি শিখে নিয়েছিলাম। শিখেছিলাম জীবনের এসব তুচ্ছ ঘেয়ো জিনিসকে এভাবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখাতে না-পারলে বড়কিছু করা সত্যিই কঠিন।

৫

সব জায়গায় পার পেলেও একটা জায়গায় রফিক সত্যি সত্যিই ধরা খেয়ে গিয়েছিল। সে ওর 'ভাত দে হারামজাদা' কবিতা লেখার পর। কবিতাটা রফিক লিখেছিল সম্ভবত উনিশ-শ চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে। কবিতাটা সুন্দর :

ভীষণ ক্ষুধার্ত আছি : উদরে, শারীরবৃত্ত ব্যেপে
অনুভূত হ'তে থাকে—প্রতিপলে—সর্বগ্রাসী ক্ষুধা !
অনাবৃষ্টি—যেমন চৈত্রের শস্যক্ষেত্রে—জ্বেলে দ্যায়
প্রভূত দাহন—তেমনি ক্ষুধার জ্বালা, জ্বলে দেহ।

দু'বেলা দু'মুঠো পেলে মোটে নেই অন্য কোনো দাবি,
অনেক অনেক-কিছু চেয়ে নিচ্ছে, সকলেই চায় :
বাড়ি, গাড়ি, টাকাকড়ি—কারো বা খ্যাতির লোভ আছে ;
আমার সামান্য দাবি : পুড়ে যাচ্ছে পেটের প্রান্তর—
ভাত চাই—এই চাওয়া সরাসরি—ঠাণ্ডা বা গরম,
সরু বা দারুণ মোটা রেশনের লাল চালে হ'লে
কোনো ক্ষতি নেই—মাটির শানকিভর্তি ভাত চাই ;
দু'বেলা দু'মুঠো পেলে ছেড়ে দেবো অন্য সব দাবি !

অযৌক্তিক লোভ নেই, এমনকী, নেই যৌনক্ষুধা—
চাইনি তো : নাভিনিম্নে-পরা শাড়ি, শাড়ির মালিক;

যে চায় সে নিয়ে যাক—যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে দাও—
জেনে রাখো : আমার ও-সবে কোনো প্রয়োজন নেই।
যদি না-মেটাতে পারো আমার সামান্য এই দাবি,
তোমার সমস্ত রাজ্যে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘ'টে যাবে;
ক্ষুধার্তের কাছে নেই ইষ্টানিষ্ট, আইন-কানুন—
সম্মুখে যা-কিছু পাবো খেয়ে যাবো অবলীলাক্রমে;
যদি বা দৈবাৎ সম্মুখে তোমাকে, ধরো, পেয়ে যাই—
রাক্ষুসে ক্ষুধার কাছে উপাদেয় উপচার হবে।

সর্বপরিবেশগ্রাসী হ'লে সামান্য ভাতের ক্ষুধা
ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসে নিমন্ত্রণ ক'রে!

দৃশ্য থেকে দ্রষ্টা অব্দি ধারাবাহিকতা খেয়ে ফেলে
অবশেষে যথাক্রমে খাবো : গাছপালা, নদী-নালা,
গ্রাম-গঞ্জ, ফুটপাত, নর্দমার জলের প্রপাত,
চলাচলকারী পথচারী, নিতম্ব-প্রধান নারী,
উড্ডীন পতাকাসহ খাদ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীর গাড়ি—
আমার ক্ষুধার কাছে কিছুই ফেল্‌না নয় আজ।

ভাত দে হারামজাদা, তা-না-হ'লে মানচিত্র খাবো।

[ভাত দে হারামজাদা]

চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষের ক্ষুধার রূপটি জ্বলজ্বল করছে কবিতাটিতে। কবিতাটি পাঠকমহলে হৈচৈ ফেলেছিল। মানুষের মুখে-মুখে অনেকদিন পর্যন্ত আবৃত্ত, উচ্চারিত হয়ে ফিরেছিল, বিশেষ করে এর শেষ পঙ্‌ক্তিটি।

সবখানে যখন কবিতাটি নিয়ে উৎসাহের ঢেউ তখন সবার অগোচরে কিন্তু ঘটে চলেছে আর-এক নাটক। কে একজন কবিতাটি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে পড়ে শুনিয়ে পুরোপুরি বুঝিয়ে ফেলেছে যে কবিতাটির শেষ পঙ্‌ক্তিটি তাঁকে উদ্দেশ করেই লেখা। আর যায় কোথায়? কোথায় হিমালয়ের মতো জাতিকে ছাপিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেদিনের শেখ মুজিবুর রহমান আর কোথায় রফিক আজাদ। ও তো একটা কীটাণুকীটও নয়! মুজিব-আচ্ছাদিত সেই বাংলাদেশে রফিক পালাবে কোথায়? কোনোমতে রফিক গিয়ে আশ্রয় নিল মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক, কাদের সিদ্দিকীর একসময়কার সহযোগী এবং ওর আত্মীয় নূরুজ্জামান শহীদের বাসায়। তারপরে শুরু হল নাকে খত দেবার মর্মান্তিক কাহিনী।

যদ্দুর জানা যায়, তেইশ পৃষ্ঠার এক দীর্ঘ ক্ষমাপ্রার্থনাপত্র লেখা হল শেখ মুজিবুর রহমান বরাবর। শুনেছি চিঠিটাতে শিল্প কী ও কাকে বলে এ–বিষয়ে একনাগাড়ে কয়েক পৃষ্ঠা খরচ করে এই কবিতায় কোনোরকম রাজনৈতিক বিষয়–যে কোনোখানেই নেই তা ইনিয়ে–বিনিয়ে প্রমাণ করে এ–যে নিতান্তই একটি আধ্যাত্মিক কবিতা এবং এতে প্রকাশিত ক্ষোভ–যে নিতান্তই মাশুকের প্রতি আশেকের একটি চিরকালীন প্রণয়াভিমান ছাড়া আর কিছু নয়—তা বহু কথার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে মহানুভব রাষ্ট্রপতির কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয়েছে যেন বিনা অপরাধে একজন নিরীহের প্রতি অকারণে অন্যায় না করা হয়।

আমি চিঠিটি পড়িনি। তবে তেইশ পৃষ্ঠা দীর্ঘ একটা চিঠিতে এসব ছাড়া কী–ই বা থাকতে পারে? তবে চিঠিতে যাই লিখুক, রফিক–যে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটেই কবিতাটি লিখেছিল এবং ঐ পঙ্‌ক্তিতে রাষ্ট্রপতিকে ইঙ্গিত না–করলেও তাঁর সরকারকেই বুঝিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর যদি স্বয়ং রাষ্ট্রপতিকেও বুঝিয়ে থাকে তাতেও অবাক হবার কিছু নেই! অনুভূত সত্যকে দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারণের ক্ষমতা ওর মধ্যে ছিল। জাগতিক সুবিধার জন্য কৌশলের আশ্রয় নিতে আমি কখনো কখনো ওকে দেখেছি কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে মিথ্যাচার করতে দেখিনি।

নূরুজ্জামান শহীদ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রিয়পাত্র। হয়তো তাঁর অনুরোধে কাজ হয়েছিল। সুরসিক বঙ্গবন্ধু বিপন্ন–কবির তেইশ পৃষ্ঠা দীর্ঘ বিশাল ক্ষমাপ্রার্থনাপত্র দেখে নাকি মৃদু হেসে সে–ব্যাপারে ইতি টেনে দিতে বলেছিলেন।

রফিকের কবিতা অত্যন্ত সংযত। কবিতা লেখার প্রায় প্রথমদিন থেকেই এই দুর্লভ গুণটি রোজগার করেছিল ও। আগেই বলেছি ওর এই সংযম মাইকেলি সংহতিকে স্মরণ করায়। হয়তো এ–ব্যাপারে মাইকেলের কিছুটা প্রভাবও ছিল রফিকের ওপরে। কবিতার শুদ্ধতম রূপটিকে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে রফিক ছিল অতন্দ্র। ওর প্রতিটি শব্দ ছিল পরিণত ও সচেতন। এমন সংহত ও নিটোল কবিতা গত পঞ্চাশ বছরে খুব বেশি লেখা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

যৌনতা, প্রেম, দেশপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম থেকে শুরু করে দৈনন্দিন অনেক দুঃখ, বেদনা, ক্ষয় ও দহন ওর কবিতাকে সম্পন্নতা দিয়েছে। ওর একটি ছোট্ট মিষ্টি প্রেমের কবিতা তুলে দিয়ে ওর প্রসঙ্গ শেষ করব :

> তুমি যেসব ভুল করতে সেগুলো খুবই মারাত্মক ছিল। তোমার কথায় ছিল গেঁয়ো টান, অনেকগুলো শব্দের করতে ভুল উচ্চারণ : 'প্রমথ চৌধুরী'কে তুমি বলতে 'প্রথম চৌধুরী' ; 'জনৈক' উচ্চারণ করতে গিয়ে সর্বদাই 'জৈনিক' বলে ফেলতে; এম্নি বহুতর ভয়াবহ ভুলে ভরা ছিল তোমার ব্যক্তিগত অভিধান। কিন্তু সে–সময়, সেই সুদূর কৈশোরে ঐ মারাত্মক ভুলগুলো তোমার বড়–বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলুম।

তোমার পরীক্ষার খাতায় সর্বদাই সাধু ও চলতি দূষণীয় মিশ্রণ ঘটাতে। ভাষা ব্যবহারে তুমি বরাবরই খুব অমনোযোগী ছিলে। বেশ ভালো হাবাগোবা–গোছের লাজুক ও অবনতমুখী মেয়ে ছিলে তুমি। 'শোকাভিভূত' বলতে গিয়ে বলে ফেলতে 'শোকভূত'। তোমার উচ্চারণের ত্রুটি, বাক্যমধ্যস্থিত শব্দের ভুল ব্যবহারে আমি তখন একধরনের মজাই পেতুম।

২০–বছর পর আজ তোমার বক্তৃতা শুনলুম। বিষয় : 'নারী–স্বাধীনতা' ! এত সুন্দর, স্পষ্ট ও নির্ভুল উচ্চারণে তোমার বক্তব্য রাখলে, যে, দেখে অবাক ও ব্যথিত হলুম ! আমার বুকের মধ্যে জেঁকে–বসা একটি পাথর বিশ বছর পর নিঃশব্দে নেমে গ্যালো॥

[তুমি : বিশ বছর আগে ও পরে]

৬

ষাট দশকের দ্বিতীয় পর্বে আর যারা এসে 'কণ্ঠস্বর'–এর আসরে জড়ো হয়েছিল দু–তিনজনের পরিচয় দিয়ে তাদের পর্ব শেষ করব।

মুহম্মদ নূরুল হুদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৬৮–র কোনো–এক সময়ে। হুদার বাড়ি কক্সবাজার উপজেলাতেই, সমুদ্র আর পাহাড়ের গা ছুঁয়ে। প্রথম দেখাতেই দৃষ্টি কেড়ে নেবার মতো দীপ্তি ছিল হুদার মধ্যে। দীর্ঘ, ছিপছিপে, সুদর্শন হুদার গায়ের রঙ ছিল ফরসা, নাক তীক্ষ্ণ, ভ্রূ ঘন কালো, চোখ আয়ত। দেখলেই বোঝা যেত সমুদ্র–বন্দর চট্টগ্রামে যে আরব–বণিকেরা দূর–অতীতে এসে বসতি স্থাপন করেছিল তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার জ্বলজ্বল করছে সেই চেহারায়।

১৯৬৫ সালে তিনি ঢাকা কলেজে এসে ভর্তি হন। ছাত্র ও কবি উভয় হিসেবেই তিনি মেধাবী। পরীক্ষার সাফল্য দিয়ে বৈষয়িক জীবনকে কুসুমাস্তীর্ণ করে তোলা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্তু গুণ বা আবুল হাসানের মতো তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তও ছিল কবিতায় পাওয়া। কবিতার এই বিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রে উথালপাথাল করে তাদেরই মতো উন্মাতাল জীবন কেটে গেছে তাঁর। তাঁর কবিতাসংখ্যাও বিপুল। কবিতার বই সংখ্যায় প্রায় তিরিশ ছুঁয়েছে।

আবেগের মত্ততা ও যুক্তি হাত ধরাধরি করে আছে তাঁর কবিতায়। আমাদের দশকের যেসব কবির কবিতায় চিন্তার ছাপ আছে তিনি তাঁদের একজন। তাঁর চেতনাজগৎ রোমান্টিক হলেও তাঁর কবিতা ধ্রুপদী ধাঁচের।

১৯৬৭–এর দিকে হুদা একটা কবিতা পাঠান আমার কাছে, নাম 'টুকরো কবিতা'।

হুদা তখনো ঢাকা কলেজের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, তাঁর বন্ধু আলতাফ হোসেনের সহপাঠী। কিন্তু আলতাফের চেয়ে তাঁর কবিতায় সাফল্যের রং লেগেছিল দেরিতে। কবিতাটি আমার কাছে বছর–দুই পড়ে থেকে উনসত্তুরের জুলাই–অক্টোবর সংখ্যার 'কণ্ঠস্বর'–এ প্রকাশিত হয়। 'কণ্ঠস্বর'–এ তাঁর দ্বিতীয় কবিতা ছাপা হয় এর বেশকিছু পরে, ১৯৭২–এর কবিতা সংখ্যায়। এই কবিতাটির সঙ্গে, আমার ধারণা, হুদার কবি–জীবনের শুরু। কবিতাটির নাম 'দূরে যাচ্ছো'। হয়তো কারো দূরে চলে যাবার অশ্রু দিয়েই কবিতাটি লেখা। কিছু পঙ্‌ক্তি তুলে দিচ্ছি :

দূরে যাচ্ছো, বৃষ্টির প্রপাত থেকে দূরে যাচ্ছো রিমঝিম পায়
বাজিয়ে শঙ্খের চুড়ি, হাওয়ায় এলিয়ে দিয়ে কালো কেশদাম
ঘূর্ণি নৃত্যে মেতে দূরে যাচ্ছো,
দূরে যাচ্ছো তুমিও উর্বশী। ...

পর্বতের শৃঙ্গ থেকে দূরে যাচ্ছো
ছায়ার প্রান্তর থেকে দূরে যাচ্ছো
পরিচিত ঘরবাড়ি, লোকালয়, সন্ধ্যাদীপ, স্বজনবান্ধব
স্মৃতির বাসরে রেখে হৃদয়ের শিশিরার্দ্র ঝাঁপি
সজল সড়ক বেয়ে দূরে যাচ্ছো, দূরে যাচ্ছো তুমিও রোদসী।

চতুষ্পার্শ্বে কাঁপে কিশলয়, বয়ে যায় কলস্বরা নদী
সবুজ বাহুর মতো তোমাকে জড়াতে চায় পত্রময় শাখা
ধর্ষিতা শরীর থেকে খুলে রেখে ব্যস্ত বেশবাস
কোথা যাচ্ছো? দূরদ্বীপে? দূরদ্বীপে কাঁপে কার কায়া?

প্রেমের কবিতা হুদা লিখেছেন অনেক। এটি তাঁর কবিতার একটি সজীব ধারা। কিন্তু যে–আবেগ অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর কবিতার ভূমিকে সবুজ করে রেখেছে তা হল জাতিসত্তার দিকে তাঁর অন্তর্জগতের যাত্রা।

পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত সারাজাতির মধ্যে নিজের অতীতের সঙ্গে আত্মপরিচয়ের এবং একাত্মতার যে–আকুতি জেগেছিল তা যাদের লেখায় সবচেয়ে বলিষ্ঠভাবে প্রতীকায়িত হয়েছে তাদের মধ্যে মুহম্মদ নূরুল হুদা একজন। পঞ্চাশের দশকে আল মাহমুদের 'সোনালি কাবিন'–এ এবং আশির দশকে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি'র মধ্যেও এই আকুতি বেগবান। হুদার দ্রাবিড়া এবং তামাটে জাতির রূপকল্পে আবহমানের এই নৃতাত্ত্বিক বাঙালি প্রতীকায়িত :

রোদ্দুরে নেয়েছি আর বৃষ্টিতে ভিজেছি
সহস্র শতাব্দী দিয়ে নিজেকে গড়েছি
আমরা তামাটে জাতি আমরা এসেছি।

এই জাতির যুগযুগের সংগ্রামশীলতা ও শক্তিমত্তার সবচেয়ে উজ্জ্বল উপমা তিনি খুঁজে পেয়েছেন এদেশের শ্রমজীবী মানুষের দুর্মর জীবন সংগ্রামের মধ্যে। ১৯৯১–এর ঘূর্ণিঝড়ে সমুদ্র–প্রমত্ততায় নিহত একজন জেলের অদমিত লড়াইয়ের মধ্যে এই সংগ্রামের রূপ তিনি দেখেছেন :

মাইন্‌সে কইলো, 'আইবো তুয়ান।'
বাজান চিক্কর দিলো, 'আইয়ক, আইয়ক।'
পেডের ভিতর যার হামিশা তুয়ান
দইজ্জার মউজর লগে বাঁধা তার জান ;
আইজ তয় হাঁচা হাঁচা আইয়ক তুয়ান।'

কলিজা বাইরে বাঁধি মাঝ–দরিয়াত
হেই রাইতেও সোনাদিয়া আছিলো বাজান,
লগে তার জোয়ান্‌কী হিম্মত সাম্পান ;
বাজানর সিনাখানও গইরর নাহান।

যহন বাইড়লো পানি, বাজানে কইলো,
'দরিয়া রে, তর বুক চিরি চিরি
চালিশ বছর ধরি আঁর দানাপানি,
তর খাই তর লই বাইজ্জে এই শরীল আঁর ;
আইজ্জা তুই হাঁচা হাঁচা ডালী লবি তার?'

হাঙ্গর মাছর মতন হা গরিল দরিয়া তহন
বাজান চিক্কর দিল, দরিয়া গজ্জন।
জব্বইজ্জার বলী খেলা শুরু অইলো পানির ভিতর
এক বলী বাজান আঁর, অইন্ন বলী বঙ্গুয় সাইগর।

[জব্বইজ্জার বলী খেলা পানির ভিতর]

কবিতাটির আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহারও অসম্ভব বলিষ্ঠ। প্রায়ই তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে অপরূপ ছবিতে ভরা :

তুমি ছুটে যাবে লুই ক্যানের কেন্দ্রের দিকে,
তুমি তখন কেন্দ্রসুন্দরী।
তুমি ছুটে যাবে পৃথিবীময় প্রভাতের দিকে,
তুমি তখন শিশিরসুন্দরী।

সংসদভবন সাক্ষী রেখে
শেরে বাংলা নগরের পাকা রাস্তা ধরে
তুমি যখন রুখে দাঁড়াবে বাতাসের উল্টোদিকে,
তোমার সবুজ রঙের শাড়ি তলিয়ে যাবে
তোমার ধানরঙ দেহে,
বিনা মেঘে বিনা বজ্রে বাজবে বাঁশি
তোমার দেহে চমকাবে বিজলি,
বিজলির পর বজ্রপাত,
তারপর জল, খল জল,
তারপর বন্যা,
তারপর তরঙ্গ,
তরঙ্গে তরঙ্গে ফণা ...

দাঁড়াবে না, কেউ না,
সেই ফণার সামনে কেউ দাঁড়াবে না,
তখন কেউ না।

[প্রভাতসুন্দরী]

তাঁর মধ্যে আর-একটা ব্যাপার আছে। একে বলা যেতে পারে : মহাবৈশ্বিক অনুভব। বিষয়টি প্রায়ই তাঁর কবিতায় চোখে পড়ে :

না, মিছিলটাকে আর রোখা গেল না, এই একমুখী মিছিলটাকে।
যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, পাহাড়-পর্বত মাড়িয়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে
যাচ্ছে তো যাচ্ছেই—আলোকপর্বত মাড়িয়ে, সৌরলোক থেকে সুরলোকে;
হাতে কোনো প্লাকার্ড নেই
মুখে কোনো স্লোগান নেই
শুধু নৃত্য
তাথৈ
তাথৈ

এই মহাবৈশ্বিক অনুভূতির সবচেয়ে বলীয়ান প্রকাশ দেখতে হলে পড়তে হবে তাঁর 'মৌলাধুনিক' ও ঐ জাতের কিছু কবিতা। এই কবিতাগুলোর ভেতরকার মহাবিশ্বের অতিজাগতিক ভীতি ও অন্তহীনতা পাঠকের স্নায়ুমণ্ডলীকে অধিকার করে। এই মহাবৈশ্বিক অনুভূতি হুদার খুবই একটা নিজস্ব জিনিশ। বাংলাসাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের কবিতাতেই কেবল এই মহাজাগতিক পৃথিবীর আদিঅন্তহীনতার চেতনা খুঁজে পাওয়া যাবে।

৭

হুদার প্রায় একসঙ্গেই এসেছিলেন আর-একজন জ্বলজ্বলে তরুণ, তীব্র আবেগ আর মননের দীপ্তিতে ধারালো, তিনি ফরহাদ মজহার। তাঁর মানসিক দীপ্রতা তাঁর উচ্ছল শরীরেও খেলা করত। একটা দুর্নিবার তারুণ্য ছিল তাঁর মধ্যে, পরিণত রূপে এখনো তা তাঁর ভেতর রয়ে গেছে। এই ধরনের ঝকঝকে তরুণদের ঐ বয়সে যেসব সাফল্য পাবার কথা তাঁর সবকিছুই তখন তাঁর প্রায় করায়ত্ত। মার্কসবাদী বিপ্লব, ঈর্ষাজনক প্রেম, মননদীপ্র কবিতা—সব নিয়ে প্রায় বিজয়ীর মতো তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন মঞ্চে।

সে-সময় দুটি স্ববিরোধী প্রবণতা ছিল ফরহাদ মজহারের মধ্যে। সাধারণ ও দুঃখী মানুষের জন্যে তাঁর মধ্যে ছিল একটা অকৃত্রিম ভালোবাসা—ষাট-দশকী মার্কসবাদী বিপ্লবের স্বপ্নের মধ্যদিয়ে তাঁর সেই অনুভূতি টের পাওয়া যায়। একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে ছিল মাইকেলি ধাঁচের কবিসুলভ প্রচণ্ড জীবনযাপনের আবেগ। এই দ্বিতীয় প্রবণতাটি তাঁকে একসময় আমেরিকার জৌলুশময় জীবনের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তিনি আমেরিকার পথে পা বাড়ান। তাঁর সেই সময়কার প্রচণ্ড আবেগের কথা এখনো আমার মনে পড়ে। ঘটনাটা তাঁর আমেরিকা যাবার দিনকয় আগের। একদিন আমার বাসায় তিনি এসেছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, আমেরিকা যাচ্ছেন কেন?

বারুদে আগুন লাগার মতো দপ করে জ্বলে উঠলেন তিনি। প্রায় চিৎকার করে বললেন : আমি ভিখিরির মতো বাঁচতে চাই না। 'ভিখিরি' কথাটা তিনি এমন তিক্ততার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন যে সন্দেহ হচ্ছিল কথাটা তিনি আমাকেই বলছেন কি না। কথাটায় খুব আঘাত লেগেছিল আমার। জাতির একটা চলনসই ভবিষ্যতের জন্যে এই দেশে আমরা যারা সংগ্রাম করে বেঁচে আছি তারা সব ভিখিরি? এদেশের যারাই অমনভাবে বিদেশী রুটি আর মাখনের সন্ধান করে পাড়ি জমাতে উৎসাহী নয়, সে-মানুষেরা সব ভিখিরি? সত্যিকার কবিসুলভ প্রচণ্ডতা নিয়েই বলেছিলেন তিনি কথাটা। জানি না দেশের নিঃসীম দুঃখ-কষ্ট নিয়ে তাঁর মধ্যে সেই মুহূর্তে কোনোরকম তীব্র হতাশা বা তিক্ততা কাজ করছিল কি না! ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন সেই মুহূর্তে কোনো কারণে তাঁকে মরিয়া করে তুলেছিল কি না!

কিন্তু সাময়িক উত্তেজনা যত তীব্রই হোক, জীবনের গভীরতর সত্য একদিন তাকে নিচে ফেলে ওপরে উঠে আসেই। তাই এই দেশের জন্য, এই দেশের সাধারণ মানুষদের জন্যে অকৃত্রিম ভালোবাসা আবার তাকে এদেশে ফিরিয়ে এনেছিল। ফেরার পর কবিতা লিখেছেন তিনি অনেক, কিন্তু এরই পাশাপাশি এবার তাঁর অন্যতম চেষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষ ও তার পরিবেশের সরাসরি কল্যাণ। সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলে তিনি এই লক্ষ্যে কাজ করছেন। আমেরিকা-প্রবাস মাতৃভূমির বিকল্প না দিলেও আর-একটি জিনিশ তাঁকে দিয়েছিল । সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তর পড়াশোনার ও নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বচ্ছ করে নেবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। এই পরিণত মন তিনি নিয়োগ করেছিলেন গদ্যরচনায়। ফলে শক্তিশালী কলাম-লেখক ও প্রবন্ধকার হিসেবে তাঁর উত্থান ঘটে। ফরহাদ মজহারের ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে বিচিত্রমাত্রিক।

ফরহাদ মজহার রক্তে রক্তে কবি। ব্যক্তিগত জীবন, সমাজমুখিতা, কলামের গদ্য—সবখানেই তাঁর ভেতরকার এই কবিটিকে চোখে পড়ে। তিনি ফার্মাসির ছাত্র। তাঁর এই ভিন্নধর্মী বিষয়টির মতো তাঁর কবিতার স্বভাবও গড়পড়তা কবিদের থেকে আলাদা। তাঁর কবিতা খুবই আলাদা স্বাদের। খুবই ভিন্ন জীবনানুভূতি উপহার দিয়েছেন তিনি। হার্দ্য বলতে যা বোঝায় তাঁর কবিতা ঠিক তা নয়। হৃদয়কে তা আর্দ্র নয়, ধারালো করে তোলে। তাঁর কবিতার মূল সম্পদ মনন। এই মননে তা জ্বলিত ও চালিত। এইজন্যে তা এত জাগ্রত ও দীপিত। তবে কবিতা যেহেতু শুধু বুদ্ধির তৈরি নয়, তাই হৃদয়াবেগ যেখানে তাঁর কবিতাকে অধিকার করতে পেরেছে, সেখানেই তা কেবল 'হৃদয়হরণ' হয়েছে।

ষাটের দশকের শেষের দিকে তাঁর 'খোকন ও তার প্রতিপুরুষ' বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৌলিকতা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর এই বইয়ে কবিতার উপাদান ছিল বিস্তর। তা এতই বেশি যে কবিতাগুলো সেই প্রাচুর্যে প্রায় উপচে পড়ছে। স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে, ছবি-বহুলতায়, বুদ্ধির প্রখরতায়, চিন্তার নতুনত্বে বইটি জ্বলজ্বলে। বিশেষ করে চিত্ররচনার সপারগতা সত্যিই মনোমুগ্ধকর :

য়ুনিভারসিটিতে আমার আপা
তার বন্ধু ও বান্ধবীদের সঙ্গে
শীতল ও পরিচ্ছন্ন ক্লাসরুমে
আজ সারাদিন
বক্তৃতা শুনবে।
বেঞ্চির ওপরে কনুই
শেকড়ের মতো কনুই থেকে গজিয়ে ওঠা
উদ্ভিদের মতো হাত,
হাতের পল্লবিত পাঁচটি সবুজ আঙুলের

আদরের ভেতর
ক্লোরোফিলহীন
হলুদ পুষ্পিত মুখ—
সেই মুখে উৎপূর্ণ আগ্রহ উঁচিয়ে
আমার আপা
সারাদিন ক্লাস করবে।

[আমার আপা এবং বান্ধবীদের য়ুনিভার্সিটি]

এমনি সব চিত্র রয়েছে বইয়ের সব জায়গায়। সেইসঙ্গে কবিতার অনেক মালমশলা। কিন্তু হৃদয়ের গাঢ়তা ও নিটোলতায় আনত না হতে পারায় তার এই বইয়ে খাঁটি কবিতা উপাদানের তুলনায় কম। তাঁর ভালো কবিতার দেখা বরং বেশি পাওয়া যায় 'এবাদতনামা'য়। আল্লার প্রতি তাঁর কৈশোরিক ভালোবাসার অবোধ আকুতির সঙ্গে দার্শনিক জিজ্ঞাসার টানাপড়েন থেকে বেশকিছু ভালো সনেট উঠে এসেছে বইটিতে। একটি সনেট তুলে দিচ্ছি :

গড়েছো বাংলাভাষা দিয়ে মোর মূর্ধা আর তালু
আলজিহ্বা খেলা করে আ-কারে ও দীর্ঘ ঈ-কারে
দমে দমে টের পাই ওঁ-কার ও বক্ষস্পন্দন
হৃদতন্ত্র বেজে ওঠে ব্যঞ্জনের বিমুগ্ধ বিস্তারে—

এত্তো ভালো লাগে, প্রভু, এত্তো ভালো লাগে বাংলাভাষা
লোভে চেটেপুটে খাই যেন জান্নাতের আতাফল।
তোমার কি ঈর্ষা হয়? তুমি তো করোনি এ জবানে
নিজেকে জাহির! তবু, হামেশাই আমি আদাজল
খেয়ে লেগে আছি যেন বাংলা রাণী নিজেই নিজের
নূরে ও হিম্মতে প্রভু আগুয়ান থাকে প্রত্যেকের।

দশে আজ বলে, বাংলা, তুমিও কি তবে ঐশ্বরিক?
তুমিও অশ্রুতপূর্ব? তুমিও কি আল্লার হরফ?

খুশি আমি, বাংলা তোমার নয়, যদি হোত তবে--
বেহুদা তোমার ডাঁট বেড়ে যেত বাংলার গৌরবে।

[বাংলা তোমার নয়]

৮

আমাদের আর-একজন কবি সম্বন্ধে কিছু বলার লোভ সামলাতে পারছি না। সে সেলিম সারোয়ার। সেলিম ছিল শ্যামলা আর ছিপছিপে গড়নের। ওর হাসি ছিল অসম্ভব মিষ্টি আর আন্তরিক। সেলিম পড়ত ইংরেজিতে। ওর পরিবারের অবস্থা ছিল সচ্ছল। সেকালেই ওদের নিজেদের জাহাজ ছিল। আমাদের তরুণ-লেখকদের মধ্যে এতটা পারিবারিক সচ্ছলতা আর কারো ছিল না। সেলিম বেশি লিখত না। কিন্তু ওর কবিতা ছিল আশ্চর্য নিটোল। ওর গোটা-তিনেক কবিতা ছেপেছিলাম আমরা, প্রত্যেকটিই ছিল অনবদ্য। নিচে তার একটি তুলে দিলাম :

আমার দু'চোখ থেকে সমুদয় অসম্ভব পদ্ম ছিঁড়ে আনি,
আমার শোণিত থেকে লাল বৃষ্টিধারা
সযত্নে বিছিয়ে দিই, যেন অমূল্য কার্পেট,
যে পথে সদর্পে হেঁটে যাবে

তুমি তো সম্রাজ্ঞী,
অভ্যস্ত দিগ্বিজয়ে, রক্তপাতে, তাই হয়তো বুঝতে পারো না
সাদা পায়রার মতো নরম যমজ পদতল
আমারই রক্ত মেখে হয়ে ওঠে গোলাপ, গোলাপ

তুমি তো সম্রাজ্ঞী তাই কখনো দেখো নি
অনিদ্রার অগ্নিকাণ্ডে জ্বলে যায় সুশোভিত স্নায়ুর শহর,
পিপাসা বর্শার সাদা ধাতব ফলার মতো
চিরে ফেলে স্বরযন্ত্র, বুক
ক্ষুধা, যেন কুষ্ঠরোগ, খেয়ে ফেলে হাতের আঙুল

তুমি তো সম্রাজ্ঞী, তাই সন্তানের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখো নি,
জানো না দুঃখ পেলে সকল সবুজ বৃক্ষ
হয়ে ওঠে তামাটে, ধূসর
ফুসফুসে জন্ম নেয় এক কালো মহাদেশ যার
ভূমিতে বিষাক্ত বন, আকাশে ক্ষুধার্ত সূর্য
জলে মৃত্যুময় পিরানিয়া
শোকের লোমশ হাত এড়াবার জন্যে সব সন্ত্রস্ত মানুষ
নিষ্ফল পাখির মতো খুঁজে ফেরে প্রতিশ্রুত নদী
তুমি তো সম্রাজ্ঞী, তাই এসব জানো না

প্রতিটি সূর্যোদয় ও প্রতিটি সূর্যাস্ত দ্বারা নির্মম প্রহৃত,
প্রতিটি ঘাতক রাত্রে হত্যা ক'রে নর্দমায় ফেলে দেবে বলে
শানায় প্রবল ছুরি, প্রতিটি জল্লাদ
অবিলম্বে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে দারুণ আগ্রহী,
কেউ কেউ তবু আছে, তোমার উদ্যানে ক্রীতদাস,
কেবল তোমাকে ভেবে, কেবল তোমাকে ভালোবেসে,
কেবল তোমার জন্যে বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকতে চায়

তুমি তো সম্রাজ্ঞী, তাই জানতে পারো না।

[তুমি তো সম্রাজ্ঞী, তাই]

এমনি নিটোল আর পরিপাটি ছিল ওর কবিতা। সবাই সেলিমকে ওর কবিতার জন্য একবাক্যে প্রশংসা করত। কিন্তু আমার কেন যেন অদ্ভুত ভয় হত ওকে নিয়ে। কেবলই মনে হত তরুণ বয়স তো এতটা নিটোলতা বা পারিপাট্যের সময় নয়, এটা তো শক্তির বয়স। এটা তো ধ্বংস আর তছনছ করার বয়স। সেই বয়স, যখন একজন কবি ভুল করবে, ভাঙবে, নিজেকে ওলটপালট আর বিপর্যস্ত করে নিজের শক্তির বন্যতায় নিজেই নিজের হত্যাকারী হয়ে আর্তনাদে আকাশ মথিত করবে। কিন্তু সেলিমের মধ্যে ভাঙনের শক্তি, ধ্বংসের উল্লাস নেই কেন? কেন সে উত্তরাধিকারকে নির্দয় শাবলে ভেঙে গুঁড়িয়ে তা থেকে গড়ে তুলছে না তার স্বতন্ত্র স্বকৃত মুখাবয়ব? কেন কেবলই পরিচিত শব্দ ছন্দ উপমা আর বক্তব্যকে তাঁর কবিতার উজ্জ্বল নিটোল মুখচ্ছদ করতে চাচ্ছে? তবে কি কোনোখানে কাব্যশক্তিতে তাঁর অনটন রয়েছে?

তার সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছিল। সেলিম খুব বেশিদিন কবিতা লেখেনি। ও ছিল ভালো ছাত্র। সবদিক থেকেই পরিপাটি। জীবন ছিল গোছালো ছিমছাম। ইংরেজিতে এম.এ. করে প্রথমে ও ওই বিভাগে শিক্ষক হয়। তারপর ছেড়ে দেয় কবিতা। তারপর দেশ ছেড়ে সেই–যে ক্যানাডা বা আমেরিকার পথে পা বাড়ায়, সেই বিদায় থেকে আর ফেরেনি।

৯

আগেই বলেছি ১৯৬৭ সাল ছিল আমাদের ফুলে–ফলে ভরে ওঠার মঞ্জরিত ঋতু। এই বছরের বারো মাসের মধ্যে 'কণ্ঠস্বর'–এর দশটি সংখ্যাই–যে কেবল বেরিয়েছিল তা নয়, ষাটের মূল লেখকদের অধিকাংশই জড়ো হয়ে গিয়েছিল 'কণ্ঠস্বর'–এর চত্বরে, আঙিনা মৌ মৌ করতে শুরু করেছিল। কেবল লেখক আসেনি, নতুন অনেক কর্মীতেও প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছিল এর আসর। গুণ আর সাযযাদ কাদিরের

কথা আগেই বলেছি। এছাড়াও এসেছিলেন তোফাজ্জল হোসেন সরকার, আগস্ট '৬৭ সংখ্যার কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে।

তোফাজ্জল হোসেন সরকার ছিলেন ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজে—আমার সহকর্মী। পদার্থবিদ্যার শিক্ষক ছিলেন তিনি। বৈপ্লবিক বা অবিশ্বাস্য কিছু ঘটিয়ে ফেলার অসাধারণ কোনো উদ্যম তাঁর মধ্যে ছিল না, কিন্তু শান্ত নীরব ও অনমনীয় একটা সাংস্কৃতিক উৎসাহ ছিল। নিজে তিনি উদ্দাম স্বভাবের ছিলেন না, কিন্তু যে-কোনো বেপরোয়া পাগলামিকে বুঝতে ও তাতে সক্রিয়ভাবে বেজে উঠতে তাঁর কোনো অসুবিধা হত না। আমার বেশকিছু উদ্ভট ও হাস্যকর পাগলামিতে যোগ দিয়ে তিনি যেভাবে সেসবে শেষপর্যন্ত টিকে ছিলেন তা থেকে তাঁর এই দিকটির প্রমাণ আমি বারে বারে পেয়েছি। একটা আশ্চর্য শমিত ভারসাম্য আছে তার ভেতরে। জীবনকে অসম্ভব শান্ত ও সহজভাবে নিতে পারেন। বছর-কয়েক আগে তাঁর প্রস্টেটের ক্যানসার ধরা পড়েছে। তাঁর সঙ্গের বুগিরা সবাই এক এক করে মৃত্যুর হিমশীতল পৃথিবীতে চলে গেছে। কিন্তু তিনি নিরুদ্বেগ। মৃত্যু এলে তাঁকে সহজভাবেই নিয়ে নেবেন তিনি। যাকে কিছুতেই এড়ানো যাবে না তার সঙ্গে এমনটাই তো আমাদের করণীয়। তার জন্যেই তো তিনি অপেক্ষা করে আছেন। মৃত্যুকে এত সহজ শান্তভাবে আমি নিতে পারি না।

'কণ্ঠস্বর'-এর দশম ও একাদশ সংখ্যায় প্রচার-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছিল গালিব আহসান খান। গালিব ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজে আমার ছাত্র ছিল। গালিবের স্বভাব ছিল অদ্ভুত। ক্লাসের প্রথম বেঞ্চে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে একটানা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বক্তৃতা শুনে যেত ও। ওর এই অসীম ধৈর্যক্ষমতা আমাকে হতবাক করত। ক্লাসের পর ও চলে আসত আমার কাছে। নানান বিষয় নিয়ে বিরতিহীন প্রশ্ন করতে থাকত। একটি প্রশ্ন প্রায় অনিবার্যভাবেই করত : 'মহৎ বৃহৎ' কিছু করা যায় কীভাবে। আমিও অনিবার্যভাবেই উত্তর দিতাম : কাজ করে গেলে। বলতাম, কেউ যদি অন্তরের ভেতর 'মহৎ বৃহৎ' হয় তবে কাজ করে যেতে থাকলে তার কাজটাও মহৎ বৃহৎ হয়ে যাবে। কাজই যদি না থাকে তবে মহৎ বৃহৎ কেন, অধম অক্ষমই বা হওয়ার উপায় কী?

একসময় আমি বুঝতে পারলাম, গালিবের তৃষ্ণা দর্শনের দিকে। ওকে খুলেই বললাম কথাটা। বললাম, জীবনের যেসব প্রশ্নের উত্তর তুমি খুঁজছ বিজ্ঞানের ভেতর তা তুমি পাবে না। তুমি দর্শনে ভর্তি হয়ে যাও।

ওকেও খুব আগ্রহী মনে হল। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরোলে ওকে নিয়ে গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সে-সময়কার অধ্যক্ষ, দার্শনিক ড. গোবিন্দ দেবের কাছে। সে-সময় ফ্যাকাল্টি পাল্টে অন্যকোনো ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি হওয়ার নিয়ম ছিল না। এজন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অনুমোদন লাগত। ড. দেব আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমার আবেদন শুনে চশমার ফাঁকে দুষ্টু হেসে বললেন : 'ঠিক আছে, বলছ যখন ব্যবস্থা করে দেব।' ব্যক্তিগতভাবে উপাচার্যের কাছে গিয়ে তিনি গালিবের অনুমোদন নিয়ে এলেন।

দর্শন গালিবের প্রকৃতির খুবই অনুকূল হয়েছিল। এখন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের

অধ্যাপক। আমার ধারণা, আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-গুটিকয় মানুষ দর্শনের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাভাবনা করছেন গালিব তাঁদের একজন।

কিছুদিনের জন্যে আমার ছোটভাই, আল মনসুরও সাহায্য করেছিল পত্রিকার কাজে। কিন্তু এদের কেউই খুব বেশিদিন টেকেনি। আসলে এদের কেউই মন-মানসিকতার দিক থেকে এই ধরনের পরিশ্রমী ও 'স্থূল' কাজের উপযোগী ছিল না। আমি নিজেও ছিলাম না। তাই কোনোকিছুর কূলকিনারা না-পেয়ে, লাভ নেই জেনেও, নিরুপায় আর অসহায় হয়ে যখন যাকে সামনে পেতাম তাকেই আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করতাম।

১০

'কণ্ঠস্বর' বেরোয় ১৯৬৫ সালে, চলে ১৯৭৬ পর্যন্ত। কাজেই ষাট দশকের লেখকদের প্রায় সবাই সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই পত্রিকায় লিখেছিল। সত্তর দশকেও এসেছিল অনেকে। সে-দলের আকারও ছোট নয়। এই বিশাল লেখকদলের কতজনই তো আজ স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে।

আমার এককালের ছাত্র ইফতেখার সেদিন কথায় কথায় বলল : 'কিছুদিন আগে 'কণ্ঠস্বর'-এর পৃষ্ঠা ওল্টাতে গিয়ে বেশকিছু অদ্ভুত লেখকের নাম চোখে পড়ল, যারা 'কণ্ঠস্বর'-এর শেষদিন পর্যন্ত এর পাতায় লিখেছে। কেউই তো আজ এদের চেনে না। কারা এরা?' আমি তাকে বললাম, 'একদিন আমাদের কাউকেই কেউ চিনবে না, ইফতেখার। দেখছ না তিনটা দশকের ব্যবধানে আমাদের কত লেখক এরই মধ্যে কেমন অপরিচিত হয়ে গেছে। এভাবে আর মাত্র কয়েকটা দশক, দেখো, আমাদের সবাইকেই কীভাবে পুরোপুরি অপরিচিত করে দেয়; আমাদের এত মানুষের এত বিরাট এই দল, এতসব উদ্দীপনা, মত্ততা, উন্মাদনা পাঠকের কাছে মৃত আর অচেনা হয়ে যায়।'

সবার পরিচিত বলে যাদের নাম আজ কত সহজে আর অবলীলায় আমরা উচ্চারণ করছি (যেন সবার তারা কত পরিচিত, কত চেনা) তারাও একদিন অপরিচিত কতকগুলো অচেনা নাম হয়ে যাবে। কে জানবে এরা সবাই একদিন ছিল এখানকার তরুণ-সাহিত্যের সবচেয়ে রক্তিম আর উজ্জ্বল মুখ—গাছ মাটি উপড়ে ফেলা একালের সাহিত্যের সব অদমিত কালবৈশাখীর ঝড়; রক্তে মাংসে জীবন্ত একদল উষ্ণ, তপ্ত, বিস্ফোরিত তরুণ! মহিম হালদার স্ট্রিটে 'মহিম' 'মহিম' বলে ডেকে প্রাণান্ত হলেও কেউ একদিন তাকে আর খুঁজে পাবে না। তখন করিবে গান সে কোন্ নতুন কবি তোমাদের ঘরে, আজি হতে শতবর্ষ পরে।

কী থাকে সত্যি সত্যি এই পৃথিবীতে? আমরা ভাবতে ভালোবাসি : থাকে। কিন্তু সত্যি সত্যি কী থাকে? যে থাকে সেই কি জানে যে সে আছে? তবু একদিন এখানে আমরা ছিলাম। আমাদের তারুণ্যে, প্রেমে আর রোমাঞ্চিত অস্তিত্বে এই জনপদকে উষ্ণ আর উচ্চকিত করে রেখেছিলাম, এতটুকু তো মিথ্যা নয়।

সংকট ও স্বস্তি

১

শুরু থেকেই 'কণ্ঠস্বর' ছিল মাসিক পত্রিকা। প্রথমে ত্রৈমাসিক হিসেবে বের করার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু কারো অনুমোদন পায়নি। না, না, তিন মাস অনেক সময়। এতদিন পর পর বেরোলে আমাদের আসল উদ্দীপনাটাই–যে হেজে যাবে। উৎসাহ নেতিয়ে পড়বে। তাছাড়া মাস না–পেরোতেই একটা তরতাজা নতুন সংখ্যার মুখ দেখার ফুর্তিটাই–যে আলাদা। নতুন রঙে, নতুন আঙ্গিকে, নতুন লেখার ডালি সাজিয়ে যখন একেকটা সংখ্যা আনকোরা আর রঙিন চেহারা নিয়ে এসে দাঁড়াবে—তার খুশি আর শিহরণের কি তুলনা আছে? এর পাশে ত্রৈমাসিক পত্রিকা তো একটা গোমরামুখো মালগাড়ি। একগাদা মালপত্র বোঝাই হয়ে লম্বা তিন মাস পর এল তো আর স্টেশন ছাড়ার নাম পর্যন্ত নেই। আর বস্তা বস্তা এতসব লেখা পড়া যায় নাকি একবারে? কত ভালো ভালো লেখা স্রেফ গাদা–গাদা জিনিশপত্রের নিচে পড়ে থাকে বলেই তো অনেক সময় চোখে পড়ে না।

১৯৬৭ সাল 'কণ্ঠস্বর'–এর জন্য সত্যিই সুদিন। দশটা সংখ্যা হাতে নিয়ে বিজয়ীর মতো দাঁড়িয়ে রইল সে। কিন্তু এই সাফল্যের সঙ্গে একটু একটু করে ফুরিয়ে আসতে লাগলাম আমি। প্রতিটা সংখ্যার সঙ্গে যেন নেতিয়ে যেতে লাগলাম। একসময় এমন হল যে একে চালিয়ে যাবার শক্তিই যেন আর রইল না ভেতরে। সেদিন আমার মতো একজন ছাব্বিশ বছরের তরুণের পক্ষে এই পত্রিকার দশটি সংখ্যা একটানা বের করে যাওয়া–যে কতটা কঠিন ছিল তা আজকের এই কম্পিউটার কম্পোজ আর অফসেট ছাপা আর অঢেল বিজ্ঞাপনের যুগের লিটন ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের বলে বোঝানো সত্যি সত্যিই কঠিন।

সবদিক দেখে আমার হাত–পা ক্রমাগত ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। সত্যি ভয় এসে গেল ভেতরে। বুঝলাম আমি আর একে টানতে পারছি না। মন ভেঙে পড়ছে। শরীর অবসন্ন। মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না। এখন কী হবে? তা হলে কি আর্থিক সংকট আর আমার করুণ অবস্থার কারণে পত্রিকা শেষ হয়ে যাবে? কী করে একে বাঁচাই? কী করে এই বিপদ উৎরে পত্রিকাকে টিকিয়ে রাখি?

'কণ্ঠস্বর'–এর আর্থিক ও আমার মানসিক অবস্থা যখন পুরোপুরি ভেঙে পড়ার মুখে, ঠিক সেই সময় সত্যি সত্যি আশান্বিত হওয়ার মতো একটা খবর পেলাম। খবরটা আমাকে আমার ম্রিয়মাণ অবস্থা থেকে সেরে উঠতে সাহায্য করল। একদিন বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে বসে আছি, এমন সময় আলমগীর কবিরের পক্ষ থেকে দুজন তরুণ এসে জানাল, এলিফ্যান্ট রোডের কাম্পালা রেস্টুরেন্টে তিনি একদিন আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমাদের পত্রিকার বিভিন্ন সমস্যার কথা তিনি শুনেছেন। পত্রিকা চালিয়ে যাবার ব্যাপারে তিনি আমাদের সাহায্য করতে আগ্রহী। দেখা করার সম্ভাব্য সময়টাও তারা আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেল।

আলমগীর কবির তখন ঢাকার তরুণমহলে, বিশেষ করে নবীন চলচ্চিত্র মহলে নতুন আশার সঞ্চার করেছেন। অনেকদিন লন্ডনে বসবাস শেষে তিনি তখন সদ্য ঢাকায় ফিরে এখানকার ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তাঁর স্বপ্ন আন্তর্জাতিক মানের বাংলা আর্ট ফিল্ম তৈরি করা, এদেশে সুস্থ ও উন্নত চলচ্চিত্র–আন্দোলন গড়ে তোলা।

দুটো ধারাতেই একসময় সাফল্য এসেছিল তাঁর। পরবর্তীতে তিনি–যে শুধু শিল্পগুণসম্পন্ন আর অনবদ্য কিছু চলচ্চিত্রই নির্মাণ করেছিলেন তাই নয়, স্বাধীনতা–উত্তরকালে আমাদের দেশে উন্নত ও সুস্থ চলচ্চিত্র–আন্দোলনের ক্ষেত্রেও পথিকৃতের ভূমিকা রেখেছিলেন ।

আলমগীর কবির আমাদের সাহায্য করতে চান শুনে খুশিতে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। কাম্পালা রেস্টুরেন্টে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হল। তাঁর কথাও আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করল। শারীরিক মানসিকভাবে বলিষ্ঠ মানুষ ছিলেন তিনি। পত্রিকার ব্যাপারটাও নিলেন বলিষ্ঠতার সঙ্গেই। পত্রিকাকে বাঁচানো ও স্বনির্ভর করে তোলার ওপর তিনি জোর দিলেন। বললেন, দরকারে এজন্যে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আর পত্রিকাকে কেবল বাঁচালেই চলবে না, এর আর্থিক অবস্থা ভালো করতে হবে, প্রচারসংখ্যা বাড়াতে হবে। সবদিক থেকে এর ভেতর শক্তি আনা দরকার। পরামর্শ হিসেবে তিনি বললেন, সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রথমেই হাজার দুয়েক বার্ষিক বা ষান্মাসিক গ্রাহক তৈরি করা যেতে পারে। এতে স্থায়ী পাঠক যেমন বাড়বে তেমনি ফান্ডে বেশকিছু টাকা এসে যাবে। ফলে পত্রিকার স্থায়িত্ব আসবে। লেখক, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাইকে দিয়ে চেনা–অচেনা, পরিচিত–অপরিচিতদের ধরতে থাকলে কাজটা করে ফেলা কঠিন নয়। দ্বিতীয়ত, প্রচুর বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে হবে। তবে বিজ্ঞাপনের কাজটা সহজ নয়। রাখঢাক না করে তিনি আমাকে বললেন : 'অধিকাংশ বিজ্ঞাপনদাতা আপনাকে ততটা চেনে না। ওরা আমাকে হয়তো চেনে। কাজেই আমি যদি বিজ্ঞাপনের কাজটা হাতে নিই তবে হয়তো অনেক বেশি বিজ্ঞাপন আনতে পারব।' কথার শেষে আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'টাকা নিয়ে ভাবাভাবি করবেন না। ও দায়িত্ব আমার। লাগলে আমি নিজে দিয়ে হলেও পত্রিকা চালাব। আপনি নিশ্চিন্তমনে শুধু উন্নতমানের রুচিশীল একটি পত্রিকা বের করুন। তবে শুধু সাহিত্য

রাখা ঠিক হবে না। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের তরুণরা আজকাল ভাবছে। যেমন চিত্রকলা, ফিল্ম, সমাজ, স্থাপত্য। এসব লেখাও এর মধ্যে রাখা উচিত। আপনার অসুবিধা হলে ওসব লেখা জোগাড় করার ভারও আমি নিতে পারি।'

আর্থিক বিষয়টা আমি কোনোদিনই বুঝি না—না নিজের ব্যাপারে, না অন্যের। এমন চমৎকারভাবে এই পত্রিকা নিয়ে যে ভাবা যেতে পারে তা আমার মাথাতেই আসেনি। নিজেকে খুবই আশ্বস্ত আর নিশ্চিন্ত মনে হল। আর্থিক দায়দায়িত্ব থেকে আমি এখন মুক্ত। টাকাপয়সার অমানুষিক বোঝা আমাকে আর বইতে হবে না। আমার কাজ শুধু একটি : মানসম্পন্ন একটি পত্রিকা বের করে যাওয়া। অবশ্যি কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করার সামান্য দায়িত্ব রয়ে গেল এই যা। পত্রিকার ব্যবসা, বিজ্ঞাপন, আর্থিক ঝুটঝামেলা—এসব কিছুর দায়দায়িত্ব তাঁর। দু–বছর ধরে একটানা এই যন্ত্রণা পোহাতে পোহাতে আমি পুরোপুরি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, বিজ্ঞাপন যা আসছিল পত্রিকার পেছনে খরচ হচ্ছিল তার থেকে অনেক বেশি। ধারে কর্জে আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ সেই প্রস্তাব এসে দাঁড়ানোয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আদাজল খেয়ে লেগে গেলাম গ্রাহক জোগাড় করতে । ফল ফলল। মাসের শেষে প্রায় পাঁচ–শ গ্রাহক সংগ্রহ হয়ে গেল। সবকিছু ভালোভাবে না–দেখে বুঝে বড় ঝুঁকি নিতে সাহস করলাম না। তাই শুধু ষান্মাসিক গ্রাহকই করলাম, তার বেশি নয়। পত্রিকার প্রতি সংখ্যার দাম পঞ্চাশ পয়সা। তাই ছটি সংখ্যার জন্যে তিন টাকা আগাম দিতে অনেকেই আপত্তি করলেন না। আমাদের হাতে দেড় হাজার টাকার মতো এসে গেল। একটা ফুরফুরে ভাব এসে গেল মনের ভেতর।

কাম্পালা রেস্টুরেন্টের শর্তমতো তিনি পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হলেন, অফিস উঠে এল আমার বাসা থেকে তাঁর বাসায়, ৩৯ এলিফ্যান্ট রোডে। তাঁর অফিস–কাম–বাসার নেট–দিয়ে–ঘেরা বাইরের বারান্দার এককোণে একটা টেবিল আর গোটা–তিনেক চেয়ার ছিল, সেই জায়গাটাকে তিনি আমাদের সম্পাদকীয় দফতর হিসেবে ব্যবহারের জন্যে দিলেন। সেই চলনসই অফিসেই আমরা আমাদের বৈকালিক আসর জমিয়ে তুললাম।

পত্রিকার ছাপা এগোতে লাগল তরতর করে। কিন্তু পাঠকের চাঁদা দিয়ে তো শুধু পত্রিকা চলে না। তাছাড়া ঐ চাঁদা তো পত্রিকার আকারে তাদের ফিরিয়েও দিতে হবে একসময়। অথচ ঐ চাঁদা নেবার ফলে আমাদের একটা বাড়তি দায় দেখা দিয়েছে। আগে আমরা প্রতি সংখ্যা পত্রিকা ছাপতাম সাড়ে বারো–শ করে, তাতে খরচ পড়ত সাড়ে সাত–শ টাকা। এখন ছাপতে হবে আঠারো–উনিশ–শ, এতে খরচ পড়বে এক হাজার থেকে এগারো–শ টাকা। এর মধ্যে চাঁদা বাবদ সংখ্যাপ্রতি হাতে এসেছে মাত্র দু–শ টাকা। অর্থাৎ সংখ্যাপ্রতি সাত–আট–শ টাকার কম বিজ্ঞাপন পেলে পত্রিকা কিছুতেই টিকবে না। আর যে–ধরনের সচ্ছলতার স্বপ্ন আমরা এরই মধ্যে দেখতে শুরু করেছি সেভাবে চালাতে হলে দেড় হাজার টাকার বিজ্ঞাপন তো একেবারেই জরুরি।

বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কথা আমার নয়, এ তিনি দেবেন। কিন্তু দেখলাম তাঁর কাছ

থেকে তেমন কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মনটা বিমর্ষ হয়ে গেল। আমি প্রায় প্রতিদিন বিকেলে তাঁর বাসায় বসি, নানা কাজে তিনি বাইরে থাকেন বলে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না। নিরুপায় হয়ে দিন–তিনেক চেষ্টার পর একদিন সকালে তাঁকে বাসায় গিয়ে বিজ্ঞাপনের জন্য ধরলাম। পত্রিকা তখন ছাপা হয়ে গেছে। তিনি জানালেন, খুব ব্যস্ত, দুয়েকদিনের মধ্যেই 'মুভ' করবেন।

কিন্তু সপ্তাহ চলে যায়, তাঁর কাছ থেকে কোনো খবর নেই। নিরুপায় হয়ে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করলাম। তিনি আমাকে পঁচাত্তর টাকার একটা ফিল্মের বিজ্ঞাপন দিয়ে বললেন,তাঁর পক্ষে এর চেয়ে বেশি এই সংখ্যায় জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি যেন এ–সংখ্যাটা গ্রাহক–চাঁদা দিয়ে কোনোরকমে বের করে নিই। পরের সংখ্যা থেকে উনি দেখবেন।

তাঁর কথা শুনে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। হলাম দুটো কারণে। এক, কোনো সংখ্যায় বিজ্ঞাপন না–থাকার অর্থ একটাই : পরের সংখ্যায় গিয়ে পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে পড়া। দ্বিতীয়ত, গ্রাহক–চাঁদাও যদি আমরা খুইয়ে বসি তবে তো আমাদের হাত একেবারেই খালি হয়ে যাবে, তখন পরের সংখ্যা বের করব কী করে আর গ্রাহকদেরই বা ছ'টি সংখ্যা দেব কী করে? সবকিছু সমেত শেষে ডুবে মরতে হবে। কাজেই অন্তত পাঁচ–ছ'শ টাকার বিজ্ঞাপন এ–সংখ্যার জন্য চাই–ই চাই। কথাটা তাঁকে বুঝিয়েও বললাম। তিনি খানিকটা ব্যথিত স্বরে বললেন : কথাই তো হয়েছে টাকার ঝামেলা আমার। আপনি অযথা দুশ্চিন্তা করছেন কেন? পত্রিকা বের করে দিন।

তাঁর কথায় আবার সাহস ফিরে এল। আমার হাতে আগের দেড়–শ টাকার বিজ্ঞাপন ছিল। সেইসঙ্গে তাঁর পঁচাত্তর টাকার বিজ্ঞাপন। সবসুদ্ধ সোয়া দু–শ টাকার বিজ্ঞাপন নিয়ে বের হল পত্রিকা। পত্রিকায় তাঁর নাম ছাপা হল ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে। গ্রাহক–চাঁদার প্রায় পুরোটাই লেগে গেল পত্রিকার পেছনে। পরের সংখ্যা ছাপার মতো কিছুই প্রায় আর হাতে রইল না।

এতে ফল যা হবার তাই হল। বিজ্ঞাপনের আয়ও নেই, গ্রাহক–চাঁদাও শেষ। ফলে পরের সংখ্যা বেরোবে কি বেরোবে না তা তাঁর অনুগ্রহের ব্যাপার হয়ে পড়ল। অথচ তাঁকেও তেমন সিরিয়াস মনে হচ্ছে না। দিনের পর দিন যায়, বিজ্ঞাপনের কোনো কথা নেই। দেখা হলেও সবসময় ব্যস্ততার কথা বলেন। হয়তো সত্যিই ব্যস্ত। এদিকে লেখা চলে গেছে প্রেসে, কাগজের অভাবে ছাপা শুরু হতে পারছে না। আমি নার্ভাস হয়ে পড়লাম। উপায়হীন হয়ে একদিন বললাম : কিছু টাকার ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতেই হবে। ছাপার কাজটা অন্তত চালিয়ে যাই।

উনি বললেন : আমার একটু টানাটানি যাচ্ছে। এখন পেরে উঠছি না।

তাঁর কথায় আমার হাত পা জমে এল। তাহলে কী হবে এখন? তিনি টাকার ব্যবস্থা না করলে পত্রিকা বেরোবে কী করে। এ দায়িত্ব তো তাঁর।

আমি দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করি, কিন্তু তিনি কিছুই করেন না। আজকাল কথা বলতে গেলে তাঁকে কিছুটা বিরক্ত বলেও মনে হয়। টানাটানির

কারণে কোনো টাকাও তিনি দিতে পারছেন না। এভাবে মাসের পর মাস চলে যেতে লাগল। তাঁর কাছে যেতে-যেতে ক্লান্ত হয়ে উঠলাম। নিজেকে খুব ছোট মনে হতে লাগল। এদিকে গ্রাহকদের পত্রিকা দিতে না-পারায় রাস্তায় ঘাটে তাদের কাছ থেকে কথা শুনতে হচ্ছে। তাদের টাকা-যে ফিরিয়ে দেব এমন সঙ্গতিও আমার নেই। যে-পত্রিকার এক বছরে দশটি সংখ্যা বের হয়েছে—পাঁচমাস পার হয়ে যায় তার একটি সংখ্যা বের হল না। যে-পত্রিকা রমরমা হয়ে উঠবে, তাকে আজ তিলে তিলে শেষ হয়ে যেতে হচ্ছে! আমার মনের ভেতরটা অসহায় যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। আমাদের দুঃখদৈন্যই তো ছিল এর চেয়ে ভালো। এ কোন্ মরুভূমির মধ্যে এসে পড়লাম? খুবই বিপন্ন মনে হতে লাগল নিজেকে।

একদিন সোজাসুজিভাবেই কথাটা পাড়লাম তাঁর কাছে। বললাম : আপনি বিজ্ঞাপন জোগাড় করে দিচ্ছেন না, টাকাপয়সার কোনো ব্যবস্থা করছেন না। পত্রিকা তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে!

আমার কথা উনি শান্তভাবে শুনলেন। কথা শেষ হলে হেসে বললেন : আসল কথা কী জানেন? এসব সাহিত্য-সংস্কৃতির পত্রিকা বের করা বিস্তর ঝামেলা আর যোগাড়যন্ত্রের ব্যাপার। আমার মনে হয় এটা আপনি হয়তো শেষপর্যন্ত পেরে উঠবেন না। এর চেয়ে এক কাজ করুন। আমাকেই বরং সম্পাদক করে দিন। আমি খাটাখাটনি করে এটাকে দাঁড় করিয়ে নেব। তবে আমি সম্পাদক হলে আপনি-যে থাকবেন না, তা কিন্তু নয়। আপনিও থাকবেন। এখন যেমন রয়েছেন, লেখকদের নিয়ে আছেন, লেখালেখির দিকটা দেখছেন—তেমনিভাবে থাকবেন। আপনি না-থাকলে কিন্তু আমি কিছুতেই পেরে উঠব না।

তাঁর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মাথার ওপর বাজ পড়লেও হয়তো আমি এতটা হতবিহ্বল হতাম না। নিজের কানকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তখনো কাম্পালা রেস্টুরেন্টের তাঁর প্রতিটা কথা, উৎসাহ, আশ্বাস আমার কানে বাজছিল। বয়সের দিক থেকে তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বড়। বড়ভাইয়ের মতো। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করেছি। আস্থায় নিয়েছি। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে কথাগুলো উনিই আমাকে বলছেন। উল্টাপাল্টা নানান কথা মনে এসে ভিড় করতে লাগল। তবে কি এতদিনের এইসব কথা আর কাজ সবই চিন্তা-পরিকল্পনা করে তিনি করেছিলেন? এই পত্রিকার সম্পাদক হওয়াই কি ছিল লক্ষ্য? তাই কি গ্রাহকদের টাকা খরচ করিয়ে, বিজ্ঞাপন বা টাকা কোনোকিছু না দিয়ে ধীরে ধীরে আমাকে নিঃশেষের এমন এক প্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছেন যাতে আমি নিরুপায় হয়ে তাঁর প্রস্তাবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হই! আমার এসব ভাবনা সত্য না হলেই আমি খুশি হইব। দুঃস্বপ্ন হলেই বেঁচে যাই। আমার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। তাহলে আমরা কোথায় যাব? কার ওপর নির্ভর করব?

আমি আস্তে আস্তে উঠে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। যন্ত্রণার ক্ষত থেকে আমার বুকের ভেতর তখন রক্তক্ষরণ হচ্ছে। পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটার জন্য এ-কাহিনীর

অবতারণা আমি করিনি। এর চেয়ে অনেক বিপজ্জনক ঘটনার সামনে জীবনে আমি পড়েছি। গল্পটা করলাম আমার সেই সময়কার করুণ অবস্থাটা বোঝানোর জন্যে, শুধু এটুকু তুলে ধরতে যে, ঘটনাটার চাপে আমাদের পুরো অগ্রগতিটাই কীভাবে তখন ছিন্নভিন্ন হবার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। আমি আজও বুঝতে পারি না, কেন তিনি সেদিন অমনটা করেছিলেন। তিনি তো ফিল্মের মানুষ, সাহিত্যের নন। তাহলে কেন সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদক হবার জন্যে তিনি উৎসাহী হয়েছিলেন। নাকি কেউ তাঁকে এ-ব্যাপারে প্ররোচিত করেছিল? তা হওয়াও অসম্ভব নয়, এ-ধরনের কিছু মানুষ তখন ছিল তাঁর আশেপাশে। পুরো ব্যাপারটা আজও আমার কাছে রহস্যময়। তবে এই পত্রিকার একটা ব্যাপার জানা না-থাকায় তিনি একটা ছোট্ট ভুল করে ফেলেছিলেন। তিনি ঠিক বুঝতে পারেননি এই পত্রিকাটি ওভাবে নিয়ে নেওয়া কারো পক্ষেই সেদিন সম্ভব ছিল না। এর কারণে আমাদের এই পত্রিকায় মালিক একজন ছিল না, ছিল অনেকে। এর মধ্যে ছিল গোষ্ঠীবদ্ধতার রক্ত, তারুণ্যের সংঘবদ্ধতা; একাগ্রতা আর ভালোবাসায় তা ছিল মুষ্টিবদ্ধ হাতের মতোই উদ্যত।

ঘটনাটা নিয়ে আমাদের সম্পর্কের যে-অবনতি ঘটেছিল তা খুব বেশিদিন টেকেনি। টেলিভিশনে আমার সাফল্যের পর এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তৈরি হয়ে যাবার পর আমাদের সম্পর্কের আবার উন্নতি ঘটে। নিজেই তিনি ব্যাপারটা মিটমাট করে ফেলেন। অনেকদিন চলে যাওয়ায় আমার মন থেকেও আগের দিনের তিক্ত স্মৃতি মুছে গিয়েছিল। তাই সম্পর্ক ভালো হতে দেরি লাগেনি। আশির দশকের শুরুতে তাঁর ইংরেজি চলচ্চিত্র পত্রিকা 'সিকোয়েন্স'র পক্ষ থেকে আমাকে তিনি টেলিভিশনের শ্রেষ্ঠ উপস্থাপক হিসেবে পুরস্কারও দিয়েছিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষ করে আমরা এতটাই কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম যে, কোনোকালে আমাদের ভেতরে-যে মনান্তর ঘটেছিল, ব্যাপারটা আমরা প্রায় পুরোপুরি ভুলেই গিয়েছিলাম।

২

এই বেদনাদায়ক পর্ব চুকে যেতেই আবার শুরু হল সেই আগের জীবন, প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিজ্ঞাপনের জন্য দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ানোর আত্মক্ষয়ী অধ্যায়। তবে এবার ব্যাপারটা আগের চেয়েও অনেক কষ্টকর—মোপাসাঁর 'নেকলেস' গল্পের হীরের নেকলেস হারিয়ে ফেলা সেই দুঃখী-দম্পতির মতো। একটা ছোট্ট ভুলের খেসারত দিতে জীবনের সব দীপ্তি আনন্দ শেষ হবার উপক্রম। আগের চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞাপন চাই এখন। আগে বারো-শ পত্রিকার জন্যে চার-পাঁচ-শ টাকার বিজ্ঞাপন পেলেই চলে যেত, এখন আঠারো-উনিশ-শ পত্রিকার জন্যে পেতে হবে অন্তত সাত-আট-শ টাকার বিজ্ঞাপন। ষাটের দশকে মরুভূমির মতো এই

দেশে এত বিজ্ঞাপন পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। সে-সময়কার সবচেয়ে বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলোও এত বিজ্ঞাপন পেতে হিমশিম খেত।

আমি পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়লাম। সারা শরীরে আগের মতোই আবার একধরনের অসাড়তা নেমে এল। কীভাবে এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাব বুঝে উঠতে পারলাম না।

লেখকদের মধ্যে মান্নানই তখন আমার সবচেয়ে কাছের। ও কবি, কথাশিল্পী— সম্পাদনার এইসব স্থূল আর বৈষয়িক কাজ ওর সহজাত নয়। তবু মনে হল, ও পারলেও পারতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে হয়তো আর কোনোদিনই এই পত্রিকা চালানো সম্ভব হবে না। একদিন ওকে বাসায় ডেকে আর্তস্বরে পত্রিকার দায়িত্ব নিয়ে নিতে অনুরোধ করলাম। বললাম : 'আমি পেছন থেকে সব ব্যাপারে সাহায্য করব। তুমি শুধু সম্পাদনার দায়িত্বটা নাও।' মান্নান আমার সেদিনের গভীর আর্তনাদের কথাটা আজও মাঝে মাঝে স্মরণ করে।

চারপাশে রটে গিয়েছিল 'কণ্ঠস্বর' বন্ধ হয়ে গেছে। লেখকেরা এ-ব্যাপারে প্রতিবাদ শুরু করল। অনেকেই এগিয়ে এসে সাহায্য করতে চাইল। সে-সময় মহাদেব সাহা থাকত রাজশাহীতে, হয়তো তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। মাঝে মাঝেই আমাকে ও চিঠি লিখত। 'কণ্ঠস্বর' বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শুনে গভীর দুঃখ থেকে ও আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল। সে-চিঠি ছিল সত্যিকার আর্তনাদ আর বেদনায় ভরা। জীবনের সব ব্যক্তিগত স্মৃতির মতো সে-চিঠিও আজ হারিয়ে গেছে। নাহলে পাঠককে বোঝানো যেত দেশের তরুণ-লেখকদের কাছে 'কণ্ঠস্বর' তখন আত্মার কতখানি ভেতরকার জিনিশ ছিল।

চারপাশের সবার কাছ থেকে 'কণ্ঠস্বর' চালিয়ে যাবার ব্যাপারে তাগিদ আসতে লাগল। কিন্তু 'কণ্ঠস্বর'-এর ব্যাপারে আমার ভেঙে-পড়া স্নায়ুকে কিছুতেই আর সারিয়ে তুলতে পারলাম না।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ আগের ঘটনাটার মতো এমন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল যে আমি আবার উঠে দাঁড়ানোর শক্তি ফিরে পেলাম। ঘটনাটা একেবারেই অদ্ভুত। হয়তো আগের ঘটনাটার চাইতেও অদ্ভুত।

৩

আমি দেখেছি প্রকৃতির মধ্যে একটা অদ্ভুত ভারসাম্য আছে। একদিকের পাল্লা কোনো কারণে ভারী হয়ে গেলে অন্যদিকে নতুন ওজন এসে দুদিকের ভেতরে সমতা এনে দেয়। কোনো জায়গার বাতাস গরম হয়ে উপরে উঠে গেলে চারদিক থেকে সহানুভূতিশীল বাতাস ছুটে এসে খালি জায়গা ভরাট করে ফেলে। হয়তো এমনি এক ভারসাম্যের ঘটনা এটি।

যেসব প্রেসকে কেন্দ্র করে সে-সময় ঢাকার সাহিত্য-আড্ডা জমজমাট, সিদ্দিক বাজারের শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস তার একটি। প্রেসটি ছিল ফুলবাড়িয়া স্টেশনের (তখনকার ঢাকার রেলস্টেশন) ঠিক পেছনেই। আমাদের তরুণ-লেখকদের অনেকেরই বেশকিছু বই, সংকলন তখন সেখান থেকে নিয়মিত বেরোচ্ছে; আর সেসবকে উপলক্ষ করে সেখানে সরগরম আসর জমছে। প্রেসটির প্রায় গোটাটাই টিনের চালের নিচে, তার পুরোটা জুড়ে কম্পোজিটাররা নিমগ্নভাবে কম্পোজ করে চলছে। প্রেসের একপাশে একটা ঝুলকালিমাখা সেকেলে ডিমাই মেশিন। থেকে-থেকে নীরবতা ভেঙে মেশিনটা অসুস্থের মতো আর্তনাদ করে চলতে শুরু করেই আবার কিছুক্ষণের মধ্যে থেমে যায়। মেশিন খারাপ বলে থামে না, থামে ছাপার অর্ডার অল্প বলে। এই প্রেসে লাখ-লাখ ছাপার অর্ডার আসে কম। অধিকাংশ অর্ডারই বই বা পত্রপত্রিকার। এগুলোর কোনোটার ছাপাই এক-দু হাজারের বেশি নয়।

প্রেসের অফিসরুমটায় প্রেসমালিক শফিক খানের টেবিল ঘিরে জমজমাট আড্ডা চলে প্রায় নিয়মিত। তরুণ লেখক, নবীন সম্পাদক, রাজনৈতিক কর্মী, মার্কসবাদী তাত্ত্বিক, এমনি নানান ধরনের উঠতি বুদ্ধিজীবীর উচ্চকণ্ঠ তর্ক-বিতর্ক, রস-রসিকতায় জায়গাটা গমগম করে। শফিক খান মৃদুভাষী সহৃদয় মানুষ, মুখে স্মিত সরল হাসি নিয়ে সবার কথা উপভোগ করেন। তর্ক ঝিমিয়ে পড়ছে দেখলে দুয়েকটা ফোড়ন কেটে তর্কের পরিবেশটাকে আবার তপ্ত করে তোলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে সাংস্কৃতিক কর্মীদের সঙ্গেই ছিল তাঁর ওঠাবসা। পরিবারের প্রয়োজনে প্রেসের দায়িত্ব ঘাড়ে নিলেও ঐ জীবনটাকে ছেড়ে দিতে তিনি রাজি নন। তাই প্রেসটাকেই একটা সরস আড্ডার জায়গা করে তুলেছেন তিনি। আপ্যায়নের নিয়মটাও এখানে বেশ উদার। প্রেসে আসার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাগতের সামনে এককাপ ধূমায়িত চা এসে যাবে এবং মাঝে মাঝে গরম শিঙাড়া আর চানাচুরে সেই পর্বের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে — এটাই অলিখিত নিয়ম। এর জন্যে আলাদা হুকুম-হাকামের রেওয়াজ নেই।

আমাদের দুরবস্থার কথা সবার মতো শফিক খানও শুনেছিলেন। একদিন আমার বিমর্ষ অবস্থা দেখে বললেন : চলেন, বাইরে থেকে ঘুরে আসি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাহাদুর শাহ পার্ক লাগোয়া একটা ছিমছাম রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলেন। রেস্টুরেন্টে অতীত কথাবার্তার স্মৃতি আমার সুখকর নয়। আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু ততক্ষণে শফিক খানের অর্ডারমতো চিকেন ফ্রাই এসে গিয়েছিল। তাই বসে পড়তে হল। খাবারের তাজা স্বাদে মনটা চাঙা হয়ে উঠলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : পত্রিকা বের করতে আপনারা আটকে যাচ্ছেন কোথায় বলেন তো!

বললাম : কাগজের দাম মোটামুটি ম্যানেজ হচ্ছে, কিন্তু প্রেসের টাকা কিছুতেই জোগাড় করে উঠতে পারছি না।

উনি কথা বাড়ালেন না, সরাসরি বললেন : ছাপার দায়িত্বটা যদি আমি নিই,তাহলে কি পত্রিকা নিয়মিত করতে পারবেন?

হঠাৎ এভাবে ছাপার দায়িত্ব নিতে তিনি এগিয়ে আসবেন এ কল্পনারও বাইরে। কিছুক্ষণের জন্যে কথা হারিয়ে ফেললাম। সুস্থির হলে বললাম : ছাপার সুরাহা হলে তো অসুবিধা থাকে না।

উনি বললেন : তাহলে আমিই নিচ্ছি দায়িত্বটা। আমার প্রেস খুব ছোট, কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে কম্পোজ ধরিয়ে কাজ তুলে আনতে অসুবিধা হবে না।

শফিক খানকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার ছিল না। দিলামও না। আমার গলার স্বর আটকে গিয়ে চোখের কোনায় পানি এসে গেল। পরের সংখ্যাতেই প্রেস পাল্টে চলে এলাম শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কসে। আমার প্রস্তাবমতো শফিক খান হলেন সহকারী সম্পাদক।

আমাদের সেই দুর্দিনে পত্রিকাটার বেঁচে-থাকার গুরুত্বটা তিনি-যে এত আন্তরিকভাবে অনুভব করেছিলেন সেজন্য আজও তার কাছে কৃতজ্ঞবোধ করি। সেদিন তিনি এগিয়ে না এলে হয়তো ঐ বিপর্যয় থেকে পত্রিকাকে কিছুতেই টেনে তোলা যেত না।

ষষ্ঠ খণ্ড

অশান্ত কালপর্ব

১

শফিক খানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কয়েকটা সংখ্যা বেরোতে-না-বেরোতেই এসে গেল উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। জাতীয়তাবাদী আবেগে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ উনসত্তরের দু-দুটো মাস। এই অভ্যুত্থানের বীজ ভেতরে-ভেতরে অঙ্কুরিত হচ্ছিল অনেক দিন থেকেই। ধরতে গেলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই। অসন্তোষের কারণ স্পষ্ট : পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ। এই শোষণের অবসানের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয়দফা দাবি উত্থাপন করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করলে পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খান সরকারের কাছে এ-দাবি চিহ্নিত হয় সরাসরি দেশদ্রোহিতা হিসেবে। আইয়ুব খান বানোয়াট আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। শুরু হয় তাঁর বিচার। ব্যাপারটাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয় ও এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু হয়ে যায়। ১৯৬৯-এর ১৭ জানুয়ারির পর থেকে এই আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং ২০ জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদের মৃত্যুর পর এই আন্দোলন উত্তাল গণআন্দোলনে রূপ নিয়ে প্রমত্ত হয়ে ওঠে। আইয়ুব সরকার পুলিশ, ই.পি.আর. ও সেনাবাহিনী নামিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত এই গণআন্দোলনকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু মতিউর, সার্জেন্ট জহুরুল হক, ড. জোহার মতো অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর ভেতর দিয়ে এই গণরোষ সর্বপ্লাবী বন্যার মতো প্রমত্ত হয়ে ওঠে।

পূর্ব পাকিস্তানের এই আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণও জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ওয়ালী খানের নেতৃত্বে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে। এই মিলিত আন্দোলনের মুখে লৌহমানব আইয়ুবের এগারো বছরের একনায়কতন্ত্রী শাসনের ভিত ভেঙে পড়ে এবং সামরিক অভ্যুত্থানের মুখে মাত্র দু-মাসের মধ্যে তাঁর পতন ঘটে। তাঁকে বিদায় করে নতুন সামরিক শাসক হিসেবে আবির্ভূত হন জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

মোটামুটি এই হল উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কাহিনী। এই আন্দোলনের মতো এতবড় গণঅভ্যুত্থান এর আগে এদেশে কখনো ঘটেনি। কেবল ঢাকা নয়, সারাদেশই তখন উত্তেজিত, উত্তাল। দেশের প্রায় প্রতিটা জায়গায় জেগে উঠছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ আর গণজোয়ার। মিছিল, মিটিং, টিয়ার গ্যাস, গুলি, কারফিউ, কারফিউ-ভাঙা মানুষের বাঁধভাঙা উন্মত্ততা, মানুষের বীরোচিত আত্মদান—এমনি অনেক ঘটনা আর উত্তেজনায় টানটান হয়েছিল দু-দুটো মাস। মনে হচ্ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধের এক স্বল্পস্থায়ী পূর্বপ্রস্তুতি চলছে যেন সেই দেশকালে। মিছিল, সংঘর্ষ আর আগুনের লেলিহান শিখা ঢাকা মহানগরীকে উন্মাতাল করে রেখেছে দিনের পর দিন। আগুনে, মৃত্যুতে,উদ্দীপনায়, সংঘর্ষে দিগ্বিদিকহীন সারা দেশবাসীর জীবন। নির্মলেন্দু গুণ সেদিন চমৎকারভাবেই লিখেছিলেন :

আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।

কেবল মাটির গ্লোবেই নয়, আমাদের সবার রক্তে তখন সেই দাউ দাউ আগুন।

২

দীর্ঘ এগারো বছরের আইয়ুবী সামরিকতার স্থবিরতা কাটিয়ে জাতি যেন নতুন করে তার আদিম মত্ততা ফিরে পেয়েছে। সারাদেশ জাতীয়তাবাদী উত্তেজনায় কাঁপছে। এই রক্তযুগান্তরের হাওয়া সাহিত্যের চৌহদ্দিকেও মাতিয়ে তুলল। আবহমানের দেশের সঙ্গে একাত্মতা, স্বাজাত্যানুভূতি, জাতীয় মুক্তির স্বপ্ন, শোষকের প্রতি ঘৃণা, দেশমাতৃকার স্নিগ্ধ গভীর রূপ, দেশের জন্য বেদনামদির অনুভূতি—এই আবেগগুলো সাহিত্যকে সজীব করে তুলল। মোটকথা অনেকদিন পর একটা নতুন শক্তিশালী বিষয় পেল আমাদের সাহিত্য, যার নাম দেশপ্রেম। পেল মানে এ নয় যে এর আগে দেশপ্রেম এখানকার সাহিত্যে ছিল না। বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে প্রেরণা পেয়ে পঞ্চাশের দশকেই দেশপ্রেম, ভাষাপ্রেম আমাদের সাহিত্যের একটি সম্পন্ন ধারার মর্যাদা পেয়েছিল। আল মাহমুদ তাঁর 'সোনালি কাবিন'-এ এই জাতির বলিষ্ঠ ও নৃতাত্ত্বিক আদিমতাকে কবিতার বিষয় করে তুলে এই দেশপ্রেমকে নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন মুনীর চৌধুরী, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ, আবদুর গাফফার চৌধুরী। কে নয়? তবু উনসত্তর-পরবর্তী দেশপ্রেম এত গুরুত্বপূর্ণ এজন্যে যে-উনসত্তরের পরের দশ বছরে আমাদের প্রায় প্রতিটি লেখকের হৃদয় এই চেতনায় প্রধানভাবে প্রজ্বলিত ছিল। দেশপ্রেম হয়ে উঠেছিল সবার নির্বিচার বিষয়বস্তু। এর পরের এক দশক কেবল নয়, আমার ধারণা, বায়ান্ন থেকে পঁচাত্তর হয়ে এখন পর্যন্ত—এই পঞ্চাশ বছরের আমাদের সাহিত্যের,

বিশেষ করে কবিতার, প্রধান উপজীব্য ও মুখ্য সাফল্য ঘটেছিল এই দেশপ্রেমমূলক লেখাতেই। বাংলাদেশের গত পঞ্চাশ বছরের কবিতার সবচেয়ে প্রবল ধারাও এটি।

অভ্যুত্থানের সময় থেকেই আমাদের কবিতা মিটিং, মিছিল, গুলি, মৃত্যু, শোভাযাত্রা, টিয়ার গ্যাস, আগুন আর বিপ্লবে ভরে উঠতে শুরু করে। ১৯৬৯-এর ২০ জানুয়ারি আসাদের নিহত হবার পর বিমূঢ়, ক্ষুব্ধ, শোকাহত লাখো মানুষ তার রক্তমাখা শার্ট লাঠির আগায় ঝুলিয়ে এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা বের করে। সেই মিছিল দেখে শামসুর রাহমান লেখেন তাঁর বিখ্যাত 'আসাদের শার্ট' কবিতাটি। তাঁর এই কবিতাটি অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের এখানকার সভা, সমিতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উদ্দীপ্তস্বরে পড়া হয়েছে। সাম্প্রতিক বিষয় শামসুর রাহমানকে সবসময় প্রাণিত করত। তাঁর কবিতায় আমাদের গত পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের জীবন্ত ইতিহাস বাঙ্ময় হয়ে আছে।

প্রথম থেকে আল মাহমুদের দেশাত্মবোধক কবিতায় দেশের সঙ্গে নিবিড় একাত্মতার অনুভূতি ওতপ্রোত ছিল। একটা মিষ্টি কিশোর-কবিতা তুলে ধরছি :

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুরবেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়?
বরকতের রক্ত।

হাজার যুগের সূর্যতাপে
জ্বলবে, এমন লাল যে,
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে
কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে!

প্রভাতফেরির মিছিল যাবে
ছড়াও ফুলের বন্যা
বিষাদগীতি গাইছে পথে
তিতুমিরের কন্যা।

চিনতে নাকি সোনার ছেলে
ক্ষুদিরামকে চিনতে?
বুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিল যে
মুক্ত বাতাস কিনতে?

পাহাড়তলীর মরণচূড়ায়
ঝাঁপ দিল যে অগ্নি,
ফেব্রুয়ারির শোকের বসন
পরল তারই ভগ্নী।

প্রভাতফেরি, প্রভাতফেরি
আমায় নেবে সঙ্গে,
বাংলা আমার বচন, আমি
জন্মেছি এই বঙ্গে॥

[একুশের কবিতা]

উনসত্তর সালের দিকে বাংলাদেশ ছিল বিস্তীর্ণ সবুজ এক গ্রামীণ পৃথিবীর নাম। নাগরিক সভ্যতা তখনও আজকের মতো ধাতব মাথা উঁচু করে এভাবে দেশজুড়ে দাঁড়িয়ে যায়নি। তখনও দেশপ্রেম মানে ছিল গ্রামবাংলার স্নিগ্ধ সুকান্ত রূপ, বাঙালি ও বাংলার শ্যামল নিসর্গের প্রতি ভালোবাসা। তার ভেতর মায়ের কোলের শান্তি ও নিবিড়তাকে অনুভব করা। রবীন্দ্রনাথ, ডি. এল. রায়, সত্যেন দত্ত, নজরুল, জীবনানন্দেও দেশপ্রেম মানে ছিল মোটামুটি এই। নজরুল অবশ্যি এর সঙ্গে বিদ্রোহ ও ভাঙনের উন্মাদনাকে যোগ করে এর সীমানাকে অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে দেশপ্রেমের ওই রূপটির সঙ্গে বহু নতুন উপাদান যোগ হয়ে এর পরিধিকে এতটাই বাড়িয়ে দিয়েছে যার সঙ্গে আগের তুলনা হয় না। সেখানে আবহমানের বাংলার সঙ্গে এসে যোগ হয়েছে ভাষাপ্রেম, এর যুগযুগের সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি, মিছিল-হরতাল-গুলি-কারফিউয়ের আবহ; অভ্যুত্থান, বিপ্লব, যুদ্ধ; জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন— এমনি অনেক কিছু। নির্মলেন্দু গুণের 'হুলিয়া' কবিতায় গ্রামবাংলার শ্যামল রূপের সঙ্গে একাত্মতা বা মায়ের স্নিগ্ধ কোলের জন্যে আকুতি যেমন রয়েছে তেমনি আছে এই সময়কার মার্কসবাদী বিপ্লবের স্বপ্ন এবং তার রোমাঞ্চ :

আমি যখন বাড়িতে পৌঁছলুম তখন দুপুর।
চতুর্দিকে চিক্‌চিক্ করছে রোদ্দুর,
আমার শরীরের ছায়া ঘুরতে ঘুরতে ছায়াহীন
একটি রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে।
কেউ চিনতে পারেনি আমাকে।
ট্রেনে সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে একজনের কাছ থেকে
আগুন চেয়ে নিয়েছিলুম, একজন মহকুমা স্টেশনে উঠেই
আমাকে জাপটে ধরতে চেয়েছিল,
একজন পেছন থেকে কাঁধে হাত রেখে
চিৎকার করে উঠেছিল।
আমি সবকেই মানুষের সমিল চেহারার কথা
স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। কেউ চিনতে পারেনি আমাকে,

একজন রাজনৈতিক নেতা, তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন,
মুখোমুখি বসে দূর থেকে বারবার চেয়ে দেখলেন,
কিন্তু চিনতে পারলেন না।

বারহাট্টায় নেমেই রফিজের স্টলে চা খেয়েছি
অথচ কী আশ্চর্য, পুনর্বার চিনি দিতে এসেও
রফিজ আমাকে চিনল না।
দীর্ঘ পাঁচ বছর পর পরিবর্তনহীন গ্রামে ফিরছি আমি,
সেই একই ভাঙাপথ, একই কালোমাটির আল ধরে
গ্রামে ফেরা, আমি কত দিন পর গ্রামে ফিরছি।

আমি যখন গ্রামে পৌঁছলুম তখন দুপুর,
আমার চতুর্দিকে চিক্‌চিক্‌ করছে রোদ,
শোঁ শোঁ করছে হাওয়া। অনেক বদলে গেছে বাড়িটা।
টিনের চাল থেকে শুরু করে পুকুরের জল,
ফুলের বাগান থেকে শুরু করে গরুর গোয়াল,
চিহ্নমাত্র শৈশবের স্মৃতি যেন নেই কোনোখানে।
পড়ার ঘরের বারান্দায় নুয়েপড়া বেলিফুলের গাছ থেকে
একটি লাউডুগী উত্তপ্ত দুপুরকে তার লক্‌লকে জিভ দেখাল।
স্বতঃস্ফূর্ত মুখের দাড়ির মতো বাড়িটির চতুর্দিকে
ঘাস, জঙ্গল, গর্ত, আগাছার গাঢ় বন গড়ে উঠেছে অনায়াসে।
যেন সবখানেই সভ্যতাকে ব্যক্ত করে
এখানে শাসন করছে গোঁয়ার প্রকৃতি।
একটি শেয়াল একটি কুকুরের পাশে শুয়েছিল প্রায়,
আমাকে দেখেই পালাল একজন, একজন গন্ধ শুঁকে নিয়ে
আমাকে চিনতে চেষ্টা করল, যেমন পুলিশসমেত চেকার
তেজগাঁয় আমাকে চিনতে চেষ্টা করেছিল।

হাঁটতে হাঁটতে একটি গাছ দেখে থমকে দাঁড়ালাম,
অশোক গাছ, বাষট্টির ঝড়ে ভেঙে যাওয়া অশোক ;
একসময় কী ভীষণ ছায়া দিত এই গাছটা, অনায়াসে
দুজন মানুষ মিশে থাকতে পারত এর ছায়ায়।
আমরা ভালোবাসার নামে একদিন সারারাত
এ-গাছের ছায়ায় লুকিয়েছিলুম।
সেই বাসন্তী, আহা সেই বাসন্তী এখন বিহারে
ডাকাত স্বামীর ঘরে চার-সন্তানের জননী হয়েছে।

পুকুরের জলে শব্দ উঠল মাছের,
আবার জিভ দেখাল সাপ,
শান্ত স্থির বোকা গ্রামকে কাঁপিয়ে দিয়ে একটি
এরোপ্লেন তখন উড়ে গেল পশ্চিমে—
আমি বাড়ির পেছনে থেকে শব্দ করে
দরোজায় টোকা দিয়ে ডাকলুম : 'মা'।
বহুদিন যে দরোজা খোলেনি,
বহুদিন যে দরোজায় কোনো কণ্ঠস্বর ছিল না,
মরচেপড়া সেই দরোজা মুহূর্তেই ক্যাচ্‌ক্যাচ্‌ শব্দ করে
খুলে গেল। বহুদিন চেষ্টা করেও যে গোয়েন্দা বিভাগ
আমাকে ধরতে পারেনি, চৈত্রের উত্তপ্ত দুপুরে
অফুরন্ত হাওয়ার ভিতরে সেই আমি
কত সহজেই একটি আলিঙ্গনের কাছে বন্দি হয়ে গেলুম।
সেই আমি কত সহজেই মায়ের চোখে চোখ রেখে
একটি অবুঝ সন্তান হয়ে গেলুম।

মা আমাকে ক্রন্দনসিক্ত একটি চুম্বনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে
অনেক জঙ্গলের পথ অতিক্রম করে
পুকুরের জলে চাল ধুতে গেলেন।
আমি ঘরের ভিতরে তাকালুম, দেখলুম দু'ঘরের মাঝামাঝি
যেখানে সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি ছিল
সেখানে লেনিন, বাবার জমা-খরচের পাশে কার্ল মার্কস,
আলমিরার একটি ভাঙা কাচের অভাব পূরণ করছে
স্ক্রুপস্কায়ার ছেঁড়া ছবি।

মা পুকুর থেকে ফিরছেন, সন্ধ্যায় মহকুমা শহর থেকে
ফিরবেন বাবা, তাঁর পিঠে সংসারের ব্যাগ ঝুলবে তেমনি।
সেনবাড়ি থেকে খবর পেয়ে বৌদি আসবেন,
পুনর্বার বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন আমাকে।
খবর পেয়ে যশমাধব থেকে আসবে ন্যাপকর্মী ইয়াসিন
তিনমাইল বিষ্টির পথ হেঁটে রসুলপুর থেকে আসবে আদিত্য,
রাত্রে মারাত্মক অস্ত্র হাতে নিয়ে আমতলা থেকে আসবে আব্বাস,
ওরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞেস করবে ঢাকার খবর।
আমাদের ভবিষ্যৎ কী?
আইয়ুব খান এখন কোথায়?
শেখ মুজিব কি ভুল করছেন?

আমার নামে আর কতদিন এরকম হুলিয়া ঝুলবে?

আমি কিছুই বলব না, আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকা
সারি সারি চোখের ভিতরে
বাঙলার বিভিন্ন ভবিষ্যৎকে চেয়ে চেয়ে দেখব।
উৎকণ্ঠিত চোখে চোখে নামবে কালো অন্ধকার,
আমি চিৎকার ক'রে কণ্ঠ থেকে অক্ষম বাসনার
জ্বালা মুছে নিয়ে বলব :
'আমি এসবের কিছুই জানি না,
অমি এসবের কিছুই বুঝি না'

[হুলিয়া]

৩

দেশপ্রেমের এই উন্মাদনা প্রতিটি মানুষকে আক্রান্ত ও অণুপ্রাণিত করেছিল। প্রবন্ধ আর গল্পের পাশাপাশি আমি তখন কবিতাও লিখতাম। মনে আছে দেশপ্রেমের আবেগে আমিও অনেকগুলো কবিতা লিখে ফেলেছিলাম এই সময়। এর একটি কবিতা লিখেছিলাম আসাদকে নিয়ে। আশ্চর্যভাবেই ঘটেছিল ঘটনাটা। আসাদকে আমি চিনতাম না। আমি তখন ঢাকা কলেজের প্রভাষক। ২০শে জানুয়ারি দুপুরের দিকে আমাদের কলেজে খবর পৌঁছল যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের তুমুল সংঘাত শুরু হয়েছে। আমি কাঁটাবনের দিক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে হাজির হলাম। ইচ্ছা, সংঘর্ষের সময় জনতার সঙ্গে শামিল হয়ে যাব।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখলাম, এগোবার পথ বন্ধ। পুলিশ কলাভবনের সামনের রাস্তাটা পুরো দখল করে ভবনের দিকে বৃষ্টির মতো টিয়ারগ্যাস ছুড়ে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে সবার অবস্থা তখন প্রাণান্ত। সবাই চোখের জ্বলুনিতে পাগলের মতো এদিক–ওদিক ছোটাছুটি করছে। আমার চোখও ভীষণ জ্বালা করছিল। দরদর করে পানি বেরিয়ে আসছিল দুচোখ দিয়ে। হঠাৎ একটা তেইশ–চব্বিশ বছরের ছেলে এগিয়ে এল আমার দিকে। তার চোখে উৎসাহভরা চাউনি। মনে হল আমাকে কোনোভাবে চেনে। হতে পারে টেলিভিশনের ভক্ত। একসময় হঠাৎ ছুটে গিয়ে কোথা থেকে একটা ভেজা রুমাল নিয়ে এসে সে আমার হাতে দিল। আমি রুমালটা দিয়ে চোখ ভিজিয়ে তার হাতে দিতেই সে সেটা কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ভিজিয়ে এনে আমাকে দিল। জিজ্ঞেস করলাম, কী নাম তোমার? সে বলল, আসাদ। বলল, আপনার আজিমপুরের খালার বাসার দোতলায় আমরা ভাড়া থাকি। আমি

দেখলাম ওর চোখও ভীষণভাবে ফুলে উঠেছে। চোখ থেকে অসম্ভব পানি ঝরছে। বললাম, শিগগির চোখে পানি দাও। রুমাল ভিজিয়ে চোখে চেপে ধরো। ও হেসে বলল, লাগবে না। মনে হল নিজের চেয়ে আমাকে সাহায্য করতেই বেশি উৎসাহী।

ঘণ্টাখানেক এভাবে চলার পর ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যেতে শুরু করল। পুলিশও আস্তে আস্তে উপাচার্যের বাড়ির দিকে পিছিয়ে গেল। আমি একসময় বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে ।

আজিমপুরের মেজোখালার বাড়ি তখন আমার প্রায় দ্বিতীয় বাসা। ওখানে গিয়ে খালাত ভাইবোনদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে প্রতিদিনই আমার বেশকিছু সময় কাটে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেদিনও আমি চলে গেলাম সেখানে। দু-ঘণ্টাও পার হয়নি, সেদিনের সংঘর্ষের গল্প নিয়ে যখন আমরা বেশ সরগরম, হঠাৎ ওপরের তলায় কান্নার শব্দ পেলাম। খবর এসেছে আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেল পুরো ঘটনাটা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছেলেরা চলে যাওয়ার পর একটা নতুন প্রসেশনের সঙ্গে আসাদ চলে গিয়েছিল শহীদুল্লাহ হলের দিকে। সেখানে সংঘর্ষের একপর্যায়ে পুলিশের গুলিতে সে মারা গেছে। পুলিশের একজন বাঙালি ডি.এস.পি. রিভলবার দিয়ে তার বুক বরাবর গুলি করেছিল। মাত্র দু-ঘণ্টা আগের সেই সজীব যৌবনদীপ্ত ছেলেটি এভাবে নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে ভাবতেও পারছিলাম না।

খবরটা শুনে অসম্ভব আহত হলাম। খুবই বিমর্ষ লাগতে লাগল। আমি চোখের সামনে তখনও আসাদের স্নিগ্ধ হাসিভরা উদ্দীপ্ত মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম। সেদিনই একটা দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলাম আসাদকে নিয়ে। কবিতাটি এমন কিছু না হলেও এর প্রতিটা শব্দ ছিল আমার চোখের পানিতে ভেজা। আমার কষ্ট অনেককে স্পর্শ করেছিল। অন্তত সাত-আটটা ছোটবড় সংকলনে কবিতাটি বিভিন্ন সময়ে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল পরের বছর-পাঁচেকের মধ্যে।

৪

ঘটনার পর ঘটনার মধ্যে দিয়ে আবহমানের এই দেশ ও জাতির সঙ্গে আমার একাত্মতাও ক্রমাগতভাবে বেড়ে যেতে লাগল। সে-যুগে সবারই কিছু-না-কিছু হয়েছিল এমনটা। একসময় মনে হল দেশের সঙ্গে যেন আমি পুরোপুরি মিশে গেছি। আমার একটা কবিতায় এই অনুভূতির কিছুটা প্রতিফলন ছিল :

আমার বুকের মধ্যে
বাঙলার নাগেশ্বর নিয়েছে জন্ম; চোখ বুজে
কান পেতে আমি তার পাতার শব্দ শুনি; বুঝি
হাওয়ার আদরে তারা নড়ে চড়ে; বুনো নাকে সে গাছের
ফুলদের ঘ্রাণ পাই; সে ফুলেরা আমার কবিতা।

আমার সে-সময়কার দেশপ্রেমের কবিতার মধ্যে পাঠকের কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল 'প্রতিশোধে হ্যামলেট' কবিতাটি। পাকিস্তানি আর তার দোসরদের পাশব দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিশোধস্পৃহাকে আমি হ্যামলেটের নিঃশব্দ প্রতিশোধ কামনার ভেতর দিয়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলাম :

পিতা, জেনে যাও, তোমার এ অবিবেকী অন্যায় হত্যার
রক্তঘাতী বিনিময় হবে।
তোমার সে নির্বোধ বিশ্বাস, প্রেম, রাজধর্ম, হে রাজন,
বিশালতা—ঈর্ষিত, উদার,
কালকূট হয়ে দ্যাখো তোমাকেই করেছে আঘাত।
হায় মানবিক কৃতঘ্নতা ! পশু আর প্রিয়তমা এক হয়ে গেছে
সততার স্নায়ু ছিঁড়ে নিতে।
তোমাদের উদ্বাহু বিশ্বাস, পিতা, কুকুরের
খাদ্য দ্যাখো আজ। স্বল্পায়ু স্বর্ণলালসায় চতুর্দিকে
মরিয়া কৃতান্তকুল ; আমাদের কামনার প্রিয়তমারাও
পশুর দাঁতাল আলিঙ্গনে তৃপ্তি চায় শুধু আজ !

শত্রুকে চিনেছি আমি পিতা। আমাদের এই প্রাসাদের
মান্যবর বাসিন্দা সে আজ : ডেনমার্কের সম্মানিত প্রভু।
দেহরক্ষী, অমাত্য, বৈভব, সম্পদ, রানী, রাজদণ্ড
পরিবৃত—সহজ নাগাল থেকে দূরে।
তোমার প্রাক্তন রানী—আমার মায়ের
কলুষিত প্রশ্রয়ে (হা ঈশ্বর !)
তোমার শয়নঘর কলঙ্কিত করে প্রতিরাত্রে।
ঘৃণ্য আরোহণে প্রতিদিন
অপমান করে ডেনমার্কের প্রিয়তম সিংহাসন।

রক্তে বাজে প্রতিশোধ। পিতা, আমি প্রতি পলে
ধূর্ত বেড়ালের মতো প্রাসাদের সতর্ক ছায়ায়
সুযোগের প্রতীক্ষায় হেঁটে ফিরি ; উন্মাদের বেশে
এড়াই সন্দেহ ; নিদ্রাকে
চিরশত্রু করেছি ; দুর্লভ প্রেমকেও
অবৈধ অশ্রুর সাথে কবর দিয়েছি অন্ধকারে।

রক্তে বাজে প্রতিশোধ। প্রতিটি স্নায়ুর
ক্ষুধার্ত চিৎকারে, দাঁতের প্রতিটি

উন্মত্ত দংশনে, উচ্চকিত শিরাদের ক্ষোভে
শরীরময় রক্তকণাদের বন্যতায়
বিনিদ্র চোখের মতো, দ্যাখো, শুধু প্রতিশোধ জ্বলে।

[প্রতিশোধে হ্যামেলট]

৫

উনসত্তরের কথা মনে হলেই ফিরে ফিরেই গুণের সেই লাইনটি আমার মনে পড়ে : 'আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।' সারাদেশটাই তখন রক্তে আর আগুনে দাউদাউ করে জ্বলছে।

এই গণঅভ্যুত্থানের ভয়াবহতম মুহূর্ত ছিল ফেব্রুয়ারি ১৬ তারিখের রাত্রি, যেদিন সামরিক বাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জোহাকে পাশবিকভাবে হত্যা করে। সার্জেন্ট জহুরুল হক হত্যার পর কয়েকদিন ধরে একটানা কারফিউ চলছিল। শহরের জনগণ প্রচণ্ড ক্ষোভ আর প্রতিবাদ নিয়ে নিজ নিজ বাড়ির ভেতর রুদ্ধশ্বাস সময় পার করছিল। সে দুঃসহ প্রতীক্ষার যেন শেষ নেই।

রাত ন'টা–দশটার দিকে ড. জোহার হত্যার খবর এসে পৌঁছল। বাইরে থেকে সারা শহরে তখন অন্ধকার আর ভূতুড়ে নিস্তব্ধতা। কিন্তু ঘরে ঘরে এই স্পর্ধিত পাশবিকতার বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ মানুষের ভেতর সমুদ্রের থৈ থৈ ঢেউয়ের মতো উপচে–পড়া দুর্জয় আক্রোশ। তবুও কোথাও কোনোখানে প্রতিরোধ নেই। হাজার হাজার রাইফেলের সামনে মৃত্যু হাতে নিয়ে কে প্রতিবাদ করতে বের হবে এই অন্ধকারে? কে যাবে কার্যত আত্মহত্যা করতে?

আমার ভেতরটা উত্তেজনায় কষ্টে অস্থিরতায় পাগলের মতো করছে। এমন পাশব অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠবে না? এত মানুষের মুক্তির আর্তি কি জন্তুসুলভ সামরিক জান্তার উদ্ধত দম্ভের নিচে দলিত হয়ে পড়ে থাকবে? আমার গ্রিন রোডের বাসার নিঃশব্দ জানালা দিয়ে স্তব্ধ বিশাল অন্ধকার ঢাকা শহরের দিকে উন্মুখ চোখে তাকিয়ে আছি। জানতে চাচ্ছি কোথাও, কাছে অথবা দূরে, একটা ছোট্ট ফুলকি, প্রতিবাদের একটা অগ্নিময় স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে কি না, আগুন লেগে যায় কি না গোটা শহরের রক্তস্রোতে।

হঠাৎ কালো রাত্রির নিঃস্তব্ধতা ভেদ করে, দূরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো হলের ছাদ থেকে হয়তোবা—সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, অস্পষ্ট একটা প্রতিবাদের সুর রাত্রির হৃদয়কে চকিতের জন্য চিরে বিমর্ষ আর্তনাদের রেখার মতো আকাশের দিকে উঠেই ধীরে ধীরে আবার মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাছাকাছি আর–একটা জায়গা থেকে একইরকম আর–একটা তীক্ষ্ণ শব্দ যেন প্রতিধ্বনি করল তার। সবার রক্ত উৎকর্ণ চঞ্চল হয়ে উঠল।

একটা অবরুদ্ধ বিরাট জন্তু মুক্তি পাচ্ছে যেন শহর জুড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে একইরকম আর-একটা শব্দ। তারপর আর-একটি। প্রতিবাদ, আক্রোশ, যন্ত্রণা, ঘৃণা যেন ফেটে পড়তে লাগল চারদিক থেকে। দেখতে দেখতে শহরের প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি পাড়া, প্রতিটি রাস্তা একইরকম হাজার হাজার প্রতিবাদের শব্দে আর স্লোগানে গমগম করতে লাগল। স্পন্দিত হতে লাগল গোটা শহরের হৃৎপিণ্ড। প্রতিটি বাড়ির প্রতিটি মানুষ বন্যার উন্মত্ত ধারায় কারফিউ ভেঙে বেরিয়ে এল রাস্তায়। অসংখ্য স্লোগান আর শোভাযাত্রায় মুখর হয়ে এগিয়ে চলল।

অকুতোভয় মানুষের কারফিউভাঙা সেই অবিশ্বাস্য বন্যার দৃশ্য দেখে মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। কিন্তু তা কিছুক্ষণের জন্যেই। তার পরেই তাদের গুলির বিপুল বিরতিহীন শব্দে প্রকম্পিত হয়ে চলল সারাটা শহর। নির্বিচার সেই গুলিবর্ষণে আহত নিহত হল বহু মানুষ। কিন্তু সেই যৌবন জলতরঙ্গ যেন মৃত্যুর অতীত। পাকিস্তানের সামরিক শক্তির ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। সূচিত হল জনগণের বিজয়। এরপর মানুষ হয়ে উঠল পুরো উচ্ছৃঙ্খল। জনতাকে রোধ করার কেউ রইল না।

পরবর্তী কয়েকদিনের শহরের ছবি মনে পড়ে। সে আগুন শুধু বাইরের নয়, ভেতরেরও। সেই মাস-দুয়েকের অভ্যুত্থানের উন্মাতাল দিনগুলো আজও চোখে ভাসে। দূরে থেকে দেখা মুসলিম লীগার লস্করের পুরানা পল্টনের আগুনলাগা বাড়ির কালো ধোঁয়ার স্মৃতি, বাংলা একাডেমীর পাশে আগুনধরা অতিথি-ভবনের মিষ্টি লাল আগুনের শিখা এখনো মনে পড়ে। শাহবাগের নওয়াব হাসান আসকারীর আগুনে জ্বলতে থাকা বাড়িটাকে এখনো চোখের সামনে দেখতে পাই। আসকারী পাকিস্তানিদের দোসর ছিলেন বলে ক্ষিপ্ত জনতা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল বাড়িটাতে। প্রাসাদের মতো বিরাট আকারের বাড়িটা ছিল এখনকার শাহবাগের মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর-ধার ঘেঁষে। বিরাট মাঠের শেষপ্রান্তে বাড়িটার সামনে একটা বড় আকারের পুকুর। দৃশ্যটা আমি দেখেছিলাম অনেক দূর থেকে, জাদুঘরের কাছাকাছি কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে।

আগুন-লাগা প্রাসাদটার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আমার মন কেন যেন বিষণ্ন হয়ে পড়েছিল। সন্ধ্যার ধূসর আলোয় দূর-থেকে-দেখা আগুনের সেই সুন্দর গোলাপি লেলিহান শিখার সঙ্গে পাকিস্তান আর তার সামন্ততন্ত্রও-যে সেই মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল সেই অনিন্দ্য রূপ দেখে তা বোঝার এতটুকু উপায় ছিল না।

৬

অসম্ভব আর্থিক কষ্ট ছিল নির্মলেন্দু গুণের। আবুল হাসানেরও ছিল তাই। দুজনে মিলে এই কষ্টের মধ্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা করত ওরা। রাতে ওদের থাকার জায়গা ছিল না। এক বন্ধুর কাছ থেকে আরেক বন্ধুর কাছে, এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে, কখনো মসজিদে, লেখক-সঙ্ঘের অফিসে, কখনো হলের বন্ধুদের রুমে মাটিতে শুয়ে ওরা ঘুমের পর্ব সারত। কার কার সঙ্গে ওরা নানান সময় থেকেছে

তার একটা ফিরিস্তি আছে গুণের 'আমার কণ্ঠস্বর' বইয়ে।

না, থাকার জায়গা নয় কেবল, খাওয়ার কষ্টেও একেক সময় শুকিয়ে ওঠার মতো অবস্থা হত ওদের। কিন্তু হেরে যাবার পাত্র নয় ওরা। তাই কোথায় কী বুদ্ধি খাটিয়ে পেটের জ্বলন্ত ক্ষুধার সুরাহা করা যায় তা অনায়াসে চলে আসত মাথার ভেতর। 'আমার কণ্ঠস্বরে' এমনি একটি প্রায় অবিশ্বাস্য উপায়ের কথা গুণ বেশ রসিয়ে লিখেছেন :

> ...ক্ষুধায় আমার পেট চোঁ চোঁ করে। আমি চলতে পারি না। কোথায় যাব, কী করব কিছুই ভেবে পাই না। ঠিক তখনই মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি খেলা করে। সিদ্ধান্ত নিই, যা থাকে কপালে! আগে তো পেট পুরে খেয়ে নেই, পরে দেখা যাবে।
>
> গুলিস্তানের পেছনে, এখন যে-জায়গাটায় গোলাপ শাহ মাজার তৈরি হয়েছে, ঠিক ঐ স্থানেই ছিল একটি খুব চালু হোটেল। হোটেলটিতে ভিড় লেগেই থাকত। ঐ ভিড়টাই আমার দরকার। আমি স্থির করি, পেট পুরে খাওয়ার পর গায়ে যখন জোর পাব, দেব দৌড়। আমি সিদ্ধান্তমতো অগ্রসর হই। পেট পুরে ডাল-মাছ-ভাত কর্মসূচি বাস্তবায়িত করি। তারপর মুখ হাত ধুয়ে অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হই কাউন্টারের দিকে। সেখানে ঝোলানো গামছায় হাত মুছি, আর আড়চোখে রাস্তার দিকে তাকাই। রাস্তা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে—আয়, আয়। পেছন থেকে খাদ্য-পরিবেশনকারী ছেলেটি চিৎকার করে আমার খাদ্যের মূল্য ঘোষণা করে। আমি এমন একটা ভাব দেখাই যে, এত টাকা হতেই পারে না। তারপর, তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, ঐ বৃষ্টির মধ্যে বেন জনসনের বেগে চোখের পলকে দেই ভোঁ দৌড়।
>
> আমি-যে দৌড় দেব, তা হোটেলের কেউই ভাবতে পারেনি। আমি লক্ষ্য করি, আমার পেছনে 'ধর্-ধর্' বলে চিৎকার করে কয়েকজন ছুটে আসছে। তারা 'ধর্ ধর্' ছাড়া অন্য কিছু বলছে না। আসলে তারা আমাকে কী বলবে, তা ঠিক করতে পারছিল না। চোর বলবে? না, আমি তো চোর নই। ডাকাত বলবে? না, আমি তো ডাকাত নই। হোটেল থেকে খেয়ে পয়সা না দিয়ে যে দৌড় দেয়, তাকে কী বলা হয়, বাংলাভাষায় তা নেই। আমি ভাষার সীমাবদ্ধতার ঐ সুযোগটা উপরি হিসেবে পেয়ে যাই। 'ধর্ ধর্' বলে আমিও দৌড়াতে শুরু করি। একটি দোতলা বাস গুলিস্তান থেকে ছেড়ে যাচ্ছিল, আমি ঐ চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠে পড়ি। তখন আমাকে আর পায় কে? কন্ডাক্টর ছাড়া তখন আমি আর কাউকে ভয় করি না।

গুণ আর আবুল হাসান দুজনে মিলে একবার মধুর ক্যান্টিনে এভাবে খেয়ে দৌড় দিতে গিয়ে হাসান দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে ধরা পড়ে গেলে কী বিপদ হয়েছিল তা লেখা আছে বইটিতে।

কেন মনে নেই, একদিন বেশ ভোরে আমার গ্রিন রোড স্টাফ কোয়ার্টার্স-এর

বাসা থেকে গিয়েছিলাম গুণদের আখড়ায়। গুণ তখন থাকত ভূতের গলিতে, মামুনুর রশিদের সঙ্গে। হাসানও থাকত একই সঙ্গে। মামুনুর রশিদ পরে সুঅভিনেতা ও নাট্যকার হিসেবে দেশজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন। বাসাটা এক-ঘরের। ঠিক ঘরও নয়, বাড়ির গ্যারেজটাকেই ঘর বানিয়ে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। ঘরের সামনের দিকটায় শাটার লাগানো। আমি গিয়েছিলাম খুব সম্ভব ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে, দেশজুড়ে তখন গণঅভ্যুত্থানের উত্তাল জোয়ার। ঘরে ঢুকে গুণকে আবিষ্কার করলাম মেঝের ওপর; একটা পাতলা পুরোনো শতছিদ্রওয়ালা লেপ জড়িয়ে সাপের মতো কুণ্ডলি পাকানো অবস্থায় শুয়ে আছেন। ঘরের বাকি সদস্যেরা আগেই উঠে গিয়েছিল, আমি যেতেই গুণ চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসলেন। পাশেই মেঝের ওপরে পড়ে আছে লন্ড্রির একটা বড় সাইজের কাগজের ঠোঙা। ঠোঙার গায় রাত জেগে লেখা দীর্ঘ কবিতা। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মতো নির্মলেন্দু গুণের অস্তিত্বও তখন ক্ষুব্ধ, উত্তাল, ছেঁড়া পালের মতো অস্থির, হাওয়ায় যেন পতপত করে উড়ছে। লেখার মধ্যেও তার ঝাঁঝ পাওয়া যায় :

মাননীয় সভাপতি, সভাপতি কে? কে সভাপতি?
ক্ষমা করবেন সভাপতি সাহেব।
আপনাকে আমি সভাপতি মানি না।
তবে কি রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র বসু? হিটলার?
মাও-সে-তুং?..না, কেউ না
আমি কাউকে মানি না, আমি নিজে সভাপতি
এই মহতী সভার।..
আমার হাতে কার্যরত নীল মাইক্রোফোন
উত্তেজিত এবং উন্মাদ।..

এইভাবে সেদিনের জাতির শক্তি ও উন্মাদনা প্রাণিত গুণ হয়ে উঠেছিলেন সেই অভ্যুত্থানের মতোই অসংযত, উত্তাল। তাঁর কবিতার তিনটি মূল বিষয় তখনই মোটামুটি পাকা হয়ে ভিড় করেছে তার কবিতায় : নারী, দেশপ্রেম আর তার উন্মাদনায় ভরা জীবন।

যাযাবর, ঘরছাড়া, প্রেমকাতর আর উন্মাতাল ছিলেন তরুণ-বয়সের নির্মলেন্দু। তাঁকে আমার মনে হত সেই গণআন্দোলনের প্রতীক বলে। প্রথম ষাটের অবক্ষয়ের যুবরাজ যেমন রফিক, শেষ ষাটের স্পন্দিত নায়ক তেমনি গুণ। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কথা মনে হলে আমার চোখে ভেসে ওঠে উনসত্তরের গুণের ছবি। দীর্ঘ, ঋজু, তারুণ্যদীপ্ত গুণ ছিলেন সেই বিশৃঙ্খল, ঝোড়ো, অস্থির সময়খণ্ডের উড্ডীন পতাকা; তার অশান্ত, বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের কণ্ঠস্বর।

৭

সময় ছুটে গেল উল্কার গতিতে। উনসত্তরের সেই গণঅভ্যুত্থানও একসময় স্তিমিত হয়ে এল। এর মধ্যে বেরিয়ে গেল 'কণ্ঠস্বর'–এর আরও কয়েকটি সংখ্যা। আমাদের গণ্ডে আবারও ফিরে এল আগের সেই লাবণ্য, শুরু হল আগের মতোই অভাবিতের পথে যাত্রা। একমাত্র মহাদেব ছাড়া ষাটের লেখকেরা প্রায় পুরোপুরি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে ততদিনে। 'কণ্ঠস্বর'–এর বয়স তখন অবশ্য বেশিদিনের নয়। কিন্তু 'কণ্ঠস্বর' কতদিন বেরোল–না–বেরোল তা আমাদের কাছে বড় কথা নয়, আমাদের আসল সাহিত্যযাত্রা কতদিনের সেটাই আমাদের কাছে বড়। ওটাই আমাদের আসল বয়স। সেখানে তো আমরা পিছিয়ে নেই। বাষট্টির 'বক্তব্য' থেকে ধরলে আমাদের বয়স তো তখন কম–সে–কম আট বছর।

একদিন মনে হল, যত সামান্যভাবেই হোক আমাদের এতদিনের কাজের একটা মূল্যায়ন তো হওয়া উচিত। অনেক পথই তো পেরিয়ে এসেছি আমরা। এখন তো খতিয়ে দেখাই উচিত এতগুলো দিন কী করলাম, সত্যি সত্যি কিছু হল কি না, নাকি সবই কেবল ফাঁকা আওয়াজ। হোক সবই ব্যর্থ, তাও তো জানা দরকার! না হলে সংশোধন করব কী করে? একটা প্রতিষ্ঠানেরও তো বার্ষিক রিপোর্ট থাকে। সেখানে আমরা এতগুলো দিন পার হলাম, এর ভালোমন্দের একটা খতিয়ান থাকবে না?

সম্মেলনের আয়োজনে নেমে পড়লাম সবাই মিলে। প্রেসক্লাবের উল্টোদিকে তখন ছিল পাকিস্তান কাউন্সিলের অফিস। যোগাযোগের দিক থেকে জায়গাটা সবার জন্যে সুবিধাজনক। তার মিলনায়তনকে এই সভার জন্য নির্বাচন করা হল। পাকিস্তান কাউন্সিলের পরিচালক তোফাজ্জল ভাই (তোফাজ্জল হোসেন), একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ওপরের ক্লাসে পড়তেন। পাকিস্তান কাউন্সিলে চাকরি করলেও তোফাজ্জল ভাই মনেপ্রাণে ছিলেন ঘনঘোর বাঙালি। পাকিস্তান–বিরোধী যে–কোনো কাজকে সাহায্য করতে পারলে খুশিতে তিনি গদগদ হয়ে উঠতেন। তোফাজ্জল ভাই ছিলেন ছোটখাটো বলিষ্ঠ মানুষ, চেহারা ছিল ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের মতো হৃদয়ও ছিল দরাজ। যে সাহস ও ভালোবাসার সঙ্গে উনি সবাইকে হৃদয় উজাড় করে সাহায্য করতেন তা থেকে বোঝা যেত রাষ্ট্রনায়ক বা সামন্তপ্রভু হলে তিনি হতেন সেই প্রভুদের একজন, যাদের দরাজ হাতের দেয়াথোয়া ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে একটি দেশ শিল্প–সাহিত্য, দর্শন–বিজ্ঞানে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে।

তোফাজ্জল ভাই সম্পূর্ণ বিনা অর্থে পাকিস্তান কাউন্সিলের সবগুলো সুযোগ পাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। বললেন : পাকিস্তান সরকারের মাল, যা পারেন নিয়ে নেন, নাহলে তো বিপরীত পক্ষের লোকেরা এসে নিয়ে নেবে।

সম্মেলনে সভাপতি হবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হল অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীকে। আমাদের সহানুভূতি দিয়ে বোঝার মতো তাঁর চেয়ে যোগ্য মানুষ তখন

আর কেউ ছিল না। আমি জানতাম, আমাদের সাহিত্য–আন্দোলনের পক্ষে তাঁর সায় নিরঙ্কুশ নয়, একবার তিনি ও আবু হেনা মোস্তফা কামাল আমাদের নিয়ে কিছু সরস কটাক্ষ করেছিলেন। তবু তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করতাম। তিনি সমালোচনা করলেও তা মাথা নিচু করে শুনে যেতে আমাদের আপত্তি ছিল না। আমরা জানতাম যত সমালোচনাই তিনি করুন, হৃদয়ের সত্য অনুভূতিটাই তিনি শেষপর্যন্ত বলবেন।

ঢাকাসহ দেশের সব জায়গার তরুণ–লেখকদের আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল। ঢাকার লেখকদের মতো তারাও অনেকেই সম্মেলনে যোগ দেবার প্রস্তুতি নিয়েছে। সম্মেলনের কর্মসূচিও ঠিক হয়ে গেছে। লিখিত বক্তৃতা পড়বে পাঁচজন—ঢাকা থেকে আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবুল কাসেম ফজলুল হক, হুমায়ুন কবীর এবং রাজশাহী থেকে আবদুল হাফিজ ও মহাদেব সাহা। সম্মেলনের তারিখ ২৯ জুন, ১৯৬৯।

সম্মেলনের দিন পাকিস্তান কাউন্সিলের মিলনায়তন সারাদেশের তরুণ–লেখকে কবিতে জনকীর্ণ হয়ে গেল। আমি স্বাগত–ভাষণ দেবার পর প্রবন্ধকারেরা একে একে নিজেদের লেখা পড়ে গেলেন। লেখাগুলো থেকে খুবই ছোট্ট করে কিছু অংশ নিচে উদ্ধৃত করছি। প্রথমে খুব সম্ভব লেখা পড়লেন আবদুল হাফিজ, আমাদের বলিষ্ঠ হাফিজ ভাই, 'কণ্ঠস্বর'–এর অন্যতম লেখক ও ষাটের তরুণ লেখকদের ভরসা ও আত্মবিশ্বাসের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। তাঁর 'কণ্ঠস্বর ও সাম্প্রতিক সাহিত্য' প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি 'কণ্ঠস্বর'–এর পটভূমি তুলে ধরে বললেন :

> 'কণ্ঠস্বর' প্রথম সংখ্যা যখন হাতে পেয়েছিলাম, তখন অনুভব করেছিলাম নির্বেদ বসন্তে এ পত্রিকা একটি অগ্নিপ্রভ পুষ্প; কেননা সে–সময় আমাদের অনুশোচনার কাল, রাজনীতিতে ভীষণ মন্দা, অর্থনীতি প্রায় বিপর্যস্ত এবং সাহিত্য বর্ষীয়ানদের কুক্ষিগত; সংস্কৃতি তখন কুসংস্কারের সেবাদাসী,রুচি ও মনন ভয়ংকরভাবে অধঃপতিত। তরুণ সাহিত্যিক শিল্পীরা আপন কণ্ঠস্বরকে কোথাও লিপিবদ্ধ করেন,এমন স্থান ছিল না। 'কণ্ঠস্বর' সেই ভয়ংকর শূন্যতাকে নিরতিশয় সাহসের সঙ্গে ধারণ করেছিল;..এই একটি কারণে অভিনন্দন পেতে পারে এই পত্রিকা।

এই গোষ্ঠীর চরিত্র ও প্রকৃতি সম্বন্ধেও কিছুটা আলোকপাত করলেন তিনি :

> 'কণ্ঠস্বর'–এর লেখকগোষ্ঠী নির্মোহ দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনের বিচার করেছেন, সে বিচার সর্বদা পবিত্র হয়েছে এমন কথা বলব না, কিন্তু আত্মবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'কণ্ঠস্বর'–এর ভূমিকা নিদারুণভাবে আপোষবিরোধী এবং এই আত্মবিশ্লেষণের মধ্যেই এ–কাল নিজের পাপ, কান্না, অসহায়তাকে নির্দ্বিধায় প্রত্যক্ষ করেছে। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের প্রতারণা কিংবা অসাধুতা এদের মধ্যে নেই, এরা বিশ্বাসী ছিলেন নিজের কণ্ঠস্বরে, প্রভুর হুকুমে এঁরা কিছু লেখেননি। এঁদের আস্থা ছিল সত্যের নির্ভুল উচ্চারণে। 'কণ্ঠস্বর' এখানেই আমাদের কালের ভাষ্যকার।...

'কণ্ঠস্বর'–এর প্রকাশনা, রুচি ও মুদ্রণসৌকর্য সম্বন্ধেও তিনি আলোকপাত করলেন :

> যাকে মলাট–সমালোচনা বলি, সেই মলাট–সমালোচনাতেও 'কণ্ঠস্বর', উচুদরের পত্রিকা হিসেবে স্থান দাবি করতে পারে। সূচিপত্রের নিত্যনতুন চেহারায়, ঝকঝকে মলাটে, প্রচ্ছদের নির্মম সুরুচিতে 'কণ্ঠস্বর' একালের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পড়েছিল খুব সম্ভব মান্নান, লেখার নাম 'এক শস্যপর্যায় : কবিতা'। লেখাটাতে মান্নান চমৎকারভাবে তুলে ধরেছিল উচ্ছল তরুণদের সাহিত্যমঞ্চ অধিকারের সেই মুখরিত চিত্রটি এবং এই ধারার স্বাতন্ত্র্যের দিকটি। এই সঙ্গেই চিহ্নিত করেছিল এর অবদান :

> ..এই সময়টি ...আমাদের সাহিত্যে উপহার দিয়েছে কিছু ফসল, সেই ফসলের জাত আলাদা, সেই ফসলের চাষ স্বতন্ত্র। সেই ফসল পরিমাণে সামান্য হ'তে পারে, কিন্তু তা-ই সবুজ সওগাত—আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন, নবীন, নব্য।

তৃতীয় প্রবন্ধের লেখক হুমায়ুন কবির। আগেই বলেছি, ও ছিল রাজনীতিপ্রবণ, মার্কসবাদী বিপ্লবে বিশ্বাসী। একটা সমৃদ্ধ জাতির স্বপ্ন ছিল ওর সামনে। প্রথম ষাটের অবক্ষয়ে স্বাভাবিকভাবেই ওর আস্থা ছিল না। নতুন জেগে-ওঠা দেশকালের আশাবাদ ও তার বলিষ্ঠ স্বরই তাই ধ্বনিত হল ওর কণ্ঠে তীব্র ও আপোষহীন ভাষায় :

> সম্প্রতি 'কণ্ঠস্বর'–এর প্রয়াস হয়তো ঘোষিত অবক্ষয় থেকে সৃজনশীলতার বিন্দুতে অপসারণ। আমাদের কালকে ধারণ করতে হবে তার। আমার বিশ্বাস, সে তা করছে এবং ক্রমাগত আরো করবে। আমাদের আশা ও আবিষ্কার, সন্ধান ও সংগ্রামের খবর দেবে---তাই তার অস্তিত্বের অর্থ। অন্যথায় বহুবিস্মৃতজনদের ভিড়ে আর-একটি মাননীয় শব হোক সে।...
> বিশ্বাসহন্তী কালে বিশ্বাসের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। সে-বিশ্বাস জীবনে বিশ্বাস, সে-বিশ্বাস বুর্জোয়াসমাজের মদস্রাব—ধাতব সভ্যতার করাল কামড়ের বিরুদ্ধে সবুজ অভ্যুত্থানের বিশ্বাস, নবউত্থানের বিশ্বাস। 'কণ্ঠস্বর' নেতিকে পেয়েছে, ইতির দীপ্র সুতোগুলোর নাটাই পেয়েছিল কি?

আমার প্রায়ই মনে হয়, অযথাই সে–সময়কার মার্কসবাদী ধারার কিছু লোক 'কণ্ঠস্বর'কে পুরোপুরি অবক্ষয়ী বলে গাল দিতেন। তাঁরা যদি একটু ভালো করে দেখতেন তাহলে সহজেই বুঝতেন যে অবক্ষয়ের পথে সূচনা ঘটলেও কেবল অবক্ষয় নয়, যে–কোনো ধারার যে–কোনো মতবাদ বা ভাবনাকে আমরা কী উদারভাবে অভিনন্দন জানাতাম।

একটা ব্যাপার লক্ষ করলেও ব্যাপারটা কিছুটা বোঝা যাবে। যে-পাঁচজন ঐ আসরে সেদিন প্রবন্ধ পড়েছিলেন তার মধ্যে তিনজনই ছিলেন মার্কসবাদী। কাজেই আমরা-যে কেবল অবক্ষয়ের প্রেরণাকেই ধারণ করেছিলাম, সামাজিক প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করতাম না, এই অভিযোগ ধোপে টিকবে বলে মনে করি না।

হুমায়ুনের পর প্রবন্ধ পড়েছিলেন আবুল কাসেম ফজলুল হক। তিনিও ছিলেন মার্কসবাদী বিপ্লবে বিশ্বাসী। ঐ ধারার একজন সক্রিয় কর্মী। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যার আলোকে তিনিও, আবদুল হাফিজের মতোই, কণ্ঠস্বরকে শনাক্ত করেছিলেন যুগ-পরিবর্তনের অচেতন ও অনিবার্য হাতিয়ার হিসেবেই। জোরালো ভাষায় তিনি বলেছিলেন :

> সাহিত্যের ক্ষীয়মাণ ধারার ক্ষয়কে 'কণ্ঠস্বর' প্রবাহিত করে নিয়ে গেছে একেবারে ধ্বংসের সমুদ্রের মোহনায়। মুমূর্ষুকে তারা ঠেলে দিয়েছেন, অনেকটা সচেতনভাবেই, মৃত্যুর অন্ধকার গহ্বরে। চতুষ্পার্শ্বে সবকিছু...ধসে যাচ্ছে দেখে কোনোপ্রকার আক্ষেপ না করে 'কণ্ঠস্বর'-এর উদ্যোগীরা নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সেই সবকিছুকেই নির্দ্বিধায় হত্যা করেছেন "যাদের নিহত হওয়া অনিবার্য ছিল এবং প্রয়োজন ছিল।"
>
> ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যদিয়ে, হয়তো অচেতনভাবেই, 'কণ্ঠস্বর' সৃষ্টি করে দিয়েছে নতুন বীজ বপনের উপযুক্ত ভূমি—যে ভূমি তৈরি হতে হয়তো, 'কণ্ঠস্বর'-এর আবির্ভাব না হলে, আরও বেশকিছু কালের প্রয়োজন হত। পূর্ববাংলার সবচেয়ে গহীন অন্ধকারময় দিনগুলোতে 'কণ্ঠস্বর'-এর আন্দোলনই ছিল এখানে একমাত্র সাহিত্যান্দোলন। যুগের অন্ধকারকে, হতাশাকে, চরিত্রহীনতাকে, আত্মদহনকে—শঠতা কপটতা জালিয়াতি আত্মহনন ও গ্লানিকে কণ্ঠস্বর ধারণ করেছে। হৃদয়হীনতার যুগে হৃদয়ের জন্য আর্তনাদ করেছে 'কণ্ঠস্বর'—দাঁড়াতে চেয়েছে হৃদয় নিয়ে—যদিও সে-হৃদয় ছিল একেবারেই বিধ্বস্ত, বিক্ষত।

পঞ্চম ও শেষ প্রবন্ধটি লিখেছিল মহাদেব সাহা। নাম 'অমিতাচারী কবিতা'। পনেরো পৃষ্ঠা দীর্ঘ এই লেখাটিতে ষাটের দশকের কবিতার একটি উজ্জ্বল, বহুমাত্রিক ও ব্যাপক পরিচয় তুলে ধরেছিল মহাদেব। সে-পরিচয় যেমন এর অন্তরঙ্গের তেমনি বহিরঙ্গের। এই কবিতার 'স্বতন্ত্র, নতুন, ভয়ংকর, শোণিতশোভিত,চিরাচরিতের সুবদ্ধ সংক্রাম হতে স্খলিত, দুঃসাহসী, উদ্ধত,পিচ্ছিল, লাঞ্ছিত,ধূসর, অন্ধকার জ্যোৎস্নাময়' প্রকৃতিকে নানান উপমা ও উদাহরণের ভেতর দিয়ে জ্বলজ্বলে করে তোলা হয়েছিল লেখাটায়।

সভাপতি মুনীর চৌধুরীর বক্তৃতাটি হয়েছিল সত্যি সত্যি অসাধারণ। এই বক্তৃতায় তিনিই প্রথম আমাদের সাহিত্য-আন্দোলনকে স্বীকৃতি দেন। ষাটের

সাহিত্যযাত্রার সামগ্রিক রূপটিকে–যে তিনি কেবল আগাপাশতলা চিহ্নিত করলেন তা নয়, আমাদের বেশ কয়েকটি শক্তি ও সম্ভাবনার দিককেও সেই সাথে তিনি তুলে ধরলেন, সেই সাথে বিপদের দিকগুলোকে ইঙ্গিতের ভেতর দিয়ে ধরিয়ে দিলেন। তাঁর অসাধারণ বক্তৃতাটি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম আমরা। বক্তৃতাটি অসম্ভব উপকার করল আমাদের। মুনীর চৌধুরীর চিন্তাভাবনাকে আমরা সে–সময় সবাই খুবই গুরুত্ব দিয়ে দেখতাম। তাঁর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আমাদের আত্মশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। প্রায় অপরাজেয় হয়ে উঠলাম আমরা। নিজেদের নিয়ে আত্মসংশয়ের পর্ব শেষ হল। নিজেদের দীনতা নিয়ে আমরা আর কখনো পেছনে ফিরে তাকাই নি। মুনীর চৌধুরীর পুরো বক্তৃতাটি বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট : ১–এ সংযোজিত হল।

মুনীর চৌধুরী সম্বন্ধে কিছু বলে এই পর্ব শেষ করব। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মুনীর চৌধুরী ছিলেন আমাদের এখানকার সাংস্কৃতিক জগতের শ্রেষ্ঠ বক্তা। বিখ্যাত নাট্যকার, নাট্য সংগঠক, গল্পকার ও উঁচুমানের সাহিত্যসমালোচকও ছিলেন তিনি। ঐ যুগটাই ছিল বক্তাদের যুগ। রাজনীতির ক্ষেত্রের শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানী, এ. কে. ফজলুল হকের মতো সংস্কৃতিজগতের মুনীর চৌধুরী, অজিত গুহ ছিলেন এই দলের। সেটা ছিল আমাদের জাতীয় জীবনের একটা বিরাট পালাবদলের কাল। একটা দীর্ঘদিনের নিদ্রিত জাতি তখন জেগে উঠে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলেছে। সেই পথে এগোনোর জন্য, জাতির ভবিষ্যৎ সংস্কৃতির রূপরেখা কেমন হওয়া উচিত সে–বিষয়ের জন্য জাতির তখন পরামর্শ, উপদেশ ও দিকনির্দেশনা প্রয়োজন। এই পথনির্দেশের জন্যে তারা দেশের মেধাবী ও সংস্কৃতিবান মানুষদের চারপাশে জড়ো হত, ভিড় করত। বক্তারা সাধ্যমতো তাঁদের সেই পিপাসা ও উৎকণ্ঠা মেটাতেন। সবচেয়ে ফলপ্রসূভাবে সংস্কৃতিজগতের এই পিপাসা মিটিয়েছিলেন মুনীর চৌধুরী। নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাহিত্যসভায় উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁর প্রাণবন্ত ভাষণে সবাইকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। দীর্ঘ শালপ্রাংশু দেহকান্তি ও উন্নত দীপ্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে যখন তিনি মঞ্চের ওপর বক্তৃতা দিতে দাঁড়াতেন তখন তাঁর ভাষণের অনবদ্য নাটকীয়তা, পরিশীলিত ও সঙ্গীতময় শব্দচয়ন; গভীর অন্তর্দৃষ্টি, বৈদ্যুতিক সপ্রতিভতা ও স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকময়তা সবাইকে সম্মোহিত ও অভিভূত করে ফেলত।

ষাটের দশকে এদেশে টেপরেকর্ডার খুব অল্প লোকের কাছেই ছিল। তাঁর বক্তৃতা আমাদের জন্য দরকারি হতে পারে ভেবে আমি (কার কাছ থেকে মনে নেই) একটি টেপরেকর্ডার জোগাড় করে স্যারের বক্তৃতাটি টেপ করেছিলাম। পরে তা অনুলিখন করা হয়। লিখিত আকারে রক্ষিত এটিই সম্ভবত মুনীর স্যারের একমাত্র মৌখিক বক্তৃতা।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি আলবদর বাহিনীর হাতে নিহত হন।

৮

সম্মেলনের উত্তাপ থিতিয়ে আসতে-না-আসতেই একটা নতুন উত্তেজনা আবার আমাদের উষ্ণ করে তুলল। এই উষ্ণতা মান্নানের গল্পগ্রন্থ 'সত্যের মতো বদমাশ'-এর নিষিদ্ধ হওয়াকে কেন্দ্র করে। পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করতে-না-করতেই পূর্ব পাকিস্তানের বেশকিছু বই ও চলচ্চিত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞার খড়্গ নেমে আসে। নিষিদ্ধ হয় বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সংগ্রামী পুরুষ মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর 'জেলে তিরিশ বছর', জহির রায়হানের বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেয়া' ইত্যাদি। এগুলো নিষিদ্ধ হয় রাজনৈতিক কারণে। এদেরই পাশাপাশি নিষিদ্ধ হল মান্নানের 'সত্যের মতো বদমাশ'। তবে অন্যদের মতো রাজনৈতিক কারণে নয়, অশ্লীলতার কারণে। এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে অন্যান্য বই ও চলচ্চিত্র নিয়ে মিছিল মিটিং হল অনেক। কিন্তু সেই উথালপাথাল অনিশ্চিত সময়ে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত একটি বই নিয়ে জনসভা করে প্রতিবাদ করার পরিবেশই বা কোথায় আর এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময়ই বা আছে কার।

আগেই বলেছি, মান্নানের গল্প ছিল খুবই নতুন ও ব্যতিক্রমী। প্রথম থেকেই ওর গল্প পাঠকমহলকে চমকে দিয়েছিল। 'সত্যের মতো বদমাশ' বইটিও ছিল অনিন্দ্য। যেমন তরতাজা, তেমনি শাণিত। বইটির নিষিদ্ধাদেশের বিরুদ্ধে আমরা কী করতে পারি তা নিয়ে আলোচনার জন্যে এক বিকেলে অনেকেই আমরা জড়ো হলাম আমার গ্রিনরোডের বাসায়। বিমর্ষ গলায় অনেকে অনেক কথা বলল। কিন্তু এর প্রতিকারের কোনো সহজ পথ বের করা গেল না। না-পারার কারণ ছিল। ইয়াহিয়া খানের মার্শাল-ল তখন নতুন এসেছে। এর কোনো সিদ্ধান্তকে রাতারাতি উল্টে দেওয়া তখন সোজা নয়। তাছাড়া সামরিক শাসনের ভেতর ব্যক্তিস্বাধীনতা এমনিতেই শৃঙ্খলিত। অনেক ব্যাপার নিয়ে কোর্ট-কাছারির অবকাশ নেই। থাকলেও মান্নান সরকারি চাকরি করে, ওর পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া একটা জায়গায় আমাদের দুর্বলতা ছিল। বইটি নিষিদ্ধ হয়েছে অশ্লীলতার দায়ে। কাজেই এ-ব্যাপারে-যে জনমতকে তাড়াতাড়ি বা সহজে সঙ্গে পাব তার ভরসাও খুব কম। কাজেই পথ একটাই। সংশ্লিষ্ট সরকারি মহলে দেন-দরবার চালানো। কিন্তু তাই বা করে কে? আমাদের একমাত্র ভরসা খালেদা আপা। কিন্তু তিনিও তো তখন রাজনীতি থেকে দূরে। তাহলে উপায়টা কী?

এ-পথে যদি আমাদের এগোতে হয় তবে প্রথমেই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এ-কাজের আসল হোতাটি কে বা কারা? কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া গেল। তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব। তিক্ততা এড়ানোর জন্য তাঁর নামটা এখানে উহ্য রাখছি। পরে তিনি বহুবছর বাংলাদেশ সরকারের সচিব ছিলেন।

আমি উপসচিব মহোদয়ের ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কথায় কথায়

একদিন জানা গেল উপসচিবের স্ত্রী আমার খালাত বোনের বান্ধবী। সেই সূত্র ধরে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে এর প্রতিকারের আবেদন জানলাম। আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে বইটির কিছু কিছু জায়গায় কিছু যৌন-প্রসঙ্গ থাকলেও এটি শিল্পমানসম্পন্ন বলে বইটির ওপর আরোপিত নিষিদ্ধাদেশ পুনর্বিবেচনা করা হোক। তিনি চশমার ভেতর দিয়ে মৃদু হেসে আমাকে বললেন, বইটির শিল্পমান বলে কিছু থাকলে এর অশ্লীলতার দিকটিকে তিনি নিজেই উপেক্ষা করতেন। কিন্তু বইটি যেহেতু শিল্প হিসেবে কোনো মানেরই নয়, তাই তিনি কিছু করতে পারছেন না।

তাঁর কথার উত্তরে বইটির কোথায় কোথায় শৈল্পিক উজ্জ্বলতা আছে তা তাঁর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার কথা তাঁকে গলাতে পারল না। সাহিত্যে অশ্লীলতা কী সে-ব্যাপারে আমলা মহোদয়ের কাছ থেকে বিশদভাবে আলোকিত হয়ে আমি ফিরে এলাম।

ক্ষমতার এটা একটা বড় সুবিধা। মূঢ়তাকে যুক্তির ওপর অনায়াসে তুলে দিয়ে একধরনের গাঁড়ল আত্মপ্রসাদের ভেতর বেঁচে থাকা যায়।

তবে 'সত্যের মতো বদমাশ'-এর ওপর তাঁর এই খবরদারি খুব বেশিদিন টেকেনি। আমাদের একজন বন্ধু ছিলেন, নাম আতাউর রহমান খান। ডাক নাম পুলু। একসময় ঢাকা কলেজে তিনি আমার সহকর্মী ছিলেন, এখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। আতাউর রহমান মানুষ হিসাবে ছিলেন উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর। হঠাৎ তিনি এক অবিশ্বাস্য কাজ করে বসলেন।

১৯৭২ সালের প্রথম দিক। সদ্য স্বাধীনতা হয়েছে। হঠাৎ তিনি এসে খবর দিলেন তাঁর চেনা এক সাংসদকে "সত্যের মতো বদমাশ'-এর ওপর নিষিদ্ধাদেশ তুলে দেয়া হল' বলে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করতে রাজি করিয়েছেন। এর জন্য দিন-তারিখ ঠিক করতে হবে। সবে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে। দেশের নিয়মকানুন সবই ঢিলেঢালা। গণপ্রতিনিধিরাই তখন আইনের বাপ-মা। তাঁর প্রস্তাব পাওয়ামাত্র তাড়াহুড়ো করে জোগাড়যন্ত্রে নেমে গেলাম। নির্ধারিত সময়ে আমরা সবাই স্টেডিয়ামের নিচের তলায় 'প্যাপিরাসে' গিয়ে হাজির হলাম। এলেন সাংসদ স্বয়ং। তাঁর নামটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না। এলেন ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা রওশন আরা রহমান, কবি গোলাম মোস্তফার জ্যেষ্ঠা কন্যা ফিরোজা খাতুন, মান্নান, আতাউর আর আমরা কতিপয় লেখক-সম্পাদক। 'প্যাপিরাস' ছিল সেই সময়কার স্টেডিয়াম এলাকার সবচেয়ে রুচিশীল বইয়ের দোকান। বিদেশের সবচেয়ে কাম্য ইংরেজি বইয়ের মতো কলকাতার সর্বশেষ ও দৃষ্টিনন্দন বই ও পত্রপত্রিকা পাওয়া যেত এখানে। 'কণ্ঠস্বর'ও তারা রাখত।

দোকানের সামনে জড়ো-হওয়া ছোটখাটো জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে সাংসদ ওজস্বী ভাষায় বক্তৃতার পরিসমাপ্তিতে বললেন : 'বাঙালির সংস্কৃতি ও বাঙালির বাক-স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করার চক্রান্তের অংশ হিসেবে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার আমাদের সাহিত্যের অন্যতম সেরা গল্পগ্রন্থ 'সত্যের মতো বদমাশ'কে

নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যে–আদেশ জারি করেছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাগ্রত জনতার পক্ষ থেকে তা বাতিল করা হল।'

বইয়ের অশ্লীলতা এভাবে মোটামুটি হালাল হয়ে গেলে বইটির মুক্তি–সংবাদ পরের দিন ফলাও করে ছবিসহ পত্রপত্রিকায় ছাপা হল। দোকানে, স্টলে বইটিকে আবার দেখা যেতে লাগল। আমাদের আশঙ্কা হল বিজ্ঞ উপসচিব মহোদয় নিকৃষ্ট শিল্পমানের অজুহাতে বইটির ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখার ব্যাপারে আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠেন কি না। তখনো তিনি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েই। কিন্তু পাকিস্তানের বিলুপ্তি তাঁর শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছিল। দেশের অবস্থাও পুরো পাল্টে গিয়েছিল। তাই বইটি শৈল্পিকভাবে যত খারাপই হোক, তখন আর তার করার কিছু ছিল না। দিনকয়েক পরে তাঁর সঙ্গে এক বন্ধুর বাড়িতে দেখা হলে তাঁকে জানালাম, শিল্পমানহীন বইটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে। তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি থেকে বুঝতে পারলাম এই পরাজয়ে তিনি আর যাই হোক, খুব একটা সুখে নেই।

উপবিষ্ট (নীচে, বাম থেকে ডানে) মনসুর মুসা, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ আবু জাফর, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, মহাদেব সাহা, আবুল হাসান। (উপরে) আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবুল কাসেম ফজলুল হক, (পরবর্তী জনের নাম জানা নেই), হুমায়ুন কবির, মোহসীন রেজা, মাহমুদ আবু সাঈদ, সিকদার আমিনুল হক, নির্মলেন্দু গুণ, মোহাম্মদ মোজাদ্দেদ। (দাঁড়িয়ে) আল মনসুর, আসাদ চৌধুরী।

শেষ বাসের যাত্রী

১

বই শেষের দিকে এগিয়ে যাবার সঙ্গে লেখকদের গল্পও এক এক করে শেষ হয়ে আসছে। এই পর্ব জুড়ে চলবে ষাটের দশকের বিদায়ের পালা। প্রথমে শেষ করে যাই ইলিয়াসের প্রসঙ্গ।

ষাটের দশকের শুরু থেকেই ইলিয়াস পুরানো ঢাকার বাসিন্দা। প্রথমে ও থাকত গ্যান্ডারিয়ায়, ১, অভয় দাস লেনে। সূত্রাপুরের লোহার পুল পেরিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিলেই অভয় দাস লেন, তার মুখেই ছিল ওই বাড়িটা। এরপর একে একে বনগ্রাম রোড ও হাটখোলা রোডের বাসা ছেড়ে একসময় উঠে যায় টিকাটুলির ১২/এ কে. এম. দাস লেনে। জীবনের শেষে এক-দুই বছর ছিল ও পুরোনো ঢাকার বাইরে, আজিমপুর কলোনিতে।

ইট-কাঠে ভরা রুক্ষ কর্কশ প্রকৃতিহীন পুরোনো ঢাকার 'অলিগলি, এবড়োথেবড়ো রাস্তা, ভগ্নপ্রায় কোঠাঘর, মিউনিসিপ্যাল হলের নিচের কোলাহল, রাস্তার নোংরা আবর্জনা'—সবকিছুকেই প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ফেলেছিল ইলিয়াস। ঐ সুবিশাল ইটের অরণ্যের উত্তেজনা, ক্লেদ ও হৃৎস্পন্দন অনুভব করেছিল নিজের ভেতরে। নিজের উপন্যাসের নায়কের মতোই ও ছিল সেই রহস্যময় আর অবাস্তব শহরটির চিলেকোঠার নির্জন বাসিন্দা, এর যাবতীয় জীবননাট্যের একান্ত দর্শক ও নিঃসঙ্গ অনুভবকারী। ওর 'চিলেকোঠার সিপাই' ও প্রথম দুটো গল্পের বইয়ে তাই এই শহরের অলিগলি, বস্তি, মহল্লা, মানুষ ও তাদের প্রাণপ্রবাহ এত জীবন্ত আর বাঙ্ময়। কিন্তু এই শহর ওর ব্যক্তিজীবনের একটা দিক মাত্র— এ ওর পরিণত জীবনের পৃথিবী। কিন্তু ওর মনোজগতের আর-একটি ভূগোল ছিল। সে হল বাংলার গ্রামীণ জগৎ—এই-জগতের অলীকতা, বাস্তবতা, সমাজ-ভূগোল-ইতিহাস-রাজনীতি বিধৃত গণমানুষের নিগূঢ় জীবন। এ জগৎকে আমরা পাই ওর 'খোয়াবনামা'য় আর পরের দুটি গল্পগ্রন্থে। এ-জগৎ ওর শৈশবের অবোধ স্পর্শকাতর হৃদয়ানুভূতি ও বিস্ময় দিয়ে আহরিত।

প্রথম ষাটের ঢাকার মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়, আত্মকেন্দ্রিকতা ও উন্মার্গ নাগরিক চেতনা এবং শৈশব-কৈশোরের পরিবার-পরিপার্শ্ব থেকে পাওয়া গ্রামবাংলার জনজীবন ও নিম্নবিত্ত মানুষের বলীয়ান জীবনবোধ ও সংগ্রামমুখিতা—এই দুই বিরোধী ধারাকে ও মিলিয়েছিল ওর লেখায়। এই পরস্পরবিরোধী প্রবণতার দ্বন্দ্বে ও ঐক্যে ওর লেখা তাই অত সম্পন্ন।

আমার ধারণা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর পর আমাদের সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিমান ঔপন্যাসিক ইলিয়াস। কেবল আমাদের এখানকার নয়, কম লিখলেও বাংলাসাহিত্যের সফল ঔপন্যাসিকদেরও ও একজন। তরল জোলো রোমান্টিসিজমের বাইরে গিয়ে জীবনকেও দেখেছে স্পষ্ট কঠোর ও পরিণত মানুষিক চোখে; এর বহুমুখিতা ও গভীরতাকে ধারণ করেছে। এসব জায়গায় ও স্রষ্টার মতো নির্বিকার। কখনো কখনো তার মতো নির্মম।

সব মৌলিক লেখকের মতো ইলিয়াসও অর্জন করেছিল খুবই স্বতন্ত্র একটা ভাষা—যা ছিল নিতান্তই ওর নিজস্ব। তিল তিল করে একে তৈরি করেছিল ও। ওর ক্ষমাহীন ও নির্মোহ জীবনদৃষ্টির মতোই শুকনো খরখরে ও আবেগবর্জিত সেই ভাষা যার ভেতরে ভেতরে বয়ে চলেছে কবিতার রুক্ষ বন্ধুর সাবলীলতা। ভাষার এই রুক্ষ খটখটে সৌন্দর্যের সঙ্গে মিল আছে শহীদ কাদরীর কবিতার, কিছুটা রফিক আজাদের। বাংলাসাহিত্যের লেখকদের মধ্যে এদিক থেকে ওর মিল জগদীশ গুপ্ত ও কমলকুমার মজুমদারের সঙ্গে। আমার ধারণা, ওর কিছু অসাধারণ গল্প এবং উপন্যাসদুটির জন্যে ও সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হবে; বিশেষ করে গ্রামীণ জীবনের উষ্ণতা, গন্ধ, মানবিকতা আর জীবনবোধে সমৃদ্ধ ওর বিচিত্রমাত্রিক ও মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস 'খোয়াবনামা'র জন্যে।

মৃত্যুবোধে আজীবন তাড়িত ছিল ইলিয়াস। এক সাক্ষাৎকারে ও বলেছিল : 'মৃত্যুটা আমাকে খুব হন্ট করে।'... 'আমি প্রতিদিন without any fail স্বপ্ন দেখি এবং আমার স্বপ্নে regular আমার মৃত্যু দেখি। কতবার যে আমার ডেডবডি দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই।' এভাবে মৃত্যুর আশঙ্কা যাকে আজীবন তাড়া করেছে তাকে। কী দীর্ঘ সময় ধরেই না নিজের সত্যিকার ডেডবডি দেখার জন্য প্রতীক্ষা করে যেতে হল।

ওর মৃত্যুর বছর-দেড়বছর আগে হঠাৎ কানে এল ওর শরীর ভালো যাচ্ছে না। কোমরের ঠিক নিচেই পায়ের উপরের দিকে, সারাক্ষণ সায়াটিকার কনকনে তীক্ষ্ণ ব্যথায় ও কষ্ট পাচ্ছে। খবরটা দিয়েছিল রবিশঙ্কর মৈত্রী—আবৃত্তিশিল্পী ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের একসময়কার কর্মী। 'খোয়াবনামা'র পাণ্ডুলিপি তৈরির ব্যাপারে ইলিয়াসকে সহযোগিতা করছিল ও তখন। ঐ অসহনীয় ব্যথা নিয়েই 'খোয়াবনামা' লেখাটা শেষ করে ইলিয়াস। এরপরেই জানা গেল ডাক্তার ভুল করে যাকে সায়াটিকার ব্যথা বলে শনাক্ত করেছিল, সে-ব্যথা সায়াটিকার নয়, ক্যান্সারের। খবর পেয়েই ছুটে গেলাম ওর টিকাটুলির ১২/এ কে. এম. দাস লেনের বাসায়। ওর অসুখের খবরটা সহ্য করতে পারছিলাম না। কেবল মনে হচ্ছিল, এভাবে কতজনকে হারাতে হবে আমাদের আর অকালে?

কিছুদিন আগেই ইলিয়াস এসেছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে। হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সুদর্শন ইলিয়াসের নানান আনন্দমুখর ছবি আমি কদিন আগেও এ্যালবামের পাতা ওল্টাতে গিয়ে দেখেছি। তারও কিছুদিন আগে ১৯৯৫ সালে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ষাটের দশকের

লেখকদের পুনর্মিলনীতেও এসেছিল ও। কী হৈহুল্লোড় আর রঙ্গ-তামাশা করেই না একটা পুরো দিন আমরা কাটিয়েছি।

ঢাকা কলেজে ও আমার সহকর্মী হয়েছিল ১৯৯০-এর দিকে। আমি চাকরিটি ছেড়ে চলে আসার আগ পর্যন্ত ও ছিল কলেজে আমার নিকটতম বন্ধু। ঢাকা কলেজের সেই সময়কার খুশি-আনন্দে ভরা সময়টাও চোখে ভাসতে লাগল। অফুরন্ত উচ্ছল রঙ্গরসিকতা আর প্রাণোচ্ছলতার কী শক্তিই না ছিল ওর মধ্যে। ছিল শ্রদ্ধা করার মতো কী সমুন্নত সমৃদ্ধ অপরাজিত একটা মনুষ্যত্ব! সেই ইলিয়াস আর থাকবে না!

ওর বাসার কাছাকাছি হতেই আমার শরীর অসাড় হয়ে আসতে লাগল। মনে হল কীভাবে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াব? কী অবস্থায় ওকে দেখব? কী বলে সান্ত্বনা দেব? আমার চোখের সামনে ওর অনেকদিন আগের অল্প বয়সের কচি মুখটা ভেসে উঠল। ভেতরটা হুহু করে উঠল।

কিন্তু ওর বাসায় যেতেই ঘটল পুরো উল্টো ব্যাপার। আমাকে দেখেই ও এমনি হৈচৈ করে গালগল্প শুরু করে দিল যে কে বলবে ওর এত কঠিন একটা অসুখ হয়েছে। আমি ওকে ওর অসুখের খবর জিজ্ঞেস করা কী—ও-ই উল্টো আমার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে নিতে আমাকে অস্থির করে ফেলল। যেন রোগটা ওর নয়, আমারই হয়েছে। বুঝলাম, বাইরের হাসি-আনন্দের আড়ালে ভেতরের দুঃখটা সহ্য করার চেষ্টা করছে ও।

এর পর যে-কদিন গেছি ঠিক একই ঘটনা ফিরে ফিরে ঘটেছে। একদিন শুধু বললাম, 'বুঝি না ব্যাপারটাকে এত সহজে কী করে নিচ্ছ? তোমার নার্ভ খুব শক্ত ইলিয়াস।' ও বলল, 'না, সায়ীদ ভাই। মানুষ তো। ভেতরে ভারি কষ্ট হয়।'

অসম্ভব মর্যাদার সঙ্গে মৃত্যুকে মোকাবেলা করে চলল ও। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যাওয়া-আসা করতে হচ্ছিল ওকে। একসময় উরুর ওপর থেকে গোটা পাটাকে কেটে শরীর থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হল। অপারেশন হল কলকাতাতেই। কেমোথেরাপি চলতে লাগল।

আশা নিয়ে ও ফেরত এল ঢাকায়। অনেকগুলো বড় বড় উপন্যাসের ভাবনা তখন ওর মাথায়। এখন কেবল কিছু সময় দরকার। একটানা কয়েকটা বছরের উর্বর পরিসর। না হলে এতসব সমৃদ্ধ জীবনানুভূতিকে কী করে সোনালি আঁটিতে বাঁধবে ও? ওর ভাই খালেকুজ্জামান ইলিয়াসকে ও তখন লিখেছিল : একজন সৃজনশীল লেখকের অন্তত তিন-শ বছর বাঁচা উচিত। না হলে কী করে নিজের সম্পূর্ণতাকে দেওয়া সম্ভব?

কিছু কিছু লেখক আছেন যাদের জীবনবোধ ও শিল্পচেতনা পরিণত হয় তাড়াতাড়ি। বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিম বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর উদাহরণ। কিন্তু কিছু কিছু লেখক আছেন, পরিণতির জন্য যাঁদের পেরোতে হয় অনেক দীর্ঘ পথ, অনেক আহরণ আর বর্জনের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে তাদের সমৃদ্ধির পর্ব। ইলিয়াস ছিল এই ধারার শিল্পী। দীর্ঘ সঞ্চয় আর সংগ্রহের পর ওর সবে শুরু হয়েছিল দেবার পর্ব। সেই সময়েই ও চলে গেল। শিল্পী হিসেবে ওর মৃত্যু হল অপরিণত বয়সে।

ঢাকায় ফিরে এলে ওকে যখন দেখতে গেলাম তখন ও ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছে। কেমোথেরাপির প্রতিক্রিয়ায় সব চুল ঝরে গেছে। ওকে দেখে অসম্ভব বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। কিন্তু ওর সেই চটুল হাসি-তামাসা আর প্রাণোচ্ছলতা একইরকম সজীব। বলল, 'ডান পা'টা কেটে ফেলা হয়েছে। অথচ ঘুমোলেই মনে হয়, পাটা তীক্ষ্ণ ব্যথায় কনকন করছে। এত ব্যথা যে ঘুম ভেঙে যায়। আসলে জানেন, ওটা পায়ের ব্যথা নয়। ঐ পাটা যে এতদিন শরীরের সঙ্গে ছিল, শরীর সে-স্মৃতি ভুলতে পারছে না। তাই মস্তিষ্কের মধ্যে ঐ ব্যথার অনুভূতি হচ্ছে। ঘুমোলে সেটা বাস্তবে টের পাচ্ছি।' অদ্ভুত লাগল শুনে। দেখলাম অপারেশন সফল হওয়ায় ওর ভেতর জীবনপিপাসা নতুন করে জেগে উঠেছে। ওরে অনেক আত্মবিশ্বাসী লাগছে। বলল, 'সুস্থ হলেই একটা নতুন উপন্যাসে হাত দেব। কয়েক দিনের মধ্যে অবশ্য একটা গল্প ধরার ইচ্ছা আছে।'

কিছুদিনের মধ্যেই আজিমপুরে সরকারি বাসা পেয়ে ওখানে উঠে গেল ইলিয়াস। ঐ ভেঙেপড়া রোগা শরীর নিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে কলেজ করতে লাগল নিয়মিত। জীবনে যা-ই ঘটুক, কাজ অবহেলা করা চলবে না—এ ছিল ওর ধর্মবোধের মতো। কর্তব্য করে যাওয়াকে সারাজীবন ও মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ দায়িত্ব বলে মনে করেছে।

কিন্তু সফল অপারেশন আর কেমোথেরাপিও ওকে শেষপর্যন্ত বাঁচাতে পারল না। ক্যানসার এর আগেই ওর শরীরের কিছু কিছু জায়গায় চলে গিয়েছিল। দেখতে দেখতে সারা শরীরে তা ছড়িয়ে পড়ল। একসময় মুখ দিয়ে রক্ত আসতে লাগল ওর। এল ফুসফুস থেকে। এই রোগে এই উপসর্গ খুবই মারাত্মক। তবুও ও স্থির, অবিচল। ওর সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখ আগের মতোই উচ্ছল, মাধুর্যে ভরা। অবিশ্বাস্য মর্যাদা আর অবিচলতার সঙ্গে মৃত্যুকে গ্রহণ করল ইলিয়াস। মৃত্যুর সামনে ওর অম্লান প্রশান্তি দেখে আমার ভয় ধরে যেত। ওর সেই অবিশ্বাস্য মর্যদাবোধের সামনে নিজেকে খুবই তুচ্ছ মনে হত। কী করে একজন মানুষের পক্ষে এ সম্ভব? কাউকে এমনভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে আমি আর দেখিনি।

১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি কমিউনিটি হাসপাতালে ও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে।

২

ষাটের তরুণদের মধ্যে সবশেষে যে ঢাকায় এসে আমাদের সহযাত্রী হয়েছিল সে মহাদেব সাহা। মহাদেব ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ওখান থেকে চিঠিপত্র আর লেখা পাঠানোর মাধ্যমে ও আমাদের একজন হয়ে ওঠে। পড়াশোনা শেষ হলে সময়-সুযোগ বুঝে ঢাকায় চলে আসে, ১৯৬৯ সালে।

চাকরির ব্যাপারে মহাদেবের ভাগ্য ছিল অসম্ভব ভালো। মফস্বল থেকে ঢাকায় আসা ছেলেদের প্রথম দু-চার বছর যে-তীব্র আর্থিক সংগ্রাম করতে হয়, যা করতে

গিয়ে প্রাণান্ত হতে হয়েছিল ওর বন্ধু হাসান বা গুণকে, ও ছিল তা থেকে অলৌকিকভাবে মুক্ত। ওর জন্যে চাকরি যেন ঠিক হয়েই ছিল। শুধু এসে দয়া করে নিয়ে নেওয়া। ঢাকায় আসতেই ও হয়ে গেল সে-সময়কার নামকরা দৈনিক 'পূর্বদেশ'-এর সহ-সম্পাদক। এর কয়েক বছর পর ও যোগ দেয় ইত্তেফাকের সহ-সম্পাদক হিসেবে। এর পর এ নিয়ে আর ওকে ভাবতে হয়নি।

গুণের মতো মহাদেবও ছিল ছ'ফুট লম্বা, ঢ্যাঙা আর একহারা। পার্থক্য এটুকু যে— গুণ ছিল বেপরোয়া আর তীব্র, মহাদেব ছিল বিমর্ষ আর অপ্রতিভ । আজও ওদের চেহারার সাদৃশ্য আমাকে অবাক করে। ছ'ফুট দীর্ঘ, শীর্ণ, একই রঙের পাজামা পাঞ্জাবি পরা শ্বেতশুভ্র দীর্ঘ চুলের এই দুই প্রবীণ কবি যখন একসঙ্গে কোনো কবিতাপাঠের আসর বা কোনো অনুষ্ঠানে যায় তখন তাদের একই বাড়ি থেকে বেড়াতে আসা একই চেহারার দুই সহোদর বলে ভুল হয়। মনে হয় কবিদের দূর ও তুষারাবৃত কোনো সফেদ জগৎ থেকে দীর্ঘদেহী ও শুভ্র এই দুই কবি যেন এইমাত্র নেমে এসেছে ।

একটা স্পর্শকাতর যৌবন রয়েছে মহাদেবের মধ্যে। চাঁদ, ফুল, প্রকৃতি, দেশ, নারী—এসব সুকুমার জিনিশের সাথে সেই অনুভূতিশীল মনের স্নিগ্ধ সমাহারে যেন ওর কবিতার আগাপাশতলা তৈরি। তবে যে-শব্দটি নিয়তির মতো ওর সারাজীবনকে অধিকার করে রেখেছে তা হল 'প্রেম'। ভালোবাসার জন্য একটা অভিমানী মৃদু আহত কাতরতায় ওর কবিতা বিমর্ষ। ওর কবিতার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দ : 'তুমি'। এই তুমিকে নিয়েই ওর সারাক্ষণের বসবাস, এই 'তুমি'র বিষণ্ন অনুভূতি ও নিপীড়নের মধ্যেই ওর বেঁচে থাকা। ওর প্রেমের এই কাতরতা অসংখ্য পাঠকের মন ছুঁয়েছে। আশির, বিশেষ করে নব্বই দশকের দিকে এসে ওর কবিতা অসম্ভব পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই জনপ্রিয়তা ঐ সময়কার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের কথা স্মরণ করায়।

প্রথম প্রথম, ষাট দশকী অবক্ষয়ের আঁচে, ওর কবিতায় কিছু কিছু শারীরিক উপাদান দেখা দিলেও কিছুদিনের মধ্যেই ও ওর নিজের স্বভাবে ফিরে আসে। দেশপ্রেম, প্রকৃতি বা মানুষের জন্য অনুভূতি অনেক আছে ওর কবিতায়। কিন্তু ওর ভেতরকার যা-কিছু ভালো ও হৃদয়স্পর্শী তার একটা বড় অংশ রয়েছে ওর প্রেমের কবিতার মধ্যে। ওর অসহায় ও আত্মকরুণাপরায়ণ প্রেমের একটি ছোট্ট বিষণ্ন কবিতা তুলে দিয়ে ওর প্রসঙ্গ শেষ করছি :

করুণা করেও হলে চিঠি দিও, খামে ভরে তুলে দিও
আঙুলের মিহিন সেলাই
ভুল বানানেও লিখো প্রিয়, বেশি হলে কেটে ফেলো তাও,
এটুকু সামান্য দাবি চিঠি দিও, তোমার শাড়ির মতো
অক্ষরের পাড়-বোনা একখানি চিঠি।
চুলের মতোন কোনো চিহ্ন দিও বিস্ময় বোঝাতে যদি চাও ...
বর্ণনা আলস্য লাগে তোমার চোখের মতো চিহ্ন কিছু দিও !

আজো তো অমল আমি চিঠি চাই, পথ চেয়ে আছি,
আসবেন অচেনা রাজার লোক
তার হাতে চিঠি দিও, বাড়ি পৌঁছে দেবে ...
এমন ব্যস্ততা যদি শুদ্ধ করে একটি শব্দই শুধু লিখো, তোমার কুশল !...
করুণা করে হলেও চিঠি দিও, ভুলে গিয়ে ভুল করে একখানি চিঠি
দিও খামে
কিছুই লেখার নেই তবু লিখো একটি পাখির শিস
একটি ফুলের ছোট নাম,
টুকিটাকি হয়তো হারিয়ে গেছে কিছু হয়তো পাওনি খুঁজে
সেইসব চুপচাপ কোনো দুপুরবেলার গল্প
খুব মেঘ করে এলে কখনো কখনো বড় একা লাগে, তাই লিখো
করুণা করেও হলে চিঠি দিও, মিথ্যা করেও হলে বোলো, ভালোবাসি।

[চিঠি দিও]

৩

এবার শুরু হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে মান্নানের গল্পও। আমাদের দলের অন্যতম সুদর্শন মান্নান। ১৯৬৭–৬৮–এর দিকে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখেছিল। ওতে ওকে মানিয়েছিল বেশ। 'সত্যের মতো বদমাশ' নিষিদ্ধ হলে আমার বাসায় মিটিঙের পর আমরা সবাই মিলে যে–গ্রুপ ছবি তুলেছিলাম তাতে ওর সেই দাড়িওয়ালা চেহারাটা রয়েছে।

একটা জায়গায় মান্নানের সঙ্গে আমার খুব গাঢ় মিল আছে। ব্যাপারটা যত হাস্যকরই শোনাক তবু আমরা দুজন এই মিলটাকে প্রাণভরে উপভোগ করি। আমরা দুজনেই সিংহরাশির জাতক। তবে জাতক–টাতক ভুলে গিয়ে কিন্তু আস্ত সিংহ হিসেবেই নিজেদের ভাবতে আমরা ভালোবাসি। এই হাস্যকর বাহাদুরি দিয়ে নিজেদের সবার সামনে হাস্যাস্পদ করতে খুশি হই। কেউ যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে আপনি কোন্ রাশি, আমি চোখ নাচিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করি, 'কোন্ রাশির বলে মনে হয়? মেষ–টেষে মতো মনে হয় কি?' প্রশ্নকর্তা যখন কিছুটা ধাঁধায় পড়েন, তখন তাকে বিজ্ঞের মতো জ্ঞান দিয়ে বলি, 'সিংহরাশি সাহেব, সিংহরাশি। ভাবসাব দেখেও বুঝতে পারেন না?'

১৯৭১ সালে একদিন সন্ধ্যায় আমি আর মান্নান রিকশা করে ইউনিভার্সিটির ভেতর দিয়ে জগন্নাথ কলেজের দিকে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা ঐ কলেজেই চাকরি করতাম। হঠাৎ একটা বিশাল গাড়ি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে কোনোমতে ব্রেক কষে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে পালিয়ে গেল। গাড়িটা পালাতেই মান্নানকে বললাম, 'গাড়িটা

আমাদের ধাক্কা দিতে এসে ওভাবে হঠাৎ সালাম ঠুকে দৌড় দিল কেন জান? ব্যাটা প্রথমে বুঝতেই পারেনি দু-দুটো জলজ্যান্ত সিংহের সামনে পড়ে গেছে। বুঝতেই দেখ দৌড়টা দিল কীভাবে।' মান্নানের কথা জানি না, কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রে আমার কোনোরকম বিশ্বাস নেই, তবু আমরা দুজন একসঙ্গে থাকলে নিজেদের সিংহত্বের কথা ফলাও করে বলে বেড়িয়ে সবাইকে উৎফুল্ল করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালাই।

মান্নানের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রায় আটত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে। বয়সের অনেক দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেছি আমরা। আমাদের দুজনেরই বিদায়ের সময় এগিয়ে এসেছে; কেবল জানি না আমাদের মধ্যে কে আগে যাব। মান্নান প্রায়ই বলে, আমাদের মৃত্যু দিয়ে ঠিক হবে আমাদের কে গ্যেটে ছিল কে শিলার। না,আমরা কেউ গ্যেটে বা শিলার নই। তাঁদের মতো অমরদের দলের নই আমরা। এ নেহাত বোঝাবার জন্যে উপমা দিয়ে বলা একটা কথার কথা। তবু এই উপমায় নিজেদের ভাবতে আমার ভালো লাগে। মানুষ সবাই বড় বা স্মরণীয় হয় না। কিন্তু অবস্থানের দিক থেকে পুরোপুরি অসম মানুষদের ভেতরেও–যে কখনো কখনো একইরকম মিল দেখতে পাওয়া যায়, এও তো একেবারে অমূলক নয়।

৪

'কণ্ঠস্বর'–এ 'ক্রাইসিস' নামের মাত্র একটি গল্প লিখলেও যাকে আমরা আমাদের সগোত্র মনে করেছি তিনি আবদুশ শাকুর। ষাটের দশকের প্রথমদিকে 'সমকাল'–এ প্রায় নিয়মিত একটা বইয়ের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ত। বিজ্ঞাপনের ওপরের লাইনে বড় বড় হরফে লেখা 'ক্ষীয়মাণ' আর তার নিচেই 'আবদুশ শাকুর'। বিজ্ঞাপনটার দিকে তাকালেই একজন ক্ষীয়মাণ আবদুশ শাকুরের বিলীয়মান করুণ চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠত। আমাদের মুখে মুখে তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল 'ক্ষীয়মান' আবদুশ শাকুর। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর 'ক্ষীয়মাণ' বইটি হাতে আসতেই টের পেলাম এ বইয়ের লেখক ক্ষীয়মাণ তো ননই, বরং অতিমাত্রায় 'বিবর্ধমান'। তাঁর গল্প আমাকে প্রায় অভিভূত করে ফেলল। গল্পের মৌলিকতা, বুদ্ধির দীপ্তি, মানবিক বোধের গাঢ়তা সত্যি সত্যিই প্রত্যাশা জাগায়।

অনায়াসেই তিনি হতে পারতেন ষাটের সাহিত্যযাত্রায় আমাদের সহযাত্রী। জীবনদৃষ্টিতে, শিল্পবোধে, নান্দনিক সচেতনতায়, শব্দের নিরন্তর অতৃপ্ত নিরীক্ষায়— সবদিক থেকেই তিনি ছিলেন আমাদের সগোত্র। কিন্তু প্রথমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় ও পরে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়ায় সেই–যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, নব্বই দশকের আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আর হদিশ পাওয়া গেল না।

অনিঃশেষ বিস্ময়বোধ নিয়ে আবদুশ শাকুরকে সবসময় আমি লক্ষ করেছি। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় যেমন তিনি বিদ্যুৎদ্যুতিময় তেমনি তাঁর লেখার পারগতায়। আরবি, ফারসি, ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর পড়াশোনাও বিস্ময়কর ও বিচিত্রমাত্রিক। শিল্পের জন্য তাঁর ভেতরে রয়েছে এক অন্তহীন নিরন্তর উন্মাদনা। একেক সময় শিল্পের একেক শাখা নিয়ে মেতে উঠেছেন তিনি। ষাটের দশকে তিনি অভিনন্দিত হয়েছিলেন সফল গল্পকার হিসেবে। সত্তরের দশকে তাঁকে দেখা যায় রম্যরচনার প্রতিভাবান স্রষ্টা হিসেবে। তাঁর এ সাফল্য খুবই উঁচুমানের। এরপরে মেতে ওঠেন তিনি উপমহাদেশীয় সঙ্গীত নিয়ে। সঙ্গীতের চর্চা ও পড়াশোনার ফলে সঙ্গীতরসবেত্তার পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। একসময় গোলাপের চর্চা করতে গিয়ে পৃথিবীর তাবৎ জাতের গোলাপে বাগান ভর্তি করে ফেলেছিলেন। আজও সে মত্ততা তার কাটেনি। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে অবসর নিয়েছেন, কিন্তু ধর্মে খুব–একটা মতি এসেছে বলে মনে হয় না। আগামীতে কী নিয়ে তার হৃদয় মেতে ওঠে তা দেখার জন্যে আমরা উদগ্রীব হয়ে আছি।

৫

ষাটের দশকের আরও কতজনেই না লিখেছিল এই সময়ের 'কণ্ঠস্বর'–এ ! আজ ২০০১ সালের হেমন্তের এই স্নিগ্ধ সকালে তাদের কথা লিখতে বসে কী আশ্চর্য সজীবভাবে তাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

মনে পড়ছে মাহমুদুল হকের কথা। গাঙচিল প্রেসে 'কণ্ঠস্বর' ছাপতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। রামকৃষ্ণ মিশন রোড এলাকার ছোট্ট ঐ প্রেসটির অন্যতম মালিক ছিলেন তিনি। প্রথমদিন গাঙচিল প্রেসে গিয়েছি, হঠাৎ কিছুটা দূর থেকে দেখি প্রেসের সামনের খোলা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে মাহমুদুল হক চুল–ভুরু–পাকা খুশি–ডগমগ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। কাছে যেতেই ভদ্রলোক প্রসন্ন খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে প্রাণবন্তভাবে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। ভদ্রলোকের উচ্চতা মাঝারির চেয়েও কম, ত্বক খসখসে,শরীর রোগা, কষ্টকর হাঁপানিতে ভুগছেন কিন্তু সারাক্ষণ আনন্দে–উৎসাহে থৈ থৈ করছেন। স্বভাবের আর চেহারার এমন বিরোধ খুব কমই দেখা যায়। তাঁর বয়স এমন কিছু নয়, খুবজোর ছত্রিশ–আটত্রিশ, কিন্তু পাকা চুল পাকা ভুরুর জন্যে একেবারে অশীতিপর বলে মনে হয়। এমন আজন্ম বৃদ্ধ মানুষ আমি এ–জীবনে আর দেখিনি। আমার কেবলি মনে হতে লাগল, চুলে ভুরুতে একটু কলপ দিলেই তো তাঁকে তরুণ দেখাতে পারে ! কেন তিনি এটুকু করেন না ? পরে বুঝেছিলাম, এর কোনো দরকারই তাঁর নেই। এমন অফুরন্ত সজীবতা তাঁর ভেতর সারাক্ষণ মৌ মৌ করছে যে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার আধ–মিনিটের মধ্যেই চোখের সামনে থেকে তাঁর সেই বয়স্ক চেহারাটা মুছে গিয়ে একজন তরতাজা

সপ্রাণ মানুষের চেহারা জেগে ওঠে, জীবনের উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে যার কোনো যোগই নেই। আমার মনে হল ভদ্রলোক নিজেও হয়তো কথাটা জানেন। পরিচয় হলে জানলাম তিনি মীজানুর রহমান, এই প্রেসেরই অন্য পার্টনার। দুজনের সঙ্গেই বেশ ভাব জমে গেল। মাহমুদুল হকের সঙ্গে না হলেও মীজান ভাইয়ের সঙ্গে আমার সেই সম্পর্ক আজও রয়েছে।

সত্যি সত্যি কতটা প্রাণশক্তি, নিমগ্নতা, নিষ্ঠা আর অঙ্গীকার–যে ছিল মীজান ভাইয়ের মধ্যে তা টের পাওয়া গেল যখন তিনি তাঁর সম্পাদনায় 'মীজানুর রহমানের পত্রিকা' বের করলেন। দীর্ঘ বিশ বছর ধরে পত্রিকাটি প্রায় একটানা চালাচ্ছেন তিনি। উচ্চাঙ্গের এই পত্রিকাটির প্রকাশনামান যেমন উঁচুমাপের তেমনি এর কলেবরও বিপুল। একটি উন্নতমানের স্ট্যান্ডার্ড ম্যাগাজিন বলতে যা বোঝায় এই পত্রিকাটি তাই। এর বিশেষ সংখ্যাগুলো খুবই অসাধারণ। যে শ্রম, নিষ্ঠা ও সাধনাকে তিনি এই পত্রিকার জন্যে নিয়োজিত করেছেন তার সমান কোনোকিছু আমি গত কয়েক দশকে দেখিনি। আশির দশকের পর যখন আমাদের এখানকার সাহিত্যিক সৃজনশীলতায় ভাটার টান চলছে সে–সময় কী করে তিনি যে এমন একটি পত্রিকা এতদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন তা আজও আমার কাছে বিস্ময়। কত থেমে–যাওয়া লেখককে তিনি–যে আবার জ্যান্ত করেছেন, কত অলেখককে–যে উৎসাহ দিয়ে লেখক বানিয়েছেন, কত নতুন ও অভাবিত বিষয়ে লিখতে–যে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। মাতালের মতো, আত্মবিস্মৃতের মতো পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন তিনি। নিজের বৈষয়িক লাভালাভ, সুখ–দুঃখ কোনোকিছুর দিকে না–তাকিয়ে এর মধ্যে নিমগ্ন থেকেছেন। সত্যিকারের বেদনা ছাড়া এমনভাবে কাজ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে সুযোগ পেয়ে তাঁর প্রতি আমার অন্তরের একান্ত শ্রদ্ধা জানিয়ে রাখলাম।

মাহমুদুল হক ছিলেন আশ্চর্য মানুষ। যেমন তাঁর পেশা ছিল অদ্ভুত, তেমনি ছিলেন নিজে। পারিবারিকভাবে তাঁদের সোনার দোকান ছিল। বায়তুল মোকাররমের তাসমিন জুয়েলার্সে তিনি নিয়মিত বসতেন। এভাবে ব্যবসার মধ্যে হেজে–যাওয়া একজন মানুষ যে কীভাবে লেখক হতে পারে আমি বুঝে উঠতে পারতাম না। বয়সে খুব সম্ভবত আমার সমানই ছিলেন তিনি। তাঁর চোখ ছিল বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের মতো খরখরে ও অন্তর্ভেদী। তাঁকে দেখলে মনে হত স্থির নিস্পৃহ চোখে আমাদের সব জারিজুরি দেখে চলেছেন। আমার কাছে তাঁকে খুবই রহস্যময় লাগত। বহুবারই তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে কিন্তু কখনো তাঁর ভেতরকার মানুষটিকে বুঝে উঠতে পারিনি। ১৯৬৭–এর দিকে 'কণ্ঠস্বর'–এ তিনি 'মনসা মাগো' নামে একটা চমৎকার গল্প এবং 'মেস্ফিসে' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। এর পরে তাঁর ব্যক্তিগত স্বভাবের মতোই দূর–ব্যবধানে সরে গিয়েছেন। সত্তরের দশকে তাঁর উপন্যাস 'জীবন আমার বোন' বেরোলে তা নতুনত্ব ও মৌলিকতার জন্য পাঠকমহলে হৈচৈ ফেলে। আশ্চর্যরকম আধুনিক ছিল তাঁর জীবনবোধ। ভাষাও ছিল খুবই লাবণ্যময়। তার 'যেখানে খঞ্জনা পাখি' আর 'অপুর পাঠশালা' উপন্যাসদুটিও খ্যাতি পেয়েছিল।

৬

'কণ্ঠস্বর'-এ খুব-একটা না লিখলেও ষাটের দশকে যাঁরা আমরা খুব কাছাকাছি ছিলাম, আহমদ ছফা তাদের একজন। কাছাকাছি থাকলেও কোথায় যেন নিজেকে একটু আলাদা করে রাখতেন তিনি। মনে হত একটু যেন বেশিরকম মনোযোগ আর খায়খাতির দাবী করছেন আমাদের কাছে। আমি এর কারণ বুঝতাম না। তাঁকে আমার কাছে অস্বস্তিকর রকমে পায়াভারী মনে হত। বুঝতাম না যে এটা তাঁর ইচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়, তাঁর ভেতরকার নানান মানসিক জটিলতাই তাঁকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। উনি হয়তো আসলে আমাদের কাছ থেকে কিছুটা বাড়তি মমতা আর স্বীকৃতি চাইতেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা দুঃখকষ্টে পোড়-খাওয়া একজন স্পর্শকাতর স্বজনহীন যুবক নগরের মানুষদের কাছে যা চাইতে পারে, তাই। হয়তো আর-একটু আদর পেলেই গলে গিয়ে আমাদের সঙ্গে একাকার হয়ে যেতেন। কিন্তু কেন-যে বিশেষ করে একজনকে এমন আলাদাভাবে মাথায় তুলে রাখতে হবে তার কারণ আমি বুঝে উঠতে পারতাম না। মানুষের অভিমান বা অসহায়তা বোঝার মতো বয়স আমার তখন হয়নি। আমাদের সেই কোলাহল-মুখরিত হট্টগোলের জগতে কারো এ-ধরনের আলাদা সমস্যার দিকে নজর দেবার মতো পরিবেশও ছিল না। ফলে নিজের নীরব অভিমানের ভেতর তিনি একটু একটু করে আমাদের থেকে দূরে সরে যান।

এ ছাড়াও, আমার ধারণা, আমাদের সঙ্গে একটা মৌলিক জায়গাতেও তাঁর পার্থক্য ছিল। ষাটের তথাকথিত-সাহিত্য-আন্দোলনটা ছিল আসলে একটা শৈল্পিক আন্দোলন, নান্দনিক শুদ্ধতা আর মনন ছিল তার অন্যতম মূল আরাধ্য। কিন্তু শৈল্পিক পরিস্ফুতি ছফার অগ্রাধিকারের বিষয় ছিল না। বক্তব্যকে তীব্রতা দেবার দিকেই ছিল তাঁর মূল ঝোঁক, লেখার নিটোলতার বা যত্নপরতার দিকে নয়।

বছর-কয়েক আগে কথাপ্রসঙ্গে আমাকে তিনি বলেছিলেন গত পঞ্চাশ বছরে একমাত্র সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গদ্যকেই তিনি আদর্শ বলে মনে করেন। তাঁর এই কথা থেকে বুঝতে পারা যায় যে শরৎচন্দ্র তারাশঙ্কর বাহিত প্রাঞ্জল ও সজিব গদ্যই ছিল তাঁর আদর্শ। আমাদের সঙ্গে এইখানে তাঁর একটা বড় ধরনের ফারাক ছিল। তাছাড়া আমাদের ধারাটাই ছিল সাহিত্যকেন্দ্রিক, তা সে যত ভিন্ন ভাবনা বা মতাদর্শেরই সমবায়েই হোক-না কেন। কিন্তু ছফার মূল প্রবণতা ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক,যদিও এর পাশাপাশি সাহিত্যরচনাতেও তিনি ছিলেন উৎসাহী। তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক প্রবন্ধের পাশাপাশি বেশকিছু ভালো উপন্যাসও লিখেছেন ছফা। তবু আমার ধারণা প্রবন্ধের চাইতে উপন্যাসেই তাঁর সাফল্য বেশি। তাঁর 'ওঙ্কার' ও 'পুষ্প ও বিহঙ্গপুরাণ' উপন্যাস হিসেবে সুসংহত ও গাঢ়। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাককে নিয়ে তাঁর লেখা 'যদ্যপি আমার গুরু' বইটিও বেশ উজ্জ্বল। ঔপন্যাসিকের শক্তি দিয়ে তিনি কৃতী অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের যে-প্রাণবন্ত ছবি এঁকেছেন তা অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকে জীবন্ত করে রাখবে।

ব্যক্তিগতভাবে আহমদ ছফা ছিলেন উষ্ণ হৃদয়সম্পন্ন,তীব্র ও উজ্জ্বল মানুষ। জীবনের সঙ্গে কিছু কিছু জায়গায় আপোষ করলেও তাঁর ভেতরকার আত্মসম্মানবোধ ছিল তীক্ষ্ণ ও অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর। সরাসরি লোকসান জেনেও নিজের বিশ্বাসের জায়গা থেকে সরে না-আসার ব্যাপারে তিনি অনমনীয় ছিলেন। 'কণ্ঠস্বর'-এর লেখা ছাপার সময় তাঁকে আমি বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেছিলাম যে 'ছফা' শব্দটির যা আসল উচ্চারণ, তা লিখতে গেলে ঐ শব্দটির বানান বাংলায় 'ছফা' না লিখে 'সফা' লেখা সমীচিন। তিনি আমার প্রস্তাব মানতে রাজি হননি। পরে শুনেছিলাম কোনো-এক সম্পাদক তাঁকে না-বলে তাঁর নামের বানান পাল্টে দেওয়ায় তিনি নাকি খুবই চটে গিয়েছিলেন। সম্পাদককে গিয়ে বলেছিলেন : এই নাম রাখার জন্য আমার জন্মের পর গরু জবাই করে তিন গ্রামের লোককে খাওয়ানো হয়েছিল। এই নাম এত সহজে পাল্টানো যাবে না।

এমনি একটা প্রচণ্ড জেদ ছিল ছফার ভেতর। এই জেদই চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তাঁকে করে তুলেছিল ব্যতিক্রমী ও অনন্য। কারো মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি কখনো কথা বলেননি। এইজন্য আমাদের যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর ছিল স্বকীয় অবস্থান। তাঁকে আমার ঠিক মননধর্মী বা চিন্তাশীল মানুষ বলে মনে হয়নি। তিনি ছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত ও হৃদয়বান ধারার মানুষ। কথা বলতেন অনুপ্রাণিত কবিদের মতো। কবিদের কল্পনাপ্রবণ উক্তি থেকে যে-ধরনের চড়া রঙ ও সহজাত সত্য বিচ্ছুরিত হয়, তাঁর কথাও ছিল তেমনি।

আহমদ ছফার চলাফেরা ছিল খুবই বিচিত্র । জীবনের শেষপর্বে তাঁর জীবন কিছুটা নিয়মের মধ্যে এলেও সবসময়েই তিনি ছিলেন বেহিশেবি বোহেমিয়ান চরিত্রের। তাঁর জীবন-জীবিকা সবকিছুই প্রায় ছিল অনিশ্চিত। একেকবার এক এক রূপে তাঁকে আমরা দেখেছি। একবার দেখা গেল কাঁধে একটা টিয়া নিয়ে তিনি সবখানে ঘরে বেড়াচ্ছেন। একবার সঙ্গীত, একবার পত্রিকা সম্পাদনা এমনি নানান ব্যাপার নিয়ে তিনি নানান সময়ে মেতে উঠেছেন। প্রকৃতি ও শিশুদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর মমতা। একবার আমাকে তিনি বলেছিলেন একদিন কারফিউ-এর সময় আমার মেয়ে লুনাকে--ওর বয়স তখন বছর চারেক—জানালা দিয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' বলে চিৎকার উঠতে দেখে তার মাথায় 'ওঙ্কার' উপন্যাস লেখার ভাবনা এসেছিল। প্রতিষ্ঠার ব্যাকুলতাও ছিল তাঁর অস্থিমজ্জায়। প্রবলভাবে আবেগতাড়িত ছিলেন বলে সুস্থির জীবনের মধ্যে নিজেকে কোনোভাবেই প্রায় গুছিয়ে তুলতে পারেননি।

ছফার মৃত্যু ঘটল কিছুটা আকস্মিকভাবে। বেশ কিছুদিন থেকে নানান অসুখে ভুগছিলেন তিনি। আগে একবার হার্ট এ্যাটাকও হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে যে হার্ট এ্যাটাকটা হল তা হল নিয়তির মতোই অমোঘ। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে গেলেন তিনি। খবর পেয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতাতে তাঁকে দেখতে গিয়ে তাঁর প্রাণহীন মৃত দেহ দেখলাম। অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ভরা তাঁর গনগনে জীবনের কোনো চিহ্ন সেখানে নেই।

৭

ষাটের দশকে আমাদের সহযাত্রী হলেও যার প্রবন্ধ ও অনুবাদ 'কণ্ঠস্বর'-এ মূলত ছাপা হয়েছিল, সত্তরের দশকে এসে তিনি আবুল কাসেম ফজলুল হক। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় খুব সম্ভব ১৯৬৮-এর জুন-জুলাই মাসে। চীনপন্থী বিপ্লবী রাজনীতির তিনি তখন একজন তরুণ সক্রিয় কর্মী। ফজলুল হক থাকতেন এলিফ্যান্ট রোডের সায়েন্স ল্যাবরেটরির গেটের উল্টোদিকে গোটাকয় বাড়ির কিছুটা ওধারেই। আজ কে এ-কথা বিশ্বাস করবে যে এই জায়গায়, যেখানে আজ বিরাট বিরাট ইমারত উঠে আকাশকে ঢেকে রেখেছে সেখানে বেশ একটা বড়সড় জলা জায়গার মাঝখানে টিনের চালওয়ালা একটা একতলা ছোট্ট বাড়িতে তিনি তাঁর সহপাঠী আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য) সঙ্গে থাকতেন, যে-বাড়িতে পৌঁছোতে একটা লম্বা বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে বেশ অনেকদূর হেঁটে তবে পৌঁছোতে হত।

ফজলুল হক আজীবন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিবাদী মানুষ। উদার সহজ ও মানবিক চোখে তিনি সবকিছুকে দেখতেন। তাঁর মার্কসীয় সহযোদ্ধাদের মধ্যে যে-সংকীর্ণতা আর একদেশদর্শিতার একগুঁয়েমি ছিল তিনি তা থেকে ছিলেন মুক্ত। 'কণ্ঠস্বর'গোষ্ঠীর উদ্ভব-যে কিছুসংখ্যক বিকারগ্রস্ত তরুণের উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল চিৎকারের কারণে নয় কেবল, এ যে সেকালের সমাজের বাস্তব প্রেক্ষাপট থেকে জেগে-ওঠা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা তা তিনি বুঝতেন। তাঁর এই উদারতা আমাদের কাছাকাছি নিয়ে আসে। কেবল সাহিত্য-ব্যাপারে নয়, ব্যক্তিগতভাবেও আমাদের দূরত্ব কমে যায়।

তখন তিনি বাংলা বিভাগে খুব সম্ভব এম. ফিল করছিলেন। একদিন তাঁর সঙ্গে বাংলা সেমিনারে গিয়ে তাঁর বিভাগেরই অন্য একজন এম. ফিলের ছাত্রী, ফুটফুটে শান্ত চেহারার প্রিয়দর্শিনী ফরিদা প্রধানকে চোখে পড়ে। তাঁকে আমার ফজলুল হকের প্রেমিকা বা ভবিষ্যৎ স্ত্রী হিসেবে ভাবতে ইচ্ছা করে। আমি ফজলুল হককে তাঁর ব্যাপারে উৎসাহী করে তোলার চেষ্টা করি। ফজলুল হকের কথা থেকেও আঁচ করা যায় যে আমার কথার আগে থেকেই তিনি ব্যাপারটা নিয়ে অনেকদিন হল বিষণ্ন হয়ে রয়েছেন। আমার ধারণা কেবল ফজলুল হক নন, ফরিদা প্রধানের অবস্থাও ছিল একইরকম। ফলে বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই তাঁদের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে যায়।

সত্তর সালের শীতের কোনো-এক দিনে ফজলুল হকের কিছু আত্মীয়ের সঙ্গে আমরা একদঙ্গল তরুণ (যাদের অনেকেই আজ খ্যাতিমান) বরযাত্রী হয়ে ট্রেনে করে কনের বাড়ি রংপুরের চিলাহাটির উদ্দেশে রওনা হলাম। বিবাহিত ছিলাম বলে দলের মধ্যে আমিই শুধু গিয়েছিলাম সস্ত্রীক। লুনাও ছিল আমাদের সঙ্গে, ওর বয়স তখন তিন কি চার। গল্পগুজব আর আড্ডার মত্ততায় ভরা সেই মুখর রেলযাত্রা আমার জীবনের অন্যতম আনন্দময় সময়ের একটি। চিলাহাটির কনকনে শীতের রাতে ফজলুল হকের ব্যবসায়ী শ্বশুরের বাড়ির বিশাল বৈঠকখানার মাটিতে পেতে দেওয়া বিছানায় নতুন লেপের নিচে সারবেঁধে ঘুমিয়ে থাকার অদ্ভুত অনুভূতি, সারা দুপুর ধরে

গাছগাছালির ভেতর দিয়ে বন্দুক কাঁধে ঘুরে-বেড়ানোর রোমাঞ্চকর স্মৃতি, জলা গোছের একটা জায়গায় এক গুলিতে তিনটা বক মেরে ফিরে আসার উত্তেজনা—সব মিলিয়ে সেই যাত্রাটা মনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

ফজলুল হকের প্রথম প্রবন্ধের বই 'কালের যাত্রার ধ্বনি' বেরোয় এই সময়েই। বইটিকে বই না বলে পুস্তিকা বলাই ভালো। পৃষ্ঠাসংখ্যা তিরিশ-চল্লিশের বেশি নয়। কিন্তু ছোট হলেও আমার ধারণা, তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্যে এটিই সেরা। তাঁর সারাজীবনের চিন্তার সারমর্ম রয়েছে এতে। যুগের নৈতিক অধঃপতনে তাঁর অন্তরের রক্তক্ষরণ এই বইয়ের অক্ষরে অক্ষরে মুদ্রিত।

আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে কালের অধঃপতন যাঁকে সবচেয়ে বিষণ্ন করেছে তিনি ফজলুল হক। এজন্যে তিনি বারে বারে ফিরে তাকিয়েছেন উনিশ শতকের দিকে। উনবিংশ শতাব্দিতে বাঙালির নৈতিক আদর্শ যে-অসাধারণ শিখরকে স্পর্শ করেছিল তাকে আমাদের যুগে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর প্রায় সব লেখা এই বেদনা আর স্বপ্নচারিতায় আর্দ্র।

লেখালেখির পাশাপাশি তাঁর সম্পাদিত মাসিক 'লোকায়ত' পত্রিকার ভেতর দিয়ে জীবনের এই উচ্চতর বৈভবের তিনি সন্ধান করেছেন। যে-একাগ্রতার সঙ্গে দীর্ঘ বিশ বছর ধরে তিনি এই পত্রিকাটি বের করেছেন, এর জন্য যে-বাস্তব পরিশ্রম করেছেন তা তাঁর মতো একজন পুরোপুরি অবৈষয়িক ও ভাবজগতের মানুষের পক্ষে কতখানি দুঃসাধ্য তা আমি অন্তত বুঝতে পারি। খুব বড় ধরনের অঙ্গীকার ছাড়া এটা সম্ভব নয়। তিনি-যে কেবল এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেই তাঁর দায় শেষ করেছেন তাই নয়, নিয়মিত সাহিত্যআসর ও ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তরুণ-লেখকদের সংগঠিত করে তাদেরকে সেই আদর্শের দিকে অনুপ্রাণিত করতেও আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এই রজতসর্বস্ব আত্মাবর্জিত যুগে যে-গুটিকয় মানুষ এখনও তাঁদের উদ্দেশ্যের দিকে পুরোপুরি নিবেদিত তিনি তাঁদের একজন।

৮

আমাদের মধ্যে কে এমন—যিনি হোটেল নাইল ভ্যালির দিনগুলো থেকে ষাটের সাহিত্য আন্দোলনের শেষদিন পর্যন্ত সব ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সব কর্মকাণ্ডে আমাদের সঙ্গে থেকেছেন, যাঁর নামের সঙ্গে আমরা এরই মধ্যে দুবার পরিচিত হয়েছি। আজও জীবনের এই অপরাহ্ন বেলা পর্যন্ত যিনি সান্নিধ্য বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞ করছেন, নিজে যিনি একজন কৃতিমান প্রবন্ধকার এবং ভালো মাপের অনুবাদক—কিন্তু 'কণ্ঠস্বর'-এ কখনো লেখেন নি বা এ ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহীও দেখা যায় নি? তিনি জ্যাক সিরাজী। অনুভূতিশীল, জাগ্রত ও ভাবুক জ্যাক সিরাজী বহু বিষয়

নিয়ে চিন্তা করেছেন। তাঁর সুখপাঠ্য ও সাবলীল বইগুলোতে তার পরিচয় আছে। তিনি ইংরেজি লেখেন মাতৃভাষার মতো। তাই কেবল ইংরেজি থেকে বাংলায় নয়, বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদেও তিনি চমৎকার ও উপভোগ্য। সুসাংবাদিক জ্যাক সিরাজী বিশশতকী পাশ্চাত্য আধুনিকাকে রক্তে মাংসে ধারণ করেছেন।

আমাদের যুগের যুক্তিবাদ, মানবিকতা ও উচ্চতর সাহিত্যের স্বপ্নে তিনি ছিলেন গভীরভাবে বিশ্বাসী। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের দিনগুলোতেও তাকে সহযাত্রী হিশেবে পেয়েছি আমি। সৌজন্যমধুর, সুহৃদয়সম্পন্ন, উচ্চতর পিপাসাসম্পন্ন জ্যাক সিরাজীর কাছে এই উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাই

৯

ঐ সময়কার আর যাদের কথা খুব করে মনে পড়ে, দোহারা গড়নের মাঝারি উচ্চতার হাসিখুশি শাহনূর খান তাদের একজন। মিষ্টি কবিতা লিখত শাহনূর। নাটকের দিকেও ছিল ওর ঝোঁক। গল্পও লিখেছিল দুয়েকটা। থাকত আমার বাসার খুব কাছেই। ওর বাবা নাট্যকার শাহাদাত আলী খানের অকালমৃত্যুর পর আমি ওদের পরিবারের খুবই কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম। শাহনূরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল রসরসিকতার। আমার টিভি-অনুষ্ঠান তখন খুবই জনপ্রিয়। আমার ছোটভাই আল মনসুরও তখন জনপ্রিয় অভিনেতা। আমার এক মামাতো বোন তখন মিষ্টি চেহারার ঘোষিকা হিসেবে সবার মন কেড়েছে। একদিন শাহনূর ব্যঙ্গ করে সবার সামনে বলল : বাংলাদেশ টিভিকে আপনারা তো আপনাদের ভাইবেরাদারের সম্পত্তি করে ফেললেন। আমি বললাম : শাহনূর, ভাগ্য ভালো যে এটা আমাদের ভাইবেরাদারদের সম্পত্তি হয়েছে, না হয়ে যদি তোমার ভাইবেরাদারদের সম্পত্তি হত তবে কী অবস্থা হত একবার ভেবেছ?

সবাই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। ভালোমানুষ শাহনূর কখনো হেরে গেলে নিজের পরাজয় সলজ্জ হাসিতে কবুল করে নিল। সেদিনও নিল।

এমনি ছিল আমার সঙ্গে সহজ শাদাসিধা শাহনূরের সম্পর্ক।

ওর বাবার মতো শাহনূরেরও মৃত্যু হয়েছিল খুবই কম বয়সে। তখন ওর বয়স চল্লিশের সামান্য কিছু ওপরে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ও মারা যায়। আগেও ওর একবার অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল। তাই দ্বিতীয় অ্যাটাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও টের পেয়ে গিয়েছিল ওর সময় শেষ হয়ে গেছে। ও ছিল অসম্ভব স্নেহশীল পিতা। দুটো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছিল ওর। ওদের ভারি ভালোবাসত ও। অ্যাটাক হওয়ার পর অসহায়ের মতো ও কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল : 'আমাকে তুমি নিয়ে যেয়ো না আল্লাহ, আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোর আমি ছাড়া কেউ নেই।' বলতে বলতে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির সবার সামনে ও মারা যায়।

* * *

আবু কায়সারের কথা মনে হলেই মনটা খুশি হয়ে ওঠে। ছোটখাটো সপ্রতিভ চেহারার ঝকঝকে তরুণ আবু কায়সার। পুরোপুরি বেপরোয়া আর ভাবনাহীন। বর্তমান মুহূর্তটাকে মউজে ফুর্তিতে উড়িয়ে দিতে পারলেই ও খুশি,পরের বেলা কী হবে তা নিয়ে ভাবাভাবি নেই। এমনি একটা মেজাজ নিয়ে 'গুহা' নামে একটা গল্প লিখে ফেলল ও 'কণ্ঠস্বর'–এ। যৌনরসের বেশ ছড়াছড়ি ছিল গল্পটায়। আমি মনে করি শৈল্পিক প্রয়োজনেই ছিল। কিন্তু চারদিকে টিটি পড়ে গেল এ নিয়ে। আবারও পত্রিকা নিষিদ্ধ হওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু কেবল সেদিন নয়, আজও আমার কাছে ভালো লাগে গল্পটা। যেসব হাজার হাজার স্থূল, পেশিওয়ালা, নির্বিবেক ছাত্র–সন্ত্রাসী আজ দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোকে তাদের বাপের তালুক করে তুলে যা–খুশি তাই করে চলেছে, যাদের সূচনা ঘটেছিল ষাটের দশকে, সেকালের পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের পৃষ্ঠপোষকতায়—সাহিত্যে তাদের প্রথম ছবিটি কায়সার এঁকেছিল এই গল্পের ভেতরে। গল্পটা এদিক থেকে ঐতিহাসিক মর্যাদা পাবার যোগ্য।

* * *

সত্যিকার প্রবন্ধ লেখার শক্তি নিয়ে যিনি এই সময় দেখা দিয়েছিলেন তিনি সনৎকুমার সাহা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সনৎ কুমার সাহার গদ্য ছিল অনবদ্য; সত্যিকার প্রবন্ধের গদ্য বলতে যা বোঝায় তাই। যে–কোনো বিষয়ের গভীরে যাবার মতো মননের ক্ষমতা ও ধীশক্তির তীক্ষ্ণতা ছিল তাঁর, ছিল ব্যাপক পড়াশোনা এবং চিন্তার ভারসাম্য। গত পঞ্চাশ বছরে তাঁর মতো তীক্ষ্ণতা ও ক্ষমতা অল্প লেখকের ছিল। আমার ধারণা লেখাকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করলে আমাদের প্রবন্ধের ধারাকে তিনি পথনির্দেশ করতে পারতেন। 'কণ্ঠস্বর'–এ বেশ কয়েকটি ভালো মানের প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন কয়েক বছরে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্তীতে প্রবন্ধ তিনি খুব বেশি লেখেননি। আমার মনে হয়, শুধু এটুকুর জন্য আমাদের সাহিত্য থেকে একজন ভালো প্রবন্ধকারকে আমরা হারিয়েছি।

* * *

আজ লিখতে বসে অনেকের মতো মনে পড়ছে বগুড়ার মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কথা। প্রথম থেকে শেষ অব্দি 'কণ্ঠস্বর'–এ লিখেছেন তিনি। বগুড়ার ষাট–দশকী তরুণ সাহিত্য দলের তিনি ছিলেন অন্যতম নেতা। 'বিপ্রতীপ' নামে একটি উজ্জ্বল ও ব্যতিক্রমী ছোটপত্রিকাও তাঁরা বের করেছিলেন বগুড়া থেকে। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পার করে পত্রিকাটি আজও টিকে আছে। কিছুটা দীর্ঘ ব্যবধানে প্রকাশিত হলেও আমার ধারণা বাংলাদেশে ষাটের দশকের সাহিত্যধারার এটিই সবচেয়ে দীর্ঘায়ু পত্রিকা। যেসব প্রমত্ত তরুণ সেদিন এই পত্রিকাকে ঘিরে সমবেত হয়েছিল তাদের মধ্যে কাজী রব, ফারুক সিদ্দিকী, বজলুল করীম বাহারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। ঐ দলের আর–একজনের কথা এখনও আমার থেকে–থেকে মনে পড়ে। তাঁর নাম আনিসুল ইসলাম আগা। উৎসাহে উত্তেজনায় টগবগ–করা তরুণ আগা লেখকদের কেউ ছিলেন

না। বগুড়ার সাতমাথায় তাঁর বইয়ের স্টলটা ছিল ষাটের দশকে ওই শহরের তরুণ–লেখকদের সরগরম আস্তানা। নিজের অজান্তে ঐ শহরে ষাট দশকী সাহিত্যের প্রধান বার্তাবাহক ছিলেন তিনি। অকারণে উত্তেজিত আগা সবসময় উঁচু পর্দায় প্রায় চিৎকার করে কথা বলতেন। তাঁর সেই প্রাণান্ত চিৎকারে ষাট–দশকী সাহিত্যের যাবতীয় মুখরোচক খবরাখবর বগুড়ার বাড়িতে বাড়িতে অনায়াসে পৌঁছে যেত।

* * *

আর ছিল বরিশালের রবীন সমাদ্দার, আমাদের নতুন সাহিত্য–আন্দোলনের একজন সত্যিকার নিবেদিত ও প্রাণিত কর্মী। সরল ও অবিচলিত চেহারার তরুণ, রবীন সমাদ্দারের অনেক কবিতা বেরিয়েছিল 'কণ্ঠস্বর'–এ। আশির শেষ আর নব্বইয়ের দশকের প্রথমদিকে আবার নতুন করে জোট বাঁধি আমরা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বরিশাল শাখার সংগঠক হিসেবে তিনি কয়েক বছর যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সেদিনের অপরাজেয় উচ্ছল তারুণ্যও আজ বয়সের ভারে নুয়ে এসেছে।

* * *

ষাটের শেষের দিকে একজন ভালো মাপের অনুবাদক হিসেবে আমরা পেয়েছিলাম হারুণ–উর–রশিদকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ছিলাম সহপাঠী। 'কণ্ঠস্বর'–এ আঁদ্রে জিদ, মালার্মে আর সাঁত বভ–এর তিনটি অসাধারণ প্রবন্ধের অনুবাদ করেছিল ও। পরে এগুলো বই হিসেবে বেরোয়। হারুণের প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য উজ্জ্বল। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ও। একসময় বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক হয়েছিল ও।

সপ্তম খণ্ড

স্বপ্নের সমান বড়

১

দেখতে দেখতে এসে গেল একাত্তর। আমাদের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম ও দীপান্বিততম অধ্যায়। এবার আর শুধু স্বাধিকারের জন্যে নয়, সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ। আর কারো সঙ্গে থেকে নয়, কারো ছত্রচ্ছায়ায় নয়, এবার দাঁড়ানো নিজের পায়ের ওপর ভর করে নিজের শক্তিতে। সারা জাতির মধ্যে তখন অভূতপূর্ব উন্মাদনা আর আত্মাহুতির আকুতি। সারা জাতি তখন শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাহাড়ের মতো উঁচু আর দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে পরাজিত করার শক্তি কারো নেই।

১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনের শীর্ষে ছাত্রনেতারা প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পতাকা ওড়াল। পতাকাটার গাঢ় সবুজের মাঝখানকার লাল সূর্যের মাঝখানে শোভা পাচ্ছে হলুদ রঙের বাংলাদেশের পতাকা, পরে এটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা কয়েকহাজার ছাত্র ও জনতা উদ্দীপ্ত হৃদয়ে উড্ডীন সেই পতাকার মধ্যে বাংলাদেশের নব-উদ্বোধনকে তাকিয়ে দেখলাম। স্বাধীনতার উদ্দীপনায় পুরো দেশ তখন থরথর করছে। যুগযুগের পরশাসনের অবসান ঘটবে, আমরা স্বাধীন হব, আমাদের ভাগ্য আমরা নির্ধারণ করব, বুকের রক্ত দিয়ে এদেশকে গড়ে তুলব—এই স্বপ্নে সবাই উদ্বেলিত। সাতই মার্চ রেসকোর্সের মঞ্চের মাত্র কয়েক হাত সামনে গিয়ে বসলাম, উঁচু মঞ্চের ওপর বঙ্গশার্দূলের ঐতিহাসিক ভাষণের বলদৃপ্ত দৃশ্য নিজের চেখে দেখার আশায়।

পঁচিশে মার্চের পর দেখতে পেলাম যুগযুগের এই অসহায় করুণ জাতিকে সম্পূর্ণ নতুন এক পরিচয়ে জেগে উঠতে। এ পরিচয় সামরিক পরিচয়। ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া, ছোটখাটো দরকার-অদরকার সবকিছু তলিয়ে গেল জাতির এই সর্বোচ্চ প্রয়োজনের সামনে।

সবকিছুর মতো হারিয়ে গেল আমাদের 'কণ্ঠস্বর'ও। এর গল্প শুনতে হলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরও একটি বছর পর্যন্ত, যতদিন-না সেই সবুজের ওপর লাল সূর্য আঁকা পতাকা প্রতিটা বাড়ির ছাদে আবার ফিরে এল লাল ঠোঁটওয়ালা কোটি কোটি সবুজ টিয়ার মতো।

২

দেশ যখন স্বাধীন হল তখন সারাটা দেশ একটা জবুথবু বৃদ্ধের মতো ভেঙে পড়ে আছে। রাষ্ট্রযন্ত্র পুরোপুরি ধসে গেছে, রাস্তাঘাট ভাঙা, ব্যবসা-বাণিজ্য বিপর্যস্ত এবং আইন-শৃঙ্খলা নেই বললেই চলে। সবকিছু শেষ, কিন্তু একটা জিনিশ তখনো বেঁচে আছে—কেবল বেঁচে নয়, সবকালের সবচেয়ে দুর্জয় আর অপ্রতিরোধ্য হয়েই বেঁচে আছে—সে হল দেশের মানুষ আর তাদের ইস্পাত-কঠিন মনোবল। তাই এত বৈরী পরিবেশেও দেশের উঠে দাঁড়াতে সময় লাগল না। এক অসম্ভব স্বপ্ন তখন সকলের চোখে। সে-স্বপ্ন সোনার বাংলার স্বপ্ন। আমরা আমাদের সবকিছুকে সেই স্বপ্নের বাংলাদেশের সমান করে নির্মাণ করতে চাই। সেই বাংলাকে পৃথিবীর সমান করতে চাই।

সামান্য মানুষ আমি। তবু এমনি এক পরিত্রাণহীন স্বপ্ন আমার স্নায়ু শিরাকেও অধিকার করে ফেলল। আমার ছোট্ট 'কণ্ঠস্বর'কে আমি বাংলাদেশের মর্যাদার সমকক্ষ করে তোলার স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। এমন পত্রিকা বের করার ভাবনায় হৃদয় উদগ্র হয়ে উঠল যার লেখার মান আর প্রকাশনা-সৌষ্ঠব পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো সেরা পত্রিকার চেয়ে কম হবে না।

স্বাধীনতার পর প্রথমেই অনুভব করেছিলাম : যে-অবক্ষয়ের পটভূমিকায় 'কণ্ঠস্বর'-এর উদ্ভব হয়েছিল সেই যুগ শেষ হয়ে এখন আমাদের জাতি একটা বড় ধরনের গঠন-যুগের সামনে দাঁড়িয়েছে। 'কণ্ঠস্বর'-এর পৃষ্ঠায়ও সেই নতুন যুগের শক্তিমত্তা জেগে ওঠা উচিত। এখন আর কেবল অন্ধকার-বন্দনার মধ্যে আটকে থাকলে চলবে না। একটা জাতীয় সৃজনপিপাসাকেও একইসঙ্গে আমাদের রক্তধারায় বহ্ল করতে হবে।

স্বাধীনতার পর জুন ১৯৭২-এ 'কণ্ঠস্বর' নতুনভাবে বের হলে তার সম্পাদকীয়তে আমি খুব জোর দিয়েই এই দিকটিকে তুলে ধরলাম :

> বর্তমান সংখ্যা থেকে 'কণ্ঠস্বর'-এর এতকালের চরিত্রেরও কিছু লক্ষ্যযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে।...এই সংখ্যার সঙ্গে 'কণ্ঠস্বর' তার অগ্রযাত্রার প্রথম পর্যায় ছেড়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে পা দিচ্ছে।...
>
> আমাদের সাহিত্য গত এক দশকের বিক্ষিপ্ত, অস্থির ও লক্ষ্যহীন মানসিকতার পর্যায় ছেড়ে—অন্ধকার বন্দনার ক্লেদাক্ত পাপ ও পচন থেকে মুক্তি নিয়ে সুস্থ সংহত এক অম্লান জীবনাগ্রহে জেগে উঠছে। ...
>
> জনসাধারণের সংগঠিত ও অসংগঠিত অসংখ্য প্রয়াস , ক্ষান্তিহীন গঠনাগ্রহ এবং জন্মান্ধ সংগ্রামপ্রবণতায় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। জীবনের অন্যান্য সব ক্ষেত্রের মতো এই প্রবল ফসলাকাঙ্ক্ষা সাহিত্যকেও স্পর্শ করবে, এমন ধারণা বিচিত্র নয়।...

বাংলাদেশের অভ্যুদয় জাতিগতভাবে আমাদের ওপর এক বিপুল ও অপরিসীম দায়িত্ব অর্পণ করেছে।... আজ বোঝা-না গেলেও (আমরা যেন না ভুলি যে) আমরাই বাংলাদেশের জন্মলগ্নের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম তরুণ জেনারেশন। সুতরাং, কিছুটা আকস্মিকভাবে হলেও, আমাদের কাঁধে আজ যে-সাহিত্যদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তার গুরুত্ব অপরিসীম।... (আজ) আমাদের সাহিত্যের অনাগত উত্তরসূরীদের সামনে নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও সাহিত্য সততার উচ্চতর আদর্শ আমাদেরই প্রতিষ্ঠা করে যেতে হবে, রেখে যেতে হবে সাহিত্য মূল্যবোধের উন্নততর মানদণ্ড।... আজ এই নবজাগ্রত জাতির লোকশ্রুত জন্মক্ষণে, এই জাতির আদিমতম সভ্য হিশেবে—এক অপ্রস্তুত পিতৃত্বের ভূমিকায়—এইটেই হয়তো আমাদের ঐতিহাসিক বিধিলিপি।

জাতীয় চৈতন্যের এই সার্বিক উজ্জীবনের মাঝখানে 'কণ্ঠস্বর'-এর এযাবৎকালের চরিত্রের-যে কিছু পরিবর্তন ঘটবে, এমন আশা অসংগত নয়। ...

যে তারুণ্য, নতুনত্ব, প্রতিভা, আপোষহীন সত্যপ্রীতি গতদশকের তরুণ সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিশেবে দেখা দিয়েছিল, আজ তার সঙ্গে সংহত চারিত্র্যশক্তি এবং দুরুহের পিপাসা এসে যোগ দিচ্ছে মনে হয়। এর ফলশ্রুতি 'কণ্ঠস্বর'-এর পৃষ্ঠায় দুর্লক্ষ্য হবার কথা নয়। কেবলমাত্র কমনীয় ত্বক আর নয়, সুদৃঢ় হাড়ের কঠিন চারিত্র্যশক্তি চাই আজ; চাই সুস্থ, কর্মঠ, শক্তিশালী পেশীর উদ্যোগী সহযোগ। ভুললে চলবে না যে, যুগ-চারিত্র্যের দিক থেকে আমাদের কালের অবস্থান বিংশশতাব্দীর নয়, উনবিংশ শতাব্দীর জাগ্রত বাংলাদেশের কাছাকাছি। কাজেই এমন আশা হয়তো অন্যায় নয় যে, এই বিক্ষুব্ধ বঙ্গভূমিতে (আবার) আদিম প্রবল যুগপুরুষদের আবির্ভাব অচিরে ঘটবে, যাঁরা প্রতিভার সঙ্গে সুস্থতা, শিল্পের সঙ্গে প্রজ্ঞা, নতুনত্বের সঙ্গে উদ্দেশ্য এবং মৌলিকতার সঙ্গে জীবনোন্মুখতাকে গ্রথিত করে দুর্বার ফসলাগ্রহ নিয়ে এসে দাঁড়াবেন সৃষ্টিশীলতার রক্তিম উর্বর মাঠের ওপর।

কণ্ঠস্বর, সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, জুন ১৯৭২

আমি জানি আমার এই স্বপ্ন বেদনাদায়কভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তবুও আমি মনে করি সে-ব্যর্থতা চিরকালীন নয়, সাময়িক। স্বাধীনতা-উত্তরকালের নৈরাজ্য ও বিচ্ছৃঙ্খলতার ভেতর অনেককিছুকে নৈরাশ্যজনক মনে বলে মনে হলেও রাখতে হবে সে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে এক শক্তিমান বাংলাদেশ আজ ধীরে ধীরে জেগে উঠতে শুরু করেছে যে ঐ স্বপ্নকে কয়েক দশকের মধ্যেই হয়তো অনেকটা সত্য করে তুলবে। যাহোক, আমার এই প্রস্তাব প্রায় সবাই কমবেশি সমর্থন করল। অনেকে আবার পছন্দ করলও না। পছন্দ না-করা অহেতুক নয়। আমাদের অনেকেই বিশ-শতকী পাশ্চাত্য আধুনিকতার সন্তান, এ-যুগের নেতি আর ব্যক্তিসর্বস্বতার প্রভাব আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কাজেই জাতীয় উজ্জীবন আর সংঘবদ্ধতার স্বপ্ন অনেকের কাছে প্রত্যাখ্যাত হবে এতে আর আশ্চর্য কী!

৩

'কণ্ঠস্বর'কে লেখা ও প্রকাশনামানের দিক থেকে উঁচুমাপের পত্রিকা করে তোলার চেষ্টায় একেবারে মরিয়া হয়ে উঠলাম। আজ ভাবলে হাসি পায়, কিন্তু সেদিন 'কণ্ঠস্বর'কে যে-কোনো দেশের যে-কোনো শ্রেষ্ঠ পত্রিকার সমকক্ষ করার জন্যে সত্যিসত্যি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম আমি। কেন চাইব না? আমরা তখন স্বাধীন। আমাদের জাতির হাজার হাজার বছরের দাসত্ব আর পরাধীনতা উৎরে আমরা মুক্ত। কোনোদিক থেকে পৃথিবীর কারো চেয়ে ছোট থাকা তো আমাদের আর কথা নয়!

দেশ স্বাধীন হলে অন্তত প্রকাশনামানের দিক থেকে একে উচ্চাঙ্গের কাগজ করে তোলার সুযোগ প্রায় অবিশ্বাস্যভাবেই এসে গেল। হঠাৎ দেখা গেল ব্যবসা-বাণিজ্য আর শিল্প-কারখানার পাকিস্তানি মালিকরা রাতারাতি উধাও, তাদের জায়গায় সেসবের মালিক এখন বাংলাদেশ সরকার। সরকারই এখন দেশের প্রধান বিজ্ঞাপনদাতা। বিজ্ঞাপনের সম্ভাবনার এই বিপুল দরোজা আচমকা খুলে যাওয়ায় পত্রিকার প্রকাশনামানকে উন্নত ও দৃষ্টিনন্দন করার ব্যাপারে বাধা রইল না। দুর্লভ বিজ্ঞাপন এখন আর ধরাছোঁয়ার বাইরের জিনিশ নয়। প্রতিষ্ঠানগুলোতে খেয়ে-না-খেয়ে ধরনা দিয়ে যেতে পারলে এ পেতে কোনো অসুবিধা নেই। এখন দরকার শুধু শ্রম। দিনরাত আঠার মতো লেগে থাকা। আজ বাঙালি জাতির স্বপ্ন সফল করার যুগ। সব অসম্ভবই আমাদের হাতে আজ সম্ভব। অনেককিছুর মতো দেশ থেকে বেশকিছু ভালো বাংলা সাহিত্যপত্রিকা বের হোক এ-স্বপ্নও আজ সবার মনে। বিজ্ঞাপনদাতারা সবাই প্রায় পরিচিত, বন্ধুবান্ধব। কোথা থেকে এসেছি-কে, কী ব্যাপার, কোন্ ধরনের পত্রিকা, এসব ফজুল প্রশ্নের উত্তর দেবার যন্ত্রণা এখন শেষ। আজ কিছুতেই বাধা নেই। উদয়াস্ত খেটে যাও, সব পাবে। আজ বাঙালির সামনে তার শেষ সীমা হল আকাশ।

বিজ্ঞাপনের জন্যে আটঘাট বেঁধে কাজ শুরু করলাম। যতবেশি সম্ভব বিজ্ঞাপন পেতে হবে আমাদের। বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে পারলে পত্রিকার সমস্ত স্বপ্ন এবং সম্ভাবনা হাতের মুঠোয় এসে যাবে। ভালোমানের লেখা দিয়ে পত্রিকার কলেবর স্ফীত করা, তার প্রকাশনামান উন্নত করা, দেশবিদেশের সেরা সাহিত্যপত্রিকার সমমানের চেহারা দেওয়া কোনোকিছুই অসম্ভব নয়। মাথার ভেতর অসম্ভব স্বপ্ন দিনরাত লেলেহান শিখায় জ্বলতে লাগল।

কিন্তু একা তো এতসব সম্ভব নয়। সঙ্গে অন্তত একজন সঙ্গী চাই। শাহনূরের ভাই সাজ্জাদ ছিল আমার ছাত্র। ও এই ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করতে রাজি হল। পরিশ্রমী প্রিয়দর্শন সাজ্জাদ যেমন ছিল চটপটে তেমনি পরিপাটি। একসময় ধীরে ধীরে মঞ্চাভিনেতা ও টিভি-তারকাও হয়েছিল ও। তারপর কেন যেন একসময় হারিয়ে গেল। অনেকদিন ওর খবর পাই না। ও ভালো আছে কি?

ব্রিফকেস হাতে সাজ্জাদের চৌকশ, ফিটফাট আর সুন্দর মার্জিত চেহারা 'কণ্ঠস্বর'-এর মানের ব্যাপারে বিজ্ঞাপনদাতাদের আস্থা বাড়িয়ে দিল।

শুরু হল আমাদের সিসিফসের জীবন। দিন নেই রাত নেই, শুধু বিজ্ঞাপনের পেছনে ছুটে বেড়ানো। সকাল দশটার দিকে সাজ্জাদ এসে পৌঁছোত আমার বাসায়। শুরু হত রিকশায় করে অফিস থেকে অফিসে চরকির মতো বিরামহীন ঘোরাঘুরি। তারপর একসময় সব শেষ করে সন্ধ্যার দিকে ক্লান্ত শরীরে বাসায় ফিরে আসা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, একইভাবে, একইপথে, একই দরজায়। আগে বিজ্ঞাপনের সম্ভাবনাই ছিল কম। তাই ছোটাছুটির একটা সীমা ছিল। তখন যা থেকে কষ্ট পেতে হত তা শারীরিক ততটা নয় যতটা মানসিক—অসম্মানের যন্ত্রণা। ঐ কষ্টই আমাকে নিঃশেষ করে আনত। এখন সে-কষ্ট গেছে, কিন্তু বিজ্ঞাপনের দিগন্ত হয়েছে বিস্তৃত। এত বিস্তৃত যে সারাদিন খেটেও সে বিশাল হা ভরাট করার উপায় নেই। অথচ তা ভরাট করে যেতেই হবে আমাদের। বিজ্ঞাপন যত বাড়বে ততই বাড়বে পত্রিকার বৈভব; ততই তা সুমুদ্রিত আর সৌষ্ঠবসম্পন্ন হবে, কাগজ-ছাপা-বাঁধাই হবে উচ্চাঙ্গের। স্ফীতকায় আর বলিষ্ঠ চেহারার সে-পত্রিকা পাঠকের চোখে বিস্ময় জাগাবে।

এই অসম্ভব আত্মক্ষয় বৃথা গেল না। আগে পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় বিজ্ঞাপন পেতাম চার-শ থেকে ছ-সাত-শ টাকার মতো। সিকি-পৃষ্ঠা আধা-পৃষ্ঠা মিলে বিজ্ঞাপন পাওয়া যেত সাত থেকে দশটি। কিন্তু স্বাধীনতার পর প্রথম যে-সংখ্যাটি বেরোল তাতে বিজ্ঞাপন পেলাম প্রায় চার হাজার টাকার। (এখনকার হিসেবে এ সোয়া লাখ-দেড় লাখ টাকার কম নয়।) পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনের সংখ্যা হল সতেরো।

এই চার হাজার টাকা আমার সামনে সমস্ত না-পাওয়ার দরজাকে যেন মুহূর্তে খুলে দিল। আগেই লিখেছি লাইনো টাইপের জন্য আমার একটা অলীক ভালোবাসা ছিল। কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠেনি। ও টাইপের কথা ভাবাই সম্ভব ছিল না। প্রগতি টাইপে প্রতি ফর্মা ছাপতে যেখানে লাগে আটত্রিশ-চল্লিশ টাকা, লাইনো টাইপে সেখানে লাগে সত্তর-পঁচাত্তর টাকা। হাসপাতালের গরিব মুমূর্ষু রোগীরা যেমন নিঃসঙ্গ বিছানায় মৃত্যুর দিন গোনার সময় ভেবে যায় হাসপাতাল রোডের পাশে ফলের দোকানের থরে থরে সাজিয়ে রাখা বেহেশতের মেওয়ার মতো আঙুর-আপেল বেদানা-নাশপাতি খেতে পারলে সে হয়তো বেঁচে উঠত, লাইনো টাইপ নিয়েও আমার স্বপ্ন প্রায় তেমনি। মনে হত ঐ টাইপে ছাপতে পারলে শ্রেষ্ঠ পত্রিকা আমিও বের করতে পারতাম। ঐ চার হাজার টাকা সেই অসম্ভবকে হাতের মুঠোয় এনে দিল।

ঢাকায় লাইনো টাইপ তখন ছিল মাত্র দুটো প্রেসে। ২৪৪ নবাবপুর রোডের আলেকজান্দ্রা এস. এম. প্রেসে আর 'দৈনিক সংবাদ' প্রেসে। দৈনিক সংবাদ প্রেস সাধারণত বাইরের কাজ করতে চাইত না। তাই একদিন আলেকজান্দ্রা প্রেসে গিয়ে হাজির হলাম। এর আগেও বেশ কয়েকবার আলেকজান্দ্রা প্রেসে গিয়েছি, কিন্তু ঢুকেছি মাথা নিচু করে, কাঁচুমাচু হয়ে। কিন্তু আজ ঢুকলাম চার হাজার টাকার টান

টান সিনা নিয়ে। কথাও বললাম জোরেশোরেই।

আলেকজান্দ্রা প্রেসের মালিক নূরুল হক সাহেব গোলগাল বেঁটেখাটো সজ্জন মানুষ। মাথাভর্তি তেলতেলে টাক। সাহিত্য ফাহিত্য নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই, তবু ফর্মা প্রতি পাঁচ টাকা কম করতে রাজি হলেন তিনি।

লাইনোতে ছাপা শুরু হয়ে গেল 'কণ্ঠস্বর'। চার হাজার টাকার বিজ্ঞাপনের সুবাদে পত্রিকার কলেবরও হল বেশ বড়সড়। নানান দিক ভেবেচিন্তে পত্রিকা প্রকাশের সময়–ব্যবধানও বাড়ানো হল। মাসিক 'কণ্ঠস্বর' হয়ে গেল ত্রৈমাসিক। পত্রিকা একলাফে চৌষট্টি–আশি পৃষ্ঠা থেকে হয়ে গেল দেড়–শ পৃষ্ঠা। লেখার মানেও যেন বান ডাকল। এতদিন পর কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষিত প্রচ্ছদে শোভা পেল 'কণ্ঠস্বর'। পত্রিকা ছাপা হল দুহাজার কপি। বলিষ্ঠ চেহারার দৃষ্টিলোভন অবয়ব নিয়ে, পাঠকদের চোখে আস্থা আর বিস্ময় জাগিয়ে 'ত্রৈমাসিক' হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন পর্যায়ে বের হল নতুন 'কণ্ঠস্বর'।

৪

হুমায়ুন কবির–যে বামপন্থী বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল তা আমি জানতাম। ব্যক্তিগতভাবে এবং 'কণ্ঠস্বর'–এর কাজ নিয়ে আমরা একসময় খুবই কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম, কিন্তু এসব প্রসঙ্গ নিয়ে ওর সঙ্গে আমার কখনো সরাসরি কথা হয়নি। হয়তো হুমায়ুনই তুলতে চায়নি । জানি না কেন এ–ব্যাপারে ওর একটা অদ্ভুত নীরবতা ছিল। ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যময় লাগত। আমাদের কথাবার্তার মূল বিষয় ছিল সাহিত্য। হুমায়ুনের ভেতর বিশ্বাস ও জীবনমুখিতার আকুতি ছিল, ও চাইত 'কণ্ঠস্বর'–এর উচ্ছল স্রোত সেই সম্পন্নতার দিকেই বয়ে যাক। অবক্ষয়কে ও বিশ্বাস করত না। জীবনের সজীব প্রাণময়তা ছিল ওর অন্বিষ্ট। জীবনের নতুন আবাদ, নবতর বিশ্বাসে বসতি বসানোর হোসেন মিয়া ছিল ও।

১৯৬৮–৬৯–এর দিকে কী একটা কারণে যেন একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গিয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে করিডোরে প্রাণের রঙিন উচ্ছলতা তখনো আমাদের সময়ের মতোই চঞ্চল–স্রোতে বয়ে চলেছে। হুমায়ুন আমাকে ওর কিছু সহপাঠী–সহপাঠিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে আলাদা করে চোখে পড়ার মতো। মাজা ফরসা রঙের ছিপছিপে দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটির লম্বা বেণী পিঠের ওপর দুলছে, চাউনি সপ্রতিভ। বিকেলে হুমায়ুন বাসায় এলে বললাম : বেশ সুন্দর তো মেয়েটা ! কে ? এত সুন্দর একটা মেয়ে তোমার সহপাঠিনী আর তুমি এখনো তার প্রেমে পড়োনি।

হুমায়ুন ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল। আমি–যে ওর অজান্তে মেয়েটার জন্যে ওর ভেতরের কাতরতা টের পেয়ে গেলাম, ও বুঝল না।

জিজ্ঞেস করলাম, নাম কী মেয়েটার?

ও বলল, সুলতানা রেবু।

এর দিনকয়েক পরেই হুমায়ুন এসে ওদের প্রেমের সুখবরটা দিল। হ্যাঁ, ঐ মেয়েটিই। এর পরে শুরু হল ওর প্রেমে আর কবিতায়–ভরা মাতাল দিনগুলো। আমাদের বাসাতেও মাঝে মাঝে ওদের দুজনের স্বপ্নমদির সুন্দর চেহারা দেখে আমরা খুশি হয়েছি। ও তখন পুরোদস্তুর কবি।

আগেই বলেছি ওর প্রথম কবিতার বইয়ের নাম ছিল 'কুসুমিত ইস্পাত'। এই ফুল আর ফলা একই সঙ্গে ছিল ওর মধ্যে। প্রেমের কোমলতার পাশাপাশি বিপ্লবের রক্তস্নানেও ছিল ওর একইরকম উৎসাহ। ওর প্রকৃতির মধ্যেই ছিল একটা ক্ষাত্র প্রণোদনা। এই প্রণোদনা ওকে সহিংস বিপ্লবের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। শোষকদের ধ্বংসের মধ্যে ওর ছিল একটা জন্মগত রোমাঞ্চ । নির্মলেন্দু গুণের 'আমার কণ্ঠস্বর' বইয়ে একটা ছোট্ট ছবি আছে হুমায়ুনের। ছবিটি ১৯৬৯–এর গণঅভ্যুত্থানের সময়কার :

> আমি আর হুমায়ুন কবির পাবলিক লাইব্রেরির সামনের রাস্তা দিয়ে শাহবাগের দিকে ছুটে যাওয়া একটি ডবল ডেকার বাসের গতিরোধ করি। হুমায়ুন কবির তখন আমার কাছ থেকে একটা দিয়াশলাই চেয়ে নেয়। তার আগে অগ্নিসংযোগে ব্যবহার করার জন্যে সে তার প্রেমিকা সুলতানা রেবুর কাছ থেকে ওর রুমালটি চেয়ে নিয়ে এসেছিল। হুমায়ুন কবির বলে : আয় বাসে কী করে অগ্নিসংযোগ করতে হয়, তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি। হুমায়ুনের কাছেই আমি বাসে অগ্নিসংযোগ করা শিখি।
>
> চোখের সামনে এতবড় একটা বাসকে জ্বলে–পুড়ে যেতে দেখে আমার বেশ খারাপই লাগছিল। কিন্তু না–পুড়িয়ে উপায়ও ছিল না।
>
> আমার কবি–বন্ধুদের মধ্যে হুমায়ুন কবিরই ছিল আমার মিছিল–সঙ্গী।

আমার ধারণা, এসব ঘটনার ভেতর দিয়ে হুমায়ুন একটু একটু করে সহিংসতার দিকে এগিয়ে চলছিল। একাত্তরের দিকে এসে বুঝতে পারলাম অস্ত্রও হাতে তুলে নিয়েছে হুমায়ুন।

একাত্তরের এক সন্ধ্যায় আমি আর হুমায়ুন কাঁটাবন এলাকার একটা বাসা থেকে যাচ্ছিলাম বাংলামোটরের দিকে। একাত্তরে নিজের বাসা ছেড়ে বাংলামোটরে (এখনকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উল্টোদিকের বাসাটায়) আমার মেজোবোনের সঙ্গে আমি তখন থাকতাম। রাস্তা পুরোপুরি ফাঁকা। রিকশায় বসে গল্পের একফাঁকে হুমায়ুন হালকা হেসে বলল : আমার কোমরের এদিকটায় একটু হাত দিয়ে দেখবেন। বলে নিজেই আমার হাতটা টেনে নিয়ে ওর কোমরের ডানদিকের ওপর রাখল। চোখে

না–দেখলেও বুঝতে পারলাম ওর পাঞ্জাবির নিচের ঐ ধাতব শীতল জিনিশটা আসলে একটা পিস্তল। দেখলাম ওর ঠোঁটের কোণে মৃদু গর্বিত হাসি। নানান প্রশ্ন এল মাথায়। হুমায়ুনের কোমরে পিস্তল কেন? ও তো স্বাধীনতাযুদ্ধে যায়নি। তাহলে কি কোনো বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে? সিরাজ শিকদারের পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির সঙ্গে ওর যোগাযোগের কথা মাঝেমধ্যে শুনতাম। তাহলে কি তাই? শ্রেণীশত্রু খতমের সংগ্রাম? কিন্তু এই সংগ্রামে . একবার জড়ালে তো ফেরার পথ থাকে না। কী করছে হুমায়ুন? কী আছে সামনে?

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার হুমায়ুন?' কিন্তু ওর মুখ থেকে কোনো কথা বের করা গেল না। একবার মনে হল স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দেওয়াও এমন অসম্ভব কিছু নয়! কে কোথায় কীভাবে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, কী করে তা বোঝা সম্ভব? সারাদেশটাই তো তখন যুদ্ধ করছে।

আমার বাংলামোটরের বোন আর তার স্বামী তখন সদ্য বিলেত থেকে ফিরে হোলি ফ্যামিলিতে সাময়িকভাবে চাকরি করছেন। আমার বোনের স্বামী ড. আবদুল মাজেদ পরবর্তীতে নাক–কান–গলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে এবং তারও পরে বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এবং প্র.ক্.চি–র কয়েক দফা সভাপতি হিসেবে এবং একসময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা হিসেবে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। উনি তখন সদ্য পাস–করা তরুণ ডাক্তার। হুমায়ুনকে উনি চিনতেন।

একদিন সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের চরমপত্র শুনে আমরা খাবার আয়োজন করছি হঠাৎ রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা ভেঙে বাসার গেটের গায় হুমায়ুনের উঁচু গলার চিৎকার যেন আছড়ে পড়ল : 'মাজেদ ভাই বাসায় আছেন? মাজেদ ভাই ...।' দরোজা খুলতেই হুমায়ুন ঝড়ের মতো বাসায় ঢুকে জানাল, একটা ছেলে বিশ্রীভাবে গুলি খেয়েছে। অপারেশন করা দরকার। পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন দুটো রিকশা নিয়ে এসেছিল ও আর ওর সঙ্গীরা।

মুক্তিযোদ্ধা ভেবে মাজেদ ভাই যত্ন নিয়ে ছেলেটাকে অপারেশন করলেন। ওদের পেছনে পেছনে পাকিস্তানি সৈন্যেরা যে–কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে আশঙ্কা করে আমাদের শরীর প্রায় ঘেমে উঠতে লাগল। হুমায়ুনের সঙ্গেও খুব–একটা কথা হল না। ওকে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আর বিমর্ষ মনে হল। আহত ছেলেটার মুখ কাপড় দিয়ে বেশ কিছুটা ঢাকা থাকায় তাকেও খুব একটা চেনা গেল না। সে কি মুক্তিযোদ্ধা নাকি অন্যকিছু? কে কোথায় কেন কীভাবে বা কার গুলিতে আহত হয়েছে সবই অস্পষ্ট রয়ে গেল। থমথমে দুর্বোধ্যতা আর রহস্যের মধ্যে দিয়ে হুমায়ুন এসে আবার চলে গেল।

স্বাধীনতার পর কয়েকটা মাস যাবার আগেই আমাদের মুখেমুখি হতে হল সেই মর্মান্তিক মুহূর্তটির। গ্রিন রোডের বাসায় একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠব–উঠব করছি, হঠাৎ দরোজায় জোরালো কড়ানাড়ার শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠলাম। আমি ছিলাম ভেতরের ঘরে। আমার স্ত্রী আগেই উঠে গিয়েছিল। সে–ই এগিয়ে গিয়ে দরোজা খুলল। ঝড়ের বেগে নূবুল হুদা ঢুকেই বলল : ভাবী, রাত এগারোটার দিকে কারা যেন

হুমায়ুনকে মাথায় গুলি করে মেরে রেখে গেছে। সায়ীদ ভাই কোথায়?

আমার ঘুম তখনো পুরোপুরি কাটেনি। মনে হল স্বপ্নের মধ্যে যেন শুনছি কথাগুলো। কী করে এ সম্ভব? তাড়াতাড়ি উঠে হুদার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই ছুটলাম ওর রাজাবাজারের বাসায়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এর-ওর কাছ থেকে শুনে ওর মৃত্যুর ঘটনার একটা ছবি পাওয়া গেল। গত রাতে ওর একজন খুবই পরিচিত বন্ধু ওকে কী-একটা কথা বলার জন্য যেন বাইরে ডেকে নেয়। ওরা ছিল দুজন। অন্যজন দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে। হুমায়ুন বাসা থেকে বের হলে ওকে মাঝখানে রেখে ঐ দুজন গল্প করতে করতে বাসার সামনের মাঠ ধরে কিছুদূর এগিয়ে যায়। এই সময় ওর বাঁ-দিকের জন পেছনদিক থেকে পিস্তল দিয়ে ওর মাথায় গুলি করে।

হুমায়ুনের কবর হল সেইদিনই। বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ-সংলগ্ন গোরস্তানে। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কবরের পাশে। সবার অশ্রু আর ভালোবাসার সামনে দিয়ে বিদায় নিল হুমায়ুন। শাদা কাপড় দিয়ে ব্যান্ডেজ করা ওর মাথা আর নিষ্পাপ কচি মুখটা আমি যেন আজও চোখের সামনে দেখতে পাই।

পরের দিন গেলাম রাজাবাজারে ওর বাসায়। রেবুর সঙ্গে দেখা হল। ততদিনে ও দুই সন্তানের জননী। দেখলাম সাহসের সঙ্গেই মৃত্যুটাকে মোকাবেলা করেছে রেবু। স্থির আর অচঞ্চল চরিত্রের মেয়ে ও। হয়তো অনিবার্য বুঝতে পেরে অনেকদিন থেকেই এই মৃত্যুর জন্যে মনে মনে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিল । আসার সময় গৎবাঁধাগোছের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। বললাম : সাবধানে থেকো। পারলে আপাতত অন্য কোথাও গিয়ে থাকার কথাও ভাবতে পার।

রেবু শুকনো মুখে হাসল। বলল : যাকে নেবার তাকে নিয়ে গেছে। আমাকে ওরা কিছু করবে না।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম হুমায়ুনের মৃত্যুর সব কথা ওর জানা। নিরাপত্তার ভয়ে নীরব হয়ে রয়েছে।

কিছুদিনের মধ্যেই আমরা জেনেছিলাম যে-হুমায়ুনের মৃত্যু ছিল সে-সময়কার পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির নেতৃত্ব-পর্যায়ের দ্বন্দ্বের জের। বিরোধের কারণে ও দল থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলে। সে-সুযোগ ওকে দেওয়া হয়নি। সুযোগ দেওয়া হয়নি ওর ভগ্নীপতি সেলিম শাহনেয়াজকেও। সে-ও ছিল ঐ দলেরই। দেশপ্রেমের প্রেরণা ছিল ওদের পরিবারের ভেতর। ওর ছোটভাইও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রাণ হারিয়েছিল কিছুদিন আগে। তাকে নিয়ে লেখা হুমায়ুনের কবিতা চোখের পানিতে আর্দ্র :

আমার নিজের ভাই
বড় বেশী ভালো সে বাসতো স্বাধীনতা
জননীর নিষেধ মানেনি, পিতার অবাধ্য হয়েছিল
পতাকার রক্তিম সাহস তাকে ডাক দিল
স্বদেশের ছবি রক্তে, ঝাঁপ দিল স্বদেশের নামে।

আমার কিশোর ভাই, প্রিয় ছিল স্বাধীনতা
শ্লোগানে উত্তাল হোত খুব। দর্পিত বাতাস
তাকে ডাক দিল, স্টেনগানে বাজাল সংগীত

বিরোধী বন্দুক থেকে একটি নিপুণ গুলি
বিদ্ধ তারে করে গেছে, ছিন্ন কুমুদের
শোভা দেহ তার পড়েছিল? জানি না কিসব
ঘাস জন্ম নেবে তার শয়নের চারপাশে,...

বিরোধী গুলির ক্ষতে যখন সুস্থির শুয়ে
আকাশের নীচে, চোখে তার বিস্মিত আকাশ
মানবিক সত্যরীতি, বঙ্গদেশ সুখের বাগান।

হুমায়ুন মারা গিয়েছিল অল্প বয়সে। অল্পবয়সে কারো মৃত্যু হলে সারা প্রকৃতি সেই অন্যায় অগ্রহণযোগ্য মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ওঠে। হুমায়ুনের ব্যাপারেও তাই হল। সবাই এর জন্য পরিতাপ করল। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর 'কণ্ঠস্বর'-এর যে-সংখ্যাটি বেরোল আমরাও তা উৎসর্গ করলাম ওর উদ্দেশে। উৎসর্গপৃষ্ঠার উল্টোপিঠে আমি মিল্টনের লিসিডাস কবিতা থেকে কয়েকটা লাইন তুলে দিয়ে আমার নিজের শোকের ভাষা দিতে চেষ্টা করলাম :

Who would not sing for Lycidas ? He knew
Himself to sing and build the lofty rhyme.
He must not float upon his watery bier
Unwept, and welter to the parching wind
Without the meed of some melodious tear.

হুমায়ুনের ওপর আমার সম্পাদকীয়ও হল বেশ দীর্ঘ। সম্পাদকীয়টা থেকে কিছুটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি :

> রং-বেরঙের ফুল-ছড়ানো শবাধারে হুমায়ুন শুয়ে ছিল—প্রত্যুত্তরহীন। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ফুল এনে সাজিয়ে দিয়েছিল শবাধারটি—নিহত তরুণ বন্ধুর জন্য তাদের সাধ্যমতো একান্ত উপহার। দেখে হঠাৎ বিশ্বাস হওয়া কঠিন, শুধু একটি নিষ্প্রাণ অনুভূতিহীন বুলেট তার দুর্বার রক্তিম যৌবনকে—তার ক্ষিপ্র উদ্যত চৈতন্য ও জাগ্রত প্রাণশক্তিকে এমন অসহায়ভাবে স্তব্ধ করে দিয়েছে।...
> জীবনের উত্তুঙ্গ শাখাকে স্পর্শ করার অনেক আগেই মৃত্যুর হিমশীতল হাত তাকে স্পর্শ করেছে। তার বন্ধুরা তার এই অভাবিত অসংগত মৃত্যুকে—দুর্দম

তারুণ্যের এই অন্যায় পতনকে—অশ্রুপাতহীন যেতে দেয়নি। অনেক অনুভূতিময় কবিতা ওর কবরের ওপর নিঃশব্দে ঝরে পড়ে ওর মৃত্যুকে গৌরবান্বিত করেছে। ওকে নিয়ে ওর বন্ধুদের রচিত অনেক স্মৃতিকথা ও রচনা, বন্ধুদের বের-করা পত্রপত্রিকা ও সংকলন, ওর মৃত্যু উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভা ও প্রতিবাদ মিছিলের সোচ্চার আওয়াজ তার মৃত্যুকে খ্যাতিমান ব্যক্তিদেরও আকাঙ্ক্ষার বিষয় করে তুলেছে। ...

একটি দেশের ইতিহাস তার কাল-পরিধির অনেক দীর্ঘ, নির্লিপ্ত ও আত্মসন্তুষ্ট অধ্যায় পার হয়ে এক-এক সময় ব্যাপক রক্তপিপাসায় জেগে ওঠে। সে তখন এসে দাঁড়ায় অসংখ্য মানুষের রক্তের দাবি নিয়ে, অনেক তাজা নতুন প্রাণের আত্মোৎসর্গের মধ্যে দিয়ে আকাঙ্ক্ষিত যুগান্তরকে অন্বেষণ করে। বাংলাদেশ আজ হয়তো সেই ব্যাপক রক্তপিপাসাকেই প্রত্যক্ষ করছে। অগণিত মানুষকে তার বলি হতে হয়েছে ইতিমধ্যে। হয়তো হুমায়ুনকেও হতে হল। তবু বলব, বাঙালি জীবনের এ বিক্ষুব্ধতম ক্রান্তিলগ্নে দেশপ্রেম বুকে নিয়ে যারাই বাংলার মাটিকে রঞ্জিত করল—যে-পথে এবং যে-কারণেই হোক—তারা শহীদ। তাদের রক্ত স্বদেশভূমির উত্তরণের সপক্ষে।

সংখ্যাটিতে মান্নানের একটা ভালো লেখা ছিল হুমায়ুনের কবিতার ওপর। আরও ছিল ফরহাদ মজহারের কবিতা। বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনার আবেগে-ভেজা কবিতাটি ছাপা হয়েছিল পত্রিকার শুরুতেই, উৎসর্গ পৃষ্ঠার পরপরই :

আমি ডেকে বলতে পারতুম, 'তুই একটু সাবধানে যা—
একটু সাবধানে, যেমন সাবধানে যায় কবি কিম্বা পাখি,
বলতে পারতুম আয় আমার সঙ্গে বোস'
আমার সঙ্গে আমি যেমন করে কিচ্ছু না-ছুঁয়ে বসে থাকি।

এমন অনেক কিছু আছে যা ছুঁয়ে দেখা ভালো নয়
যেমন বারুদভর্তি বন্দুক কবিতা কিম্বা প্রেম
এসব ছুঁয়েও না-ছোঁয়ার ভান করা ভালো
আমি বলতে পারতুম 'হুমায়ুন খবরদার সাবধানে যা'

আমি বলতে পারতুম যেমন বন্ধুরা আমাকে বলে
আমি বন্ধুর মতোন গ্রীবা উঁচিয়ে বলতে পারতুম
হুমায়ুনের কাঁধে হাত রেখে বলতে পারতুম, 'হুমায়ুন
আয় আমার সঙ্গে বোস, আমরা কিচ্ছু না-ছুঁয়ে বসে থাকব।'

জানিয়ে দিতে পারতুম ইস্পাতের–সঙ্গে–কুসুমের–ভালোবাসা ভালো নয়,
ভালো নয় সেতুর উপর দাঁড়িয়ে খেয়ার জন্যে অপেক্ষা করা
ভালো নয় ইন্দিরা রোডে রেবুকে ফেলে লেখক শিবিরে
মেতে থাকা
বলতে পারতুম 'অত দ্রুত নয় হুমায়ুন, আস্তে আস্তে যা'

সবকিছুই তো বলতে পারতুম, সবকিছুই কি বলা যায়!
সবসময় কি সবকিছু করা যায়? সংগঠন বা সংসার?
এই–যে এখন তুই দাঁড়িয়ে আছিস সামনে, মাথায় গুলি
রক্তে তোর শরীর ভিজে যাচ্ছে ভিজুক, আমি কী করব?
ভিজুক। সত্যিই কি ভিজতে থাকবি তুই হুমায়ুন আমার সামনে
তুই বলছিস না কেন 'ফরহাদ, তুই তো ফার্মেসির লোক
আমাকে ব্যান্ডেজ করে দে, আমি হুমায়ুন আমাকে ...'
যেমন করে একদিন যুদ্ধের ভেতর বলেছিলি তেমনি করে বল্।

আমি তো ফার্মেসির লোক, আমি ব্যান্ডেজ করে দিতে পারতুম।
স্বপ্নের ভেতর আমি বেশ কয়েকজন হুমায়ুন–কে ব্যান্ডেজ করেছি
বেশ কয়েকজন হুমায়ুনকে ডেকে বলেছি 'হুমায়ুন,
আয় আমার সঙ্গে আমরা কিচ্ছু–না–ছুঁয়ে বসে থাকব।'

কিন্তু প্রত্যেকবার আরো কয়েকজন হুমায়ুনকে খুন করা হয়
সংসারের মতোন সংগঠন থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করা হয়;
আমি কয়জনকে ব্যান্ডেজ করব হুমায়ুন, এ অসম্ভব;
ভিজতে থাক তুই, ভিজুক, রক্তে তোর শরীর ভেসে যাক।

যদি সব হুমায়ুনকে ব্যান্ডেজ করে দিতে পারতুম তবে তারা
একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে পারত : এই হচ্ছে সময়
যখন সিদ্ধান্ত নেয়া ভালো কিচ্ছু–না–ছুঁয়ে বসে থাকার
কিছু নয়—সংগঠন নয়, সংসার নয়, কবিতা নয়, প্রেম নয়

শুধু মাথায় বিশাল ব্যান্ডেজ বেঁধে অর্বাচীন হয়ে বসে থাকা...
এই সময় যখন কিচ্ছু–না–ছুঁয়ে বসে থাকার
সাহস থাকা ভালো।

৫

একাত্তরের যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তীকালে সারা জাতির মতো আমাদের ছোট্ট লেখকদলটিও যেন মৃত্যুর শিকার হয়ে উঠল। এক এক করে বেশ কয়েকজনের বিদায় দেখতে হল আমাদের। কেবল রাজনীতি আর যুদ্ধের শিকার হয়েই যে সবাই বিদায় নিল তা নয়, নানানভাবেই হারাতে হল তাদের। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৬-এর মধ্যে চলে গেল কয়েকজন তরুণ-লেখক।

ফরসা, ছোটখাট, লাজুক আর সন্ত্রস্ত চেহারার আবুল কাসেম এই দলের প্রথমদিকের একজন।

একেবারেই নিরীহ চেহারার ছেলে ছিল আবুল কাশেম। আমার কাছে প্রথম কবিতা নিয়ে এসেছিল সত্তরের কোনো-একসময়ে । কবিতাটা ছাপাও হয়েছিল পরের সংখ্যাতেই। ও ছিল পুরোপুরি কবি। ওর কবিতা ছিল শীত-সকালের শিশির-ভেজা ঘাসের মতো। সেখানে শব্দদের ফাঁকে ফাঁকে রহস্যেরা শিশিরের মতো জমে আছে। ওর মৃত্যুটা অদ্ভুত। ও মারা গিয়েছিল একাত্তরের পঁচিশে মার্চ রাতেই। নির্মলেন্দু গুণের 'আমার কণ্ঠস্বর'-এ ওর মৃত্যুর একটা ছোট্ট বিবরণ আছে :

> ১৯৭১ সালের ২৫মার্চের কালরাত্রে, কবি অসীম সাহার অবর্তমানে আবুল কাসেম জগন্নাথ হলে অসীমের রুমে ছিল। সে হয়তো ভেবেছিল ছাত্রশূন্য হলের নির্জন-কক্ষটি তার কাব্যরচনার অনুকূল হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য কাশেমের, দুর্ভাগ্য আমাদের যে, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে ঐ রাতেই কবি আবুল কাশেম অন্য অনেকের সঙ্গে নিহত হন। তাঁর মরদেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত জগন্নাথ হলের গণকবরে বা ঐ হলের পুকুরে ভাসমান লাশের সারিতেই তাঁরও স্থান হয়েছিল।

হুমায়ুনের মতো সশস্ত্র রাজনীতির শিকার হয়ে যারা প্রাণ হারিয়েছিল শশাঙ্ক পাল ছিল তাদের একজন। মাঝারি উচ্চতার, ছিপছিপে ও সুঠাম শরীরের শশাঙ্ক ছিল আবেগী ও অস্থির স্বভাবের তরুণ। কথা বলার সময় সেই অস্থিরতা ওর হাতেপায়ে যেন অস্বস্তভাবে কাঁপত। ও ছিল পুরোপুরি সাহিত্য-অন্ত প্রাণ। 'শ্রাবন্তী' নামে একটা গল্প-পত্রিকা বের করত ও। নিজেও গল্প লিখত। ও ছিল সৎ , উৎসাহী , আদর্শবান এবং তীব্র আবেগতাড়িত, অস্থিরচিত্ত তরুণ—যে-ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বৈপ্লবিক রাজনীতির সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যায়। ও একসময় সর্বহারা পার্টির 'কট্টর' অ্যাক্টিভিস্ট হয়ে ওঠে। এই রাজনীতিই ওর কাল হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতার পর জন্মস্থান পিরোজপুরে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে নিহত হয় শশাঙ্ক পাল।

৬

স্বাধীনতার আগে 'কণ্ঠস্বর'কে আমরা মাসিক পত্রিকা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে গেলেও নানা সমস্যার জন্যে গড়ে এ দুমাসে একটির বেশি বের করতে পারিনি। ত্রৈমাসিক করব সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সুবিধা হয়ে গেল অনেক। তিনমাসে একবার বের করতে হল বলে সুস্থিরভাবে সময় নিয়ে দেখে বুঝে বের করা সম্ভব হয়ে গেল। পৃষ্ঠাসংখ্যা ষাটসত্তুর থেকে দেড়শ-পৌনে দু-শ হয়ে যাওয়ায় একধরনের বিশালতা এবং রাজকীয়তা এল চেহারায়। বড় আকারের লেখা ছাপার জায়গা হল, লেখার মানও বেড়ে গেল পত্রিকার। আর এমন একটা পত্রিকাকে যদি সুশ্রী আর দৃষ্টিনন্দন লাইনো টাইপে ছেপে চুয়াল্লিশ পাউন্ড কার্টিজ কাগজে ভারভার্তি আর অভিজাত চেহারা দিয়ে বের করা যায় তবে আর পায় কে?

হতে লাগল তাই। একেকটা পত্রিকা বেরোতে লাগল আভিজাত্য রুচি আর বৈভবের প্রতীক হয়ে। লেখা আর প্রকাশনাগৌরবে 'কণ্ঠস্বর' হয়ে উঠল অনবদ্য। স্বাধীন বাংলাদেশ সারাজাতির কাছ থেকে তখন সত্যিসত্যিই অভাবনীয় কিছু প্রত্যাশা করছে। 'কণ্ঠস্বর' সে-প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হল না।

স্বাধীনতার আগে সেই ষান্মাসিক গ্রাহকদের পর্ব পেরিয়ে যাবার পর 'কণ্ঠস্বর' আবার বের করতে শুরু করেছিলাম সাড়ে বারো-শ কপি করে। একটানে তাকে দুহাজারে তুলে ফেললাম। দুহাজারের মধ্যে বিক্রির জন্যে দোকানে যেত কমপক্ষে আঠারো-শ কপি; আশ্চর্য ব্যাপার এই আঠার-শ-ই বিক্রি হয়ে যেত। বিক্রির এই সংখ্যাটা খুবই অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য এজন্যে যে তখন বাংলাভাষার সেরা কাগজ 'চতুরঙ্গ' বা 'এক্ষণ'ও চলত আট-শ থেকে এক হাজার কপি। কী করে আমাদের এত পাঠক হল? এর আগে বাংলাভাষার একটিমাত্র উচ্চাঙ্গের পত্রিকারই কেবল ২০০০ কপি ছাপার কথা শুনেছি। সে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'। আজও কি পশ্চিমবঙ্গে বা আমাদের এখানে কোনো 'উন্নতমানের' পত্রিকা এক হাজার কপির বেশি চলে ? অধিকাংশ কাগজকেই তো ছ-সাত শ বিক্রি করতে নাভিশ্বাস উঠে যায়। তাহলে কী করে আমাদের এমনটা হল?

এই আঠারো-শ-র সবই-যে বাংলাদেশে বিক্রি হত তা নয়; দু-শ বিক্রি হত কলকাতায়। স্বাধীনতার পর 'কণ্ঠস্বর'কে আমি কোলকাতায় পাঠানোর ব্যাপারে জোর উদ্যোগ নিয়েছিলাম। বিক্রি হত কলেজ স্ট্রিটের পাতিরামের বুক স্টলে। স্টলটা ছোট কিন্তু সে-সময়কার কোলকাতার সিরিয়াস পত্রপত্রিকা আর লিটল ম্যাগাজিনের সেরা দোকান ছিল ওটা। পাশেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কফি হাউস আর কলেজ স্ট্রিটের বিখ্যাত বইপাড়া থাকায় এ-ধরনের পত্রপত্রিকার চাহিদা এই দোকানে ছিল প্রচুর। কোলকাতায় পত্রিকা পাঠাতে বা তার দাম পেতে ঝক্কি ছিল বিস্তর তবু পত্রিকা কোলকাতায় পাঠাতাম আমি। পাঠাতাম এর পাঠকপ্রিয়তার কারণে; কলেজ স্ট্রিটের পাঠকেরা পত্রিকাটাকে হুটোপুটি করে কিনে নিত বলে। দিন-সাতেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যেত দু-শ কপি।

কেবল পাতিরামে নয়, 'চতুরঙ্গ' 'এক্ষণে'র মতো 'দেশ' 'আনন্দবাজারে'র মতো বড় বড় পত্রিকা-অফিসেও সৌজন্যসংখ্যা পাঠাতাম। পাঠাতাম 'কণ্ঠস্বর'-এর প্রতিটি কপির সঙ্গে আমার এই নীরব কথা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে : মনে কোরো না কেবল তোমরাই আছ, দেখ, তোমাদের অনেক পরে বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গনে এসে আমরাও, বাংলাদেশের মানুষেরাও, তোমাদের সমান মানের জিনিশ নিয়ে এরই মধ্যে কেমন এসে দাঁড়িয়েছি।

'কণ্ঠস্বর' সম্বন্ধে সে-সময়কার বাংলাদেশের উঠতি সংস্কৃতিবান মধ্যবিত্তদের অনুভূতি কেমন ছিল একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি। আমার একজন খুবই নিকটজন আছেন। এখন তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী এবং ফেনী থেকে নির্বাচিত সাংসদ। নাম মোশাররফ হোসেন। আমি তাঁকে বড়ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করি। স্বাধীনতার পরের দিনগুলোতে তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে অনেক বিজ্ঞাপন দিয়ে তিনি আমাদের ঋণী করেছেন। 'কণ্ঠস্বর'-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে প্রায়ই তিনি রসিকতা করে বলতেন, 'বাংলাদেশের দুটো রপ্তানিযোগ্য জিনিশ আছে বুঝলে? এক,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান; দুই, তোমাদের 'কণ্ঠস্বর'।

তবু আমি এখনও এ-কথা ভেবে অবাক হই, কেন সেদিন পাঠকেরা এভাবে 'কণ্ঠস্বর' কিনেছিল? সে কি পত্রিকার অপ্রত্যাশিত মান দেখে? খুশি হয়ে? নাকি সদ্য স্বাধীনতা-পাওয়া দেশে নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতির কাছে তাদের বেড়ে-যাওয়া প্রত্যাশা আমরা পূরণ করতে পেরেছিলাম বলে। নাকি ঘটেছিল অন্যকিছু? আমার ধারণা, পঞ্চাশ আর ষাটের দশকের সুস্থির ও আদর্শপ্রাণিত জীবন-পরিবেশের ভেতর থেকে নিঃশব্দে এদেশে জেগে উঠেছিল একটা বড় আকারের শিক্ষিত ও রুচিঋদ্ধ মধ্যবিত্তশ্রেণী যারা সত্তরের দশকের প্রথমদিকে এদেশের শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও বাহকের ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কয়েক দশকের ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকট, রাজনৈতিক বিপর্যয় ও লালসা আর লুণ্ঠনের অন্ধ ঘূর্ণাবর্তের ভেতর ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এরাই কি সেদিন হয়ে উঠেছিল সেদিনের 'কণ্ঠস্বর'-এর ক্রেতা?

৭

আবুল হাসানের প্রকৃতি ছিল আশ্চর্য সরল আর মিষ্টি। ওর চোখদুটোও ছিল সেই স্নিগ্ধ মাধুর্যে ভরা। ওর ছবিগুলোতেও সেই মিষ্টি হাসিটি চোখে পড়ে। রাজনীতির হৈ-হাঙ্গামা থেকে দূরে একটা শান্ত প্রাকৃতিক জগতে ওর ছিল একাকী বিচরণ। ফিরে ফিরে মনে হয় কী সরলই না ছিল হাসান। কেউ ওর কোনো ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিলে মিষ্টি হেসে কী শিশুর মতোই না খুশি হত। একদিন সন্ধ্যায় সূর্যসেন হলের মাঠে ও কবিতা পড়ে শোনাচ্ছিল আমাদের। হঠাৎ দেখা গেল একটা কবিতায় ও লিখেছে : 'তুমি, হে আমার জীবনের সারমেয়!' আমি হেসে বললাম, 'কী হল হাসান। প্রিয়াকে

একেবারে কুকুর বানিয়ে দিলে !' ও স্বভাব-সরলভাবে বলল, 'কই, কোথায় ?' যেন প্রিয়ার মধ্যে কুকুর এল কী করে তাই খুঁজে দেখার চেষ্টা করছে। আমি বললাম, 'সারমেয় মানে কী বলো তো ?' ও বলল, 'কেন সারমেয় মানে সার; মানে সারাৎসার, সারবস্তু !' আমি জানতাম ও এ-ধরনেরই কিছু-একটা বলবে। বললাম, 'সারমেয় মানে কুকুর, হাসান, সারবস্তু নয়। বুঝতে পারছ প্রিয়ার কী সর্বনাশ করে বসেছ ?'

হাসানের মুখ লাল হয়ে উঠল। আন্তরিকভাবে বলতে লাগল : 'সত্যি আমি জানতাম না সায়ীদ ভাই, সত্যি না। কবিতাটা কালই পত্রিকায় দেওয়ার কথা ছিল। কী লজ্জাতেই না পড়ে যেতাম ! কী সব কথাই না শুনতে হত !'

এমনি সহজ শাদামাঠা আন্তরিক হৃদয়ের মানুষ ছিল ও। সব ব্যাপারেই এমনি সরলতা আর আন্তরিকতা ছিল ওর মধ্যে। কবিতার ভেতর প্রিয়তমার কল্যাণ কামনাতেও ও এ-ধরনের সহৃদয়তা থেকে খুব দূরে নয় :

যদি সে সুগন্ধি শিশি, তবে তাকে নিয়ে যাক অন্য প্রেমিক !
আতরের উষ্ণ ঘ্রাণে একটি মানুষ তবু ফিরে পাবে পুষ্পবোধ পুনঃ
কিছুক্ষণ শুভ্র এক স্নিগ্ধ গন্ধ স্বাস্থ্য ও প্রণয় দেবে তাকে।
একটি প্রেমিক খুশি হলে আমি হব নাকি খুব আনন্দিত ?...

যদি সে চৈত্রের মাঠ—মিলিত ফাটলে কিছু শুকনো পাতা তবে
পাতা-কুড়োনিরা এসে নিয়ে যাক অন্য এক উর্বর আগুনে।
ফের সে আসুক ফিরে সেই মাঠে শস্যবীজে, বৃষ্টির ভিতরে।
একটি শুকনো মাঠ যদি ধরে শস্য তবে আমি লাভবান।

যদি সে সন্তানবতী, তবে তার সংসারের শুভ্র অধিকারে
তোমরা সহায় হও, তোমরা কেউ বাধা দিও না হে,
শিশুর মুতের ঘ্রাণে মুগ্ধ কাঁথা ভিজুক বিজনে ;
একটি সংসার যদি সুখী হয়, আমিও তো সুখী।

আর যদি সে কিছু নয়, শুধু মারী, শুধু মহামারী !
ভালোবাসা দিতে গিয়ে দেয় শুধু ভুবুর অনল।
তোমরা কেউই আঘাত কোরো না তাকে, আহত কোরো না।
যদি সে কেবলি বিষ—ক্ষতি নেই—আমি তাকে বানাব অমৃত !

[কল্যাণ মাধুরী]

কবিতা ছিল হাসানের প্রতিমুহূর্তের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। চারপাশের সবার কবিতা মন দিয়ে পড়ত ও। সেসবের উষ্ণ আমেজে চাঙা হয়ে থাকতে ভালোবাসত। কারো কবিতার কোনো জায়গা ভালো লাগলে তা বারে বারে পড়ে

পুরোপুরি নিজের জিনিশ না–করে ফেলা পর্যন্ত থামত না। সুযোগ হলে যার কবিতা তাকে আবৃত্তি করে শোনাত। ও জানত কোনো কবিকে তার কবিতা আবৃত্তি করে শোনালে কবির ভালো লাগে। নিজের অস্তিত্বকে তার কাছে অর্থপূর্ণ মনে হয় ।

আমার কবিতা নিয়েও কথা বলত ও মাঝে মাঝে। বলত, 'আপনার শব্দগুলো বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটার মতো। বেশ লাগে আমার।' জানি না নবীন–কবি গুণ যেভাবে দৈনিক বাংলার সাহিত্যপাতার সম্পাদক আহসান হাবীবকে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে তাঁকে দুর্বল করেছিল এটাও তেমনিভাবে আমাকে পকেটে পুরে ফেলার চেষ্টা ছিল কি না। লেখকদের বিশ্বাস নেই। কখন কী চালাকি দিয়ে যে তারা সম্পাদকদের থলের বেড়াল বানিয়ে ফেলে বোঝা দায়। কিন্তু হাসানের বৈষয়িক বুদ্ধি অতটা তীক্ষ্ণ ছিল না। আমার মনে হত, আন্তরিক ভালোলাগা থেকেই ও কথাগুলো বলত।

সবাই আশা করেছিল হাসান একদিন ভালো মাপের কবিতা উপহার দেবে। কিন্তু মৃত্যু যে ওর এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে সেটা আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। জন্মগতভাবে ওর হৃৎপিণ্ডের দুটো ভাল্ব ছিল নষ্ট। ছেলেবেলা থেকেই দুর্বল ছিল হাসান। সামান্য পরিশ্রমে হাঁপিয়ে পড়ত। স্বাধীনতার পরপর এই অসুখ আস্তে আস্তে বেড়ে যেতে লাগল। সবাই বুঝে গেল দিন ফুরিয়ে আসছে হাসানের । অনেকে মিলে চেষ্টা–কষ্ট করে চিকিৎসার জন্যে জার্মানিতে পাঠানোর ব্যবস্থাও করল ওকে। কিন্তু তখন ওর অসুখ আরোগ্যের বাইরে।

ঢাকায় ফেরার পর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে আসতে লাগল। হৃৎযন্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে লাগল। একসময় পোস্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালে ভর্তিও হল ও। কিন্তু বাঁচল না। ১৯৭৫–এর ২৬শে নভেম্বর সকালে সবাই যখন ওর খবর পেয়ে হাসপাতালে গেল, তখন ও ওর অনেকদিনের জ্বর, ঘাম, ক্লান্তি আর অবসিত যৌবনের বিশীর্ণ বিছানাকে বিদায় জানিয়ে অসাড় হয়ে পড়ে আছে। মৃত্যুর সময় ওর বয়স হয়েছিল ২৮ বছর।

আশ্চর্য সহজভাবে মৃত্যুকে মেনে নিয়েছিল হাসান। এভাবে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে যে–কোনো তরুণেরই বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হওয়ার কথা। দুঃসহ বিপর্যস্ত আর্তনাদে চারপাশকে রক্তাক্ত আর ফালি–ফালি করে ফেলার কথা। কিন্তু এমন করতে কখনোই প্রায় ওকে আমি দেখিনি। যখনই দেখেছি তখনই দেখেছি ওর মুখে সেই মিষ্টি হাসিটি লেগে আছে। মৃত্যুর দিনকয়েক আগে ওকে শেষবারের মতো যখন হাসপাতালে দেখতে যাই তখনও ওর সেই সজীব চোখ, সুস্মিত হাসি, তপ্ত জীবনতৃষ্ণাকে আমি একইভাবে উষ্ণতা ছড়াতে দেখেছি।

মৃত্যু সবসময় ওর পেছনে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের ওপর ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলেছে, কিন্তু ওর হৃদয় ছিল মৃত্যুহীন। জীবনকে তো নয়ই, ওর কবিতাকেও মৃত্যু অধিকার করতে পারেনি। জীবনের উপমায় ভরা ছিল ওর কবিতা। ওর শেষ বই 'পৃথক পালঙ্ক' যখন বেরোয় তখন ওর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। জীবন থেকে দূরে এক পৃথক পালঙ্ক তখন ওর জন্যে নির্দিষ্ট। তবু এই নিষ্ঠুর বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও ওর মন জীবনের ইতিবাচকতাতেই ছিল ভরা :

যতদূর থাকো ফের দেখা হবে। কেননা মানুষ
যদিও বিরহকামী কিন্তু তার মিলনই মৌলিক।

যন্ত্রণা ছিল অনেক, তবু ঐ নিঃশব্দ রক্তক্ষরণকে ধারণ করে তাকে ও করতে চেয়েছে মুক্তাফলবান :

ঝিনুক নীরবে সহো
ঝিনুক নীরবে সহো, ঝিনুক নীরবে সহে যাও
ভিতরে বিষের বালি, মুখ বুজে মুক্তা ফলাও !

মৃত্যুর আগে লেখা একটা কবিতায় একটা জবাই-হওয়া মৃত্যুপথযাত্রী মোরগের রক্তমাখা মৃত্যুদৃশ্যের ভেতর নিজেরই মৃত্যুর নির্মম শিল্পচিত্রই হয়তো দেখেছিল হাসান :

ঘুরে ঘুরে নাচিতেছে পণ্ডিতের মতো প্রাণে
রৌদ্রের উঠানে ঐ নাচিতেছে যন্ত্রণার শেষ অভিজ্ঞানে !

পাখা লাল, শরীর সমস্ত ঢাকা লোহুর কার্পেটে !

মাথা কেটে পড়ে আছে, যায় যায়, তবুও নর্তক
উদয়শঙ্কর যেন নাচিতেছে ভারতী মুদ্রায় !

এইমাত্র বিদ্ধ হল বেদনায় চিকন চাকুর ক্রূরতায় !
এইমাত্র যন্ত্রণায় নাচ তার সিদ্ধ হল, শিল্পীভূত হল;...

এখন শান্তি শান্তি—অনুভূতি আহত পাখায়
ভেঙে পড়ে আছে পাখি, গৃহস্থের গরিব মোরগ !

একদিকে পুচ্ছ হায়—অন্যদিকে আমার ছায়ায়
মুখ গুঁজে শান্ত ঐ, শান্ত সে সমাহিত, এখন নিহতগ !!

[মোরগ]

নিজের জীবনেরও এমনি নির্মম দৃশ্য চোখে নিয়েই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে হাসান। ও বিদায় নিয়েছিল সবাইকে বিষণ্ন করে। ওকে নিয়ে লেখা একটা কবিতায় ওর প্রিয়তম বন্ধু নির্মলেন্দু গুণ কিছুদিন পরে লিখেছিলেন :

ভালোবেসে যাকে ছুঁই, সেই যায় দীর্ঘ পরবাসে ...।

গুণের হৃদয় নিপিষ্ট-করা এই পঙক্তি হাসানের সব প্রিয়-মানুষদের শূন্যহৃদয়ের কষ্টেরই যেন ভাষা।

অখ্যাত কবির জীবন নিয়ে ও চলে গেছে। ভালো কবিতা লেখার সময় ও পায়নি। তবু ওর শেষের দিকে কবিতা পড়লে দেখা যায় তাতে পরিণতির রঙ লাগতে শুরু করেছিল। সে-পরিণতি যেমন রক্তিম তেমনি ফলবান।

অনেকদিক থেকেই দুর্ভাগা ছিল হাসান। কবিতা লেখার উন্মাদনার সোনালি মুহূর্তগুলো ছাড়া জীবনে প্রায় কিছুই ছিল না ওর। তবু মৃত্যুর কিছুদিন আগে, অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের মতোই, প্রায় স্বর্গ থেকেই যেন, ও পেয়ে গিয়েছিল জীবনের সেই দুর্লভতম সম্পদ : প্রেম। কেবল প্রেম নয়, একজন সুন্দরীতমার প্রেম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষিকা, কবি, হয়তো ওর চাইতে বয়সে কিছুটা বড়, সুন্দরী সুরাইয়া খানম ওকে ভালোবেসেছিল। ওর জীবনের শেষদিনগুলোকে সেবায়, ভালোবাসায়, আশ্বাসে, সাহচর্যে ভরিয়ে দিয়েছিল। খুব অপ্রত্যাশিতভাবেই প্রেম পেয়েছিল হাসান। মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য, তবু জীবনের সর্বশেষ মুহূর্তগুলোকে প্রেমের সেই অনুপম বর্ণচ্ছটায় রক্তিম করে বিদায় নিতে পেরেছিল ও। ওর মতো দুর্ভাগ্যানিপিষ্ট একটা জীবনে এর চেয়ে সার্থকতার প্রাপ্তি আর কী হতে পারত?

ওর শেষ বই 'পৃথক পালঙ্ক' সুরাইয়া খানমকে উৎসর্গিত।

৮

'কণ্ঠস্বর'-এর শুরু থেকেই এলোমেলো ছোটাছুটিতে আমার জীবন খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-গোসলের ঠিক-ঠিকানা ছিল না। দিনরাত বিজ্ঞাপনের জন্যে দৌড়াদৌড়ি , প্রেসের যন্ত্রণা, খিদেয় চোঁ চোঁ করা পেট নিয়ে একটানা কাজ—এসব করতে করতে ৬৮-৬৯-এর দিকেই টের পেতে শুরু করেছিলাম আমার পাকস্থলীতে প্রায়ই তীব্র ব্যথা করছে, এবং ব্যথার সময় পেটের ওপরদিকটা শক্ত হয়ে উঠছে। একসময় ডাক্তার না-দেখিয়ে উপায় থাকল না। ডাক্তার আমাকে গ্যাস্ট্রিক আলসারের ওষুধ দিলেন এবং সুনিয়মিত জীবনযাপনের পরামর্শ দিলেন।

স্বাধীনতার পর পত্রিকার আকারের সঙ্গে কাজ বেড়ে যাওয়ায় আমার অসুস্থতা আবার ফিরে আসতে শুরু করল। পত্রিকার একটা সংখ্যা আরেকটাকে ছাড়িয়ে যতই সুন্দর হয়ে উঠতে লাগল আমিও ততই বেশি করে অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলাম। আমার চেহারা রুগ্ণ আর বিমর্ষ হয়ে আসতে লাগল।

তেহাত্তরের প্রথমদিকে একটা খুবই অনবদ্য সংখ্যা বেরোল 'কণ্ঠস্বর'-এর। লেখার মানে, প্রকাশনা-সৌষ্ঠবে যে-কোনো উন্নত পত্রিকাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার

মতো। আজও আমার ধারণা : এটিই কণ্ঠস্বরের সেরা সংখ্যা। কিন্তু পত্রিকার চেহারা যখন সবচেয়ে সুন্দর তখন আমার চেহারা হয়ে পড়েছে সবচেয়ে কুৎসিত আর শ্রীহীন। উল্টাপাল্টা ছোটাছুটি আর অনিয়মের ফলে অন্ত্রের ঘা বেড়ে গেছে বিপজ্জনকভাবে। পাকস্থলীতে দুবার বেশিরকম রক্তপাত হওয়ায় আমাকে ছ–মাসের জন্য বিছানা নিতে হল।

৯

দেখতে দেখতে এসে গেল পঁচাত্তর সাল। না, ঠিক দেখতে দেখতে নয়, জাতীয় জীবনে অনেক বড়বড় ঘটনার উথালপাতাল ঢেউ উৎরেই আমাদের জীবনে পঁচাত্তর এসে দাঁড়াল। এর মধ্যে সারাদেশের বিধ্বস্ত যোগাযোগব্যবস্থা, প্রশাসন, ব্যবসা–বাণিজ্য ও মানুষের জীবনযাত্রাকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সশস্ত্র আন্দোলনকে দমন করা হয়েছে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা বিলুপ্ত করে প্রবর্তিত হয়েছে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির ধারা। সারাদেশে তখন বাকশালের একদলীয় শাসন। এরই পাশাপাশি চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ সারাদেশকে করে তুলেছে অস্থির, বিহ্বল আর বিমর্ষ। অরাজকতায়, আশাভঙ্গে দেশ তখন বিভ্রান্ত, গন্তব্যহীন।

'কণ্ঠস্বর'–এর প্রথম সংখ্যা ১৯৬৫–এ বেরোলেও এর আসল যাত্রা শুরু হয়েছিল ছেষট্টি থেকে। সেই হিসেবে ১৯৭৫–কে দশম বর্ষ পদার্পণের বছর ধরে এপ্রিল মাসে মোটামুটি জাঁকালো ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। এবার অনুষ্ঠান আয়োজিত হল বাংলা একাডেমীর মিলনায়তনে। সভাপতি হলেন 'সমকাল'–সম্পাদক সিকানদর আবু জাফর।

সম্পাদক হিসেবে সিকানদর আবু জাফর ছিলেন অসম্ভব দুঃসাহসী । তাঁর মতো দুর্ধর্ষ মানুষ আমি আমাদের যুগে শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া কাউকে দেখিনি। যেমন তিনি ছিলেন ক্ষিপ্রবুদ্ধিসম্পন্ন তেমনি অপ্রতিরোধ্য। কাউকে পরোয়া করা তাঁর ধাতের মধ্যেই ছিল না। তাঁর এই দুঃসাহস ছিল 'সমকাল'–এর প্রাণ। তাঁর সম্পাদনায় দীর্ঘ পনেরো বছর বেরিয়েছে 'সমকাল' এবং যতদিন বেরিয়েছে ততদিন এক অপরাজেয় সাহসের পতাকা হয়েই বেরিয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতীয়তাবাদকে যেমন সাহসের সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, একইরকম সাহসের সঙ্গে সংস্কৃতিক্ষেত্রে তিনি পঞ্চাশ ও ষাট দশকের দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন 'সমকাল'–এর মাধ্যমে।

আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'সমকাল'–এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের জন্মের পর আমাদের সাহিত্যের বিকাশমান ও প্রগতিশীল যাত্রাকে প্রথম ধারণ করেছে

'সমকাল', এই সাহিত্যের সর্বোচ্চ রূপটিকে উপহার দিয়েছে। অতিপ্রজ ও দীর্ঘায়ু এই পত্রিকার ভেতর দিয়েই বাংলাদেশের সাহিত্য প্রথমবারের মতো নিজের শক্তি ও যোগ্যতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে, পেয়েছে নিজের সাহিত্যভূমির ওপর নিজের নিরঙ্কুশ আধিকার। 'সমকাল' সেকালে আমাদের সাহিত্যের ব্যাপারে নিজেদের মনের সমস্ত সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাঙালি যেমন নিজের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছিল, তেমনি, এর কিছুটা আগেই, 'সমকাল'-এর মধ্যদিয়ে অর্জন করেছিল নিজের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সার্বভৌমত্ব।

প্রচণ্ড জীবনমুখী আর প্রাণশক্তিতে ভরা ছিলেন জাফর ভাই। তাঁর দাদা ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান। পাঠান-জীবনের সেই প্রচণ্ডতা ছিল তাঁর রক্তে। জীবন-উপভোগের ঝাঁঝালো নেশায় কত বিচিত্র পথে-যে তিনি পা বাড়িয়েছেন তার শেষ নেই। কবিতা লেখা, নাটক লেখা, সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদনা, ব্যবসা, রেসের ঘোড়া কেনা—কী নয়? শুনেছি যৌবনে নাকি ডাকাতদলের সঙ্গে জুটে ডাকাতিও করেছেন একবার। একদিন গল্পে গল্পে আমাকে বলেছিলেন, 'কবে জীবন দয়া করে আমার দরোজায় এসে দাঁড়াবে তার জন্যে আমি বসে থাকিনি, আমি অর্ধেক রাস্তা এগিয়ে গিয়ে জীবনকে হিঁচড়ে টেনে আমার ঘরে নিয়ে এসেছি।' মুখের কথা নয়, সত্যি জাফরভাই ছিলেন ওরকমই।

জীবনের শেষের দিকে জাফর ভাই হাঁপানিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এই নিষ্ঠুর রোগটাই তাঁর অবিশ্বাস্য প্রাণশক্তিকে ধীরে ধীরে শেষ করে আনে। এই রোগেই তিনি মারা যান। আমারও তখন অ্যাজমার প্রবণতা ছিল। শেরাটনের সামনে দিয়ে একদিন গাড়িতে যেতে যেতে আমাকে বললেন, 'বাংলাদেশে এত লোক থাকতে তুমি আর আমি সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক কেন জানো? আমাদের দুজনার যে অ্যাজমার রোগ, তাই।' 'হাঃ হাঃ'! তাঁর সেই আত্মতৃপ্তি-ভরা হাসি।

এমন দুর্দান্ত আর বেপরোয়া মানুষটা অসুখে ভুগে-ভুগে কী যে নির্জীব আর ম্রিয়মাণ হয়ে এলেন একসময়, ভাবতেও কষ্ট লাগে। কিন্তু ম্রিয়মাণ হয়ে এলেও তাঁর মনের সেই শক্তিমত্তা, কৌতুকবোধ, তোয়াক্কাহীন উদ্দাম আবেগ তখনো তাঁর ভেতর জ্বলছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর রসবোধের কমতি ছিল না। আমিও তাঁর সঙ্গে সবসময়েই রসিকতা করতাম।

একদিন আমাদের কবিবন্ধু মনজুরে মওলার বাসার পার্টিতে গল্প করছিলাম আমরা। ঘরভর্তি মানুষ। হঠাৎ শুনলাম জাফর ভাই নিচে এসে গেছেন, একতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন। তাড়াতাড়ি নিচে গেলাম তাকে নিয়ে আসতে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় তাঁকে হাত ধরে সাহায্য করতে হল। মনে মনে ভাবলাম, 'আহা, এই সেই আমাদের দুর্ধর্ষ জাফর ভাই—বিপদে বিপর্যয়ে যিনি ছিলেন সবার ওপরে বটগাছের মতো। কারো কোনো অসুবিধা দেখামাত্রই যিনি সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছেন, ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।' তাঁর হাত ধরে তাঁকে সবার মাঝখানে নিয়ে এলাম আমি। তারপর হেসে বললাম, 'উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আসুন আমাদের এই বিশিষ্ট অতিথির সঙ্গে

আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।' সবাই শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে এগিয়ে এল। আমি বললাম, 'সুধীমণ্ডলী, ইনি একজন বৃদ্ধ বাঘ। আগে সব জায়গায় ঘুরেফিরে খেতেন, এখন গর্ত থেকে গলা বের করে যতটুকু যা জুটছে তাই দিয়েই কোনোমতে কাজ চালিয়ে চলেছেন।' আমার কথায় সবাই হো হো করে হেসে উঠল। জাফর ভাইও মৃদু হেসে সপ্রশংস চাউনিতে উপমাটা অনুমোদন করলেন। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, পেছনে ভাবী। তিনি–যে এতক্ষণ আমাদের পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন আমি বুঝিতে পারিনি।

জাফর ভাইয়ের মৃত্যুর দিনটার কথা আজও মনে পড়ে। মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর বাসায় ছুটে গেলাম। আমি তাঁর খুব কাছেই থাকতাম। তাঁর বাসায় লেখক শিল্পী অনেকের সঙ্গেই দেখা হল। সবাই বিমর্ষ। কিন্তু আমি কেন যেন কিছুতেই ভাবতে পারছিলাম না জাফর ভাই মারা গেছেন। ঘরের ভেতর একটা খাটিয়ায় জাফর ভাইকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। খাটিয়াটা একটা আশ্চর্য রঙিন কারুকার্যখচিত চাদরে ঢাকা। আমার মনে হচ্ছিল ঐ চাদরের নিচে অমনি প্রাণবন্ত আর রঙিন হয়েই যেন তিনি এখনো বেঁচে আছেন। ঘরের একপাশে বেশকিছু মেয়ে কান্নাকাটি করছিল, তাদের উল্টোদিকে বসে কয়েকজন মৌলভী একটানা কোরান পড়ে যাচ্ছেন—বেঁচে থাকতে যেসব বিলাপ বা ধর্মীয় আচরণকে তিনি কোনোদিন কোনো মূল্যই দেননি। আমার কেন যেন কেবলি মনে হতে লাগল তাঁর জন্যে এসব কান্নাকাটি আর আত্মার মুক্তির জন্যে ক্রিয়াকলাপ দেখে চাদরের নিচে শুয়ে তিনি হয়তো মনে মনে হাসছেন।

তাঁর মৃত মুখ না–দেখেই আমি ফিরে এসেছিলাম। আজও আমি বিশ্বাস করি তিনি বেঁচে আছেন।

১০

মিলনায়তন ভর্তি শ্রোতার অংশগ্রহণে আমাদের দশম বর্ষ পদার্পণ অনুষ্ঠানটি বেশ জমজমাটই হল। অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় আমার ছোট্ট বক্তব্যটি আমি লিখিত আকারে তুলে ধরেছিলাম, তাই অনুষ্ঠানে তেমন কিছু বললাম না। আমার বক্তব্যে আমি 'কণ্ঠস্বর'–এর মূল চরিত্রটি তুলে ধরার পাশাপাশি এর দশম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমার অনুভূতিটুকু জানিয়েছিলাম :

> 'কণ্ঠস্বর' দশম বর্ষে পদার্পণ করলো। আমাদের প্রাথমিক প্রস্তুতির তুলনায় বড়ো বেশী দীর্ঘ এই সময়—বড়ো বেশী রকম অপ্রত্যাশিত ও অস্বস্তিকর। সত্যি কথা বলতে কি 'কণ্ঠস্বর'–এর এতোটা দীর্ঘায়ুর জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। তবু 'কণ্ঠস্বর' এখনো বেঁচে আছে। একটা নতুন সাহিত্যযুগের আত্যন্তিক প্রয়োজন, একত্রিত একটি নবীন লেখকদলের সমবেত দরকার এই পত্রিকাটিকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে।

বুদ্ধদেব বসু একবার দুঃখ করে লিখেছিলেন যে তাঁদের পরের যুগের তরুণরা, 'কল্লোল' সম্পর্কে তাঁদের অতি-উৎসাহের ন্যায়সঙ্গত কারণ খুঁজে না পেয়ে, প্রায়ই তাঁকে নির্দ্বিধায় এমন সব নির্মম কথা শুনিয়ে থাকে যে, 'কল্লোল' সম্বন্ধে তাঁদের অত উচ্ছ্বসিত হওয়া ব্যক্তিগত অতি-উৎসাহেরই নামান্তর যেহেতু 'কল্লোল' 'বাজে লেখায় ভর্তি'। আজ, এতোদিন পর, 'কণ্ঠস্বর'-এর পুরনো দিনের পৃষ্ঠাগুলো ওল্টাতে গিয়ে এমনি একটা কথাই ফিরে ফিরে মনে জাগছে : সত্যিকারের ক'টা 'ভালো' লেখা প্রকাশিত হয়েছে 'কণ্ঠস্বর'-এর এযাবৎকালের পৃষ্ঠায়—আজ অব্দি? কোথায় সেই সব প্রবুদ্ধ, মৌলিক, শক্তিমান রচনার বিপুল উৎসার—যাকে সার্বিক পরিপূর্ণতায় ধারণ করতে পারলেই, একটি পত্রিকাকে ন্যায়ত 'উচ্চাঙ্গের' বলে অভিহিত করা যায়? কোথায় সেই সাহিত্যরুচির উন্নতমান—কিংবা মহাদেব সাহার ভাষায় 'সংযম ও স্থৈর্য'—যা থাকলেই শুধুমাত্র একটি পত্রিকা প্রগাঢ় ও শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে?

না, 'কণ্ঠস্বর'-এ সেসব নেই। 'কণ্ঠস্বর' হাতে নিয়ে কোনো শুদ্ধতাবাদী এমন কথা ভাবতে পারবেন না যে একালের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনায় সমৃদ্ধ একটি অনন্য পত্রিকা তিনি হাতে ছুঁয়েছেন। না, 'কণ্ঠস্বর' কোনো ঈপ্সিত 'স্ট্যান্ডার্ড ম্যাগাজিন' নয়, 'কণ্ঠস্বর' আজো 'লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন'—এর রচনা এবং প্রকাশনাঘটিত সমস্ত পরিশীলন সত্ত্বেও। 'কণ্ঠস্বর' মূলত লেখক-সৃষ্টির পত্রিকা। এ কারণেই 'কণ্ঠস্বর' 'স্থৈর্য এবং সংযমে'র নয়—'কণ্ঠস্বর' নতুনত্ব এবং প্রতিভার; গৃহপালিত প্রাতিষ্ঠানিকতার নয়, প্রতিষ্ঠাহীন অনিকেতের; তারুণ্যের এবং ভুলের, শক্তির এবং অসহায়তার, সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাচার ও দুঃসাহসী মৌলিকতার—অগতানুগতিকতার, আপোষহীনতার, ব্যতিক্রমের। বিশ্বাস করি 'কণ্ঠস্বর' এখনো তার এই আপোষহীন চরিত্র হারায়নি। নান্দনিক পরিশীলনের পাশাপাশি প্রতিভার উজ্জ্বল স্বেচ্ছাচারকে, 'কণ্ঠস্বর', আজ অব্দি, একইভাবে অন্বেষণ করে।..

শেষ করার আগে আবার মনে হচ্ছে, 'কণ্ঠস্বর' এত দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে, প্রথম প্রকাশের সময়, ঘুণাক্ষরেও মনে আসেনি। আজ মনে হচ্ছে যদি এ ভুল না ঘটত, যদি জানতে পারতাম সেদিন যে দীর্ঘ দশটা বছরের ঝঞ্ঝা উৎরে বেঁচে থাকবে আমাদের এই ভালোবাসার সাম্পান, তবে হয়তো আরও একটু সতর্ক হতাম; সচেতন পরিকল্পনায়, সনিষ্ঠ শ্রমে আরও একটু ফলবান করে তুলতে চেষ্টা করতাম আমাদের প্রয়াসের, আনন্দের এই ফসলটিকে।

১৯৭৬

অনুষ্ঠানে কারা কারা বক্তব্য দিয়েছিলেন মনে পড়ছে না। কেবল নির্মলেন্দু গুণের কথা মনে পড়ে। বক্তৃতায় গুণ আমার সেই সাইকেলে চড়ে তাঁর বিজ্ঞাপন সংগ্রহের করুণ দিনগুলোর কথা মজা করে স্মরণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'পিছন ফিরে যখন আজ সেই দিনগুলোর দিকে তাকাই তখন দেখতে পাই একটা সাইকেলের ওপর ক্লান্তভাবে ঝুঁকে পড়ে আমি ঢাকা শহরের রাস্তাগুলোর ওপর দিয়ে

যেন কেবলই ছুটে চলেছি। সে ছোটার যেন শেষ নেই। 'কণ্ঠস্বর'–এর সঙ্গে সেদিন আমার জড়িয়ে পড়া আমার কবিজীবনের জন্য খুবই কাজে এসেছিল।' শেষ বাক্যে বলেছিলেন : 'জীবনে আমি হয়তো অনেক কিছুই হতে পারতাম। হতে পারতাম আমলা কিংবা অধ্যাপক, বেশ্যার দালাল কিংবা ব্যবসায়ী, কিন্তু কোনোকিছু না হয়ে আমি–যে কবি হয়েছিলাম, হ্যাঁ কবি আর কিছুই নয়, সে হয়তো সেদিন ওভাবে 'কণ্ঠস্বর'–এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম বলে।'

গুণের বক্তৃতা শেষ না–হতেই মঞ্চের খুব কাছে বারান্দার দিক থেকে একটা হৈচৈ–এর শব্দ কানে এল। আমি মঞ্চ থেকে উঠে বারান্দার কাছে যেতেই দেখলাম আবুল হাসান মঞ্চে উঠে একটা কবিতা পড়ার জন্যে সবার সঙ্গে হৈচৈ বাধিয়ে দিয়েছে। কবিতাটা কাশীনাথ রায়ের, পাঁচ পৃষ্ঠা লম্বা, 'কণ্ঠস্বর'–এর সেই সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল। হাসান তখন বেশ অসুস্থ। ওর মৃত্যু হয় এর কয়েক মাসের মধ্যেই। আমাদের অনুষ্ঠানে কবিতা পড়ার পর্ব ছিল না, আমি তাই হাসানকে বুঝিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করলাম। আমার কথায় হাসান আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল। অসম্ভব চেঁচিয়ে বলতে লাগল : 'আমি পড়বই। কবিতাটা অসাধারণ। এটা সবাইকে শোনাতেই হবে।' দেখলাম, ওর চোখমুখ পুরোপুরি তেড়িয়া আর অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ওর সারা শরীর ঘামে ভেজা, মুখ লালচে, রোগা হাতদুটো থরথর করে কাঁপছে। ওর জন্য আমার ভয় করতে লাগল।

ওকে কবিতা পড়ার জন্যে মঞ্চে নিয়ে এলাম। অদ্ভুত উন্মাদনা নিয়ে মাতালের মতো ও আবৃত্তি করে গেল কবিতাটা। ভালো কবিতা নিয়ে—সে যারই লেখা হোক––ওর ছিল এমনি মত্ততা। শ্রোতারা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল ওর আবৃত্তিতে। যখন আবৃত্তি শেষ হল মনে হল ওর শক্তি যেন শেষ হয়ে এসেছে। ও যেন পড়ে যাচ্ছে। আমরা ওকে ধরে মঞ্চের বাইরে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম।

সভাপতির বক্তৃতায় সিকানদর আবু জাফর নানান রসের ভিয়েন দিয়ে চমৎকার ও উপভোগ্য বক্তৃতা করলেন। আনন্দময় সমাপ্তি হল অনুষ্ঠানের।

এর মাসখানেক পর জাফর ভাইয়ের মৃত্যু হল। আমরা পরবর্তী সংখ্যার 'কণ্ঠস্বর' তাঁর নামে উৎসর্গ করলাম।

সত্তরের সহযাত্রী

১

সত্তুরের দশকের শুরু হতেই বোঝা গেল 'কণ্ঠস্বর'–যে কেবল ষাট দশকের তরুণদেরই মুখপত্র হিসেবে কাজ করেছে তাই নয়, সত্তর দশকের তরুণদেরও তা একখানে জড়ো করে ফেলেছে। নিজের অজান্তে সত্তরের তরুণ–সাহিত্যেরও এ হয়ে পড়েছে নিজস্ব মুখপাত্র। গল্পকার বা ঔপন্যাসিক সংখ্যা সত্তরের ভাঁড়ারে খুব বেশি ছিল না কিন্তু এই দশকের ভালো কবিদের প্রায় সবাই 'কণ্ঠস্বর'–এর আসরে এসে জড়ো হয়ে গিয়েছিল। এসেছিল আবিদ আজাদ, সানাউল হক খান, রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, জাহিদুল হক, শিহাব সরকার,খান মুহম্মদ ফারাবী,ইকবাল আজিজ, কামাল চৌধুরীর মতো অন্তত তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন কবি।

সত্তরের কবিদের মধ্যে রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, খান মোহাম্মদ ফারাবী, দাউদ হায়দার, শিহাব সরকার, কামাল চৌধুরী, ওয়াসীউদ্দীন আহমদ ছিল আমার ঢাকা কলেজের সরাসরি ছাত্র।

একেক সময় মনে হয় সাহিত্যগোষ্ঠী হিসেবে আমরা ছিলাম সত্যি সত্যি দুর্ভাগা। কত ছোট্ট একটা দল, অথচ মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে কতজন লেখককেই না হারাতে হয়েছিল আমাদের ! অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ' পড়লে দেখা যায় ঐ গোষ্ঠীর লেখকরা হারিয়েছিল মাত্র একজনকে, তাদের প্রিয় গোকুল নাগকে। আর আমরা হারিয়েছিলাম কত প্রিয় মুখ। স্বাধীনতাযুদ্ধের মধ্যেই হারাতে হয়েছিল আবুল কাসেমকে, তার কয়েক বছরের মধ্যেই এক এক করে বিদায় নিয়েছিল হুমায়ুন কবির, শশাঙ্ক পাল,আবুল হাসান,আর খান মোহাম্মদ ফারাবীকে। কিছুদিন পড়ে বিদায় নিয়েছিল রুদ্র মহম্মদ শহীদুল্লা। ঘটনাগুলো আমাদের খুবই শোকাহত করেছিল।

২

আমি সবচেয়ে মুষড়ে পড়েছিলাম ফারাবীর মৃত্যুতে। ও কেবল আমার ছাত্র ছিল না, ছিল আমার খুবই ঘনিষ্ঠ। ঢাকা কলেজে ও যখন আমার ছাত্র তখন ওর বয়স সতেরো-আঠারো, আমার তিরিশ-একত্রিশ। কিন্তু ওর মেধার ধার আর পড়াশোনার পরিমাণ এতটাই ছিল যে ওকে সমবয়সী ভাবতে এতটুকু অসুবিধা হত না। আমরা প্রায় বন্ধুই হয়ে উঠেছিলাম। ওর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্কবিতর্কের অন্তরঙ্গ আর আনন্দঘন মুহূর্তগুলো প্রায়ই মনে পড়ে।

ফারাবীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৭০ সালে, ঢাকা কলেজ বার্ষিকী প্রকাশ করতে গিয়ে। ঐ পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে ওর একটা প্রবন্ধ ও আমার হাতে দেয়। লেখাটা পড়ে আমি যারপরনাই অবাক হয়ে যাই। লেখাটিতে যে যুক্তিময়তা, গভীর উপলব্ধি, মেধার দীপ্তি, দার্শনিক দৃষ্টি এবং বিস্তৃত পড়াশোনার ছাপ ছিল তা সতেরো বছরের একজন কলেজি ছাত্রের কাছ থেকে খুবই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। আমার এমনও সন্দেহ হয় যে অন্য কারো লেখায় নিজের নাম বসিয়ে ও হয়তো কলেজ-বার্ষিকীতে ছাপানোর জন্যে জমা দিয়েছে। আমি গোপনে ওর ব্যাপারে খোঁজখবর নিই এবং জানতে পারি যে ও মাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছে। (পরে আমাদের কলেজ থেকে ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাতেও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল)। কৌতূহলী হয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করে আমি লেখাটার ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত হই। কেবল সন্দেহমুক্ত নয়, আমি স্পষ্ট অনুভব করি যে আমাদের সাহিত্যে একজন শক্তিমান লেখককে আমরা অচিরেই পেতে যাচ্ছি যে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে উজ্জ্বল অবদান রাখবে।

আমার ধারণা মিথ্যা হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই বেরোল ওর ছোটদের গল্পের বই 'মামার বিয়ের বরযাত্রী'। বইটায় রম্যতা, কৌতুক এবং শিশুমনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ অনবদ্য। ছেলেবয়সের যতরকম দুষ্টুমি থাকা সম্ভব তার কোনোটিই যেন বাদ নেই এতে। বইটি লিখেছিল ও ক্লাস এইটে থাকতে। আশ্চর্য : বইটি এখনো বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের দেশব্যাপী বইপড়া কর্মসূচির ক্লাস এইটের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য। ছেলেমেয়েরা বইটি পড়ে এখনও অসম্ভব মজা পায়।

ওর কবিতাও অপূর্ব। ও ছিল মার্কসবাদী বিপ্লবে বিশ্বাসী। ও বিশ্বাস করত রক্তময় সংগ্রামের ভেতর দিয়ে আজকের এইসব নিঃস্বতা উৎরে একদিন মানবজাতির জ্যোতির্ময় ভবিষ্যৎ দেখা দেবে :

বেঁচে আছি আজো হয়তো তাই
মাছি তাড়ানোর মতো দুইহাতে আঁধার সরাই,
পরম বিশ্বাসে এই শীতল মেঝেতে বুক ঘষি
চিৎকার করে বলি : ভালোবাসি আজো ভালোবাসি...

বিপ্লবে আর প্রেমে বিশ্বাস—এ দুটিই ছিল ওর জীবনের দুই তীর :

আমি তো তাদেরই জন্য
সূর্যের দিকে চেয়ে থাকবার
অভ্যাসে যারা বন্য।

আমি তো তোমারও জন্য
কপাল-জ্বালানো যে মেয়ের টিপে
রক্তের ছোপ ধন্য।

ব্যক্তিগতভাবে লাজুক আর একাচোরা ছিল ফারাবী। একটি প্রবন্ধে ওর একটি বর্ণনা দিতে গিয়ে আমি লিখেছিলাম : 'চোখের কোণে মৃদু বিষণ্ন হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি অপ্রতিভ তরুণ'। বর্ণনাটি ভুল নয়, কিন্তু যখন ও বক্তৃতা দিতে মঞ্চে দাঁড়াত তখন ও ছিল সত্যি অসাধারণ। সমস্ত অপ্রতিভতাকে হাওয়ায় উড়িয়ে যেন প্রদীপ্ত এস্রাজের মতো বেজে উঠত ও। ওর বক্তৃতা ছিল পরিশিলিত, বুদ্ধিদীপ্ত ও বেগবান। আমার ধারণা, বেঁচে থাকলে একজন শক্তিশালী ও উঁচুমাপের বক্তা হত ও।

কিন্তু ওর প্রতিভার সবচেয়ে অনিন্দ্য রূপটি ফুটে উঠেছিল ওর প্রবন্ধে। ওর প্রবন্ধ ছিল শাণিত ও দ্যুতিময়। মেধার সুতীক্ষ্ণ তলোয়ারে যে-কোনো বিষয়কে বিস্ময়করভাবে কেটে-কেটে তার মর্মমূলকে অনাবৃত করে ফেলতে পারত ও। ওর যুক্তিপ্রতিভা ও প্রজ্জ্বলিত চৈতন্য ওর ভাষাকেও করে তুলেছিল দীপ্তিময়। সে-সময়কার কাব্য-আক্রান্ত, আবেগস্রস্ত,মন্থর ভ্যাপসা গদ্যের জগতে ওর গদ্য ছিল নতুন বল্লমের মতো চকচকে। একটা প্রবন্ধের শুরুতে ও লিখেছিল : 'এই মৃত্যুচিহ্নিত পৃথিবীতে জীবনের নিকটতম উপমা শিল্প।' লাইনটি বহুদিন পর্যন্ত আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মাত্র আঠারো বছরে লিখেছিল ও লাইনটি।

আমরা সবাই ওর কাছ থেকে যখন বড় কিছু আশা করতে শুরু করছি, তখনই হঠাৎ করে প্রায় বিনা এত্তেলায় চলে গেল ফারাবী। একুশ ছেড়ে বাইশ বছরে পড়তে-না-পড়তেই বিদায় নিল। ১৯৭৩-এর কোনো একসময়ে একদিন পি.জি.হাসপাতালের (এখনকার বঙ্গবন্ধু হাসপাতালের) প্যাথলজি বিভাগে গিয়েছিলাম সেখানকার কয়েকজন ডাক্তার-বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে। গল্প যখন জমে উঠেছে ঠিক সেই সময় একজন সিনিয়র অধ্যাপক বিমর্ষমুখে ঘরে ঢুকেই হাতপা এলিয়ে একটা চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে পড়লেন। একজন তরুণ ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, স্যারের কি মন খারাপ? অধ্যাপক জবাব দিলেন : বইয়েপসি টেস্টে একটা ছেলের কার্সিনোমা পেলাম। খুবই মেধাবী একটা ছেলে ...'

আমি জিজ্ঞেস করলাম : 'কী নাম।' উনি বললেন : 'ফারাবী। ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। আমাদের পরিচিত।' আমি আতঙ্কগ্রস্তের মতো বললাম : 'অবস্থা কেমন?' উনি বললেন : 'ভালো না।'

অধ্যাপকের কথার ঢেউ শেষ হতেই ডাক্তারদের হোঁচট খাওয়া গল্প আবার শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। অসম্ভব কষ্ট হতে লাগল

আমার। এত মেধাবী, সুন্দর সপ্রতিভ আর সম্ভাবনাময় একজন প্রতিভাবান যুবক এভাবে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে ভাবতেও বুকের ভেতরটা ছিঁড়ে যেতে লাগল। আমি ওর সুন্দর ভাবুক আর বিষণ্ন মুখটাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। কত স্বপ্ন কত সাধ তার বাকি। যাদের ভেতর বিভা নেই, আলো–উদ্ভাস কোনোকিছু কিছু নেই, সেসব কোটি কোটি নির্বীজ আর অক্ষম কীটের মতো মানুষ এই পৃথিবীকে শুধু ভারাক্রান্ত করার জন্য থেকে যাবে আর যাদের মধ্যে প্রতিভা আর সম্ভাবনার জ্বলিত দীপ্তি তাদের চলে যেতে হবে, এ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না।

হাসপাতালে ওকে দেখতে গেলাম। আগের মতোই মুখে সেই বিষণ্ন চেনা হাসি ফুটিয়ে ও আমার দিকে অপলভাবে তাকিয়ে রইল। সে চাউনি দুঃসহ। যেন বলতে চায় : স্যার, যাচ্ছি। ওর সেদিনের চাউনির বিষণ্নতা আগের চেয়ে অনেক বেশি জমাট, স্থির। আজও ওর কথা মনে হলেই সেই নিঃশব্দ অপলক চাউনিকে আমি আমার দিকে একইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখি । ও আমাকে খুবই ভালোবাসত। আমাকে দেখে ওর উচ্ছ্বসিত হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ওর চোখ সামান্যভাবে ভিজে উঠলেও সেখান থেকে পানি গড়িয়ে পড়ল না। আমি ওর পাশে গিয়ে বসলাম। টের পেলাম জীবনের মতো মৃত্যুকেও ও অবিচল মর্যাদার সঙ্গেই মোকাবেলা করতে চেষ্টা করছে।

ওকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করা হল। কিন্তু ফল হল না। ক্যানসার ওর শরীরে অনেকদূর ছড়িয়ে গিয়েছিল। বছর পার হওয়ার আগেই ওর মৃত্যু হল। ওর মৃত্যুর দিন আমি ছিলাম ঢাকার বাইরে। যখন ওর মৃত্যুর খবর আমি পেলাম তার অনেক আগেই ওর কবর হয়ে গেছে।

বিশ বছর বয়সের মধ্যেই মোট পাঁচটি বই লিখেছিল ফারাবী। প্রতিটি বই–ই ছিল প্রতিভা আর দীপ্রতায় উজ্জ্বল।

৩

ছোটখাটো লাজুক আর মিষ্টি চেহারার আবিদ আজাদের চেহারা আজও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। ওর মাত্র একটা কবিতা ছাপা হয়েছিল 'কণ্ঠস্বর'–এ, খুব সম্ভব এর অন্তিম সংখ্যায়, কিন্তু তাতেও 'কণ্ঠস্বর'–কে ও আপন করে নিয়েছিল। খুবই আলাদা ধাঁচের কবিতা লিখেছে আবিদ। খুবই নিজস্ব একটা গদ্যছন্দ তৈরি করে নিয়েছে। এই ছন্দ একেবারেই ওর ব্যক্তিগত জীবনানুভূতি থেকে উঠে আসা। ছন্দের মতো কবিতাতেও রয়েছে একটা আলাদা আস্বাদ, মনকে তা একটা রহস্যময় কুয়াশার মতো স্পর্শ বুলিয়ে যায়। আজও ওর বেশকিছু কবিতার লাইন মনের ভেতর গুনগুনিয়ে ফেরে। একটা ছোট্ট কবিতা তুলে দিচ্ছি :

শব্দে ভুল হয়েছিল তাই আমি তোমাকে পাইনি।
শব্দে ভুল হলে এত কিছু হয়? এত অনুতাপ?

অনুতাপে পুড়ে যায় সব। তোমাকে গভীরভাবে
চেয়েছিল আমার হৃদয়। তুমি তা জানোনি আজো।

শব্দে ভুল হয়েছিল, শব্দে-শব্দে সেই ভুল আজো
বেজে যায়—ক্ষমা চাই, নাকি তোমাকেই চাই বলো
দংস্ট্রা-মধুর সাজে, পুষ্পে, বীজে। আমাকে রোপণ
করেছিলে তবে ভুলে? বলো, কেন ভুলে থাকা যায়?

শব্দে ভুল হলে এতকিছু হয়? এত হাহাকার?
শব্দে ভুল হয়েছিল, তাই আমি তোমাকে পাইনি।

[শব্দ ভুল হলে]

৪

ওর মতো অল্প বয়সে না হলেও বেশ অল্প বয়সেই সত্তরের আরেকজন কবিকে আমরা হারিয়েছি, সে রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ফারাবীর মতো রুদ্রও ছিল আমার ঢাকা কলেজের ছাত্র। একাদশ শ্রেণীতে পড়ার সময়কার ওর অল্পবয়সী চেহারাটা এখনো চোখের সামনে ভাসে। মূল নামের আগে 'রুদ্র' শব্দটা ওই সময়েই ও লাগিয়ে নিয়েছিল। ব্যাপারটা নিয়ে আমি আপত্তি করেছিলাম। মূল নামের সঙ্গে ডাকনাম জুড়ে দেওয়াকে আমার কাছে কোনোদিনই খুব সুরুচির মনে হয় না। ওকেও সেটা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু নাম থেকে ঐ শব্দটা বাদ দিতে ও রাজি হয়নি। পরে জানতে পেরেছিলাম 'রুদ্র' ওর ডাকনাম ছিল না। ওটা ছিল ওর নিজেরই পছন্দের শব্দ। ওই শব্দটাকে ও হয়তো ওর নিজের পরিচয় করে তুলতে চেয়েছিল।

গোটা সত্তর দশক ধরে আমি ছিলাম ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক। ওই ম্যাগাজিনে লেখা ছাপাবার সূত্র ধরেই ছাত্রদের মধ্যে যারা লেখালেখি করত তাদের সঙ্গে আমার জানাশোনা হয়ে যেত। ফারাবীর সঙ্গে আমার পরিচয় অমনি করেই। রুদ্রের সঙ্গেও তাই। যদ্দুর মনে পড়ে রুদ্রেরও একটা কবিতা বেরিয়েছিল কলেজ ম্যাগাজিনে। সেই থেকেই ও আমার কাছাকাছি হয়ে পড়ে।

রুদ্রের কবিতা আদৌ রুদ্র ছিল না। এগুলো ছিল সপ্রেম অনুভূতিতে ভরা। দেশের হৃদয়কে অনুভব করা যেত ওর কবিতার ভেতর। বাংলাদেশের মাটির গন্ধ পাওয়া যেত। দুঃখী মানুষের জন্যে একটা অকৃত্রিম অনুভূতি ছিল ওর ভেতর। ওর কবিতা ছিল সেই মমতায় সজীব। শেষের দিকে গান লিখে সুর দিতে শুরু করেছিল। গানের ব্যাপারে কোনো আনুষ্ঠানিক চর্চা ওর ছিল কি না জানিনা, কিন্তু ওর গান মানুষের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। ওর 'ভালো আছি ভালো থেকো, আকাশের ঠিকানা চিঠি লিখো' গানটি আমার ধারণা নব্বই-এর দশকের বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গান।

ওর মধ্যে ছিল একটা জ্যান্ত তরতাজা প্রাণ। ওর সারাশরীর জুড়েই যেন ছিল সে-প্রাণের অস্তিত্ব। এই প্রাণের তাগিদেই ও সারাক্ষণ ছুটে বেড়াত। জীবনের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না ওর। হয়তো সেরকম ইচ্ছাও ছিল না ওর। হৃদয়ের উচ্ছ্রিত মত্ত ঢেউয়ের সঙ্গে ও জীবনের ভেতর লুটোপুটি খেত। ফলে জীবন একসময় পুরোপুরি ওর হাতের বাইরে চলে যায়। জীবনযাপন হয়ে ওঠে বিশৃঙ্খল। তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে বিয়ে হলেও তা বেশিদিন টেকেনি। আস্তে আস্তে নানা ধরনের অসুখ-বিসুখে বিপর্যস্ত হয়ে আসতে থাকে রুদ্র। গ্যাসটিক আলসার তো ছিলই সেই সঙ্গে একটি অচিকিৎস্য স্নায়বিক রোগ ওকে রুগ্ন করে ফেলেছিল। একদিন কিছুটা হঠাৎ করেই মারা যায় ও। তখন ওর বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ।

ও ছিল ভালোবাসায় ভরা বেপরোয়া জীবন্ত মানুষ। সেই ধরনের মানুষ যারা অন্যদের হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসা যেমন দিতে পারে তেমনি অন্যেরাও তাদেরকে নিজেদের ভালোবাসা দিতে পেরে খুশি হয়। ঘৃণা করলেও মানুষ এদেরকে ভালো না-বেসে পারে না। শুনেছি ওর সঙ্গে তসলিমা নাসরিনের সম্পর্ক তিক্ততম পর্যায়ে গিয়ে ওদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হলেও তসলিমা ওর মৃত্যু পর্যন্ত ওকে ভালোবেসেছে। ওর বন্ধুদের হৃদয়ে ওর জায়গা-যে কতখানি ছিল তা ওর মৃত্যুর পর ওদের শোকপ্রকাশের পরিমাণ থেকে বোঝা গিয়েছিল। ওর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে ওর বন্ধুরা ওর জন্মদিন উপলক্ষে যে-'রুদ্রমেলা' চালু করেছিল তা এখনও সাড়ম্বরে টিকে আছে। ওর মৃত্যু ওর বন্ধুদের যে কীভাবে আঘাত দিয়েছিল তা ওর বন্ধু কামাল চৌধুরীর লেখা থেকে বোঝা যায়।

কামাল চৌধুরীও সত্তরের ভালো কবিদের একজন। ওর কবিতার সজীবতা আর নিটোল হৃদয়কে স্পর্শ করে। যতদূর টের পাই, বয়সের সাথে ওর কবিতা পরিণতির দিকেও এগিয়েছে।

৫

পুরু ঢোলাঢালা রঙিন পুলোভার গায়ে শক্তসমর্থ চেহারার দাউদের কথা মনে পড়ে। ওর স্বভাবের মতো ওর চাউনিও ছিল স্পষ্ট ও সরাসরি। নিজেকে নিয়ে ওর কোনো সংকোচ ছিল না। কবিদের মধ্যে এ-ধরনের চরিত্র খুব কম দেখা যায়। ওদের পরিবারের পাঁচ ভাইয়ের পাঁচ ভাই-ই লেখক। জিয়া হায়দার, রশিদ হায়দার, মাকিদ হায়দার, দাউদ হায়দার, জাহিদ হায়দার—সবাই। এজন্যে আমি টেলিভিশনে একবার এদের পঞ্চপাণ্ডব বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। দাউদের কবিতার শব্দগুলোও ছিল ওরই মতো বলিষ্ঠ আর সপ্রতিভ। ওর কবিতার বইয়ের নাম 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ' কথাটা এখন বাংলাদেশের মানুষের বাগধারায় পরিণত হয়েছে। বেপরোয়া

স্বভাবের জন্যে ওকে জীবনে মাশুল দিতে হয়েছে নির্মমভাবে। ১৯৭৪–৭৫–এর দিকে ও দৈনিক সংবাদে একটা কবিতা লেখে, যাতে হযরত মোহাম্মদ (দ.) সম্বন্ধে এমন একটি বিশেষণ ছিল যা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আহত করে। ব্যাপারটা নিয়ে সারাদেশের মৌলবাদী মুসলমানরা সহিংস হয়ে উঠলে ওকে প্রাণ হাতে করে দেশ থেকে পালাতে হয়। ওর নিয়তি হয়ে দাঁড়ায় সালমান রুশদির মতো। কলকাতায় কিছুদিন পড়াশোনা করে এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছে কয়েক বছর কাটিয়ে ও একপর্যায়ে জার্মানিতে চলে যায়। আর কি কখনো ফিরতে পারবে ও জন্মভূমিতে !

* * *

রাজপ্রাসাদের ভোগলিপ্সা ছেড়ে পুরো সাধুসন্ত বনে যাওয়া যেমন রাজনীতি ছেড়ে পুরোপুরি কবি বনে যাওয়া, আমার ধারণা মোটামুটি তেমনি। জাহিদুল হক তাই করেছিল। ও ছিল ফেনীর ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি। সব ছেড়েছুঁড়ে হয়ে গেল পুরোদস্তুর কবি। ষাটের কবি জাহিদ লিখতে আরম্ভ করে সত্তরে। এই সময়েই ওর কবিতা বেরোতে শুরু করে 'কণ্ঠস্বর'–এ। ছোটখাটো চেহারার উদ্যত ও আত্মপ্রত্যয়ী জাহিদের চাউনি সপ্রতিভ ও স্বচ্ছ। কারো সামনে দীনতার অনুভূতি ছিল না ওর। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর জাহিদ কথা বলত পেছন দিকে মাথা ঝাঁকি দিয়ে, সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে।

খুব সম্ভব ১৯৮২–৮৩–র দিকের একটা দিনের কথা। শেরাটন হোটেলে একবার জাহিদকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলাম মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ খানের সঙ্গে। হাবিবুল্লাহ খান একে মন্ত্রী, তায় ছফুট দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, সুদর্শন মানুষ। জাহিদ দেখতে মিষ্টি, কিন্তু তাঁর তুলনায় ছোটখাটো। দুজন দাঁড়িয়ে আছে মুখোমুখি। আমি জাহিদকে হাবিবুল্লাহ খানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম : ইনি হাবিবুল্লাহ খান, শিল্পমন্ত্রী। জাহিদ হাবিবুল্লাহ খানের হাত চেপে ধরে মাথা পেছন দিকে ঝাঁকিয়ে বলল : আই অ্যাম জাহিদুল হক, দ্য পোয়েট। রাজার মতো ওর দৃষ্টি, আত্মপ্রত্যয়ী হাবিবুল্লাহ খানের দিকে সরাসরি প্রসারিত।

কারো কাছে হেরে যাবার পাত্র নয় জাহিদ। একজন আপাদমস্তক কবি ছিল ও। ওর প্রতিটি কথায়, প্রতিটি ভঙ্গিতে, নিজের ওপর এই প্রশ্নাতীত আত্মবিশ্বাসে দৃপ্ত কবিকে অনুভব করা যেত। এমন একজন কবি যে সারাজীবনে অনেক কবিতা লিখবে তা ভাবতে অসুবিধা নেই। সেদিন ওর শ্রেষ্ঠ কবিতা হাতে নিয়ে বুঝলাম, এরই মধ্যে বারোটি কবিতার বই বেরিয়েছে ওর। অধিকাংশ কবিতাই তারুণ্যের স্নিগ্ধ আমেজ লাগা। আগেই বলেছি ওর ভেতর ছিল কবিজন্ম নিয়ে একধরনের দ্বিধাহীন গৌরববোধ। কবিকে ও মানবজাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ বলে মনে করত। সেই আত্মতৃপ্তি আর মর্যাদাবোধ নিয়ে ও সেদিনের মতো আজও রয়ে গেছে।

৬

সুদূর কুষ্টিয়া শহর থেকে এই সময় এসে হাড়ির হল আরেক নিঃসঙ্গ তরুণ, নাম ইকবাল আজিজ। রাস্তা থেকে রাস্তায় সারাদিন হেঁটে বেড়িয়ে বেড়িয়ে যেন জীবনকে স্পর্শ করত

ইকবাল। কুষ্টিয়ার ক্লান্তিকর জীবনের বাইরে ওর সময় কাটানোর একমাত্র জায়গা তখন শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া গড়াই নদীর ধার—তার অফুরন্ত প্রেম তার প্রেরণার উৎস।

ইকবাল লিখেছে : 'আমি ব্যথিত হৃদয়ে [সেই] নদীর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল অনেকদূরে..গভীর থেকে নদী যেন কেঁদে চলেছে।' কিছুদিনের মধ্যেই স্পর্শকাতর হৃদয় নিয়ে সেই নিঃসঙ্গ তরুণটির বিক্ষিপ্ত যাতায়াত শুরু হয়ে গেল ঢাকায়। টাকা থাকলেই ছুটে আসত এখানে, সব উড়িয়ে শেষ করে ফিরে যেত নিজের শহরে। স্বভাবের দিক থেকে প্রথম ষাটের উন্মার্গ তরুণ-লেখকদের সঙ্গে ওর ছিল মিল। আসতে আসতে একসময় সোজা 'কণ্ঠস্বর'-এর সত্তর-দশকী লেখকদের দলে ভিড়ে যায়।

নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা নিয়ে ইকবাল প্রায়ই আমার বাসায় ছুটে আসত। অস্থিরভাবে উঁচু পর্দায় বিপর্যস্তভাবে কথা বলে চলত ও। ইকবালের একটা জিনিশ আমার খুব ভালো লাগে, তা হল ওর চাঁদে-পাওয়া স্বভাব। যখন যা নিয়ে মত্ত হয় তখন তার বাইরে আর কোনোকিছুই প্রায় ওর মনে থাকে না। এতগুলো বছর কবিতা নিয়ে ওভাবেই কাটিয়ে দিয়েছে। বেশকিছু ভালো কবিতা লিখেছে ও। কবিতার বই চারটি। এখন চলছে ওর গল্প লেখা নিয়ে মেতে থাকা দিন।

* * *

সত্তরের কবিদের মধ্যে যার কবিতার মধ্যে আমি একটা নিঃশব্দ স্বপ্নজগত দেখতে পেতাম সে শিহাব সরকার। ওর শব্দদের ফাঁকে ফাঁকে ছিল বনজোছনার রহস্য। নম্র, মৃদুভাষী শিহাব একটি নিজের কাব্যভাষা তৈরি করে নিয়েছিল। কারো সঙ্গে ওর মিল ছিল না। একটা নিজস্ব গদ্যছন্দও ছিল ওর। সত্তুরের কবিতার কথা মনে হলে ওর কবিতার কথা খুব মনে হয়।

* * *

কবি হিশেবে পরে খ্যাতিমান হলেও সত্তরের শুরুতে 'কণ্ঠস্বর'-এ বাংলাদেশের ছোটগল্পের ওপরে একটা চমৎকার প্রবন্ধ লিখে আমাদের মনে আশা জাগিয়েছিলেন অসীম সাহা। প্রবন্ধটার নাম ছিল বেরিয়েছিল সংখ্যায়। দীর্ঘ কালো চুল আর অনবদ্য নিবিড় দাড়িতে সুন্দর গৌরবর্ণ অসীমকে ঋষিপুত্রের মতো লাগত। অসীমের মনের সরলতা তার সুন্দর চেহারায় প্রকাশ পেত। গদ্য তিনি খুব-একটা লেখেননি । কিন্তু আমার ধারণা, কবিতার মতো গদ্যও ছিল তাঁর লেখার সহজাত মাধ্যম।

'কণ্ঠস্বর'-এর কেবলমাত্র একটি সংখ্যায় লিখেও যিনি আমাদের একেবারে ভেতরের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। আমার অনুরোধে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ফররুখ আহমেদের ওপর একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ দিয়েছিলেন তিনি। 'কণ্ঠস্বর'-এর শেষ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে বেরিয়েছিল সেটি। তখন তিনি প্রিয়দর্শন চটপটে তরুণ। সদ্য ডক্টরেট করে বিলেত থেকে ফিরেছেন। লেখাটি তাঁর প্রথমদিকের হলেও ছিল বেশ উজ্জ্বল। লেখাটি আমাকে আশান্বিত করেছিল। তাঁর সম্বন্ধে সকলের জেগে-ওঠা উৎসাহকে পরবর্তীতে তিনি নিরাশ করেননি।

৭

দেড় দশক ধরে 'কণ্ঠস্বর'-এ লিখেছে অনেকে। যাদের সম্বন্ধে বলেছি তাঁরা ছাড়াও লিখেছেন আলী মনোয়ার, মনজুরে মওলা, হাসান ফেরদৌস, হায়াত সাইফ, আবুল মোমেন, আকরাম হোসেন, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, নূরুল করিম নাসিম, সুব্রত বড়ুয়া, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মেসবাহউদ্দীন আহমদ, রাজীব আহসান চৌধুরী, রুবী রহমান, আবু জাফর, শফিউল আলম, সানাউল হক খান, খন্দকার আশরাফ হোসেন, অরূপ তালুকদার, আ.ফ.ম. সিরাজউদ্দৌলা চৌধুরী, আবু করিম, আবু জাফর, আরশাদ আজিজ, আহমদ কবির, ইফতেখারুল ইসলাম, কামাল কাসেদ, জাহিদ হায়দার, দিবাকর বড়ুয়া, নজরুল ইসলাম, নূরুল হক, মখদুম-ই-মুলক মাশরাফী, মহসীন রেজা, মাকিদ হায়দার, মাহবুবুল করিম, মাহবুব সাদিক, মাহমুদ আবু সাইদ, মশুকুর রহমান চৌধুরী, মুহম্মদ সিরাজ, মোশাররফ হোসেন, মোস্তফা মীর, মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল, রবিউল আলম, রবিউল হাসান, শাহাদাত হোসেন বুলবুল, সেলিম রহমান, আশরাফ হোসেন, সুরাইয়া খানম, হাসান ফিরোজ, মহফিল হক, জগন্ময় মজুমদার, মাহবুব হাসান, ইউসুফ শরীফ, নাজিম শাহরিয়ার, সোহরাব হাসান, আবুবকর সিদ্দিক, রাজীব আহসান চৌধুরী, রহমান মাসুদ, তপংকর চক্রবর্তী, ময়ূখ চৌধুরী, তাপস মজুমদার, মাহবুবুল বারী খান, মাশুক চৌধুরী, হাসান হাফিজ, আহসান হামিদ-এমনি অনেকে। এছাড়া বন্ধু, সুহৃদ, শুভানুধ্যায়ী যারা এসেছে গেছে, সহযোগিতা উৎসাহ ভালোবাসা দিয়ে কাছে বা দূর থেকে কৃতজ্ঞ করেছে—তাদের সবাইকে নিয়ে একটি বইয়ে কতটুকু বা লেখা যাবে?

কোথা লিখে রাখি এত প্রিয় নাম
যারা পাশাপাশি একদা ছিলাম?

ও-হ্যাঁ, চারজন উল্লেখযোগ্য লেখকের কথা বলতে-যে ভুলেই বসে আছি দেখছি! হাসান আহমেদ কবির, মঈনুদ্দীন শাহরিয়ার, আবুল খয়ের আর জ. জ.—এদের নাম তো বলাই হয়নি। প্রিয় পাঠক, কানে কানে বলি, এঁদের নাম বাদ পড়ায় মন খারাপ করবেন না। বাংলাসাহিত্যের কোনো ক্ষতিই হয়নি এতে। কারণ এ চারটিই ছিল আমার ছদ্মনাম। মান্নান একবার অহংকার করে লিখেছিল : 'কণ্ঠস্বর' ছিল আমার যৌবন আর 'কণ্ঠস্বর'-এর যৌবন ছিলাম ছিলাম আমি।' গর্বিত প্রেমিকের মতো কথাটা ও বলেছে এজন্যে যে—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটিকা, সমালোচনা মিলিয়ে 'কণ্ঠস্বর'-এ সবচেয়ে বেশি লেখা ছাপা হয়েছিল ওরই। কিন্তু গতকাল হিসেব করে মনে হল আমার যৌবন হিশেবেও 'কণ্ঠস্বর' খুব-একটা খারাপ ছিল না। কারণ এত লেখার পরেও দীর্ঘ এগারো বছরে আমার চেয়ে মাত্র চারটি লেখা বেশি ছাপা হয়েছিল মান্নানের।

শিশিরের শব্দের মতন

দশম বর্ষ শেষ হতে-না-হতেই আমি টের পেলাম 'কণ্ঠস্বর'-এর জন্যে যে-জন্মান্ধ আবেগ আমার অস্তিত্বকে এতদিন কামড়ে ধরে রেখেছিল তার নখর ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে। 'কণ্ঠস্বর'-এর ব্যাপারে আমার আগ্রহ যথেষ্টই কমে এসেছে। কেবলি মনে হচ্ছে : আর কেন? এবার তো পাট চুকানোর সময় হয়ে এল। এ তো কোনো স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা বা গড়পড়তা সাধারণ পত্রিকাও নয় যে একে আজীবন ঘাড়ে করে বয়ে বেড়াতে হবে। এ তো চিরদিনের কাগজ নয়! এ তো লিটল ম্যাগাজিন! এ তো ক্ষণিকের জোনাকি। একটা সাহিত্যের ধারাকে নতুন বাঁকে তুলে দিয়ে বা একটি নতুন লেখকদলকে নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েই তো এর দায়িত্ব শেষ। এর পরে সাহিত্যের পল্বলে যখন আবার বান ডেকে নতুন সাগরের গান জাগবে, নতুন জীবনানুভূতিতে নতুন বোধে ভরে উঠবে সাহিত্যের আঙিনা, সেদিন সেই নতুন কালের নতুন শিহরণকে ভাষা দেবার দায়িত্ব নিয়ে যে-সাম্পান ভাসানো হবে সে তো আমাদের সাম্পান নয়! সে তো অন্য কারো। ভাসাবেও আর কেউ। যে নতুন অচেনা জীবনানুভূতিগুলোকে সমাজের এবং জীবনের ভিত থেকে জেগে উঠতে দেখে আমরা প্রথম ষাটের তরুণেরা একদিন বিস্ময়ে শিউরে উঠেছিলাম, যে-শিহরণের ভাষা দেবার জন্যে আমরা এতদিন অস্বস্ত আর উন্মুখ হয়ে ছুটে বেড়িয়েছি, সে-কাজ তো আমাদের অনেকদূর এগিয়ে গেছে! যে-লেখকেরা সেই নতুন বোধের বিস্ময়গুলোকে তুলে ধরার জন্যে আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে সেদিন অচেনা অতিথির মতো এসে দাঁড়িয়েছিল তারা তো এখন সবাই পরিচিত। কেবল পরিচিত কেন, কেউ কেউ তো প্রতিষ্ঠাই পেয়ে গেছে। তাদের বিশেষ বা আলাদা পরিচর্যার তো আর দরকার নেই!

একটা উর্দু শের পড়েছিলাম এরকম : 'এসো আমি বলে দিচ্ছি ফুল আর কলির মধ্যে পার্থক্য কী?/ ফুল হল যে-কথা বলা হয়ে গেছে, কলি হল যে-কথা এখনো বলা হয়নি।' আমাদের সবাই তো আজ কলি ছেড়ে ফুলের পর্বে ফুটে উঠছে। আমরা তো এখন আর রাত্রির নই; আমরা তো এখন দিনের, প্রভাতের, উদ্ভাসিত পৃথিবীর। তাহলে আর কেন এই পত্রিকা? কেন আর পণ্ডশ্রম? এর পরে যারা আসবে তাদের দায় কেন আমরা নিতে যাব। নতুন চেতনায় জ্বলে উঠে নিজেদের প্রকাশের আবেগে তারা যদি কোনো নতুন আর অবিশ্বাস্য মুখপত্র বের করার বেদনা অনুভব করে, তবে তা তো বের করতে হবে তাদেরই। আমরা যেভাবে আমাদের শ্রমে, সততায়, কষ্টে আমাদের কালের বেদনাগুলোর উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি তাদেরও তো একই রকম সততা শ্রম আর দুঃখকষ্ট দিয়ে তাদের যুগের বেদনা এবং সংকটগুলোর উত্তর দিতে হবে। তাদের করণীয় কাজ আমরা কেন করব? 'যৌবন তোমার আর বেদনা আমার' —এ কেমন কথা?

১৯৭৫–৭৬–এর দিকে আমার সবচেয়ে কাছাকাছি ছিল বরিশালের ইকবাল হাসান। ও তখন সবে বরিশাল থেকে এসেছে, কবিতা লেখে। অসম্ভব আবেগপ্রবণ ইকবালের কথাগুলো অনুভূতিতে অস্থিরভাবে কাঁপত। আমার এ ভাবনার কথা দুয়েকজনের মতো ওকেও বললাম। ইকবালকে বললাম : এতদিন এত কষ্ট করে যে–দুঃখের পতাকা আমরা আকাশে উড়িয়ে রেখেছি,তাকে নিঃশব্দে চলে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। এসো, ঘোষণা দিয়ে অনুষ্ঠান করে তাকে আমরা সাড়ম্বরে বিদায় দিই।

অনেক ভেবেচিন্তে চারুকলা ইনস্টিটিউটের বকুলতলায় আমরা 'কণ্ঠস্বর'–এর বিদায়–অনুষ্ঠানের আয়োজন করলাম। গাছপালায় ছাওয়া এই ভবনটির অনবদ্য স্থাপত্যসৌকর্য আজও আমার মনটাকে প্রথমদিনের মতোই স্নিগ্ধ করে। এমনি একটি ছায়াবহুল মুগ্ধ আঙিনা আমাদের এতদিনের ভালোবাসাকে বিদায়ের জন্যে সবচেয়ে মানানসই হবে মনে করে এই আঙিনাটিকেই আমরা বেছে নিলাম।

সভা বেশি বড় হল না। কেন এই পত্রিকা চালিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না সে–কথা সবাইকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু উপস্থিত লেখকেরা আমার কথায় সায় দিচ্ছে বলে মনে হল না। অনেককে বিমর্ষও দেখাল। কে ঠিক মনে নেই, সম্ভবত নূরুল হুদা, আমার ভাবনা–যে সঠিক নয় তা ব্যাখ্যা করে একটা প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করল। অনেক সমর্থনও পেল সে। অতি–তরুণেরা সভার পেছন দিকে দাঁড়িয়ে পত্রিকা বন্ধের বিরুদ্ধে বারকয় স্লোগানও তুলল । তাদের নেতৃত্বে রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ওদের বয়সী তরুণদের জন্য পত্রিকাটি সত্যি সত্যি দরকার ছিল। রুদ্র আমার ছাত্র ছিল, তাই দল নিয়ে দূরে দাঁড়িয়েই প্রতিবাদ করল, সামনে এল না। মোটামুটি সবার অননুমোদনের ভেতর দিয়েই সভা শেষ হল।

সবাই আমাকে অনুরোধ করল এ নিয়ে আর–একবার চিন্তা করতে। কিন্তু পত্রিকা চালিয়ে যাবার কোনো অর্থই আমি খুঁজে পেলাম না। নিজেকে খুবই ক্লান্ত মনে হতে লাগল। ততদিনে অনেক খাটাখাটনি করে ১৯৭৬ সালের প্রথম সংখ্যা বের করার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিশাল ঐ সংখ্যাটি ছিল কবিতা–সংখ্যা। ঐ সংখ্যায় সত্তুর দশকের প্রায় সব কবির সমাবেশ ঘটেছিল। ঐ সংখ্যাই 'কণ্ঠস্বর'–এর শেষ সংখ্যা।

আমার মনে হয় ঐ সময়ে 'কণ্ঠস্বর' বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালোই হয়েছিল। সবকিছুকে তার পরিপূর্ণ মুহূর্তেই বিদায় নেওয়া ভালো। যৌবনের মৃত্যুই সুন্দর। কবিতা–সংখ্যাটি বের হলে তা নিয়ে হৈচৈ পড়ল। সবাই সংখ্যাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, কিন্তু ও–ই শেষ। এরপরে 'কণ্ঠস্বর' নিয়ে আর কোনো কোলাহল ওঠেনি।

পরিশিষ্ট

'কণ্ঠস্বর' গোষ্ঠীর বলবান প্রতিনিধি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের উৎপীড়নের শিকার হয়ে আমি এই সভার সভাপতিত্ব করতে তিন ঘণ্টার জন্যে অঙ্গীকারবদ্ধ। কুক্ষণে রাজী হয়েছিলাম, কারণ আমার জানা উচিত ছিল যে 'কণ্ঠস্বর'গোষ্ঠীর স্বভাবের মধ্যে শ্রদ্ধা অন্যতম প্রশংসার বিষয় নয়। এবং তাদের বহু রচনায় আমি পড়েছি যে অধ্যাপকবর্গই তাদের কাছে সর্বাপেক্ষা অশ্রদ্ধেয়। তবু মনে মনে শুধু এইটুকু সাহস ছিল যে যেহেতু এই বয়সের তরুণ-সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই আমার ছাত্র এবং যেহেতু তাদের সাহচর্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ্য করা আমার জন্যে বাধ্যতামূলক, সুতরাং এই সভায় তাদের সাহচর্য কয়েকঘণ্টা সহ্য করা দুঃসহ না-ও হতে পারে। আমি বিস্তৃততর প্রচার মাধ্যমে এ-কথা অনেকবার বলেছি যে আমি আশেপাশের লেখকদের পাঠ্য অপাঠ্য অসংখ্য লেখা অনবরত পাঠ করে থাকি। বিশেষ করে 'কণ্ঠস্বর'গোষ্ঠীর লেখা আমি আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। পড়েছি এবং একটা কথা ভালভাবে অনুধাবন করেছি যে, আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে যে নানারকম স্তরের উদ্ভব হচ্ছে, বিলয় হচ্ছে তার একটা স্পষ্ট সন্ধিসূত্র এদের পরিচয়ের মধ্যে নিহিত আছে। আমরা অর্থাৎ আমাদের বয়সী লোকেরা একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে বড় হবার পর অনেককাল ধরে আধিপত্য করে এসেছি এখানকার সম্ভাবনাশীল সাহিত্যের ওপর। এই তরুণদের মধ্যে একজন একবার আমাকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আঘাত করে জানিয়ে দিয়েছিল যে আমার সমগ্র সাংস্কৃতিক চিন্তার মধ্যে একটা মস্তবড় গলদ না হলেও একটা পরস্পরবিরোধিতা আছে। তার মতে, আমরা পাকিস্তানপূর্ব এমন একটা পরিবেশের মধ্যে আমাদের মানস-গঠন করেছিলাম, যার সঙ্গে এখানকার পরিবেশের একটা মূলগত অমিল রয়েছে। মুসলমান সাহিত্যানুরাগী হিসেবে ও একজন মানুষ হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের যে নিপীড়ন আমাকে সবসময় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ক্ষুব্ধ ও সচকিত রাখত এবং যার ফলে যাবতীয় সংস্কৃতিচিন্তার পেছনে সেই উৎপীড়নকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমার মনের মধ্যে একটা বিরূপ মনোভাব কার্যকর ছিল, আমি বহুকাল পরেও সে অভ্যাসটাকে বর্জন করতে পারি নি। আমি যখনি আমার সাংস্কৃতিক চিন্তাকে স্পষ্টতা দান করি সেই বিরুদ্ধচিন্তা, সেই নেতিবাচক চিন্তা আমাকে অধিকার করে। 'কণ্ঠস্বর'গোষ্ঠীর সেই প্রতিনিধি তার স্বভাবী দুর্বিনীত ঔদ্ধত্য নিয়ে আমাকে বলেছে, 'কণ্ঠস্বর'গোষ্ঠীকে গালাগালি করায় কোনো অসুবিধা নেই। নিজেরাই তাদেরকে এত নির্বিচারে গালাগালি করে যে, এ ব্যাপারে সত্যিসত্যিই সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। সেই যুবক আমাকে বলেছে যে, আপনি বরাবর মনে করছেন, আপনার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এক ভিন্ন সম্প্রদায়ের চিন্তা বা তার অনুপ্রবেশের দ্বারা বিঘ্নিত হতে পারে। কিন্তু আমি জন্মের পর সে সম্প্রদায়ের কোনো লোককে আমার সামনে অত্যাচারীরূপে দেখতে পাইনি। আমি জন্মাবধি আমার

স্ব–সম্প্রদায়ের বয়স্ক লোকদেরকেই আমার গলা টিপে ধরে রাখতে দেখছি। দেখছি, তারা আমাকে কথা বলতে দিতে চায় না। আমি তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাই। আমার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে আমি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই ঐ ক্ষমতাবান সম্প্রদায়ের বয়স্ক, বর্ধিষ্ণু, ক্ষয়িষ্ণু, প্রাণহীন শক্তির বিরুদ্ধে। 'কণ্ঠস্বর'গোষ্ঠীর লেখকরা সব জায়গায় হয়ত রচনার পারিপাট্যে প্রবীণদের সেই বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি, হয়ত চিন্তায় সেই সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা আনতে পারেনি, হয়ত পরিপূর্ণ জীবন–দর্শনের ঐক্য ও সঙ্গতি খুঁজে পায়নি যা সাহিত্যের বৃক্ষকে ফলবান করতে পারে, কিন্তু তাই বলে তারা কিছুতেই সহ্য করতে রাজী নয় যে এইসব প্রবীণরাই, বয়স্করাই, ক্ষমতাবানরাই, প্রতারকরাই এ সমাজে মান্য এবং শ্রদ্ধেয়। এরা এ বেড়া ভাঙতে চেয়েছে ; এই অবাঞ্ছিত শক্তিকে তছনছ করে দিতে চেয়েছে। এ ব্যাপারে যতটা তাদের ক্ষমতার মধ্যে ছিল, তার অতিরিক্তও হয়ত তারা করেছে। এর মধ্যে প্রশংসার দিকটি এই যে যা ধ্বংস করা উচিত তার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মনোভাব এরা গ্রহণ করেছিল। হয়ত যেভাবে ধ্বংস করতে পারলে তা সত্যিকার অর্থে কার্যকর হতে পারত এবং তা পরবর্তী সাহিত্যচেষ্টার সৎ, সফল, সুস্থ এবং মূল্যবান ভিত্তি হতে পারত, সেটাকে পুরোপুরি খুঁজে পায়নি। কিন্তু অনুসন্ধানের সততায় ও আক্রমণের অমোঘ লক্ষ্যে এরা নির্ভুল ছিল বলে আমি এদের সর্বান্তকরণে অভিনন্দন জানাই। 'কণ্ঠস্বর'গোষ্ঠীর অস্তিত্বের মূল্য সম্বন্ধে এরা নিজেরাই প্রশ্ন তুলেছে। এবং এই প্রশ্নের ভিত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে মহাদেব সাহা তার প্রবন্ধে কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে সেইসব অমিতাচারী অনিয়মী ও বিপর্যস্ত ভাবের—যে সব ভাবকে ভাষারূপ দেবার সৎ ঐকান্তিকতা তারা অনুভব করছে। এই কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে একটা কথা বেশীও বলেছে। সে বলেছে, আমরা নাগরিক চেতনার এমন একটা জটিল পর্যায়ে উপনীত হয়েছি, ব্যক্তিত্বের শতধাবিভক্ত এমন একটা অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি, যার ফলে সাজানো গোছানো সরল কথায় কোনো জীবনসত্যকে আর প্রকাশ করা যাচ্ছে না। এখন আর শালীন শোভন মার্জিত পরিশীলিত বাক্যে সব কথাকে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা, যে কথা প্রকাশ করবার জন্যে সকলের অন্তরাত্মা ক্রন্দন করছে, তা অনেকাংশে যৌনতা আক্রান্ত, অনেকাংশে কুটিল, অনেকাংশে অশ্লীল, অনেকাংশে জটিল, অথচ সেইটাকে ধরার জন্যেই আমাকে চেষ্টা করতে হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার মধ্যে সন্দেহের স্থল যেটুকু প্রবীণরা তাকে বড় করে তুলবেনই। প্রায় আতঙ্কিত হয়ে অনেক সময় ভাবি, আমি নিজেও যেন কিছুতেই আর এদের ধরতে পারছি না। তবু একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে, 'কণ্ঠস্বর'গোষ্ঠীর সাহিত্যে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের প্রধানতম দুর্বলতাগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আমার বরাবর মনে হয়েছে, গ্রাম্যতা, কূপমণ্ডুকতা, আঞ্চলিকতা, অতিসরলতা––এসবই হচ্ছে আমাদের সাহিত্যের প্রধানতম দুর্বলতা। 'কণ্ঠস্বর'গোষ্ঠী এসবের বিরুদ্ধে নাগরিকতা, বৈদগ্ধ, পরিশীলিত মানস ও সংস্কৃতিপরায়ণতার ছাপ সাহিত্যের ক্ষেত্রে ফেলতে চেষ্টা করছে। এটা সর্বাংশে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু তবু একটা কথা সেই সঙ্গে যুক্ত করা আবশ্যক। 'কণ্ঠস্বর' গোষ্ঠীর এই অতিনাগরিকতার মধ্যে কোথাও ফাঁকি নেই তো? আমার মনে আছে, কয়েকবছর আগে টোকিওর কোনো এক নাট্যসম্মেলনে আধুনিক নাটকের প্রধান পুরোহিত আয়ানেস্কোর নাটকের প্রশংসায় আমরা যখন পঞ্চমুখ, ঠিক সেই

সময় ইসরাইলের প্রতিনিধি মিস বোহাম উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের মতের বিরুদ্ধে একটি বক্তৃতা করলেন। একটা কথা খুব চমৎকার বলেছিলেন তিনি সেদিন। তিনি বলেছিলেন, শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত আত্মকেন্দ্রিকতার প্রখর ও একক সত্তার বক্তব্যের যে সাহিত্য যা স্বভাবতই একটু জটিল, রহস্যময় ও প্রতীকী; তা সর্বদেশে, সর্ব সংস্কৃতিতে সবসময় গ্রাহ্য কিনা। আমরা জানি, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনে এই ধরনের সাহিত্য গ্রাহ্য করা হয় না। তারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে সাহিত্যের স্পষ্ট সুস্থ জীবনবক্তব্য নেই, তা সাহিত্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং যে চিত্রকলায় মানুষের স্বাভাবিক পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হয় না, চিত্রকলা হিসেবে তা অগ্রহণযোগ্য। অবশ্যি যেসব দেশ অন্যরকম অর্থে প্রাগ্রসরশীল তারাও এ–ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন যে ইউরোপীয় সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আজকে যে আঙ্গিকচেতনা স্বাভাবিক, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পরিপ্রেক্ষিতেও তা স্বাভাবিক কিনা। যারা শেক্সপিয়ার পার হয়ে এসেছে, শেলি কীটস বায়রন পার হয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে হঠাৎ একজন টি.এস. এলিয়ট বা একজন ডিলার টমাসের আবির্ভাব আকস্মিক নয়। এ তার স্বাভাবিক শিল্পকলার ক্রমবিকাশের কোনো একটা বিশেষ স্তরের আবির্ভাব। প্রত্যেক সৎ শিল্পীই চেষ্টা করেন পূর্বতন প্রাচীন শিল্পরূপকে পরিত্যাগ করে নিজের বক্তব্যকে সংরাগময় করে তুলতে। প্রত্যেক কবিরও এই একই চেষ্টা। 'কণ্ঠস্বরগোষ্ঠীর বিক্ষুব্ধ–অস্থির চঞ্চল কবিরা প্রাণপণে পুরোনোতন কবিদের বাক্য ও শব্দগঠনের বিশিষ্ট রীতিকে অস্বীকার করেছে। উদাহরণ হিসেবে আবদুল মান্নান সৈয়দকেও নেওয়া যায়। তীক্ষ্ণ এবং আলোকোজ্জ্বল অর্থে সে তীব্র না লিখে দীপ্র লেখে ; বিস্তৃতিকে বিস্তৃতি না বলে আতীতি বলে। আমাকে প্রায়ই ওর রচনা পড়ার জন্যে একাধিকবার অভিধান খুলতে হয়। সব সময় যে হতাশ হই তা নয়, মাঝে মাঝে চমৎকৃতও হই। আমি বুঝতে পারি, ওর অন্তরের যে যন্ত্রণা সে হচ্ছে যে, ও প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করছে যে যারা ওর বিরুদ্ধ চেতনার লোক, যাদের কোনো স্বপ্ন নেই, যারা শুধু পুরাতনের অনুকৃতিকারী, যারা একটা ক্ষয়িষ্ণু সমাজকে চমকের আবরণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, তাদের কোনো কথার সঙ্গে যেন ওর কথা না মেলে। এইটের জন্যেই ও প্রধানত ব্যতিব্যস্ত। এবং এইজন্যেই ওরা সব সময় এইসব অতিব্যবহৃত শব্দ পরিত্যাগ করে স্বাদে, গন্ধে, আঘ্রাণে নতুন এমন কিছু চেতনার সম্পদকে আবিষ্কার করতে চায়। এবং এইটে করার উদগ্র কামনা নিয়েই অভিধান হাতড়ে, ব্যাকরণের দুরূহতম নিয়মকে বাক্য গঠনের মধ্যে টেনে নিয়ে ওরা এমন চমৎকার বাক্য গঠন করছে যা আমার স্তিমিত চেতনাকে আঘাত করে নতুন অর্থ অনুসন্ধানের জন্যে আমাকে প্রলুব্ধ করে। আমি এইটের জন্যেই এদের প্রশংসা করি। ওদের এই প্রয়াস আমাকে একটু কষ্ট করায় বটে, আমাকে অপমানও করে বটে, আমার জ্ঞানের প্রতি কটাক্ষও করে বটে, তা করুক। যদি এই প্রয়াস নিজে একটা সত্য উচ্চারণ করতে পারে এবং অপরকে সত্য উচ্চারণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তবে তা আগামী দিনের সাহিত্যের একটা সত্যিকার বুনিয়াদ গঠন করতে পারবে। ধন্যবাদ।* ২

---

* আলোচনাসভায় জনাব মুনীর চৌধুরী সভাপতি হিসেবে যে মৌখিক ভাষণ দেন, তা প্রায় সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় এখানে মুদ্রিত হল।